The SCIENCE of LIVING
QUANTUM METHOD

মহাজাতকের
ভূমিকা
সম্বলিত

রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা

নাহার আল বোখারী

রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা

মনোদৈহিক সুস্থতা ও সৌন্দর্যের গুরুত্বকে সামনে রেখে দীর্ঘ দুই যুগের গবেষণার ফসল– রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা।

বইয়ের প্রথমভাগে রয়েছে বিভিন্ন আসন, মুদ্রা, প্রাণায়ামের খুব সহজ সাবলীল বিবরণ ও নিয়মাবলি। বইটির দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত সৌন্দর্যচর্চা অধ্যায়টি যে-কোনো সচেতন মানুষের জন্যে অবশ্যপাঠ্য।

ব্যায়াম, পরিমিত ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস, সাজপোশাক, ব্যক্তিত্ব, কথা বলা, হাঁটা-চলার ভঙ্গি, শুদ্ধাচার, মানবিক গুণাবলি, শিক্ষা– এ সবকিছু মিলিয়েই একজন মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আগ্রহী সব বয়সী পাঠক এ বইয়ের দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করে হতে পারেন সুস্থ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত জীবনের অধিকারী।

রোগ নিরাময়ে
কোয়ান্টাম ব্যায়াম
ও
সৌন্দর্যচর্চা

নাহার আল বোখারী

যোগ ফাউন্ডেশন
quantummethod.org.bd

রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা

নাহার আল বোখারী

প্রকাশক

মায়িশা তাবাসসুম
যোগ ফাউন্ডেশন
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৯৩৫৫৭৫৬, ০৯৬১৩-০০২০২৫
০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮
info@quantummethod.org.bd

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর, ২০০৪

১২ তম মুদ্রণ

অক্টোবর, ২০১৯

প্রচ্ছদ

আবদুলাহ জুবাইর

স্কেচ

চন্দ্রজিৎ কুমার

মুদ্রাকর

উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার
ইসলাম ভবন (২য় তলা)
৬৮ ফকিরাপুল বাজার রোড, ঢাকা-১০০০

মূল্য

৩৮৫ টাকা

Rog Niramoye Quantum Beyam
O Shoundaryacharcha
(Quantum Yoga for Health & Beauty Care)

By : **Nahar El Bukhari**

Published by : Yoga Foundation

Price : $20

ISBN 978-984-34-2477-8

উৎসর্গ

মা মোহতারেমা হাসেনা বানু
আধ্যাত্মিক পিতা হযরত শাহ মোহাম্মদ ইলিয়াস শাহ (রহ.)
ও
দাদা হযরত শাহ মোহাম্মদ আফাজউদ্দীন শাহ (রহ.)
এবং আমার কোয়ান্টাম পরিবারের প্রিয় সন্তানদেরকে

কৃতজ্ঞতা

যোগী, মুনি, ঋষি ও সাধককুল
যাঁদের হাজার বছরের চর্চা ও অনুশীলনের ফসল
পরিবেশিত হয়েছে
'রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা' বইয়ে

সূচিপত্র

প্রসঙ্গকথা ☐ ৫
ব্যায়ামের ভূমিকা ☐ ৮
আসন ১ ॥ শবাসন ☐ ১৭
আসন ২ ॥ উজ্জীবন ☐ ১৯
আসন ৩ ॥ বজ্রাসন ☐ ২৪
আসন ৪ ॥ হস্তপদাসন ☐ ২৬
আসন ৫ ॥ ত্রিকোণাসন ☐ ২৮
আসন ৬ ॥ অর্ধচন্দ্রাসন ☐ ৩০
আসন ৭ ॥ জানুশিরাসন ☐ ৩২
আসন ৮ ॥ শশাঙ্গাসন ☐ ৩৪
আসন ৯ ॥ ভদ্রাসন ☐ ৩৬
আসন ১০ ॥ গোমুখাসন ☐ ৩৭
আসন ১১ ॥ উষ্ট্রাসন ☐ ৩৯
আসন ১২ ॥ উত্থিতপদাসন ☐ ৪১
আসন ১৩ ॥ ভুজঙ্গাসন ☐ ৪২
আসন ১৪ ॥ শলভাসন ☐ ৪৪
আসন ১৫ ॥ সর্বাঙ্গাসন ☐ ৪৬
আসন ১৬ ॥ মৎস্যাসন ☐ ৪৮
আসন ১৭ ॥ উৎকট আসন ☐ ৫০
আসন ১৮ ॥ বৃক্ষাসন ☐ ৫১
আসন ১৯ ॥ মুণ্ডকাসন ☐ ৫৩
আসন ২০ ॥ অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন ☐ ৫৪
আসন ২১ ॥ ধনুরাসন ☐ ৫৬
আসন ২২ ॥ পশ্চিমোত্তানাসন ☐ ৫৮
আসন ২৩ ॥ স্বরায়ন ☐ ৬০
আসন ২৪ ॥ অর্ধকূর্মাসন ☐ ৬২
আসন ২৫ ॥ পবনমুক্তাসন ☐ ৬৩
আসন ২৬ ॥ হলাসন ☐ ৬৫
আসন ২৭ ॥ শীর্ষাসন ☐ ৬৭
আসন ২৮ ॥ পদ্মাসন ☐ ৭০
আসন ২৯ ॥ দৃষ্টিদান ☐ ৭২
আসন ৩০ ॥ সুপ্ত ভদ্রাসন ☐ ৭৪
ধৌতি ☐ ৭৫
মুদ্রা ☐ ৭৭
প্রাণায়াম ☐ ৮০
সহজ ব্যায়াম ☐ ৮৩
হাঁটুর ব্যথায় করণীয় ব্যায়াম ☐ ৮৫
সারভাইক্যাল স্পন্ডিলাইটিসে
করণীয় ব্যায়াম ☐ ৮৭
ঘাড়ে ব্যথার রোগীদের জন্যে পরামর্শ ☐ ৮৯
কোমরে ব্যথার রোগীদের পরামর্শ ☐ ৯০
গর্ভবতী মহিলাদের ব্যায়াম ☐ ৯১
প্রসবপরবর্তী ব্যায়াম ☐ ১০১
যে রোগ নিরাময়ে যে ব্যায়াম ☐ ১০৮
সতর্ক থাকুন! ☐ ১১২
উপকৃত হবেন ☐ ১১৩
৩০ মিনিটের প্রোগ্রাম ☐ ১১৪
দেহকাঠামো ॥ মেরুদণ্ড ☐ ১১৭
এন্ডোক্রাইন সিস্টেম ☐ ১২০
স্ত্রী প্রজননতন্ত্র ☐ ১২৪
মাসিক ঋতুচক্র ☐ ১২৬
ঋতু সংক্রান্ত সমস্যা ☐ ১২৯
দেহের সঠিক মাপ ☐ ১৩৬
আহার ☐ ১৩৯
পরিমিত খাদ্য তালিকা ☐ ১৪৪
সকালের নাশতা ☐ ১৪৫
দুপুরের খাবার ☐ ১৪৬
রাতের খাবার ☐ ১৪৭
সৌন্দর্যচর্চার ইতিহাস ☐ ১৪৯
সৌন্দর্যচর্চা ॥ মৌলিক সত্য ☐ ১৫৫
সৌন্দর্যচর্চা ॥ গোসল ☐ ১৫৭
কেশ পরিচর্যা ☐ ১৫৯
ত্বকের যত্ন ☐ ১৬৮
মুখের যত্ন ☐ ১৭০
প্রাকৃতিক উপায়ে রূপচর্চা ☐ ১৭৮
ভ্রুর যত্ন ☐ ১৮৬
চোখের যত্ন ☐ ১৮৭
কানের যত্ন ☐ ১৮৯
ঠোঁটের যত্ন ☐ ১৯০
দাঁতের যত্ন ☐ ১৯২
ঘাড় ও গলার যত্ন ☐ ১৯৪
হাতের যত্ন ☐ ১৯৫
পায়ের যত্ন ☐ ১৯৮
পায়ের বিভিন্ন সমস্যা ☐ ২০১
সৌন্দর্যচর্চায় মেহেদি ☐ ২০৩
কীভাবে সাজবেন ☐ ২০৭
ঋতু অনুযায়ী সাজ ☐ ২১৪
পোশাক ☐ ২১৬
অলংকার বা গহনা ☐ ২২০
আচারব্যবহার ☐ ২২৩
পারিবারিক শিষ্টাচার ☐ ২২৮

প্রসঙ্গকথা

দুই যুগের দীর্ঘ গবেষণা, শ্রম ও ধৈর্যের ফসল রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা। এত নিরবচ্ছিন্ন ও নিরলস যোগব্যায়াম চর্চাকারিণী আমি দেখি নি। ব্যস্ততার অজুহাতে আমার ব্যায়ামচর্চা যেখানে মাঝে মাঝেই বাদ পড়ে যেত, সেখানে তিনি ছিলেন নিয়মিত। সহধর্মিণী হিসেবে ঘরে আসার পর আমার যোগধ্যানচর্চা তার মনে স্বাভাবিক কৌতূহল সৃষ্টি করে। আসনের উপকারিতা বোঝার পর চর্চার কথা আর বলতে হয় নি। আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়ামচর্চায় আমরা হয়ে উঠি একাত্ম।

সংবেদনশীল মন ও তীক্ষ্ণ মেধার কারণে যে-কোনো বিষয় আয়ত্ত করা ও অন্যকে তা বোঝানোর সহজাত ক্ষমতা যোগচর্চার ক্ষেত্রেও তাকে করে তোলে অনন্য। মহিলাদের সুস্থ জীবনের জন্যে যোগচর্চার গুরুত্বকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। ১৯৮৩ সালে যোগ মেডিটেশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশে প্রথম মহিলাদের ব্যায়াম শেখাতে শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি তার চাইনিজ রান্না শেখানোর অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান 'তাই চি চাইনিজ কুকিং সেন্টার' বন্ধ করে মহিলাদের যোগাসন শেখানোর কাজে নিজেকে পুরোপুরি নিবেদিত করেন। বছরের পর বছর শত শত মহিলা তার কাছ থেকে সরাসরি প্রশিক্ষণ নিয়ে চর্চা করে তাদের ব্যাকপেইন, স্পন্ডিলাইটিস, পিরিয়ডের সমস্যাসহ বহু মনোদৈহিক রোগ থেকে মুক্ত হয়েছেন।

যোগাসনের প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে আমরা অনুভব করি, ব্যস্ত জীবনের প্রেক্ষাপটে এর চর্চাকে সহজ করা গেলে আধুনিক মানুষ এ থেকে আরো বেশি উপকৃত হবে। বছরের পর বছর গবেষণা চলতে থাকে অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে। বিভিন্ন আসনে দম নেয়া ও ছাড়া নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে চর্চাকারীরা এক ধরনের বিভ্রান্তি ও জটিলতার সম্মুখীন হতেন। এ বিভ্রান্তি থেকে মুক্তির জন্যে দম স্বাভাবিক রেখে আসনের চর্চা করে দেখা যায়, একই

উপকার চমৎকারভাবে পাওয়া যাচ্ছে। আর এরপর আসনের সাথে যুক্ত করা হলো কোয়ান্টাম মেথড চর্চার আলোকে সুস্থতার মনছবি। উদ্ভাবিত হলো যোগের সবচেয়ে সহজ ও ফলপ্রসূ আধুনিকায়ন–কোয়ান্টাম ব্যায়াম।

রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা বইয়ের প্রথমভাগে আসন, মুদ্রা, প্রাণায়ামের খুব সহজ ও সাবলীল বিবরণ রয়েছে। এর সাথে রয়েছে ব্যায়ামের নিয়মাবলি। প্রতিটি অধ্যায় ভালো করে পড়ে নিলে নিজে নিজেই চর্চা করতে কোনো অসুবিধে হবে না। তবে কোনো জটিল রোগব্যাধি থাকলে ব্যায়াম শুরুর আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া উচিত। এ-ছাড়াও প্রথমভাগে উচ্চতা ও ওজনের চার্ট, ব্যায়ামের সাপ্তাহিক সূচি, সুষম আহার ও খাবার তালিকা, মেরুদণ্ড ও দেহের এন্ডোক্রাইন সিস্টেম ও নারী জননগ্রন্থি নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা প্রতিটি পাঠকের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে এবং স্বাস্থ্য সচেতনতাকে বাড়িয়ে দেবে।

বইটির দ্বিতীয় অংশ অনুসারে সৌন্দর্যচর্চা আপনার আকর্ষণী ক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দেবে। নবীজী (স) বলেছেন, 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক'। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের পরিপূর্ণ পরিচ্ছন্নতা সৌন্দর্যের অর্ধেক। গোসল থেকে শুরু করে কেশ পরিচর্যা, ত্বকের যত্ন, দাঁতের যত্ন, হাত, পা ও নখের যত্ন নেয়ার সাথে সাথে বলা হয়েছে কম খরচে প্রাকৃতিক উপায়ে সৌন্দর্যচর্চার বিস্তারিত প্রক্রিয়া, যা থেকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই উপকৃত হবেন।

রূপচর্চা সংক্রান্ত অনেকগুলো লেখা অধুনালুপ্ত মাসিক ডাইজেস্ট ও উপমা ডাইজেস্টে প্রকাশিত হয়। উলেখ্য, '৮০ ও '৯০-এর দশকে মাসিক ডাইজেস্ট ও উপমা ডাইজেস্টে নিয়মিত 'নীড় সুনিবিড়' ফিচারে তিনি পরিবার, রান্নাবান্না, রূপচর্চা, স্বাস্থ্য ও সংসারের টুকিটাকি তথ্য ও পাঠকের প্রশ্নোত্তর দিয়েছেন। তার এ কলাম তখন পাঠক মহলে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

সৌন্দর্যচর্চা অংশে মেয়েদের জন্যে অতি প্রয়োজনীয় অধ্যায় হচ্ছে 'কীভাবে সাজবেন'। শুধু দামি সুন্দর পোশাক ও অলংকার থাকলেই হয় না। কোন ঋতুতে কোন বেলায় কী ধরনের রং, পোশাক ও সাজ মানাবে–এ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে সুন্দর পোশাকও দৃষ্টিনন্দন না হয়ে দৃষ্টিকটু হয়ে দাঁড়ায়। তাই সাজতে আগ্রহী প্রতিটি নারীই এ অধ্যায় থেকে জানতে পারবেন

কখন কী কাপড় পরবেন, কোন ধরনের মেক-আপ নেবেন, কোন ধরনের অলংকার পরবেন, কোন ধরনের সুগন্ধী ব্যবহার করবেন। আর পারিবারিক শিষ্টাচার অনুসরণ করলে পরিবার হয়ে উঠবে শান্তির নীড়।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বইটি পড়লে যে-কেউ বুঝতে পারবেন লেখিকা ব্যায়াম, সুস্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতাগুলোকেই রাখ-ঢাক না করে পাঠকের উপকারের মানসে সহজসরল ঘরোয়া কথা বলার ঢঙে লিখে গেছেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আগ্রহী পাঠক এ জ্ঞান নির্দ্বিধায় নিজের জীবনে প্রয়োগ করে সুস্থ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত জীবনের অধিকারী হবেন। পরম করুণাময় মানুষের কল্যাণে লেখিকার এই আন্তরিক প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমাদের সবার জীবন হয়ে উঠুক শুভ্র সমুজ্জ্বল।

বিনয়াবনত

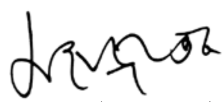

(মহাজাতক)
১ ডিসেম্বর, ২০০৪

ব্যায়ামের ভূমিকা

সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকেই দৈহিক শক্তির জন্যে শরীরচর্চা এবং নিজেকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে সৌন্দর্যচর্চার সূত্রপাত হয়। প্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতা ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় শরীর ও সৌন্দর্যচর্চা ছিল শিক্ষার এক প্রধান অঙ্গ। পরবর্তী প্রতিটি সভ্যতায় আমরা দেখতে পাই এর ছাপ।

আধুনিক কালে বিজ্ঞান আমাদের দৈহিক শ্রমের সুযোগ অনেক কমিয়ে দেয়ায় শরীরচর্চা বা ব্যায়ামের প্রয়োজন আরো বেড়ে গেছে। তাছাড়া যারা দৈহিক শ্রম করেন তাদেরও দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ–যেমন হার্ট, লিভার, কিডনি, অগ্ন্যাশয় ও অন্যান্য এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডগুলো অর্থাৎ দেহের হরমোন প্রবাহ গতিশীল ও সুষম রাখার জন্যেও প্রয়োজন বিশেষ ব্যায়াম। কারণ দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুস্থ ও গতিশীল রাখতে না পারলে পেশিশক্তি এক সময় বিপর্যস্ত হয়ে যায়।

দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্মক্ষমতা গতিশীল করে শরীরকে সুস্থ রেখে নিজেকে যে-কোনো সাধনা বা কর্মোপযোগী করে তোলার লক্ষ্যেই আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে দ্রাবিড় সাধকরা যোগব্যায়াম উদ্ভাবন করেন। বিশ শতকে পাশ্চাত্যে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান অনেক উন্নত, সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ হয়েছে। কিন্তু যোগব্যায়ামের চেয়ে উন্নত কোনো ব্যায়াম তারা আবিষ্কার করতে পারে নি। তাই পাশ্চাত্যে সুস্থ থাকার জন্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিপুল সংখ্যক মানুষ এই যোগব্যায়ামের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। প্রতি বছরই যোগব্যায়ামের প্রতি আগ্রহী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। এমনকি হাঁপানি, হৃদরোগ, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জটিল রোগ নিরাময়ে অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে যোগব্যায়ামের বিভিন্ন আসনকে প্রয়োগ করা হয়েছে।

কোয়ান্টাম ব্যায়াম যোগব্যায়ামেরই সহজ ও আধুনিক সংস্করণ। নতুন সহস্রাব্দের আধুনিক নরনারীর প্রয়োজনকে সামনে রেখে যোগ ফাউন্ডেশনের সিকি শতাব্দীর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার আলোকে এ আধুনিকায়ন করা হয়েছে। যোগের বিভিন্ন আসন কোয়ান্টামের শক্তি নিয়ে হয়ে উঠেছে আরো কার্যকরী ও ফলপ্রসূ। মহিলাদের জন্যে এ বইয়ের ব্যায়ামগুলো বিশেষভাবে গ্রন্থনা করা হলেও একজন পুরুষও তার প্রয়োজনীয় ব্যায়ামগুলো বেছে নিয়ে সমানভাবে উপকৃত হতে পারবেন।

কোয়ান্টাম ব্যায়ামের বিশেষত্ব

প্রচলিত যোগব্যায়ামে বিভিন্ন আসন করার সময় দম নেয়া ও ছাড়ার বিশেষ বিশেষ নিয়ম রয়েছে–যা যথাযথভাবে অনুসরণ করে আয়ত্ত করার জন্যে একজন দক্ষ প্রশিক্ষকের অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে। কিন্তু কোয়ান্টাম ব্যায়াম এই বিশেষ পদ্ধতিতে দম নেয়া ও ছাড়ার ঝামেলামুক্ত। আসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দম স্বাভাবিক রাখতে হয়। ফলে এর চর্চা খুব সহজ। কোনো প্রশিক্ষক ছাড়া অনুশীলন করতেও কোনো অসুবিধে নেই।

দ্বিতীয়ত, কোয়ান্টাম ব্যায়ামে কোয়ান্টাম মেডিটেশনের মাধ্যমে মনের বিশাল শক্তিকে সংযুক্ত করা হয়েছে মনছবি অবলোকনের মধ্য দিয়ে। প্রতিটি আসনের সাথে সে আসনের উপকারিতা সম্পর্কে ভিজুয়ালাইজ বা মনছবি তৈরির মাধ্যমে মনোশক্তিকে সুস্থতা ও নিরাময়ের ক্ষেত্রে চমৎকারভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

যোগ মেডিটেশনের বহুমুখী মনোদৈহিক উপকারিতা বিবেচনা করে ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৬৯ তম সাধারণ অধিবেশনে বিশ্বের ১৭৫টি দেশের সম্মতিক্রমে **২১ জুন-কে বিশ্ব যোগ দিবস** হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে কোয়ান্টাম যোগব্যায়াম এখন পরিণত হয়েছে আধুনিক মানুষের উপযোগী মনোদৈহিক ব্যায়ামে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান সময়ে যোগব্যায়ামের চর্চা প্রতিটি মানুষের জন্যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও অন্যান্য ব্যায়ামের মধ্যে পার্থক্য

কোয়ান্টাম ব্যায়াম মূলত মনোদৈহিক ব্যায়াম। শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক প্রাণবন্ততা–দুটোই অর্জিত হয় এর মাধ্যমে। কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও প্রচলিত সাধারণ ব্যায়ামের পার্থক্য আলোচনা করলেই বিষয়টি আমাদের কাছে আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কোয়ান্টাম ব্যায়াম	অন্যান্য ব্যায়াম
১. কোয়ান্টাম ব্যায়াম করার ফলে দেহ ও মন উভয়ই সুস্থ থাকে। মানসিক প্রশান্তি লাভ করা যায়।	১. প্রচলিত সাধারণ ব্যায়ামে শুধু শরীরের বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরই ব্যায়াম হয়। মানসিক প্রশান্তি অর্জিত হয় না।
২. কোয়ান্টাম ব্যায়ামে শরীরের কোনো ক্ষয় হয় না; তাই ক্ষয়পূরণের জন্যে কোনো বিশেষ খাবারের প্রয়োজন হয় না।	২. সাধারণ ব্যায়ামে শারীরিক ক্ষয়সাধন হয়। ফলে তা পূরণের জন্যে বাড়তি খাবারের প্রয়োজন হয়।
৩. আমাদের শরীরে দুধরনের গ্রন্থি আছে। ১. বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (Exocrine Gland) ও ২. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Endocrine Gland)। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলো থেকে একপ্রকার রস নিঃসৃত হয় যার নাম হরমোন। কোয়ান্টাম ব্যায়াম এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডগুলো সুস্থ রেখে শরীরে হরমোন প্রবাহ স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে।	৩. প্রচলিত সাধারণ ব্যায়ামে শরীরের বাহ্যিক ব্যায়ামই হয়। যেমন, অতিরিক্ত মোটা থাকলে তা কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু হরমোন প্রবাহের ওপর এর কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে না।

৪. কোয়ান্টাম ব্যায়াম মেরুদণ্ডে লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি টান পড়তে সাহায্য করে।	৪. সাধারণ ব্যায়ামে এটা সম্ভব না।
৫. কোয়ান্টাম ব্যায়াম দ্বারাস্নায়ু ও পেশি সুস্থ রাখা সম্ভব।	৫. সাধারণ ব্যায়ামে শুধু পেশিগুলোরই ব্যায়াম করা সম্ভব। স্নায়ুর ব্যায়াম হয় না।
৬. কোয়ান্টাম ব্যায়ামের ফলে দেহ-মন উভয়ই সুস্থ থাকে বলে যৌবনকে দীর্ঘদিন ধরে রাখা সম্ভব হয়। দেহকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসে বলে ত্বকে ভাঁজ পড়ে না।	৬. কিন্তু অন্যান্য ব্যায়াম খুব তাড়াতাড়ি শারীরিক স্থূলতা কমিয়ে নিয়ে আসে বলে ত্বকে ভাঁজ পড়ে বার্ধক্যের ছাপ তাড়াতাড়ি পড়ে।
৭. সর্বোপরি কোয়ান্টাম ব্যায়ামে দেহের গড়ন সুগঠিত ও সুললিত হয়। চেহারায় কান্তি ও লাবণ্য বাড়ে।	৭. সাধারণ ব্যায়ামে দেহ স্লিম হয় কিন্তু চেহারায় লাবণ্য থাকে না। দেখতে কাঠখোট্টা লাগে। তাই আজকাল পাশ্চাত্যে যোগ ব্যায়ামের চর্চা এত দ্রুত বাড়ছে।

তাই শরীর সুস্থ, সুন্দর ও লাবণ্যময় করে গড়ে তোলার জন্যে কোয়ান্টাম ব্যায়ামের কোনো বিকল্প নেই।

শুরু করার আগে জেনে নিন

কোয়ান্টাম ব্যায়ামের নিয়মাবলি

১. কোয়ান্টাম ব্যায়াম করার সময় আরামদায়ক ঢিলেঢালা পোশাক পরুন।

২. একেবারে খালি পেটে অথবা একেবারে ভরপেটে ব্যায়াম করা উচিত নয়। হালকা কিছু খেয়ে ব্যায়াম করা যায়। যেমন : ভেজানো কাঁচা ছোলা (২/৩ টেবিল চামচ) অথবা ২/৩ টুকরো কাঁচা পেঁপে।

৩. খুব শক্ত বা নরম জায়গায় ব্যায়াম করা উচিত নয়। কার্পেট বা কাঁথাকম্বল বিছিয়ে তার ওপর চাদর দিয়ে ব্যায়াম করা উচিত।

৪. পূর্ণ আহারের তিন থেকে চার ঘণ্টা পরে ব্যায়াম করা উচিত।

৫. আলো-বাতাসপূর্ণ খোলা জায়গায় ব্যায়াম করা ভালো।

৬. শীতের সময় ঘরের দরজা-জানালা খুলে বাতাস প্রবেশ করিয়ে নিয়ে ব্যায়াম করুন। এতে প্রচুর অক্সিজেন ঘরে প্রবেশ করবে।

৭. কোয়ান্টাম ব্যায়াম করার সময় কথা বলবেন না, কোনোরকম গানবাজনা শুনবেন না; বরং যে আসন করছেন তার উপকারিতার বিষয়গুলো মনছবি করুন অর্থাৎ কল্পনা করুন ও বিশ্বাসের সাথে অনুভব করুন।

৮. মেয়েদের মাসিক চলাকালে ব্যায়াম করা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ। মাসিক ভালো হওয়ার একদিন পর ব্যায়াম শুরু করুন।

৯. ব্যায়াম শেষে ১০ মিনিট শিথিলায়ন বা শবাসন করে শরীর ঠান্ডা করে নিয়ে গোসল করুন। কারণ ব্যায়াম করার ফলে শরীরে তাপমাত্রা কিছুটা বেড়ে যায়। তাই হঠাৎ করে যাতে গরম/ ঠান্ডা না লাগে সেজন্যে শিথিলায়ন করে পরে গোসল করুন।

১০. প্রতিদিন সম্ভব হলে একঘণ্টা হাঁটুন।

১১. ব্যায়াম করার সময় টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন হলে টয়লেট সেরে ব্যায়াম করুন। পেশাব-পায়খানা চেপে রেখে ব্যায়াম করা উচিত নয়।

১২. ব্যায়ামের আগে পাঁচ মিনিট হলেও শবাসনে শিথিলায়ন করে মনকে স্থির করে নিয়ে ব্যায়াম শুরু করুন।

১৩. প্রতিদিন ১০/১২টি আসন করতে পারেন।

১৪. প্রাণায়াম বা মুদ্রা খালি পেটে করাই ভালো।

১৫. কোয়ান্টাম ব্যায়াম করার সময় শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখুন। শুধু প্রাণায়াম ও মুদ্রায় নিয়ম অনুসারে দম নেবেন ও ছাড়বেন।

১৬. কোনো আসন একবারেই সঠিক ভঙ্গিমায় জোর করে করার চেষ্টা করবেন না। সহজভাবে শরীরকে ব্যায়ামের ভঙ্গিমায় যতটুকু নিতে পারেন ততটুকুই করুন। আস্তে আস্তে শরীর নমনীয় হলে ভঙ্গিমা সঠিক হবে। তা না হলে হঠাৎ করে শরীরের কোনো জায়গায় টান পড়তে পারে কিংবা মেরুদণ্ডে, ঘাড়ে, কোমরে টান লেগে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। তাই ধীরে ধীরে শরীরকে সঠিক ভঙ্গিমায় আনার চেষ্টা করুন।

১৭. কোয়ান্টাম ব্যায়াম যে-কোনো সময়ই করা যায়, তবে সকাল বা সন্ধ্যায় করাই ভালো।

১৮. সন্তানসম্ভবা হলে সহজ আসন, প্রাণায়াম করা গেলেও মুদ্রা করা থেকে পুরোপুরি বিরত থাকতে হবে।

১৯. সন্তান প্রসবের পর মায়েদের যে রক্তক্ষরণ হয়, সেটা সম্পূর্ণ বন্ধ হলে আবার আস্তে আস্তে ব্যায়াম শুরু করা যেতে পারে।

২০. গর্ভাবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শেই ব্যায়াম করা উচিত।

২১. হাই ব্লাডপ্রেশার, স্লিপড ডিস্ক, সারভাইক্যাল বা লাম্বার স্পন্ডিলাইটিস, হার্টের অসুখ, করোনারি থ্রম্বসিস, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, চোখের অসুখ, যেমন রেটিনাল হেমোরেজ ইত্যাদি রোগে যারা ভুগছেন তারা সামনের দিকে ঝোঁকা (forward bending) ব্যায়াম এবং শীর্ষাসন একেবারেই করবেন না।

২২. পেপটিক আলসারের (গ্যাসট্রিক ও ডিয়োডেনাল) রোগীরা পেটের ওপর চাপ লাগে এমন ব্যায়াম করবেন না। যেমন পশ্চিমোত্তানাসন, জানুশিরাসন ইত্যাদি।

২৩. যক্ষ্মা, পুরিসি, জন্ডিস, কিডনির অসুখ হলে পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ব্যায়াম, আসন বা মুদ্রা করা উচিত নয়।

২৪. অপারেশনের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেয়ার তিন মাস পরেই ব্যায়াম করা যায়। প্রথমে হালকা ব্যায়াম ও আস্তে আস্তে সব ব্যায়ামই করা যাবে, যদি শারীরিক অন্য কোনো সমস্যা না থাকে।

২৫. গলব্লাডার, এপেন্ডিকসসহ অন্যান্য অঙ্গের অপারেশন হলে ছয় মাস পরেই ব্যায়াম করা যায়, যদি ডাক্তারের নিষেধ না থাকে।

২৬. হার্টের অপারেশন হলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে ব্যায়াম করা উচিত।

২৭. সামনের দিকে ঝোঁকা কয়েকটি ব্যায়ামের পর অবশ্যই পেছনের দিকে ঝোঁকা একটি ব্যায়াম করা উচিত।

২৮. কথায় বলে, 'মন ভালো তো সব ভালো'। তাই সবসময় মনকে শান্ত ও প্রফুল রাখুন। দুশ্চিন্তামুক্ত প্রশান্ত মনের জন্যে ব্যায়াম এবং তার সাথে মেডিটেশন করুন। ব্যায়াম এবং ধ্যান–দুটো মিলেই সুস্থ ও আনন্দময় জীবন।

২৯. বয়স ৩৫ থেকে ৪০ হলে অবশ্যই রক্তের লিপিড প্রোফাইল করে নিন। ৪০ বছর বয়সের পর বছরে দুবার রক্তের লিপিড প্রোফাইল করুন।

৩০. বয়স ৩৫ থেকে ৪০ হলে একবার ব্রেস্ট-এর মেমোগ্রাফি করে নিন। ব্রেস্ট-এ কোনো চাকা, ব্যথা অনুভব করলে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিন। অবহেলা না করে দ্রুত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। বর্তমানে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও ব্রেস্ট ক্যান্সার দ্রুত হারে বাড়ছে।

৩১. বয়স ৩৫ থেকে ৪০ হলে বোন মিনারেল ডেনসিটি (BMD) টেস্ট করে নিন। হাড়ের ভেতর ক্যালসিয়ামের ঘনত্ব জেনে নিন এবং সেই অনুসারে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি ডায়েটারি ফুড হিসেবে নিয়মিত খান।

৩২. যাদের পরিবারে ডায়াবেটিস রয়েছে, তারা অল্পবয়স থেকেই রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা পরীক্ষা করে জেনে নিন আপনার ডায়াবেটিস হয়েছে কিনা। যেমন এইচ.বি.এ.ওয়ান.সি (HbA1c) এবং ফাস্টিং ব্লাড গ্লুকোজ (Fasting blood glucose) পরীক্ষার মাধ্যমে। বর্তমানে ডায়াবেটিস মহামারি আকার ধারণ করছে। মনে করা হচ্ছে, বাংলাদেশে প্রতি ১০ জনে একজন এ রোগে আক্রান্ত। তাই এ বিষয়ে বইতে যে ব্যায়াম দেয়া আছে, নিয়মিত করুন ও খাদ্যাভ্যাসে সচেতন হোন।

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। সাদা ভাত, সাদা চিনি পরিহার করুন। নিজের যত্ন নিজে করুন।

৩৩. সাধারণত মেনোপজের পর (মাসিক স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেলে) মায়েদের কতগুলো শারীরিক সমস্যা হয়ে থাকে। যেমন শরীর থেকে গরম ভাপের মতো বের হওয়া, মাথার তালু জ্বালা, বুক ধড়ফড় করা, পা ব্যথা, কান দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দ বের হওয়া ইত্যাদি উপসর্গ। এ-ক্ষেত্রে হরমোন পরীক্ষা করে জেনে নিতে হয়। যেমন এফ.এস.এইচ (FSH), টি.এস.এইচ (TSH) হরমোন পরীক্ষার মাধ্যমে।

৩৪. মেনোপজ-পরবর্তী আরেকটি সমস্যা হলো অস্টিও আর্থ্রাইটিস। এর ফলে হাতের আঙুলের গিঁটসহ অন্যান্য সব গিঁট ফুলে যাওয়া ও ব্যথা অনুভব করা। এ থেকে মুক্তির জন্যে নিয়মিত ব্যায়াম ও মেডিটেশন করুন, উপশম পাবেন।

৩৫. যদি আপনার কোনো মানসিক সমস্যা থাকে কিংবা এলোমেলো ভাবনা-চিন্তা, অস্বাভাবিক আচরণ করেন, বহুদিন মনোকষ্টে ভোগার পর এমন হয়, তাহলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। কাউন্সেলিং সেবা নিন। ওষুধপত্র ডাক্তারের পরামর্শে খেতে পারেন। জ্বীন-ভূতে ধরেছে কিংবা কেউ তাবিজ-কবচ করেছে, এটা অনেক মানুষের ভুল ধারণা। এসব ভেবে হুজুর বাড়ি, পানিপড়া ইত্যাদির পেছনে ছুটে টাকা-পয়সা নষ্ট না করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।

৩৬. সার্বিক মনোদৈহিক সুস্থতার জন্যে সব ধরনের আসক্তি থেকে মুক্ত থাকুন। বর্তমান সময়ের ভার্চুয়াল ভাইরাসে আপনি আক্রান্ত হলে কাউন্সেলিং সেবা নিন। পরিবারের সাথে একাত্ম থাকুন। কেননা পরিবার আপনার ভালবাসার ও প্রশান্তির শেকড়।

আসন পদ্ধতি
কার্যকারিতা ও উপকারিতা

কোয়ান্টাম ব্যায়ামের আসনগুলোকে আমরা মূলত দুভাগে ভাগ করতে পারি।

এক. ধ্যানাসন। দুই. স্বাস্থ্যাসন।

ধ্যানাসনগুলো আমাদের প্রাচীন সাধকরা ধ্যান-মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে সিদ্ধি বা কামেলিয়াত হাসিলের জন্যে ব্যবহার করতেন। আর স্বাস্থ্যাসনগুলো মূলত শরীরকে পরিপূর্ণভাবে সুস্থ রেখে দীর্ঘ সাধনা চালিয়ে যাওয়ার উপযোগিতা অর্জনের জন্যে চর্চা করা হয়েছে। যোগ সাধনায় ৪০০০-এর বেশি আসনের চর্চা করেছেন সাধকরা। এর মধ্যে বহু আসন শুধু দক্ষ গুরুর তত্ত্বাবধানেই অনুশীলন করা সম্ভব। আর স্বাভাবিক সুস্থতার জন্যে এতগুলো আসন অনুশীলনের প্রয়োজনও নেই।

তাই আমরা এ বইটিতে আধুনিক মানুষের সুস্থ দেহ ও সুন্দর প্রাণোচ্ছল মনের অধিকারী হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় আসনগুলোকেই সন্নিবেশিত করেছি।

ধ্যানাসন ও স্বাস্থ্যাসনের মধ্যে মূলগত পার্থক্য হচ্ছে–ধ্যানাসন সাধারণভাবে যে-কোনো শারীরিক ব্যাধি নিয়েই করা যায়। যেমন : বজ্রাসন, পদ্মাসন, সুখাসন, গোমুখাসন, শবাসন। কিন্তু স্বাস্থ্যাসনে বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধিনিষেধ রয়েছে। তাই নিজের রোগ সম্পর্কে জেনে নিয়ে সেই প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্যাসনগুলো অনুশীলন করা উচিত।

আসন ১

সহজ শিথিলায়ন বা শবাসন

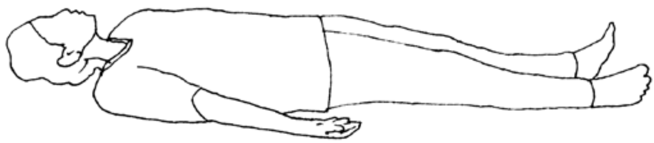

সহজ শিথিলায়ন বা শবাসন ব্যায়ামের পূর্বে এবং ব্যায়ামের পরে পাঁচ থেকে ১০ মিনিট করতে পারেন। শব অর্থ লাশ। অর্থাৎ মৃত বা লাশের মতো পড়ে থেকে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে শরীর পুরোপুরি শিথিল বা নরম করে দেয়া অর্থাৎ হাত-পা পুরোপুরি ছেড়ে দিলে যেমন লাগে সেভাবে আপনি চিৎ হয়ে শুয়ে পা দুটো লম্বা করে ছড়িয়ে দিন। তবে দুপায়ের মাঝে এক হাত পরিমাণ ফাঁক রাখলে ভালো। হাত দুটো শরীরের দুপাশে ও হাতের তালু ওপরের দিকে রাখুন। এরপর চোখ বন্ধ করে গভীরভাবে তিন/ চার বার লম্বা দম নিয়ে ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। তারপর স্বাভাবিকভাবে দম নিতে নিতে ভাবুন, আপনার শরীর পুরোপুরি শিথিল অর্থাৎ নিস্তেজ হয়ে আসছে, বেশ আরাম লাগছে।

এবার কল্পনা করুন, আপনি একটি সুন্দর মনোরম ফুলের বাগানে সবুজ নরম ঘাসের ওপর শুয়ে আছেন। গ্রীষ্মকাল হলে ভাবুন, দখিনা বাতাস আপনার শরীরকে জুড়িয়ে দিচ্ছে আর শীতকাল হলে ভাবুন, ঈষদুষ্ণ বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। বেশ আরাম আরাম লাগছে। মন থেকে সকল দুশ্চিন্তা দূর করে দিন। কল্পনার রাজ্যে কিছুক্ষণ বিচরণ করুন। শবাসন করাকালে বিশ্বাসের সাথে ভাবুন, আপনার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ। আপনার খুব আরাম লাগছে। এভাবে ভাবতে ভাবতে ঘুম এসে গেলেও ক্ষতি নেই।

সহজ শিথিলায়ন বা শবাসন উপুড় হয়ে শুয়েও করতে পারেন।

তবে ব্যায়াম চলাকালে উপুড় হয়ে ব্যায়াম করার সময় যদি একটু বিশ্রাম নিতে চান তখন উপুড় হয়ে এক মিনিট শবাসন করতে পারেন। সাধারণভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে শবাসন বা সহজ শিথিলায়ন করবেন।

উপকারিতা

১. ব্যায়ামের পর সহজ শিথিলায়নে দেহ-মন উভয়ই বিশ্রাম পায়। সহজ শিথিলায়নের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যে, আমরা যখন দাঁড়িয়ে বা বসে থাকি তখন শরীরের ওপরের অংশে রক্ত চলাচল চালু রাখতে হৃৎপিণ্ডকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। কিন্তু সহজ শিথিলায়নের সময় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব শরীরের সমস্ত অংশের ওপর সমান থাকে বলে রক্ত চলাচল সহজ হয় এবং শরীরের সকল অংশে হৃৎপিণ্ড বেশি পরিশ্রম না করেই রক্ত সরবরাহ করার সুযোগ পায়। ক্লান্তি দূর হয়ে সহজেই সতেজ অনুভূতি চলে আসে।

২. যারা শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম বেশি করেন, তাদের জন্যে সহজ শিথিলায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করে ক্লান্তিবোধ করলে ১০ মিনিট সহজ শিথিলায়ন করে নিলে পুনরায় পড়াশোনায় মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে। গর্ভবতী মায়েদের জন্যে সহজ শিথিলায়ন খুবই উপকারী। তাতে শরীর-মন দুটোই ভালো থাকে।

আসন ২

উজ্জীবন

ব্যায়াম শুরু করলে প্রথমেই শরীরটাকে উজ্জীবিত বা 'ওয়ার্ম-আপ' (warm-up) করে নেয়া ভালো। দেহকে একটু উজ্জীবিত করে নিলে দেহ নমনীয় হবে এবং পরবর্তী আসনগুলো করা সহজ হবে। ১৫ ধাপে বিভক্ত এই অনুশীলনীর মাধ্যমে আপনার পেশি ও হাড়ের জয়েন্টের জড়তা কেটে যাবে এবং আপনার শরীর ব্যায়াম ও আসনের জন্যে প্রস্তুত অবস্থায় চলে আসবে। যে-কোনো ব্যায়ামের আগেই একটু ওয়ার্ম-আপ প্রয়োজন। এই ১৫ ধাপের অনুশীলন শরীরকে চমৎকারভাবে ওয়ার্ম-আপ করে বলেই একে 'উজ্জীবন' বলা হয়। এই অনুশীলনকালে দম স্বাভাবিক থাকবে।

উজ্জীবন : ছবি– ১

উজ্জীবনের ১৫ ধাপ

পদ্ধতি : দুপায়ের মাঝখানে চার আঙুল ফাঁক রেখে দুহাত শরীরের দুপাশে রেখে বুক টান করে সোজা হয়ে দাঁড়ান।

১. বুক টান করে সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় দুহাত সোজা ওপরে তুলুন। খেয়াল রাখুন আপনার শরীরের ওজন যেন দুপায়ের ওপর সমানভাবে পড়ে। কোনো দিকে কাত হবেন না বা কোনো পায়ে ভর বেশি দেবেন না।

২. ধীরে ধীরে হাত ও মাথা পেছন দিকে নিতে থাকুন। কোমর থেকে মেরুদণ্ড পেছন দিকে বেঁকে যাবে। হাঁটু ভাঙবে না। পা সোজা থাকবে। ঘাড় থাকবে শিথিল। যতদূর সম্ভব শরীর পেছন দিকে বাঁকিয়ে দিন।

উজ্জীবন : ছবি– ২

৩. পুরো সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ুন। কপাল যতদূর সম্ভব হাঁটুর কাছাকাছি নিয়ে আসুন। হাতের আঙুল মেঝে স্পর্শ করবে।

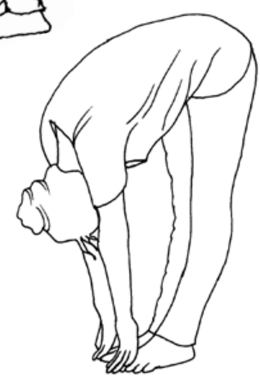

উজ্জীবন : ছবি– ৩

৪. হাঁটু ভেঙে কোমর ও মাথা মাটির সমান্তরালে নিয়ে আসুন। হাতের আঙুল ও করতল এবার সুন্দরভাবে মেঝে স্পর্শ করবে। হাতের ওপর কিছুটা ওজন থাকবে।

উজ্জীবন : ছবি– ৪

৫. দুহাতের ওপর ভর দিয়ে প্রথমে ডান পা পেছন দিকে নিন।

উজ্জীবন : ছবি– ৫

৬. বাম পা-ও পেছন দিকে নিন। পুরো শরীরের ওজন হাত ও পায়ের আঙুলের ওপর পড়বে। মাথা ও কোমর মেঝের সমান্তরাল থাকবে।

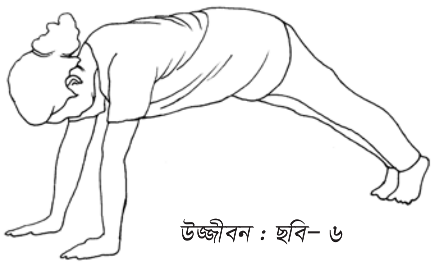

উজ্জীবন : ছবি– ৬

৭. পা ও ঊরু মাটির সাথে লেগে থাকবে। কোমর থেকে মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে হাতে ভর দিয়ে মাথা যতদূর সম্ভব পেছন দিকে নিয়ে যান।

উজ্জীবন : ছবি– ৭

৮. সমস্ত শরীর মেঝেতে লাগিয়ে দিন। পা হাঁটু পেট বুক কপাল–সব মেঝেতে লেগে যাবে, হাত দুটো থাকবে মাথার দুপাশে।

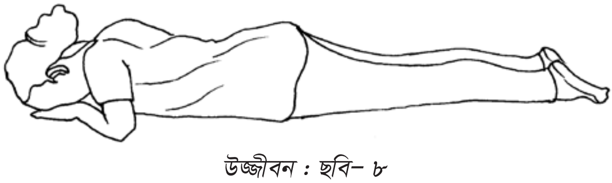

উজ্জীবন : ছবি– ৮

৯. হাতের ওপর ভর দিয়ে আবার মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে দিন। হাঁটু জোড়া লেগে থাকবে। (৭নং অবস্থানের মতো)

উজ্জীবন : ছবি– ৯

১০. আগের মতো দুহাত ও দুপায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে কোমর ও মাথা মাটির সমান্তরাল রাখুন। (৬নং অবস্থানের মতো)

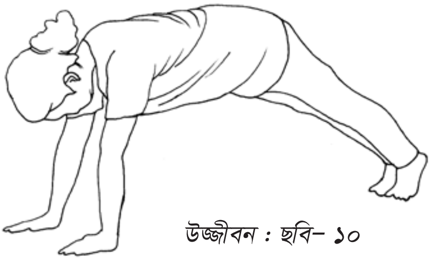

উজ্জীবন : ছবি– ১০

১১. প্রথমে ডান পা হাতের সামনে আনুন। বাম পায়ের পাতা পেছনে মাটিতে লেগে থাকবে।

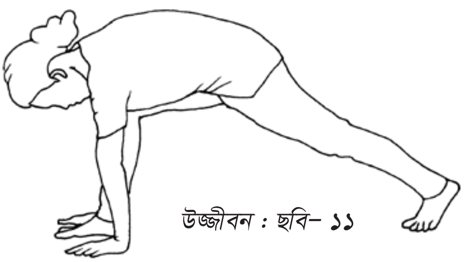

উজ্জীবন : ছবি– ১১

১২. হাঁটু ভাঙা অবস্থায় দুহাতের পাশে দুই পা রাখুন। কোমর ও মাথা মেঝের সমান্তরাল থাকবে। (৪নং অবস্থানের মতো)

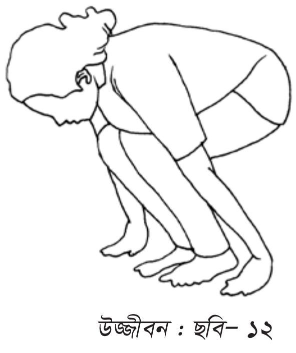

উজ্জীবন : ছবি– ১২

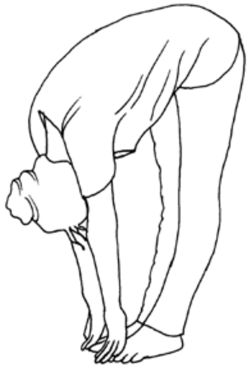

১৩. দুপায়ের ওপর ওজন রেখে হাঁটু সোজা করুন। কপাল হাঁটুর কাছাকাছি থাকবে। হাতের আঙুল মাটি স্পর্শ করবে। (৩নং অবস্থানের মতো)

উজ্জীবন : ছবি– **১৩**

উজ্জীবন : ছবি– **১৪**

১৪. হাঁটুর কাছ থেকে মাথা উঠিয়ে মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে একেবারে পেছন দিকে মাথা হেলিয়ে দিন। হাত দুটো মাথার পেছনে থাকবে। (২নং অবস্থানের মতো)

১৫. এবার বুক টান করে হাত সোজা ওপরের দিকে আনুন। (১নং অবস্থানের মতো)

এবার দুহাত শরীরের দুপাশে রাখুন। আরাম করে দাঁড়ান। এভাবে পাঁচ থেকে ১০ বার করতে পারেন।

উজ্জীবন : ছবি– **১৫**

আসন
৩

জাজেন বা বজ্রাসন

পদ্ধতি : প্রথমে দুই হাঁটু ভেঙে বসুন। দুপায়ের পাতা পেছন দিকে চিৎ হয়ে মাটির সাথে লেগে থাকবে। মেরুদণ্ড সোজা রেখে নিতম্ব দুপায়ের গোড়ালির ওপর রেখে বসুন, যেন দুই হাঁটু জোড়া লেগে থাকে। এবার দুহাত টানটান করে হাতের পাতা এবং আঙুলগুলো সোজা রেখে হাঁটুর ওপর উপুড় করে রাখুন (ছবির মতো করে)। এভাবে যতক্ষণ পারেন শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে বসে থাকুন। প্রথম দিকে পায়ে টান অনুভব করতে পারেন। বেশি চাপ বা ব্যথা অনুভব করলে পা সোজা করে একটু বিরতি দিন। তারপর আবার পা ভাঁজ করে আসনে বসুন। যখন সহজে করতে পারবেন তখন ইচ্ছে করলে ১০ থেকে ৩০ মিনিট আপনি জাজেন বা বজ্রাসনে বসে থাকতে পারেন।

বজ্রাসন : ছবি– ১

উপকারিতা

১. হাঁটুতে ইউরিক এসিড জমে হাঁটু ও ছোট ছোট অস্থি সন্ধিস্থলে বাতজনিত কোনো ব্যথা থাকলে নিয়মিত জাজেন বা বজ্রাসনে তা দূর হয়ে পা-কে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

২. তিন বেলা খাবারের পর পরই জাজেন বা বজ্রাসনে বসলে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়।

৩. বজ্রাসনে বসে প্রতিদিন ১০০ বার চুল ব্রাশ করলে সহজে চুল পাকে না এবং চুল পড়াও কমে যায়।

৪. দেহের নিচের অংশ সুগঠিত করতে জাজেন বা বজ্রাসন খুবই সহায়ক।

৫. এছাড়া রাতে খাবারের পর বজ্রাসনের অভ্যাস করলে হজমশক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে সুনিদ্রা আসতে সাহায্য করে।

বি.দ্র. : *মনে রাখতে হবে, কোনো আসনই জোর করে একবারে সঠিক ভঙ্গিমায় করার চেষ্টা করা ঠিক নয়। ধীরে ধীরে সঠিক ভঙ্গিমায় নিয়ে আসতে হবে।*

আসন ৪

হস্তপদাসন

পদ্ধতি : প্রথমে মেরুদণ্ড সোজা রেখে দুপায়ের মধ্যে চার/ পাঁচ আঙুল পরিমাণ ফাঁক করে দাঁড়ান। এবার হাত দুটো মাথার ওপরে সোজা করে তুলুন। দুই কানের সাথে দুহাত লাগিয়ে রাখুন। হাতের তালু সামনের দিকে থাকবে। (ছবির মতো)

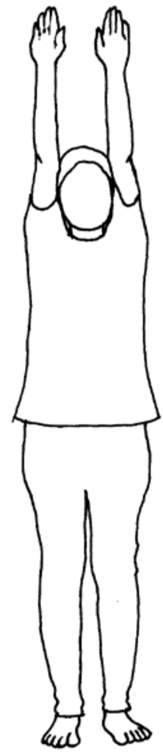

হস্তপদাসন : ছবি– ১

এবার ধীরে ধীরে শরীরের ওপরের অংশ সামনের দিকে নামাতে থাকুন। মাথা নুইয়ে মুখ হাঁটুর কাছে নিয়ে এসে কপাল হাঁটুর সাথে লাগিয়ে রাখুন। এবার দুহাত দিয়ে দুপায়ের গোড়ালির একটু ওপরে ধরুন। খেয়াল রাখুন যাতে হাঁটু ভেঙে না যায়। হাঁটু সোজা করে রাখতে হবে এবং পেট ও বুক উরুর সাথে লেগে থাকবে। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে ১০ থেকে ২০ সেকেন্ড এভাবে থাকুন। তারপর ধীরে ধীরে শরীরকে আগের অবস্থায় নিয়ে আসুন। এভাবে তিন থেকে পাঁচ বার করতে পারেন।

মনে রাখতে হবে, প্রথম দিকে শরীর সঠিক ভঙ্গিমায় না-ও আসতে পারে। তবে জোর করে শরীরকে সঠিক ভঙ্গিমায় নিতে যাবেন না। এতে উপকারের চেয়ে ক্ষতি হতে পারে। তাই ধীরে ধীরে সঠিক ভঙ্গিমায় আসুন। ক্লান্তি বোধ করলে প্রত্যেক ব্যায়ামের পরই সহজ শিথিলায়নে বিশ্রাম নিতে পারেন।

উপকারিতা

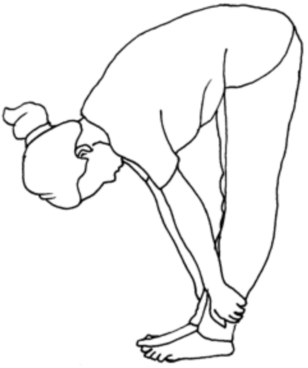

হস্তপদাসন : ছবি– ২

১. যারা লম্বা হতে চান তারা এ আসন করে উচ্চতা বাড়াতে পারেন। ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে-মেয়েরা এ ব্যায়াম করে উচ্চতার ব্যাপারে বেশি উপকৃত হবেন।

২. হস্তপদাসনে মেরুদণ্ড সহজ ও নমনীয় থাকে। দেহের অসমতা দূর হয়।

৩. নিয়মিত অভ্যাসে পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ রোগ হতে পারে না।

৪. পেটে চর্বি জমতে পারে না। অপ্রয়োজনীয় চর্বি কমিয়ে দেহকে সুন্দর করে তোলে।

হস্তপদাসন : ছবি– ৩

৫. নিয়মিত হস্তপদাসন অভ্যাসে পেটের অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ–যথা পাকস্থলী, যকৃৎ, পীহা ও ক্ষুদ্রান্ত্রে চাপ পড়ায় তাদের ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে সাহায্য করে।

৬. যারা নিু রক্তচাপে ভুগছেন তারা এ আসনটি করলে উপকার পাবেন।

বি.দ্র. : *যাদের উচ্চ রক্তচাপ, পীহা ও যকৃৎ স্বাভাবিকের চেয়েও বড়, যাদের হৃদরোগ, স্লিপড ডিস্ক, সারভাইক্যাল বা লাম্বার স্পন্ডিলাইটিস ও চোখের কঠিন অসুখ রয়েছে তারা এ আসনটি করবেন না।*

আসন ৫

ত্রিকোণাসন

পদ্ধতি : প্রথমে শরীর সোজা রেখে দাঁড়ান। এবার দুই পা আড়াই থেকে তিন ফুট পরিমাণ ফাঁক করুন। এরপর হাত দুটো শরীরের দুপাশে কাঁধ বরাবর উঁচু করুন। হাতের তালু নিম্নমুখী করে রাখুন। (১নং ছবির মতো)

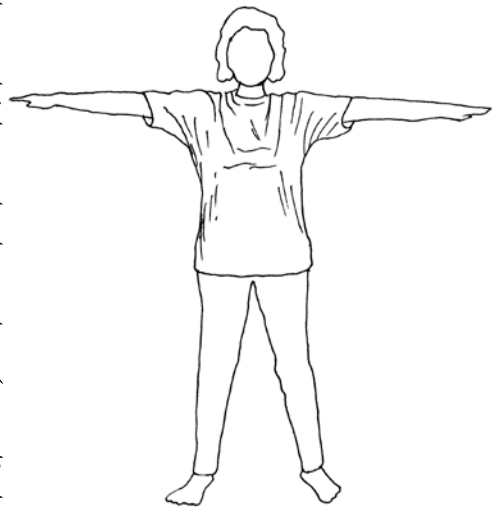

ত্রিকোণাসন : ছবি– ১

এবার পা থেকে কোমর পর্যন্ত শরীর সোজা রেখে সামনে/পেছনে না ঝুঁকে আস্তে আস্তে ডান দিকে বাঁকা করুন। খেয়াল রাখুন যেন হাঁটু না ভাঙে। এবার আস্তে আস্তে ডান দিকে বাঁকিয়ে ডান পায়ের পাতা স্পর্শ করতে চেষ্টা করুন। সহজভাবে যতটুকু হাত যায় ততটুকুই রাখুন। কিছুদিন অভ্যাস করলে আসনটি সঠিক ভঙ্গিমায় করতে পারবেন। এভাবে প্রথমে ডানদিকে, পরে বামদিকে করুন। একবার ডানে আর একবার বামে মিলে হয় এক প্রস্থ। এভাবে তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ করতে পারেন।

প্রত্যেক পাশে অবস্থানে সময় নিন ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড। দম স্বাভাবিক রাখুন। যেদিকে বাঁকাবেন সেদিকের হাত নিচে ও অপর হাত মাথার ওপরে তুলে রাখুন। দৃষ্টি থাকবে ওপরের হাতের আঙুলে। (২নং ছবির মতো)

উপকারিতা

১. এ আসনটি কোমরের চর্বি কমিয়ে কোমরকে সরু ও সুন্দর করে তোলে।

২. মেরুদণ্ডে আড়াআড়ি টান পড়ায় মেরুদণ্ড নমনীয় ও কমনীয় থাকে। মেরুদণ্ডে রক্ত চলাচল বাড়ায়, পুষ্টি যোগাতে সাহায্য করে।

৩. পিঠের মাংসপেশিকে মজবুত রাখে। ফলে পিঠে ব্যথাবেদনা হতে পারে না।

৪. সায়াটিকা রোগ প্রতিরোধ করে।

৫. হাত পা বুক ও পিঠের গঠন সুন্দর করে।

৬. কিডনিতে রক্ত চলাচল বাড়ে। ফলে কিডনির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৭. এছাড়াও এড্রিনাল গ্ল্যান্ডকে সুস্থ ও সক্রিয় রাখতে এ আসনটি নিয়মিত করা দরকার। কারণ, এড্রিনাল গ্ল্যান্ড কোনো কারণে অসুস্থ হলে রক্তচাপ কমে যেতে পারে, পরিপাক ক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটতে পারে। ক্ষুধা কমে যেতে পারে, অলসতা আসতে পারে। তাই আসনটি প্রতিদিনই করা দরকার।

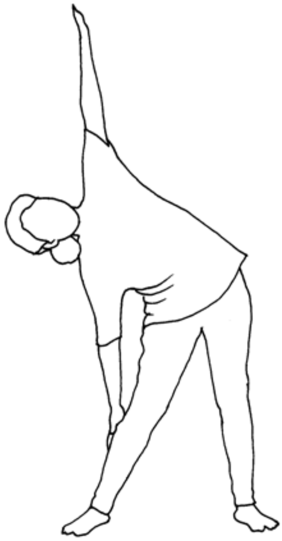

ত্রিকোণাসন : ছবি– ২(ক)

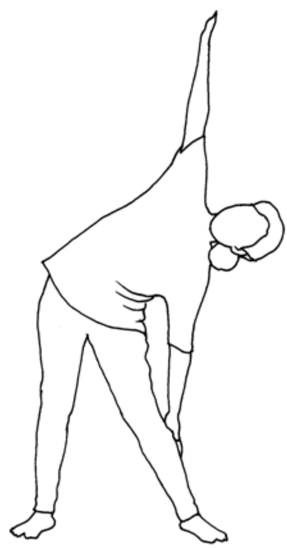

ত্রিকোণাসন : ছবি– ২(খ)

আসন ৬

অর্ধচন্দ্রাসন

পদ্ধতি : প্রথমে দুই পা ও মেরুদণ্ড সোজা করে দুপায়ের পাতা কাছাকাছি রেখে দাঁড়ান। এবার দুহাত মাথার ওপরে তুলুন। হাত দুটো যেন কানের সাথে লেগে থাকে। দুহাতের তালু একত্রে চেপে রাখুন (১নং ছবির মতো)। এবার কোমর থেকে শরীরের ওপরের অংশ ধীরে ধীরে ডান দিকে বাঁকান (২নং ছবির মতো)। একই ভাবে ১নং ছবির মতো অবস্থানে ফিরে এসে কোমর থেকে শরীরের ওপরের অংশ ধীরে ধীরে বাম দিকে বাঁকান (৩নং ছবির মতো)। দম স্বাভাবিক রাখুন। খেয়াল রাখুন যেন শরীর সামনে কিংবা পেছনে ঝুঁকে না যায়।

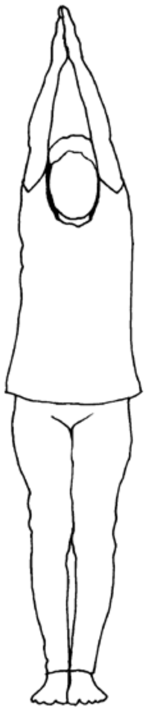

অর্ধচন্দ্রাসন : ছবি– ১

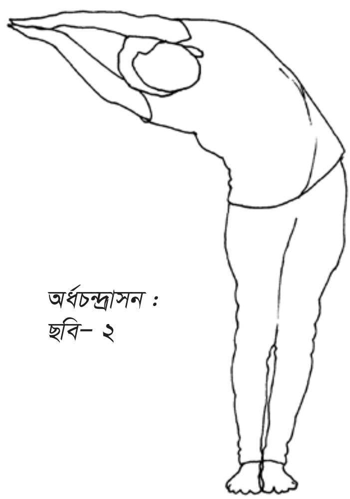

অর্ধচন্দ্রাসন : ছবি– ২

আয়নার সামনে এটি করলে আপনি সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন। এভাবে একবার ডানে ও একবার বামে–প্রত্যেক পাশে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড করে অবস্থান করুন। তবে

অর্ধচন্দ্রাসন : ছবি– ৩

সহজভাবে যতটুকু পারেন করুন। জোর করে করবেন না। একবার ডানে ও একবার বামে মিলে এক প্রস্থ হয়। এভাবে তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ করুন।

উপকারিতা

১. কিডনিতে রক্ত চলাচল বাড়িয়ে কিডনি সুস্থ রাখে। ফলে কিডনির কোনো রোগ হতে পারে না।

২. এড্রিনাল গ্ল্যান্ডকে সুস্থ রাখে।

৩. মেরুদণ্ড নমনীয় ও কমনীয় রাখে।

৪. কোমরে সরাসরি চাপ পড়ায় অতিরিক্ত চর্বি কোমরে জমতে পারে না।

আসন
৭

জানুশিরাসন

পদ্ধতি : প্রথমে পা সামনে সোজা করে মেরুদণ্ড সোজা রেখে মাটিতে বসুন। পা দুটো যেন সামনের দিকে ছড়িয়ে থাকে। এবার প্রথমে ডান পায়ের হাঁটু ভেঙে ডান পায়ের পাতা বাম উরুর শেষ প্রান্তে এনে লাগিয়ে রাখুন। দেখতে যেন সমকোণের মতো লাগে (১নং ছবির মতো)। অর্থাৎ বাম পা সোজা রেখে ডান পা ভেঙে এনে রাখতে হবে নব্বই ডিগ্রি এঙ্গেলে।

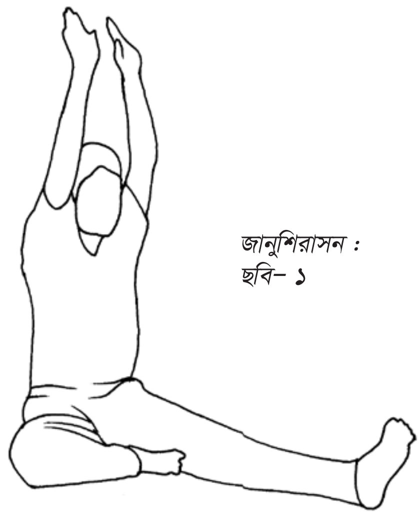

জানুশিরাসন : ছবি– ১

এরপর দম স্বাভাবিক রেখে মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বাম হাঁটুর ওপর কপাল ঠেকাতে চেষ্টা করুন (৪নং ছবির মতো)। হাত দুটো দিয়ে বাম পায়ের বুড়ো আঙুল ধরুন। হাঁটু যেন না ভাঙে। যতদিন না সঠিক ভঙ্গিমায় আনতে পারছেন ততদিন যতটুকু পারবেন ততটুকু ঝুঁকবেন (২ ও ৩নং

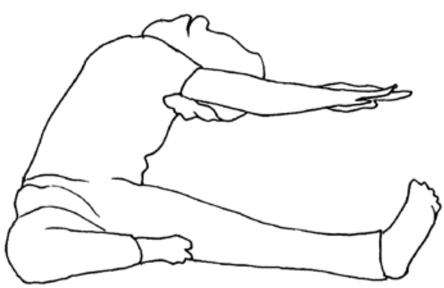

জানুশিরাসন : ছবি– ২

ছবির মতো)। জোর করে কপাল হাঁটুতে ঠেকাতে যাবেন না। এভাবে প্রথমে ডানে ও পরে একইভাবে বাম পায়ে করুন। প্রত্যেক বারই সঠিক ভঙ্গিমায় গিয়ে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। ডানে-বামে মিলে এক প্রস্থ। এভাবে তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ করুন।

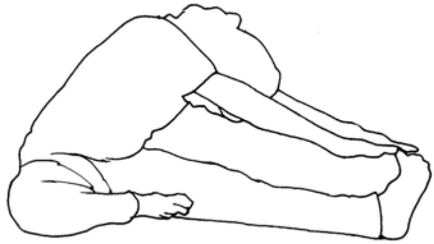

জানুশিরাসন : ছবি– ৩

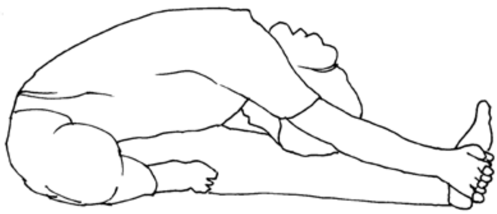

জানুশিরাসন : ছবি– ৪

এ আসনে কপাল ও হাঁটু একত্রে মিশে থাকে বলে একে জানুশিরাসন বলে। জানু অর্থ হাঁটু, শির অর্থ মাথা।

উপকারিতা

১. জানুশিরাসন অভ্যাসে অগ্ন্যাশয়ে চাপ পড়ায় অগ্ন্যাশয় সুস্থ ও সবল থাকে। এতে বহুমূত্র রোগ হতে পারে না। আর যারা এ রোগে ভুগছেন তারা এ আসনটি করলে বহুমূত্র রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন।

২. পেটে চর্বি জমতে পারে না।

***বি.দ্র.** : সামনে ঝোঁকা নিষেধ–এমন রোগ থাকলে এ আসন করবেন না।*

আসন
৮

শশাঙ্গাসন

পদ্ধতি : প্রথমে জাজেন বা বজ্রাসনের মতো করে বসুন। এবার এ অবস্থা থেকে হাঁটুতে ভর করে শরীরের ওপরের অংশ তুলুন। মাথা সোজা করুন। এবার আস্তে আস্তে মাথা সামনের দিকে বাঁকিয়ে কপাল হাঁটুর সাথে লাগাতে চেষ্টা করুন। এবার হাত দুটো দিয়ে দুপায়ের গোড়ালি ধরুন। দম স্বাভাবিক থাকবে। থুতনি গলার শেষ প্রান্তে থাকবে। দুপায়ের গোড়ালি লেগে থাকবে। মাথার তালু মাটিতে থাকবে (ছবির মতো)।

শশাঙ্গাসন : ছবি– ১

তবে জোর করে সঠিক ভঙ্গিমায় প্রথমেই যেতে চেষ্টা করবেন না। চর্চা করলে ধীরে ধীরে সঠিক ভঙ্গিমায় যেতে পারবেন। শেষ অবস্থানে গিয়ে ১০ থেকে ২০ সেকেন্ড থাকুন। ইচ্ছে করলে সহজ শিথিলায়ন বা শবাসন করে বিশ্রাম নিয়েও করতে পারেন। যাদের নিম্ন রক্তচাপ আছে, এ আসন করলে তাদের প্রথমদিকে মাথা ঘোরাতে পারে; ভয়ের কিছু নেই। সাইনুসাইটিস থাকলে প্রথম দিকে কপাল, নাকের দুপাশ এবং মাথা ব্যথা করতে পারে। পরে ঠিক হয়ে যায়। এ আসনটি তিন থেকে পাঁচ বার করতে পারেন।

উপকারিতা

১. এ আসন নিয়মিত অভ্যাস করলেস্নায়ুর মটর নিউরোন সুস্থ-সাবলীল থাকে। ফলে যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হয়।

২. মেরুদণ্ড নমনীয়-কমনীয় হয়। মেরুদণ্ডের সংযোগস্থলগুলোর স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকে বলে লোয়ার মটর নিউরোন বেশি কর্মক্ষম হয়।

৩. টনসিলে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায় বলে টনসিলের সমস্যা থাকলে তা দূর হয়ে যায়। ঘন ঘন ঠান্ডা লাগা দূর হয়। এ আসন নিয়মিত করলে টনসিলের রোগ সম্পূর্ণরূপে সেরে যায়। তবে ক্রনিক হলে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া উচিত।

৪. পিটুইটারি গ্ল্যান্ডে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি করে তাকে সুস্থ-সতেজ রাখে। ফলে বিভিন্ন মেয়েলি রোগে উপকার পাওয়া যায়।

৫. থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের হরমোন প্রবাহ ঠিক রাখে।

৬. শশাঙ্গাসনের নিয়মিত অভ্যাস লম্বা হতে সাহায্য করে।

৭. এছাড়াও অগ্ন্যাশয়, যকৃৎ ও পীহার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

৮. যারা ক্ষুধামান্দ্যয় ভোগেন তাদের এ আসন করলে ক্ষুধা বাড়ে।

আসন ৯

ভদ্রাসন

ভদ্রাসন : ছবি– ১

পদ্ধতি : প্রথমে দুই পা সামনের দিকে ছড়িয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে বসুন। এবার (ছবির মতো) দুপায়ের পাতা ও গোড়ালি একত্র করে যোনিমণ্ডলে স্থাপন করুন। এবার দুহাত দুহাঁটুর ওপরে রেখে চেপে ধরুন। মেরুদণ্ড সোজা রাখুন। প্রয়োজনে দেয়ালের সাথে কিংবা খাটের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে সোজা রাখতে পারেন। দম স্বাভাবিক রেখে ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড এ ভঙ্গিমায় অবস্থান করুন। এভাবে তিন থেকে পাঁচ বার করতে পারেন। ইচ্ছে করলে একসাথে এক থেকে তিন মিনিট করতে পারেন। তারপর পা সোজা করে একটু বিশ্রাম নিয়ে অন্য আসন করুন।

উপকারিতা

১. মাসিক বা ঋতু সংক্রান্ত যত রোগ রয়েছে, প্রতিটির জন্যেই এ আসন অত্যন্ত উপকারী। অর্থাৎ আমাদের শরীরে যে জননগ্রন্থি আছে, তাকে সুস্থ রাখার জন্যে এ আসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। (মাসিক সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

আসন
১০

স্থিরায়ন বা গোমুখাসন

পদ্ধতি : প্রথমে মেরুদণ্ড সোজা করে দুই পা সামনের দিকে ছড়িয়ে বসুন। এবার বাম পায়ের হাঁটু ভেঙে ডান পায়ের নিচ দিয়ে নিয়ে এসে ডান নিতম্বের কাছে নিয়ে রাখুন। বাম পায়ের গোড়ালি ডান নিতম্বের সাথে লেগে থাকবে। তবে যদি না লাগাতে পারেন জোর করে লাগাতে যাবেন না। আস্তে আস্তে অভ্যাস হলে লেগে যাবে।

গোমুখাসন : ছবি– ১

এবার ডান পা হাঁটু ভেঙে বাম উরুর ওপর দিয়ে এনে এমনভাবে রাখুন, যাতে বাম নিতম্বের সাথে ডান পায়ের গোড়ালি স্পর্শ করে। পায়ের পাতার পিঠ মাটিতে বিছানো থাকবে (১নং ছবি দেখুন)। এবার ডান হাত ডান কাঁধের ওপর নিয়ে এসে যতদূর পারেন পিঠের ওপর রাখুন। হাতের পাতা উপুড় অবস্থায় পিঠের ওপর থাকবে। এবার বাম হাত কোমরের কাছ থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে পিঠের ওপর রাখা ডান হাতটি ধরতে চেষ্টা করুন (২নং ছবির মতো)। ডান হাত দিয়ে বাম হাত আটকে ধরুন। এ আসনে যেদিকের পা ওপরে থাকবে সেদিকের হাত

গোমুখাসন : ছবি– ২

কাঁধের ওপরে থাকবে, হাত কানের সাথে লেগে থাকবে। অর্থাৎ বাম পা ওপরে থাকলে বাম হাত কাঁধের ওপর থাকবে। ডান পা ওপরে থাকলে ডান হাত কাঁধের ওপর থাকবে। মেরুদণ্ড ও শরীর সবসময় সোজা থাকবে। সামনে বা পেছনে, ডানে বা বামে যেন বেঁকে না যায়। দম স্বাভাবিক রেখে ডান পা ওপরে রাখা অবস্থায় ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড অবস্থান করুন। আবার বাম পা ওপরে রাখা অবস্থায় ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড অবস্থান করুন। এভাবে ডানে-বামে মিলে এক প্রস্থ হবে।

এভাবে তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ করতে পারেন। পরে অভ্যাস হলে একবারেই একপাশে এক থেকে তিন মিনিট করতে পারেন। আর যদি ২০ সেকেন্ডও হাত ধরে রাখতে না পারেন অসুবিধে নেই। যতটুকু সহজভাবে পারেন করুন। তাতেও ফল হবে। নিয়মিত চর্চা করলে সঠিক ভঙ্গিমায় আসনটি অনেকক্ষণ করতে পারবেন। এক হাঁটুর ওপর অন্য হাঁটু এমনভাবে থাকে–দেখতে গরুর মুখের মতো দেখায়, তাই এ আসনের নাম গোমুখাসন।

উপকারিতা

১. এ আসনে মানসিক ওস্নায়বিক উত্তেজনা দূর হয়।

২. নিয়মিত এ আসনটি অভ্যাস করলে হাঁটুতে বাতব্যথা ও বাতজনিত রোগ হতে পারে না।

৩. হাত ও কাঁধের সন্ধিস্থলের জন্যে বিশেষ উপকারী।

৪. এ আসন নিয়মিত অনুশীলন করলে কোনো স্ত্রীরোগ হতে পারে না এবং যৌন সংযম বজায় রাখা সহজ হয়।

৫. যাদের ফ্রোজেন শোলডার (frozen shoulder) রোগ রয়েছে অর্থাৎ হাত ওপরে তুলতে পারেন না তাদের জন্যে এ আসন বিশেষ উপকারী।

৬. নিয়মিত এ আসন করলে অর্শ, বাত, সায়াটিকা, মূত্রদাহ হতে পারে না।

৭. যারা অনেকক্ষণ কাজ করতে করতে কাঁধের কাছে ব্যথা অনুভব করেন, চিনচিন ব্যথা করে–মনে হয় একটি শলাকা বা সুঁই ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে–তারা নিয়মিত এ আসন করলে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

৮. রাতে যাদের ভালো ঘুম হয় না তারা রাতে খাবারের পরে বজ্রাসন করে ঘুমানোর আগে এ আসন নিয়মিত করলে অনিদ্রা দূর হয়।

আসন
১১

উষ্ট্রাসন

পদ্ধতি : প্রথমে দুই হাঁটুর ওপর ভর করে (১নং ছবির মতো) দাঁড়ান। দুই হাঁটুসহ দুই পা লেগে থাকবে। মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত মাটির সঙ্গে লেগে থাকবে। এবার দম স্বাভাবিক রেখে দুহাত দিয়ে দুপায়ের গোড়ালি ধরুন। বুক ও পেট যতটা সম্ভব সামনের দিকে এবং ঘাড় ও মাথা পেছন দিকে বাঁকিয়ে ধনুকের মতো করুন। এ অবস্থায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। তারপর আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসুন। এভাবে তিন থেকে পাঁচ বার করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন–যদি প্রথম অবস্থায় পা জোড়া লাগিয়ে না করতে পারেন তাহলে দুই হাঁটু, পা ফাঁকা করে করলে সহজে করতে পারবেন। দুহাত একত্রে গোড়ালির ওপর না রাখতে পারলে একহাত দিয়ে ধরুন, অন্য হাত দিয়ে খাটের পাশে করলে খাট ধরুন কিংবা দেয়াল ধরে করুন। এভাবে হাত পাল্টে একবার ডান হাত দিয়ে ডান পা আবার বাম হাত দিয়ে বাম পা ধরতে চেষ্টা করুন। এভাবে

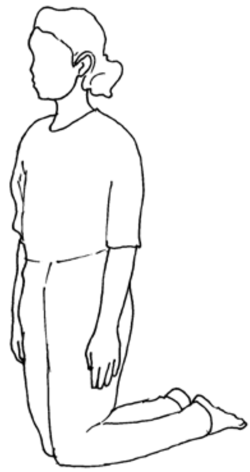

উষ্ট্রাসন : ছবি– ১

উষ্ট্রাসন : ছবি– ২

কিছুদিন অভ্যাস করলে সঠিক ভঙ্গিমায় আসনটি করতে পারবেন। এ আসনটিতে শরীরের মধ্যভাগ উটের মতো উঁচু হয়ে থাকে বলে একে উষ্ট্রাসন বলা হয়।

উপকারিতা

১. যারা কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে ভুগছেন তারা প্রতিদিন ভোরে একগ্লাস পানি খেয়ে উষ্ট্রাসন নিয়মিত অভ্যাস করলে বিশেষ উপকার পাবেন।

২. উষ্ট্রাসন নিয়মিত অভ্যাস করলে পেটে চর্বি জমতে পারে না। চর্বি থাকলে কমিয়ে কোমর ও পেট সুন্দর-সুশ্রী করে।

৩. শরীরে গরম-ঠান্ডা লাগার সহ্যশক্তি বাড়ায়।

৪. হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড ও টনসিল সুস্থ এবং সক্রিয় রাখে। এড্রিনাল গ্রন্থিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত চলাচল করিয়ে তাদের সুস্থ ও কর্মক্ষম করতে সাহায্য করে।

বি.দ্র. : *যারা হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের রোগে ভুগছেন তারা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এ আসন করবেন না।*

আসন
১২

উত্থিতপদাসন

উত্থিতপদাসন : ছবি– ১

পদ্ধতি : প্রথমে চিৎ হয়ে দুই পা সোজা করে জোড়া লাগিয়ে শুয়ে পড়ুন। দুহাত শরীরের দুপাশে মাটিতে রাখুন। হাতের তালু মাটিতে লেগে থাকবে। এবার দম স্বাভাবিক রেখে পা দুটো জোড় অবস্থায় ধীরে ধীরে মাটি থেকে ওপরে তুলুন এবং আস্তে আস্তে এমন এক জায়গায় ধরে রাখুন (ছবির মতো করে), যেখানে পেটে বেশি চাপ অনুভব করেন। এবার এ অবস্থায় ১০ থেকে ৩০ সেকেন্ড অবস্থান করুন। এভাবে তিন থেকে সাত বার পর্যন্ত করতে পারেন। প্রয়োজনে শবাসনে বিশ্রাম নিয়ে করতে পারেন। প্রথম দিকে এ আসনটি করার পর পেটের চামড়ায় প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করতে পারেন; এতে ভয়ের কিছু নেই। নিয়মিত অনুশীলন করলে ব্যথা চলে যাবে।

উপকারিতা

১. যাদের পেটে চর্বি বেশি তারা একটু বেশি বার করলে পেটের চর্বি কমিয়ে আনতে পারবেন। পেটের শেপ সুন্দর হবে।

২. এ আসন নিয়মিত করলে কোনোদিন হার্নিয়া হতে পারে না।

৩. মেয়েদের ডিম্বাশয়ে (ovary) প্রচুর রক্ত চলাচল হয় বলে স্ত্রীরোগ হতে পারে না। আর হলেও কিছুদিন করলে ভালো হয়ে যায়।

৪. যাদের জরায়ু নেমে যায় তারা বিশেষ উপকার পাবেন।

৫. হজমশক্তি বৃদ্ধি করে। পেটের পেশি ওস্নায়ুতন্ত্র, লিভার, পীহা প্রভৃতি সতেজ ও সক্রিয় থাকে।

আসন ১৩

ভুজঙ্গাসন

ভুজঙ্গাসন : ছবি– **১**

পদ্ধতি : প্রথমে উপুড় হয়ে দুই পা জোড় করে সোজা রেখে মাটিতে শুয়ে পড়ুন। মাথাটা বামে অথবা ডানে–যেদিকে ইচ্ছে কাত করে রাখুন। হাত দুটো শরীরের দুপাশে ও হাতের পাতা মাটিতে লেগে থাকবে।

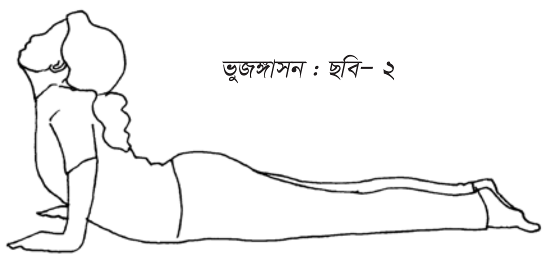

ভুজঙ্গাসন : ছবি– **২**

এবার (১নং ছবির মতো) হাত দুটো টেনে নিয়ে এসে দুবাহু বরাবর উপুড় করে রাখুন। হাতের ওপর ভর করে মাথা ওপরে তুলুন। বুক মাটি থেকে ওপরে উঠবে। কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত পা জোড় অবস্থায় সোজা থাকবে। নাভি মেঝেতে লেগে থাকবে। দম থাকবে স্বাভাবিক। (২নং ছবির মতো) এভাবে পূর্ণ ভঙ্গিমায় এসে ১০/১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। তিন থেকে পাঁচ বার করতে পারেন। প্রয়োজনে শবাসনে ১০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিয়ে করতে পারেন।

এবার (৩নং ছবির মতো) হাতের ওপর ভর করে বুক-পেট-মাথা পেছন দিকে এলিয়ে দিয়ে পা দুটো হাঁটু ভেঙে মাথার তালুর সাথে লাগিয়ে দিন। নাভি ওপরে থাকবে। এ অবস্থানে ১০/১৫ সেকেন্ড থাকতে পারেন। এভাবে তিন থেকে পাঁচ বার করতে পারেন। ৩নং ছবির আসনটির নাম পূর্ণ ভুজঙ্গাসন।

ভুজঙ্গ অর্থ সাপ। সাপের ফনার মতো দেখতে লাগে বলে আসনটির নাম ভুজঙ্গাসন।

প্রথমদিকে পা জোড় অবস্থায় আসনটি না করতে পারলে পা দুটো সুবিধা মতো ফাঁক করে অভ্যাস করতে পারেন। ধীরে ধীরে শরীর নমনীয় হলে সঠিক ভঙ্গিমায় আসনটি করতে পারবেন। জোর করে একবারে করতে যাবেন না।

উপকারিতা

১. এ আসনটি নিয়মিত করলে ব্যাকপেইন, স্পন্ডিলাইটিস, স্লিপড ডিস্কজাতীয় রোগ হতে পারে না।

২. সব ধরনের স্ত্রীরোগের মহৌষধ হিসেবে কাজ করে। তাই প্রতিদিন এ আসনটি অভ্যাস করা উচিত।

৩. যে-সব ছেলেমেয়ের বয়স অনুযায়ী বুকের গড়ন সরু বা অপরিণত তাদের এ আসনটি করা উচিত। নিয়মিত অভ্যাসে বুক সুগঠিত হয়।

৪. আসনটিতে ঘাড় গলা মুখ বুক পিঠ কোমর ও মেরুদণ্ডের ওপরে চাপ পড়ায় ঐ অঞ্চলের স্নায়ুতন্ত্র ও পেশি সতেজ ও সক্রিয় থাকে। পিঠের মাংসপেশিকে মজবুত ও বেশি কর্মক্ষম করে।

৫. মেরুদণ্ডের হাড় নমনীয় থাকে।

৬. টনসিলাইটিস থেকে মুক্তির জন্যে এবং যারা ঘন ঘন ঠান্ডায় ভোগেন তাদের জন্যে উপকারী।

৭. এ আসনটি হাই ব্লাডপ্রেশার রোগীদের জন্যে খুবই উপকারী। মানসিক উদ্বেগ ও উত্তেজনার ফলে আমাদের শরীরের রক্তে এড্রিনালিন বেড়ে গিয়ে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। এ আসন নিয়মিত চর্চা এড্রিনাল গ্রন্থিকে ত্রুটিমুক্ত ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

৮. অর্ধ ভুজঙ্গাসনেও পূর্ণ ভুজঙ্গাসনের মতো ফল পাওয়া যায়।

৯. এ আসন নিয়মিত করলে হজমশক্তি বাড়ে। যকৃৎ ও পীহা সুস্থ থাকে।

আসন
১৪

অর্ধশলভাসন

অর্ধশলভাসন : ছবি– ১

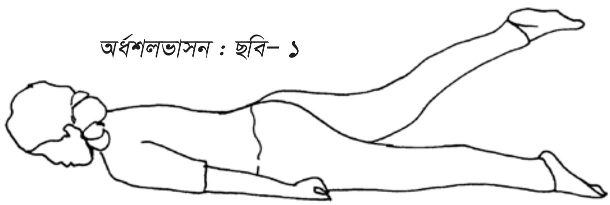

পদ্ধতি : প্রথমে উপুড় হয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ুন। হাত দুটো শরীরের সাথে দুপাশে লাগিয়ে রাখুন। এবার মেঝেতে হাতের তালু লাগিয়ে হাত মুষ্টিবদ্ধ করুন। থুতনি মেঝেতে লেগে থাকবে।

এবার দম স্বাভাবিক রেখে প্রথমে ডান পা সোজা রেখে হাঁটু না ভেঙে ওপরের দিকে তুলুন। বাম পা মাটিতে লেগে থাকবে। খেয়াল রাখুন পা যেন ডানে/ বামে বেঁকে না যায়। সোজা ওপরে তুলতে হবে। এ ভঙ্গিমায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। একই পদ্ধতিতে এরপর বাম পা তুলে ডান পা মাটিতে রেখে করুন। একবার ডান পা ও একবার বাম পা মিলে এক প্রস্থ হয়। এভাবে তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ করতে পারেন। এভাবে আলাদা আলাদাভাবে দুই পা তুলে অভ্যাস হলে পরে একইসাথে (২নং ছবির মতো) দুই পা একত্রে জোড়া লাগিয়ে হাঁটু না ভেঙে ও মাথা না তুলে করতে পারবেন। একে বলে পূর্ণশলভাসন।

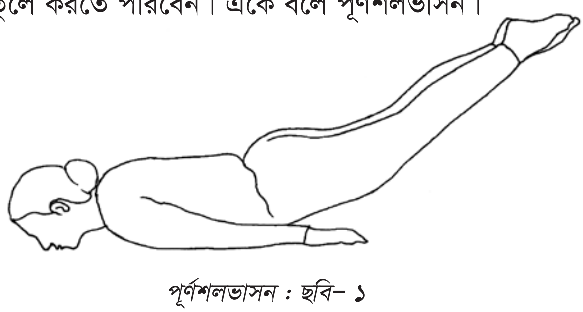

পূর্ণশলভাসন : ছবি– ১

উপকারিতা

১. এ আসন নিয়মিত চর্চা করলে কোমর ব্যথা, কটিবাত, মাসিকের সময় নিচের পেট ব্যথা ইত্যাদি হতে পারে না। এছাড়া শরীরের নিম্নাংশের খুব ভালো ব্যায়াম হয়।

২. কোমর ও নিচের পেটে চর্বি জমতে পারে না।

৩. স্লিপড ডিস্ক, লাম্বার স্পন্ডিলাইটিস বা জরায়ু উল্টে যাওয়ার কারণে কোমরে যে ব্যথা হয়, এর নিরাময়ে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

৪. নিতম্ব ও পিঠের মাংসপেশি মজবুত ও সুদৃঢ় করে মেরুদণ্ডকে ধরে রাখতে সাহায্য করে। যার ফলে স্লিপড ডিস্ক হতে পারে না।

৫. স্লিপড ডিস্ক থেকে যে সায়াটিকা ব্যথার সৃষ্টি হয়, এ আসন নিয়মিত চর্চা করলে তার উপশম হয়।

আসন ১৫

সর্বাঙ্গাসন

পদ্ধতি : প্রথমে চিৎ হয়ে দুই পা সোজা রেখে শুয়ে পড়ুন। হাত দুটো শরীরের দুপাশে রাখুন। এবার হাতের কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে জোড় পা সোজা অবস্থায় ওপরে তুলুন। দুহাত দিয়ে কোমরের কাছে ধরে রাখুন যেমন কোনো গাছকে ঠেস দিয়ে রাখা হয় তেমনি করে। থুতনি গলার কাছে লেগে থাকবে। মাথা, ঘাড়, কাঁধ মাটিতে লেগে থাকবে (ঠিক ছবির মতো)। দম স্বাভাবিক রেখে এ ভঙ্গিমায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। বিশ্রাম নিয়ে তিন থেকে চার বার করতে পারেন। ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে গেলে এক সাথে এক থেকে তিন মিনিটও এ ভঙ্গিমায় অবস্থান করতে পারেন। এ আসনটিতে শরীরের সর্ব অঙ্গের ব্যায়াম হয় বলে একে সর্বাঙ্গাসন বলা হয়। ইচ্ছে করলে প্রথম দিকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে করতে পারেন। অথবা কাউকে দিয়ে ধরে রেখেও করতে পারেন।

উপকারিতা

১. এ আসনটি যৌবনকে দীর্ঘ দিন ধরে রাখতে সাহায্য করে।

২. শরীরের থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড ও টনসিল প্রভৃতিতে প্রচুর রক্ত চলাচল হয়ে সতেজ ও সুস্থ রাখে। এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড থেকে যে হরমোন নিঃসৃত হয় তা সঠিকভাবে নিঃসৃত হওয়ার সুযোগ পায়।

৩. কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণকালে পিটুইটারি গ্রন্থির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পিটুইটারি গ্রন্থির সক্রিয়তায় নারীর দেহে যৌবনাগমন ঘটে ও দেহকে সুন্দর করে গড়ে তোলে।
৪. কোষ্ঠকাঠিন্য, রেট্রোভারটেড ইউটেরাস, অর্শ প্রভৃতি রোগে যারা ভুগছেন তাদের জন্যে এ আসন অত্যন্ত উপকারী।
৫. এ আসন নিয়মিত চর্চায় স্থানচ্যুত জরায়ু যথাস্থানে ফিরে আসে।

বি.দ্র. : *যারা হার্টের রোগে ভুগছেন এবং যে-সব ছেলেমেয়ের বয়স* ***১২*** *বছরের কম তাদের এ আসনটি করা উচিত নয়। সর্বাঙ্গাসনের পর মৎস্যাসন অবশ্যই করবেন।*

আসন
১৬

মৎস্যাসন

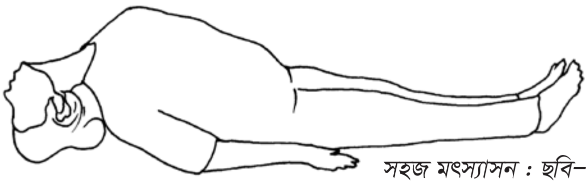

সহজ মৎস্যাসন : ছবি– ১

পদ্ধতি : প্রথমে চিৎ হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ুন। দুই পা জোড়া লেগে থাকবে। হাত দুটো শরীরের দুপাশে থাকবে। হাতের তালু মাটিতে লেগে থাকবে। এবার নিতম্ব পর্যন্ত মাটিতে রেখে হাত দুপাশে রাখুন। বুক উঁচু করে মাথার তালু মাটিতে ঠেকান (১নং ছবির মতো)। দম স্বাভাবিক থাকবে। এ ভঙ্গিমায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। এভাবে তিন বার করুন। অভ্যস্ত হলে একবারে এক থেকে দুই মিনিট অবস্থান করতে পারেন।

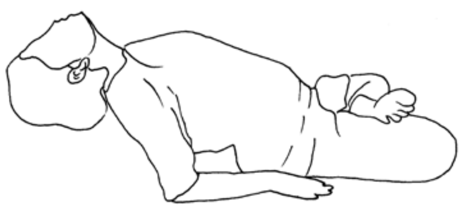

মৎস্যাসন : ছবি– ২

মৎস্যাসন : ছবি– ৩

এবার প্রথমে সোজা হয়ে পদ্মাসনে বসুন। পা দুটো পদ্মাসনে রেখে দুহাতের কনুই মাটিতে ভর করে (২নং ছবির মতো) শুয়ে পড়তে চেষ্টা করুন। এবার বুক ও পেট মাটি থেকে ওপরের দিকে তুলুন। মাথার তালু

মাটির সঙ্গে ঠেকে থাকবে। এখন দুপায়ের বুড়ো আঙুল দুহাত দিয়ে ধরুন। দম স্বাভাবিক থাকবে (৩ নং ছবির মতো)।

এ ভঙ্গিমায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড থাকুন। প্রয়োজনে বিশ্রাম নিয়ে তিন বার করুন। অভ্যস্ত হয়ে গেলে একবারে এক থেকে দুই মিনিটও করতে পারেন। সর্বাঙ্গাসনের পর এ আসনটি করা উচিত।

উপকারিতা

১. এ আসনে পিটুইটারি থাইরয়েড প্যারাথাইরয়েড থাইমাস প্রভৃতি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতে প্রচুর রক্ত চলাচল হওয়ায় এদেরকে সুস্থ্ রাখতে সাহায্য করে।

২. হাঁপানি সর্দি কাশি ব্রঙ্কাইটিস টনসিলের সমস্যা থাকলে নিয়মিত আসনটি করলে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

৩. ঘাড়, কাঁধ, মেরুদণ্ডের দুপাশের পেশি ওস্নায়ুর খুব ভালো ব্যায়াম হয়।

৪. বুকের গঠন সুঠাম ও সুন্দর হয়।

আসন
১৭

তুলাসন বা উৎকট আসন

পদ্ধতি : প্রথমে মেরুদণ্ড সোজা রেখে দুই পা একফুট পরিমাণে কিংবা তার চেয়ে কিছুটা কম ফাঁক রেখে দাঁড়ান। হাত দুটো সামনের দিকে (ছবির মতো) ছড়িয়ে দিয়ে চেয়ারে বসার ভঙ্গিমায় বসুন। হাতের তালু নিচের দিকে মাটি থেকে সমান্তরাল অবস্থায় থাকবে। দম স্বাভাবিক থাকবে। এ ভঙ্গিমায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। এভাবে তিন থেকে পাঁচ বার করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, প্রথমদিকে যেটুকু সময় পারেন ততটুকুই করবেন। অভ্যস্ত হলে পরে নির্ধারিত সময় নিয়ে করতে পারবেন।

তুলাসন বা উৎকট আসন : ছবি– ১

উপকারিতা

১. এ আসনটি পায়ের শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। যাদের হাঁটতে বা সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করতে পায়ে কষ্ট হয় বা পায়ে শক্তি পান না তাদের জন্যে আসনটি খুবই উপকারী।

২. এ আসন করার ফলে কোমর ও মেরুদণ্ডে বেশ চাপ পড়ায় কোমরে কোনো ব্যথা হতে পারে না।

৩. ঊরুর ওপর চাপ পড়ায় যাদের ঊরু মোটা তারাও বিশেষ উপকার পাবেন। বাড়তি চর্বি কমিয়ে ঊরুর গঠন সুন্দর করতে সহায়ক হবে।

আসন ১৮

বৃক্ষাসন

পদ্ধতি : প্রথমে মেরুদণ্ড সোজা রেখে দুই পা সোজা করে মাটিতে দাঁড়ান। এবার (১নং ছবির মতো) প্রথমে ডান পা তুলে বাম পায়ের ঊরুর

বৃক্ষাসন : ছবি– ১

বৃক্ষাসন : ছবি– ২

একেবারে শেষ প্রান্তে নিয়ে রাখুন। ডান পায়ের পাতা বাম ঊরুর সাথে লেগে থাকবে। এবার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে হাত দুটো কাঁধের দুপাশে রাখুন। এবার এ অবস্থা থেকে আস্তে আস্তে হাত মাথার ওপরে নিয়ে দুহাতের তালু (২নং ছবির মতো) একত্রে জোড় করে রাখুন। এ অবস্থায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। আবার বাম পা তুলে একইভাবে ডান পায়ের ঊরুর সাথে লাগিয়ে মাথার ওপর দুহাত জোড় করে রাখুন। এ ভঙ্গিমায় গিয়ে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড

অবস্থান করুন। দম স্বাভাবিক থাকবে। এভাবে ডানে ও বামে মিলে এক প্রস্থ হয়। এ আসন তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ করতে পারেন।

উপকারিতা

১. এ আসনটিও পায়ের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি নিয়মিত করলে পায়ে ব্যথাবেদনা হতে পারে না। হাত-পা কামড়ায় না। এছাড়া পায়ের প্রধান ধমনীতে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায় বলে পায়ের পেশি ও স্নায়ুগুলো পুষ্ট ও সতেজ হয়।

২. কোমরের পেশিকে মজবুত রাখে।

৩. পায়ের গঠন সুন্দর হয়।

আসন
১৯

মুণ্ডকাসন

পদ্ধতি : প্রথমে বজ্রাসনে বসুন। এবার (১নং ছবির মতো) হাঁটু দুটো যত দূর সম্ভব ছড়িয়ে দিন। এবার ডান হাত ডান হাঁটুর ওপর ও বাম হাত বাম হাঁটুর ওপর রাখুন। মেরুদণ্ড সোজা রেখে এভাবে বসে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। এরপর বজ্রাসনে ফিরে আসুন। পায়ে বিশ্রাম দিয়ে তিন থেকে পাঁচ বার করতে পারেন। অথবা একবার একসাথে দুই থেকে তিন মিনিটও এ ভঙ্গিমায় অবস্থান করতে পারেন। দম স্বাভাবিক থাকবে।

মুণ্ডকাসন : ছবি– **১**

উপকারিতা

১. সায়াটিকার ব্যথায় যারা কষ্ট পাচ্ছেন তাদের জন্যে বিশেষ উপকারী।

২. হাঁটুতে বাতব্যথা হতে পারে না।

আসন
২০

অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন

অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন : ছবি– ১ (সামনে থেকে)

অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন : ছবি– ২ (পেছন থেকে)

পদ্ধতি : প্রথমে মেরুদণ্ড সোজা রেখে মাটিতে দুই পা ছড়িয়ে বসুন। এবার বাম পায়ের হাঁটু ভেঙে ডান পায়ের নিচ দিয়ে নিয়ে এসে ডান উরুর সাথে লাগিয়ে মাটিতে রাখুন। পায়ের পাতা মাটি থেকে ওপরের দিকে থাকবে। এবার ডান পা তুলে বাম পায়ের উরুর ওপর দিয়ে নিয়ে এসে হাঁটুর কাছে খাড়া অবস্থায় রাখুন। পায়ের পাতা মাটিতে লেগে থাকবে। পায়ের আঙুল সামনের দিকে ছড়ানো থাকবে (১নং ছবির মতো)। এবার বাম হাত ডান হাঁটুর ওপর দিয়ে নিয়ে এসে বাম হাঁটু ধরুন এবং ডান হাতটি কোমরের কাছ থেকে পেছন দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে বাম পাশের কোমরের কাছে হাতের পিঠ দিয়ে স্পর্শ করুন। হাতের পাতা ওপরে থাকবে। মাথা যথাসম্ভব ডান দিকে ঘুরিয়ে পেছনে দেখার চেষ্টা করুন (২নং ছবির মতো)। দম স্বাভাবিক থাকবে। এ অবস্থায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন।

এভাবে একবার ডান পা ওপরে ডান হাত পেছনে রেখে আর একবার বাম পা ওপরে বাম হাত পেছনে রেখে চেষ্টা করুন। ডানে ও বামে মিলে এক প্রস্থ হবে। এভাবে তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ করতে পারেন। একই নিয়মে প্রথমে ডান পায়ে পরে বাম পায়ে অবশ্যই করতে হবে। যখন অভ্যস্ত হয়ে যাবেন তখন এক এক পায়ে এক পাশে সঠিক ভঙ্গিমায় একমিনিট করে অবস্থান করতে পারেন। দুই পায়ে দুই মিনিট।

তবে প্রথম অবস্থায় হাত-পা জোর করে সঠিক ভঙ্গিমায় আনতে যাবেন না। যতটুকু সহজভাবে পারবেন করুন। নিয়মিত চর্চায় শরীর নমনীয় হলে সঠিক ভঙ্গিমায় পারবেন। সঠিক ভঙ্গিমায় না হলেও ফল পাবেন।

বি.দ্র.: *যেদিকের পা ওপরে থাকবে সেদিকের হাত পেছনে থাকবে।*

উপকারিতা

১. এ আসনে মেরুদণ্ডের মধ্যভাগের কশেরুকাগুলোর ওপর বিশেষ চাপ পড়ে বলে বিশেষ উপকার হয়। মেরুদণ্ডের মধ্যভাগকে নমনীয়, মধ্যভাগের স্নায়ুকে কর্মতৎপর করে তোলার জন্যে মৎস্যেন্দ্রাসন অবশ্যই করা প্রয়োজন।

২. অল্প বয়স থেকে এ আসনটি অভ্যাস করলে মেরুদণ্ডের হাড়ের সমস্যা হতে পারে না।

৩. যকৃৎ পীহা পাকস্থলী ক্ষুদ্রান্ত্র কিডনি ওভারি ও এড্রিনাল গ্ল্যান্ড প্রভৃতিতে রক্ত চলাচল বাড়িয়ে এদের সুস্থ ও সুপরিচালিত করে।

৪. যাদের কাঁধ উঁচুনিচু তাদের আসনটি অবশ্যই করা উচিত।

৪. একমাত্র এ আসনের ফলে মেরুদণ্ডে মোচড় পড়ে। যারা খেলাধুলা বা ব্যায়াম করেন না তাদের জন্যে এ আসনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আসন ২১

ধনুরাসন

পদ্ধতি : প্রথমে উপুড় হয়ে শরীর সোজা রেখে হাত দুটো শরীরের দুপাশে রেখে শুয়ে পড়ুন। এবার (১নং ছবির মতো) মাটি থেকে উরু ওপরে তুলে হাঁটু ভেঙে খাড়া করুন। পেট মাটিতে লেগে থাকবে। বুক ও গলা ওপরে তুলে দুহাত দিয়ে দুপায়ের গোড়ালি ধরুন। হাত দুটো টানটান সোজা থাকবে। দম স্বাভাবিক থাকবে। হাঁটু যথাসম্ভব মাটি থেকে ওপরে তুলতে চেষ্টা করুন। দুই হাঁটু জোড়া লেগে থাকবে। দৃষ্টি ওপরে থাকবে। ছবির মতো ভঙ্গিমায় এসে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। তবে প্রথমে হাঁটু জোড়া অবস্থায় না পারলে দুপা ফাঁক করে (২নং ছবির মতো) করতে পারেন। পরে অভ্যস্ত হলে (১নং ছবির মতো) সঠিকভাবে করুন। শরীর ধনুকের মতো দেখায় বলে এর নাম ধনুরাসন।

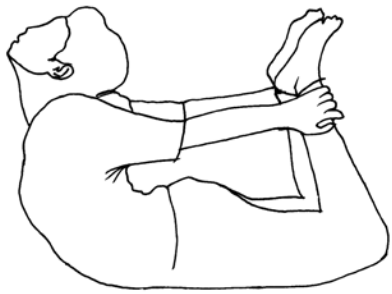

ধনুরাসন : ছবি– ১

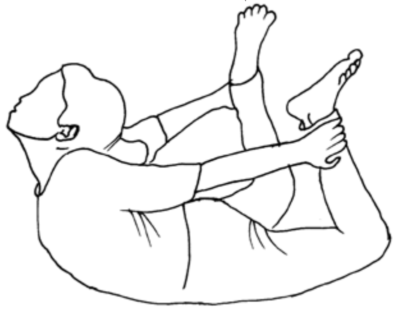

ধনুরাসন : ছবি– ২

উপকারিতা

১. কিডনি, থাইরয়েড ও এড্রিনাল গ্রন্থিকে সুস্থ স্বাভাবিক রাখে।

২. কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়।

৩. পিঠের মাংসপেশিগুলোতে বেশ চাপ পড়ায় মেরুদণ্ডেরস্নায়ুগুলোতে প্রচুর রক্ত চলাচল হয়ে সুস্থ-সতেজ রাখে।

৪. যাদের কোমরে বেশি চর্বি আছে এবং যাদের বুকের খাঁচা অনুন্নত তারা নিয়মিত এ আসন করলে অবশ্যই উপকৃত হবেন।

বি.দ্র. : *যারা গলগণ্ড রোগে বা লাম্বার স্পন্ডিলাইটিসজনিত অসুস্থতায় ভুগছেন তারা এ আসনটি করবেন না। কারণ, এ আসনটি করার সময় শরীরের কটিদেশীয় কশেরুকায় অত্যধিক চাপ পড়ে বলে কোমরের ব্যথা বেড়ে যেতে পারে।*

আসন ২২

পশ্চিমোত্তানাসন

পদ্ধতি : প্রথমে দুই পা সামনে ছড়িয়ে মেরুদণ্ড সোজা রেখে বসুন। এবার আস্তে আস্তে মাথা নিচু করে (১নং ছবির মতো) হাঁটু সোজা রেখে মাথা যতদূর সম্ভব সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে পা ধরতে চেষ্টা করুন। আস্তে আস্তে দুহাত দিয়ে দুপায়ের বুড়ো আঙুল ধরুন। কনুই মাটিতে লেগে থাকবে। দম স্বাভাবিক থাকবে। এভাবে প্রথম দিকে কিছুদিন করার পর শরীর নমনীয় হলে (২নং ছবির মতো) সঠিক ভঙ্গিমায় করতে পারবেন।

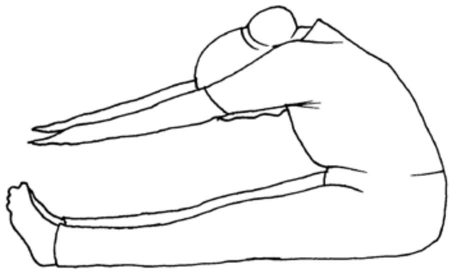

পশ্চিমোত্তানাসন : ছবি– ১
(সহজ ভঙ্গিমা)

সঠিক ভঙ্গিমা হলো–দুই পা মাটির সাথে লেগে থাকবে। কপাল হাঁটুর সাথে ও দুহাতের কনুই মাটিতে ঠেকে থাকবে। দুহাতের আঙুল দিয়ে দুপায়ের বুড়ো আঙুল ধরা যাবে (২নং ছবির মতো)। দম স্বাভাবিক থাকবে। যাদের পেটে চর্বি বেশি তারা সঠিক ভঙ্গিমায় সাত থেকে ১০ বার করতে পারেন, তা না হলে তিন থেকে পাঁচ বার করুন।

পশ্চিমোত্তানাসন : ছবি– ২
(সঠিক ভঙ্গিমা)

উপকারিতা

১. এ আসন পেটের চর্বি কমিয়ে দেহের গঠন সুন্দর করে।
২. উরুর তলদেশে বিভিন্ন পেশিতে বেশ চাপ পড়ায় তা সতেজ থাকে।
৩. যাদের বদহজম ও পেটের পীড়া আছে তারা বিশেষ উপকৃত হবেন।
৪. আমাশয় রোগের উপশম হয়। পেটে গ্যাস হতে পারে না।
৫. মেরুদণ্ড ও পেটের জন্যে বিশেষ উপকারী ব্যায়াম।
৬. অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের লম্বা হতে সাহায্য করে।
৭. এছাড়া অগ্ন্যাশয়, মূত্রাশয় প্রভৃতি সুস্থ রাখে।

বি.দ্র. : *যাদের হার্নিয়া বা এপেন্ডিসাইটিস আছে তারা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এ আসন করবেন না। আর যাদের পীহা, যকৃৎ অত্যধিক বড় বা রুগ্‌ণ তাদের এ আসনটি না করাই ভালো।*

আসন
২৩

সিংহাসন বা স্বরায়ন

পদ্ধতি : প্রথমে বজ্রাসনে বসুন। এবার সামনের হাঁটু ঠিক সোজা রেখে পেছন দিক থেকে দুই পা উরুর দুদিকে ছড়িয়ে দিন। আপনার নিতম্ব মাটিতে রাখুন (২নং ছবির মতো)। দুই হাঁটুর ওপর দুহাত রাখুন। মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। এবার নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে মাথাটা নিচু করে থুতনি গলার কাছে ঠেকান এবং সাথে সাথে জিহ্বা যতটা সম্ভব বড় করে সামনের দিকে বের করুন। এবার গলা দিয়ে আ-আ-আ-আ-আ শব্দ করতে করতে মুখ দিয়ে দম ছাড়ুন (১নং ছবির মতো)। এভাবে নাক দিয়ে দম নিয়ে জিহ্বা বড় করে মুখ দিয়ে আ-আ-আ শব্দে দম ছাড়ুন। এ আসনটি পাঁচ থেকে ছয় বার করুন। স্বরায়নে সময় বাধা নেই, যতটুকু সময় দরকার করুন।

সিংহাসন বা স্বরায়ন : ছবি– ১
(সামনে থেকে)

সিংহাসন বা স্বরায়ন : ছবি– ২
(পেছন থেকে)

উপকারিতা

১. এ আসনে গলার স্বর সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়।

২. টনসিলের জন্যে বিশেষ উপকারী।

৩. কানের পর্দা ভারী হওয়ার জন্যে যারা কানে কম শোনেন তারা বিশেষ উপকার পাবেন।

৪. তোতলামি দূর করতে সাহায্য করে।

আসন
২৪

অর্ধকূর্মাসন

পদ্ধতি : প্রথমে বজ্রাসনে বসুন। এবার আস্তে আস্তে কোমর থেকে নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে মাথা মাটির কাছে নিয়ে আসুন। কপাল মাটিতে রাখুন। নিতম্ব পায়ের গোড়ালির ওপরে থাকবে। হাত দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দিন। হাতের তালু দুটো একত্রে জোড়া লাগিয়ে রাখুন। ঠোঁট ও থুতনি মাটিতে লাগবে না। হাত কানের সাথে লেগে থাকবে। দম স্বাভাবিক রেখে এ ভঙ্গিমায় ১০ থেকে ২০ সেকেন্ড অবস্থান করুন (ছবির মতো)। আসনটি পুরোপুরি আয়ত্তে এলে এ ভঙ্গিমায় একবারে এক মিনিটও অবস্থান করতে পারেন। তখন একবার করলেই হবে।

অর্ধকূর্মাসন : ছবি– ১

উপকারিতা

১. এ আসনে শক্তি বৃদ্ধি হয়। পায়ের গোড়ালি ও হাঁটুতে বাত হতে পারে না। আর থাকলেও উপকার পাওয়া যায়।

২. পেট ও নিতম্বের অতিরিক্ত চর্বি কমিয়ে স্বাভাবিক করে তোলে।

৩. এ আসনটিতে লিভারে প্রচুর রক্ত চলাচল করে লিভারকে সুস্থ রাখে।

আসন
২৫

পবনমুক্তাসন

পবনমুক্তাসন : ছবি– ১

পদ্ধতি : প্রথমে সোজা হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার দম স্বাভাবিক রেখে প্রথমে ডান পা তুলে হাঁটু ভাঁজ করে বুকের কাছে এনে দুহাত দিয়ে চেপে ধরুন। ঊরু পেটের সাথে লেগে থাকবে (১নং ছবির মতো)। যদি পেটে চাপ না পড়ে অর্থাৎ ঊরু সঠিকভাবে লাগতে না চায় তাহলে একটা তোয়ালে ভাঁজ করে পেটের ওপর রেখে দিন। তাহলে সহজে চাপ লাগবে। কয়েকদিন অনুশীলন করার পর এমনিতেই হাঁটু বুকের কাছে লাগবে।

এভাবে (ছবির মতো) প্রথমে ডান পা বুকের সাথে লাগিয়ে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। তারপর বাম পা ভাঁজ করে বুকের সাথে লাগান। তারপর দুই পা সোজা করে মাটিতে রেখে আবার একত্রে দুই পা ভাঁজ করে বুকের কাছে নিয়ে এসে চেপে ধরুন (২নং ছবির মতো)।

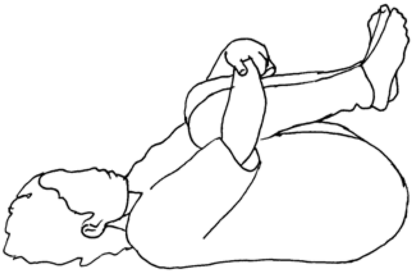

পবনমুক্তাসন : ছবি– ২

এভাবে প্রথমে ডান পা, পরে বাম পা, তারপর দুই পা একত্রে–এরকম তিন ধাপ মিলে এক প্রস্থ হবে। এভাবে তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ করতে পারেন।

বি.দ্র. : *এ আসনটি করার সময় অবশ্যই প্রথমে ডান পা তুলে করবেন। কারণ, যদি প্রথমে বাম পা তুলে করেন তাহলে পেটের মধ্য কোলনে যে বায়ু জমে আছে, তা বের না হয়ে অবরোহী কোলন থেকে আরোহী কোলনে প্রবেশ করবে। ফলে বায়ুর বহির্গমন হবে না। তাই প্রথমেই ডান পা তুলে করতে হবে।*

উপকারিতা

১. এ আসন করলে পেটের মধ্যে বায়ু জমতে পারে না কিংবা কোনো কারণে বায়ু হলে তা নির্গমন হয়।

২. হাঁপানির জন্যে উপকারী।

৩. নিয়মিত পবনমুক্তাসন করলে পাকস্থলী ক্ষুদ্রান্ত্র যকৃৎ পীহা বেশি কর্মক্ষম হয়, হজমশক্তি বাড়ে।

আসন ২৬

হলাসন

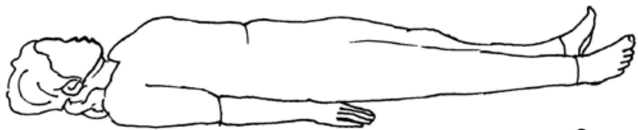

হলাসন : ছবি– ১

পদ্ধতি : প্রথমে সোজা হয়ে শুয়ে পড়ুন। হাত দুটো শরীরের দুপাশে তালু উপুড় করে রাখুন (১নং ছবির মতো)। এবার (২নং ছবির মতো) দুই পা জোড় করে ওপরে তুলুন। এরপর (৩নং ছবির মতো) দুই পা জোড় রেখে মাটি থেকে শরীরটা তুলে পা দুটো মাথার পেছনে রাখুন। এভাবে কিছুদিন চেষ্টা করার পর (৪নং ছবির মতো) পা দুটো জোড় অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে মাথার পেছনে নিয়ে দুপায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝে স্পর্শ করুন। এ ভঙ্গিমায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। দম স্বাভাবিক থাকবে। আবার (১নং ছবির মতো) স্বাভাবিক অবস্থায় এসে ১০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় করুন। এভাবে তিন থেকে পাঁচ বার করতে পারেন। আসনটি পুরোপুরি আয়ত্তে এলে একবারে এক মিনিট পর্যন্ত করা যায়।

উপকারিতা

১. এ আসনে পেটের মেদ কমে। কোমরে ও নিতম্বে মেদ জমতে পারে না।

২. আমাদের গলার কাছে থাইরয়েড গ্রন্থি রয়েছে। মোটা বা

হলাসন : ছবি– ২

চিকন হওয়া কিছুটা নির্ভর করে এই গ্ল্যান্ড-এর স্বাস্থ্যের ওপর অর্থাৎ থাইরয়েড গ্রন্থির অসুস্থতার জন্যে কম হরমোন নিঃসরণ হলে শরীর অতিরিক্ত মোটা হয়ে যায় আর বেশি হরমোন নিঃসরণ হলে স্নায়ুর উত্তেজনা বৃদ্ধি, গলগণ্ড, অত্যধিক শুকনা, চক্ষুদ্বয়ের অত্যধিক স্ফীতি, হৃৎপিণ্ডের গতি (হার্ট বিট) বৃদ্ধি পায়। যার ফলে শরীরের ওজন কমতে থাকে। তাই এ আসন করলে থাইরয়েডে পর্যাপ্ত রক্ত চলাচল হয়ে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডকে সুস্থ রাখে। থাইরয়েড হরমোন প্রবাহ স্বাভাবিক রাখে।

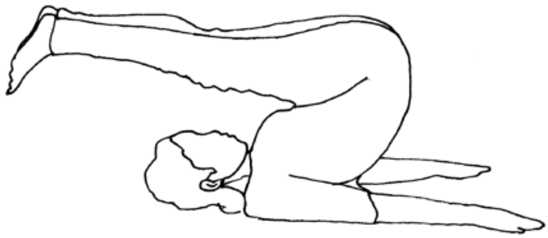

হলাসন : ছবি– ৩

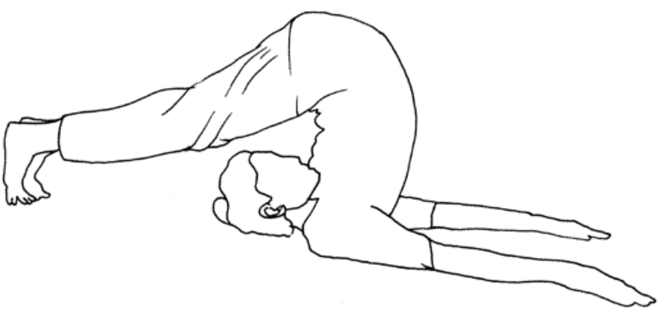

৩. টনসিলের সমস্যা দূর হয়।

৪. এ আসনের ফলে পরিপাকতন্ত্রের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ায় তাদের ক্রিয়াকলাপকে গতিশীল করে।

৫. কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময়ে সাহায্য করে।

৬. মেরুদণ্ডে স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে।

৭. এ আসনটি নিয়মিত করলে ডায়াবেটিস, বাত, সায়াটিকা, স্ত্রীরোগ হতে পারে না। আর এসব রোগ থাকলেও তা নিরাময় হয়।

আসন ২৭

শীর্ষাসন

পদ্ধতি : প্রথমে বজ্রাসনে বসুন। এবার সামনের দিকে ঝুঁকে দুহাতের আঙুলগুলো একে অপরের মধ্যে ঢুকিয়ে জোড়াবদ্ধ করে নিয়ে কনুই থেকে মাটিতে রাখুন। মাথার তালু মাটিতে স্পর্শ করে রাখুন (১নং ছবির মতো)। এবার এ ভঙ্গিমায় ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড অবস্থান করুন। এভাবে একবার করার পর ১০ সেকেন্ড করে বিশ্রাম নিয়ে দুই থেকে তিন বার করুন। যারা পূর্ণ শীর্ষাসন করতে পারবেন না তারাও এভাবে শীর্ষাসনের কিছুটা ফল পাবেন। দম স্বাভাবিক থাকবে।

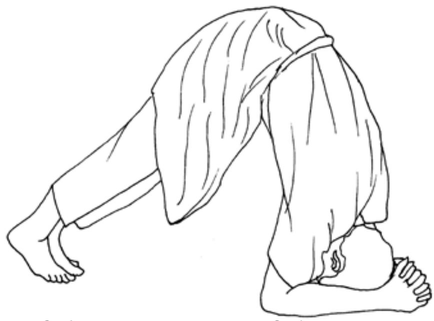

শীর্ষাসন : ছবি– ১ (সহজ শীর্ষাসন)

এবার পূর্ণ শীর্ষাসন করতে হলে দুহাতের কনুই মাটিতে রাখুন। দুই কনুইয়ের মধ্যে এক ফুট পরিমাণ ফাঁক থাকবে। দুহাতের আঙুল একে অপরের মধ্যে খাপবদ্ধ থাকবে। এবার শক্তভাবে খাপবদ্ধ রেখে দুই কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে দেয়ালে সাপোর্ট রেখে (৪নং ছবির ভঙ্গিমায়) ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড

শীর্ষাসন– দ্বিতীয় ধাপ : ছবি– ২

অবস্থান করুন। দম স্বাভাবিক থাকবে। এভাবে একবার করে বিশ্রাম নিয়ে দুই থেকে তিন বার করতে পারেন। যদি তা-ও সম্ভব না হয় তাহলে একজনের সাহায্য নিয়ে দুই পা মাটি থেকে জোড় করে ওপরে তুলে ধরে রাখতে পারেন। আসনটিতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে একসাথে এক থেকে তিন মিনিট করা যায়। তখন কোনো সাপোর্টের প্রয়োজন হবে না। এরপর শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

***বি.দ্র.** : যাদের উচ্চ রক্তচাপ বা হৃদরোগ অথবা চোখের কোনো কঠিন অসুখ আছে তারা শীর্ষাসন করবেন না।*

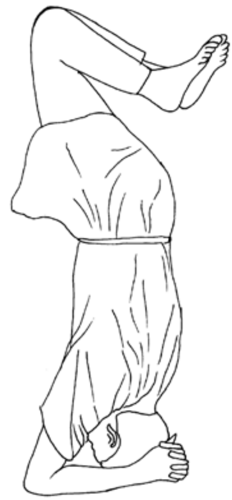

শীর্ষাসন– তৃতীয় ধাপ : ছবি– ৩

উপকারিতা

১. শীর্ষাসনের সময় প্রচুর রক্ত মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত হয়। মস্তিষ্ক হচ্ছে আমাদের মহা শক্তিশালী জৈব কম্পিউটার। এখানে রয়েছে বিশেষ গ্রন্থি হাইপোথ্যালামাস, যা হরমোন নিঃসরণ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক।

২. দৃষ্টি স্মৃতি শ্রবণ স্পর্শ অনুভূতির কেন্দ্রস্থল হলো মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কে অবস্থিত এস্নায়ু কেন্দ্রগুলোকে নিয়মিত শীর্ষাসনের মাধ্যমে সুস্থ রাখা যায়।

৩. নিয়মিত শীর্ষাসন করলে মাথাব্যথা থেকে উপশম পাওয়া যায়।

৪. মুখমণ্ডলে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায় বলে চোখ কান নাক দাঁতে সহজে কোনো রোগ হতে পারে না।

৫. পিটুইটারি গ্রন্থিতে রক্ত চলাচল প্রচুর পরিমাণে হয় বলে এ গ্রন্থির কর্মক্ষমতা

পূর্ণ শীর্ষাসন : ছবি– ৪

বৃদ্ধি পায়। ফলে দেহের সমস্ত গ্রন্থি ও স্নায়ু সুস্থ ও সক্রিয় থাকে।

৬. টনসিলের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৭. মেয়েদের জরায়ু সরে গেলে নিয়মিত এ আসনটি করলে তা ঠিক জায়গায় ফিরে আসে।

৮. এছাড়া লিউকোরিয়া, অর্শ, একশিরা, হাঁপানি, মাথাধরা, আলস্য ইত্যাদি দূর হয়।

আসন ২৮

পদ্মাসন

পদ্ধতি : প্রথমে দুই পা সামনের দিকে ছড়িয়ে বসুন। এবার হাত দিয়ে ডান পা হাঁটুর কাছ থেকে ভাঁজ করে বাম পায়ের ঊরুর ওপর রাখুন। তারপর বাম পায়ের হাঁটু ভাঁজ করে একই নিয়মে ডান উরুর ওপর রাখুন এবং দুই পায়ের গোড়ালি দুটো যেন নিচের পেট স্পর্শ করে (২নং ছবির মতো)। হাত দুটো দুই হাঁটুর ওপর রাখুন। হাতের তালু ওপরের দিকে থাকবে এবং হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনী (ছবির মতো) ধরে রাখুন। মেরুদণ্ড সোজা রাখুন। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখুন। (২নং ছবির মতো) সঠিক অবস্থায় বসে ধীরে ধীরে নাক দিয়ে দম নিন (বুক ফুলিয়ে)। এরপর দম পাঁচ/ সাত সেকেন্ড ধরে ছাড়ুন।

সহজ পদ্মাসন : ছবি– ১

পদ্মাসন : ছবি– ২

ছাড়ার সময় আপনার পেট ভেতরের দিকে বসে যাবে। অর্থাৎ দম নিন বুকে, ছাড়ুন সম্পূর্ণরূপে এবং দম নেয়ার চেয়ে ছাড়ার সময় একটু বেশি নিন। এভাবে এক থেকে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত পদ্মাসনে বসে প্রাণায়াম করতে পারেন। প্রয়োজনে পা অদলবদল করে নিতে পারেন। যত দিন সহজে করতে অভ্যস্ত না হন ততদিন প্রথমে সহজ পদ্মাসনে অর্থাৎ এক পায়ে করে অভ্যাস করুন (১নং ছবির মতো)। মনে রাখবেন–অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো আসন জোর করে করবেন না। নিয়মিত করলে ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে এবং সঠিকভাবে করতে পারবেন।

উপকারিতা

১. মনোসংযোগ বৃদ্ধি পায়, মন স্থির হয়।

২. পায়ের ব্যথা, হাঁটুতে বাত-ব্যথা হতে পারে না। পায়ের গ্রন্থিগুলোকে সুস্থ-সবল রাখে।

৩. পদ্মাসনে বসে প্রাণায়াম করলে ফুসফুস ভালো থাকে। ছোটবেলা থেকেই অভ্যাস করলে হাঁপানি হতে পারে না।

৪. মুখের ত্বক সুন্দর থাকে।

৫. এ আসন করার সময় মেরুদণ্ড সোজা থাকে। যাদের মেরুদণ্ড একটু বাঁকা, ক্রমাগত এ আসনটির অভ্যাস তাদের জন্যে খুবই উপকারী। এছাড়া মেরুদণ্ড থেকে যে-সবস্নায়ু শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছে, সেগুলোকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে সাহায্য করে।

আসন
২৯

দৃষ্টিদান

দৃষ্টিদান : ছবি– ১ (দৃষ্টি নিচের দিকে)

দৃষ্টিদান : ছবি– ২ (দৃষ্টি উপরের দিকে)

পদ্ধতি : প্রথমে পদ্মাসন বা সুখাসনে বসুন। অর্থাৎ যেভাবে আরাম অনুভব করেন সেভাবেই বসুন। তবে যে আসনই হোক না কেন–মেরুদণ্ড সোজা টানটান রেখে বসবেন। এবার সামনে মাটিতে একটি বিন্দু অথবা চিহ্ন স্থাপন করুন এবং তার দিকে তাকিয়ে থাকুন এক সেকেন্ড (১নং ছবির মতো)। এরপর ওপরের দিকে (আপনার ঘরের ছাদের দিকে সোজা দৃষ্টি বরাবর) একটি পয়েন্ট আগে থেকেই ঠিক করে নিয়ে সেদিকে তাকান এবং এক সেকেন্ড অবস্থান করুন (২নং ছবির মতো)। এরপর ওপরের ছাদের ডান দিকে একটি পয়েন্ট ভেবে নিয়ে চোখের মনি ঘুরিয়ে ডানে তাকান। এক সেকেন্ড অবস্থান করুন (৩নং ছবির মতো)। আবার নিচের পয়েন্টে তাকান (১নং ছবির মতো)। এভাবে প্রথমে ডান দিকে ও পরে বাম দিকের পয়েন্ট

ঠিক করে একইভাবে করুন। অর্থাৎ নিচে-ওপরে-ডানে-নিচে–এভাবে সাত থেকে ১০ বার চোখের মনি ঘোরান। আবার নিচে-ওপরে- বামে-নিচে–এভাবে চোখের মনি ঘোরান সাত থেকে ১০ বার (৪নং ছবির মতো)। প্রত্যেকবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এক সেকেন্ড অবস্থান করুন।

মেরুদণ্ড সোজা রেখে ঠিকভাবে বসবেন। মাথা নড়বে না। শুধু চোখের মনি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে করবেন।

দৃষ্টিদান : ছবি– ৩ (উপরে ডানে দৃষ্টি)

উপকারিতা

১. এ আসনটিতে চোখের বিশেষ উপকার হয়। দৃষ্টিশক্তি বাড়ে। চোখের এলার্জি থাকলে তার উপশম হয়। চোখের নার্ভগুলোতে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পেয়ে চোখকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। অল্পবয়স থেকেই এ আসন অভ্যাস করলে দৃষ্টিশক্তি ঠিক থাকে, চশমা পরতে হয় না।

দৃষ্টিদান : ছবি– ৪ (উপরে বামে দৃষ্টি)

বি.দ্র. : □ *চোখের কঠিন অসুখে ভুগলে এ ব্যায়াম করা যাবে না। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেন।*

□ *চোখের রেটিনায় কোনো অপারেশন কিংবা সমস্যা থাকলে এই ব্যায়াম করা যাবে না এবং সামনে মাথা ঝোঁকানো (নিচু করা) যাবে না।*

□ *কোনো ধরনের প্রাণায়াম করা যাবে না।*

আসন
৩০

সুপ্ত ভদ্রাসন

সুপ্ত ভদ্রাসন : ছবি– ১

পদ্ধতি : প্রথমে সোজা হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার দুই পা হাঁটু থেকে ভাঁজ করে দুহাতের সাহায্যে দুপায়ের পাতা একত্র করে জোড়া লাগান। জোড় দুপায়ের বুড়ো আঙুল দুটো বুকের মাঝখানে নিয়ে এসে চেপে ধরুন। আপনার হাত যেন আলগা হয়ে না যায় (ছবির মতো)। এভাবে এ ভঙ্গিমায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। দম স্বাভাবিক থাকবে। এভাবে তিন থেকে পাঁচ বার করতে পারেন। প্রথমবার করার পর পা ছেড়ে দিয়ে সোজা করে রাখুন। আবার দ্বিতীয়বার করুন; এভাবে তিন থেকে পাঁচ বার।

উপকারিতা

১. যারা অর্শ রোগে ভুগছেন তারা এ আসনে অশ্বিনীমুদ্রা করলে খুবই উপকৃত হবেন।

২. এ আসনে লিভেটর এনাই পেশিতে অতিরিক্ত চাপ পড়ার ফলে পেশিকে মজবুত ও শক্তিশালী করে পেলভিক এলাকার অঙ্গগুলোকে নিজ নিজ স্থানে ধরে রাখতে সাহায্য করে। যার ফলে জরায়ু, মলদ্বার বা মূত্রাশয়ের স্থানচ্যুতি হতে পারে না।

৩. স্ত্রীরোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ধৌতি
১

সহজ অগ্নিসার ধৌতি

পদ্ধতি : প্রথমে মেরুদণ্ড সোজা রেখে সুখাসনে বসুন (ছবির মতো)। এবার দম স্বাভাবিক রেখে দুহাতের বুড়ো আঙুল যেখানে শরীরের দুপাশের পাঁজরের হাড় শেষ হয়ে গেছে সেখানে রাখুন। হাতের বাকি আঙুল একত্র রেখে দুহাত দিয়ে পেট চেপে ধরে নাভির এক আঙুল পরিমাণ নিচে চেপে ধরুন। ঝট করে ছেড়ে দিন। বুড়ো আঙুল যেখানে রেখেছেন সেখান থেকে সরাবেন না। শুধু দুহাতের বাকি আঙুলগুলো একত্র রেখে চেপে ধরুন। ঝট করে ছাড়ুন। এভাবে ৩০ থেকে ৪০ বার চেপে ধরুন। চাপ দেয়ার সাথে সাথে ছাড়ুন। চাপ দিয়ে ধরে রাখবেন না।

সহজ অগ্নিসার ধৌতি : ছবি– ১

উপকারিতা

১. যারা বহুদিন ধরে আমাশয়ে ভুগছেন তাদের জন্যে বিশেষ উপকারী ব্যায়াম।

বি.দ্র. : *আমাশয় হলে খাওয়া-দাওয়ার প্রতি খেয়াল রাখুন। অতিরিক্ত তেল-ঝাল-মসলা পরিহার করুন। বাইরের খোলা খাবার খাবেন না; খাওয়ার আগে অবশ্যই সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিন।*

ধৌতি
২

বমন ধৌতি

পদ্ধতি : ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই খালি পেটে এক থেকে দুই লিটার পরিমাণ পানি পান করুন। তারপর মুখ হা করে ডান হাতের মধ্যমা আঙুল দিয়ে আল-জিহ্বার কাছে নাড়া দিলেই বমির উদ্রেক হবে। যে পানি পান করেছেন তা বেরিয়ে আসবে। এভাবে পানি পান করে গলায় আঙুল দিয়ে ইচ্ছাকৃত বমির মাধ্যমে ধৌত করাকে বমন ধৌতি বলে। এতে পাকস্থলীর ভেতর বাড়তি এসিড-পিত্ত বেরিয়ে আসে। স্বাভাবিক বমি হওয়ার ফলে মানুষ যেমন দুর্বল হয়ে যায়, এতে তা হয় না। বমন ধৌতি মাসে দুই/একবার করাই ভালো–এর বেশি নয়। ধৌতি করার পর এক গ্লাস পানি পান করে পাঁচ মিনিট সহজ শিথিলায়ন বা শবাসন করবেন। তারপর নাশতা খাবেন। শীতের সময় কুসুম গরম পানি পান করে বমন ধৌতি করতে পারেন।

উপকারিতা

১. যাদের পিত্তদোষ বা এসিডিটির দোষ রয়েছে তারা বিশেষ উপকৃত হবেন।

২. পাকস্থলীতে কোনো দূষিত পদার্থ জমতে পারে না।

৩. যাদের ঢেকুর ওঠে বা মুখ তিতা বা টক লাগে তাদের জন্যে এ প্রক্রিয়াটি বিশেষ উপকারী।

বিপরীত করণীতে অশ্বিনীমুদ্রা

পদ্ধতি : প্রথমে মাটিতে দুই পা সোজা রেখে মেরুদণ্ড সোজা করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। দুহাত শরীরের দুপাশে রাখুন। এবার দুই হাঁটু ভাঁজ করে পেটের কাছে নিয়ে এসে দুই পা সোজা রেখে ধীরে ধীরে ওপরে তুলুন। দুহাতের তালু দিয়ে নিতম্ব ধরে ঠেস দিয়ে রাখুন (ছবির মতো)। থুতনি গলার সাথে লেগে থাকবে। দম স্বাভাবিক থাকবে। এভাবে না পারলে দেয়ালে পা রেখে দুহাত দিয়ে (ছবির মতো) নিতম্ব ঠেস দিয়েও করতে পারেন, তাতেও ফল হবে। পরে অভ্যস্ত হলে এমনিতেই পারবেন। দেহকে এ ভঙ্গিমায় রেখে বার বার মলদ্বার সংকুচিত ও প্রসারিত করুন। এভাবে একবার সংকুচিত ও একবার প্রসারিত করাকে এক মাত্রা বলে। এভাবে ১০ থেকে ২৫ মাত্রা করতে পারেন। এসময় দম স্বাভাবিক থাকবে।

বিপরীত করণীতে অশ্বিনীমুদ্রা : ছবি– ১

উপকারিতা

১. যারা বহুদিন ধরে অর্শরোগে ভুগছেন তারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। মলদ্বারের ভেতরের শিরায় রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্শরোগ হতে পারে না এবং হলেও নিরাময় লাভ করবেন।

বজ্রাসনে অশ্বিনীমুদ্রা

পদ্ধতি : প্রথমে বজ্রাসনে বসুন, তারপর একবার মলদ্বার সংকুচিত করুন ও একবার প্রসারিত করুন। এভাবে একপ্রস্থ হবে। ১০ থেকে ২০ প্রস্থ করতে পারেন।

বজ্রাসন

উপকারিতা

এটিতেও একই ফল পাবেন।

সুপ্ত ভদ্রাসনে অশ্বিনীমুদ্রা

পদ্ধতি : প্রথমে সুপ্ত ভদ্রাসন করুন। তারপর শরীরটাকে সে ভঙ্গিমায় রেখে মলদ্বার একবার সংকুচিত ও একবার প্রসারিত করুন। এভাবে ১০ থেকে ২০ প্রস্থ করতে পারেন।

উপকারিতা

১. এতে সুপ্ত ভদ্রাসনের সব উপকারিতা পাওয়া যায়।

২. মলদ্বারের বিশেষ ব্যায়াম হয়।

৩. জরায়ুর স্থানচ্যুতি হলে তার বিশেষ উপকার হবে, জরায়ু সঠিক স্থানে নিয়ে আসতে সাহায্য করে।

সুপ্ত ভদ্রাসন

প্রাণায়াম

প্রাণশক্তি বৃদ্ধি পায় ও দেহকে জরা-ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখে বলে একে প্রাণায়াম বলে।

একনাসা প্রাণায়াম বা নাসায়ন

পদ্ধতি : মেরুদণ্ড সোজা রেখে প্রথমে এক পা ওপরে তুলে আর এক পা ভাঁজ করে নিচে রেখে (ছবির মতো করে) বসুন। এবার (ছবির মতো করে) ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে নাকের ডান পাশের ছিদ্র চেপে ধরুন। এমনভাবে ধরুন যেন বাতাস বেরিয়ে যেতে না পারে। এবার বাম পাশের ছিদ্র দিয়ে দম নিয়ে অনামিকা দিয়ে বাম পাশের ছিদ্রটিও বন্ধ করে দিন। তারপর

নাসায়ন : ছবি– ১

নাসায়ন : ছবি– ৩

হাত ও আঙুলের ভঙ্গি

পদ্মাসনে নাসায়ন : ছবি– ২

বাম ছিদ্র বন্ধ রেখেই ডান ছিদ্র থেকে বুড়ো আঙুল তুলে ডান ছিদ্র দিয়ে দম ছাড়ুন। বাম ছিদ্র বন্ধ রাখা অবস্থায়ই নাকের ডান ছিদ্র দিয়ে পুনরায় দম নিন। দম নেয়া হলে বুড়ো আঙুল দিয়ে ডান ছিদ্র বন্ধ করে পুনরায় বাম ছিদ্র দিয়ে দম ছাড়ুন। এভাবে একবার বাম নাক বন্ধ রেখে ডান নাক দিয়ে ছাড়া আবার ডান নাক বন্ধ রেখে বাম নাক দিয়ে ছাড়া–এই মিলে একপ্রস্থ হবে। এভাবে ছয় থেকে ১০ প্রস্থ করতে পারেন। নাসায়ন আপনি পদ্মাসনে বসেও করতে পারেন।

উপকারিতা

১. এ প্রাণায়ামে ফুসফুসের খুব ভালো কাজ হয়। মাইগ্রেন নিরাময়ে ভালো ফল পাওয়া যায়। প্রাণায়ামের ফলে ফুসফুসে প্রচুর অক্সিজেন প্রবেশ করে। ফলে কোনো রোগ সহজে ফুসফুস আক্রমণ করতে পারে না।

পদ্মাসনে প্রাণায়াম

পদ্ধতি : প্রথমে মেরুদণ্ড সোজা রেখে মাটিতে দুই পা ছড়িয়ে বসুন। এবার বাম পা হাঁটু থেকে ভেঙে ডান উরুর ওপর এবং ডান পা একইভাবে বাম উরুর ওপর রাখুন। হাত দুটো কোয়ান্টা ভঙ্গি করে চিৎ অবস্থায় দুই হাঁটুর ওপর রাখুন এবং তর্জনী ও বুড়ো আঙুল একত্রে (ছবির মতো করে) ধরে রাখুন। দৃষ্টি স্বাভাবিক সোজা বরাবর রাখুন। এবার নাকের দুই ছিদ্র দিয়ে ধীরে ধীরে দম নিতে থাকুন। বুক ফুলিয়ে দম নিন। কয়েক সেকেন্ড দম বন্ধ রেখে পুনরায় দুই নাকের ছিদ্র দিয়েই ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। চোখের দৃষ্টি রাখুন নাকের অগ্রভাগে ও মনোযোগ রাখুন দমের প্রবেশপথে অর্থাৎ নাকের ছিদ্রতে। এভাবে এক থেকে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত করতে পারেন।

পদ্মাসন

কখনো পা ব্যথা হয়ে উঠলে পা পরিবর্তন করে বসতে পারেন।

উপকারিতা

১. হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

২. হাঁপানি রোগ হতে পারে না। থাকলে ভালো উপকার পাওয়া যায়।

৩. মেরুদণ্ড সোজা ও সবল রাখে।

৪. চিন্তা শক্তি, স্মৃতি শক্তি, ইচ্ছা শক্তি ও মনের একাগ্রতা বাড়ে।

৫. পায়ের পেশি ও স্নায়ু ভালো, সতেজ ও সক্রিয় থাকে, পায়ে বাত হতে পারে না।

***বি.দ্র.:** অবশ্যই আগে পদ্মাসন অভ্যাস করুন। তারপর প্রাণায়াম করুন।*

ভ্রমণ প্রাণায়াম

পদ্ধতি : মেরুদণ্ড সোজা রেখে সমান তালে পা ফেলে হাঁটতে শুরু করুন। এবার ছয় কদমে হাঁটতে হাঁটতে দম নিন এবং আট কদমে দম ছাড়ুন। অর্থাৎ ধীরে ধীরে দম নিতে নিতে মনে মনে গণনা করে ছয় কদম এগিয়ে যান। আর ধীরে ধীরে দম ছাড়তে ছাড়তে মনে মনে গণনা করে আট কদম হাঁটুন। ফলে দম নেয়ার চেয়ে ছাড়ার সময় একটু বেশি লাগবে। পাঁচ/ সাত মিনিট এভাবে প্রতি বার হাঁটুন। ধীরে ধীরে কদমের সংখ্যা বাড়াতে থাকুন। আট কদমে নিন। ১০ কদমে ছাড়ুন। ১০ কদমে নিন। ১২ কদমে ছাড়ুন। ১২ কদমে নিন। ১৬ কদমে ছাড়ুন।

উপকারিতা

১. এ প্রাণায়ামটি সবার জন্যে উপযোগী। বিশেষ করে বয়স্কদের জন্যে বিশেষ উপযোগী।

২. যারা অসুখ-বিসুখের জন্যে কোনো ধরনের ব্যায়াম করতে পারেন না তারা এ প্রাণায়ামটি অভ্যাস করলে শরীর রোগমুক্ত রাখতে পারবেন।

***বি.দ্র. :** প্রাণায়ামটি করার সময় যদি বুকে চিনচিন ব্যথা অনুভব করেন তাহলে বুঝতে হবে ফুসফুসের ক্ষমতা অনুযায়ী মাত্রা বেশি হয়ে যাচ্ছে। যেদিন এরকম অনুভব করবেন সেদিন বন্ধ রাখুন। পরে মাত্রা কমিয়ে দুই/ তিন মিনিট করুন এবং ধীরে ধীরে সময় বাড়িয়ে পাঁচ/ সাত মিনিট করুন।*

সহজ ব্যায়াম

পা ঘূর্ণন বা লেগ সার্কেলিং

পা ঘূর্ণন বা লেগ সার্কেলিং : ছবি– ১

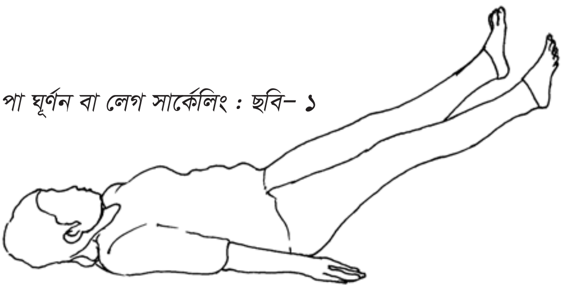

পদ্ধতি : প্রথমে মেঝেতে শুয়ে পড়ুন। মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। হাত দুটো শরীরের দুপাশে রাখুন। হাতের তালু মেঝেতে লেগে থাকবে। এবার (১নং ছবির মতো) ডান পা ঘড়ির কাঁটার মতো বৃত্তাকারে ডানদিকে ঘোরান। আবার (২নং ছবির মতো) বাম পা বামদিকে বৃত্তাকারে ঘোরান। প্রতি পায়ে পাঁচ থেকে সাত বার করে ঘোরান।

পা ঘূর্ণন বা লেগ সার্কেলিং : ছবি– ২

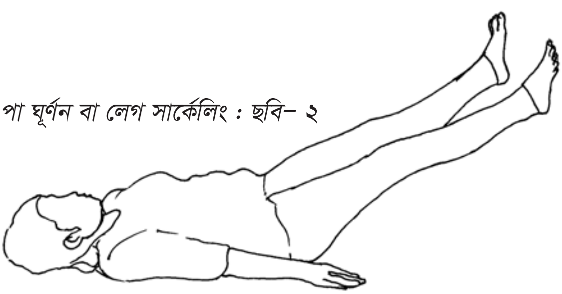

এবার (৩নং ছবির মতো) দুই পা একত্র করে বৃত্তাকারে ডান দিকে ঘোরান। এভাবে পাঁচ/ সাত বার ঘোরান। আবার বৃত্তাকারে বাম দিকে পাঁচ/ সাত বার ঘোরান (৪নং ছবির মতো)। দম স্বাভাবিক থাকবে। ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে গেলে ১০ থেকে ২০ বার করেও করতে পারেন।

পা ঘূর্ণন বা লেগ সার্কেলিং : ছবি– ৩

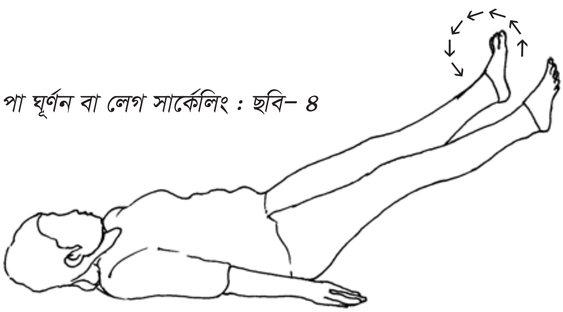

পা ঘূর্ণন বা লেগ সার্কেলিং : ছবি– ৪

উপকারিতা

১. নিয়মিত করলে কোমরে ও পেটে চর্বি জমতে পারে না। যদিও থাকে তাহলে কিছু দিনের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসে।

২. কোমরের ব্যথা দূর হয়। নিতম্বের মাংসপেশিকে মজবুত ও সুদৃঢ় করে।

৩. হার্নিয়া, রেট্রোভারটেড ইউটেরাস প্রভৃতি রোগের হাত থেকে রক্ষা করে।

হাঁটুর ব্যথায় করণীয় ব্যায়াম

পদ্ধতি : সোজা হয়ে বিছানা কিংবা কার্পেটের ওপর শুয়ে কিংবা বসে পড়ুন। দুই পা সোজা করে টান টান রাখুন। এবার দুপায়ের পাতা এবং আঙুলগুলো শক্ত করে শরীরের দিকে বাঁকান। অর্থাৎ উল্টো দিকে বাঁকান এবং মনে মনে এক থেকে ১০ গুণুন। এবার পা ছেড়ে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসুন। এভাবে ১০ বার করুন। ছেলে মেয়ে উভয়ের জন্যে প্রযোজ্য।

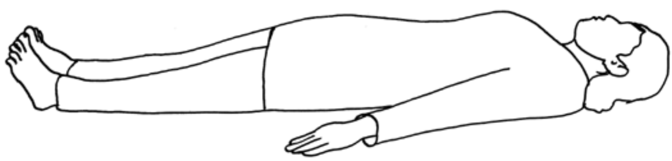

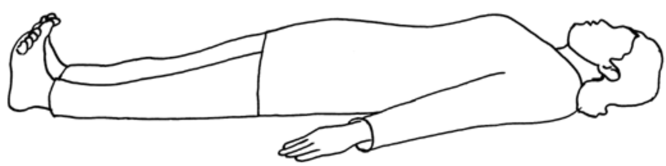

উপকারিতা

১. হাঁটুর জয়েন্টগুলো দৃঢ় করে। ৪০ বছর বয়সের পরে দিনে তিন বেলা এভাবে করুন। হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ হাঁটুর বাটি সরে যায়–এমন যাদের মাঝে মাঝে মনে হয় তাদের জন্যে বিশেষ উপকারী।

হাঁটুর ব্যথার রোগীদের জন্যে পরামর্শ

১. একটানা বেশিক্ষণ হাঁটবেন না বা দাঁড়িয়ে থাকবেন না।
২. ব্যথাযুক্ত হাঁটুকে বিশ্রাম দিন এবং ছোটখাটো আঘাত থেকে হাঁটুকে মুক্ত রাখুন।

ছবি- ২

৩. হাঁটু গেড়ে বসবেন না। বাথরুমে হাই কমোড বা চেয়ার কমোড ব্যবহার করুন।

৪. পায়ের জুতা জুৎসই করে নিন। হাইহিল জুতা পরবেন না।

৫. চলাফেরার সময় হাতে লাঠি বা ওয়াকার ব্যবহার করুন।

৬. বয়স্ক হলে চলাফেরায় সাহায্য নিন। ঘরের মেঝে মসৃণ হলে ম্যাট বিছিয়ে নিন।

৭. শরীরের অতিরিক্ত ওজন কমান। ভারী জিনিস বহন করবেন না।

৮. প্রয়োজনে অর্থোপেডিক্স ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

সারভাইক্যাল স্পন্ডিলাইটিস-এ করণীয় ব্যায়াম

পদ্ধতি ১

সোজা হয়ে দাঁড়ান বা বসুন। মাথা সোজা রেখে ডান হাতের তালু কপালের মাঝখানে রাখুন। এবার বাম হাতের তালু তার ওপর রেখে জোরে চাপ দিন। মনে মনে ১০ পর্যন্ত গণনা করুন। এভাবে তিন বার করবেন।

পদ্ধতি ২

সোজা হয়ে দাঁড়ান বা বসুন। দুহাত মুষ্টিবদ্ধ করে ঘাড় নয়, মাথার পেছনে রাখুন। মাথা না বাঁকিয়ে হাতের ওপর জোরে চাপ দিন। ১০ পর্যন্ত গণনা করুন। এভাবে তিন বার করুন।

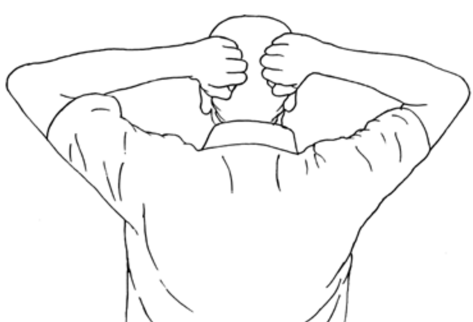

পদ্ধতি ৩

সোজা হয়ে দাঁড়ান অথবা বসুন। ডান হাত ডান গালের ওপর (ছবি অনুযায়ী) রাখুন। মাথা সোজা রেখে জোরে চাপ দিন। ১০ পর্যন্ত

গণনা করুন। এভাবে তিন বার করুন। বাম দিকে একইভাবে করুন। ডান হাত (ছবি নং ১), বাম হাত (ছবি নং ২)।

ডান হাত (ছবি নং ১)

বাম হাত (ছবি নং ২)

পদ্ধতি ৪

ছবি অনুযায়ী ডান হাত কপালের ডান পাশে এবং বাম হাত মাথার পেছনে বাম দিকে রাখুন। মাথা সোজা রেখে জোরে চাপ দিয়ে ডান কাঁধের ওপর দেখতে চেষ্টা করুন। ১০ পর্যন্ত গণনা করুন। এভাবে তিন বার করুন। এবার ছবি অনুযায়ী বাম হাত কপালের বাম পাশে এবং ডান হাত মাথার

ডান হাত (ছবি নং ১)

বাম হাত (ছবি নং ২)

পেছনে ডান দিকে রেখে জোরে চাপ দিয়ে বাম কাঁধের ওপর দেখতে চেষ্টা করুন। ১০ পর্যন্ত গণনা করুন। এ ব্যায়াম পাঁচ থেকে ১০ মিনিট করে প্রতিদিন এক বা দুই বেলা করুন।

ঘাড়ে ব্যথার রোগীদের জন্যে বিশেষ পরামর্শ

১. শক্ত বিছানায় লম্বা হয়ে ঘাড়ের নিচে শিশুদের কোল বালিশ বা তোয়ালে গোল করে দিয়ে চিৎ হয়ে আধা ঘণ্টা করে সকাল ও বিকেলে শোবেন এবং ঘুমানোর সময় নরম বালিশ ব্যবহার করবেন।

২. ব্যথার সময়, কাজের সময় এবং ভ্রমণের সময় অবশ্যই কলার ব্যবহার করবেন।

৩. ভ্রমণের সময় এবং বসা অবস্থায় ঘুমাবেন না। শুয়ে শুয়ে বা কাত হয়ে পড়াশোনা করবেন না।

৪. কেউ পেছন থেকে ডাকলে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাবেন না, নিজে ঘুরে যাবেন।

৫. মাথায় ভারী জিনিস বহন করবেন না এবং ঘাড়ে ঠান্ডা লাগাবেন না।

৬. সেলুনে ঘাড় মালিশ করাবেন না বা মটকাবেন না।

সব ধরনের ব্যথার ক্ষেত্রে যোগ উপদেশমতো নিয়মিত ব্যায়াম করবেন এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের নির্দেশনা অনুযায়ী ফিজিওথেরাপি নিতে পারেন।

কোমরে ব্যথার রোগীদের জন্যে পরামর্শ

১. ফোম বা বেশি নরম বিছানায় এবং বাঁকা ও কুঁজো হয়ে শোবেন না।
২. বেশি ব্যথা থাকা অবস্থায় ব্যায়াম করবেন না, উপুড় হয়ে ঘুমাবেন না।
৩. কোমর বাঁকা বা নরম করে কোনো কাজ করবেন না এবং ভারী কিছু তুলবেন না।
৪. কোনো জিনিস তোলার সময় কোমর শক্ত রেখে সোজাভাবে সাবধানে তুলবেন।
৫. ব্যথা থাকা অবস্থায় চেয়ারে বসে খাবেন এবং নামাজ পড়বেন।
৬. বাথরুমে হাই কমোড বা চেয়ার কমোড ব্যবহার করুন।
৭. শোয়া থেকে ওঠার সময় একদিকে কাত হয়ে হাতে ভর দিয়ে উঠবেন।
৮. সোজা হয়ে চেয়ারে বসে বা দাঁড়িয়ে গোসল করবেন এবং দৈনন্দিন কাজ করবেন।
৯. বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে বা বসে থাকবেন না। বেশিদূর হাঁটতে হলে থেমে থেমে হাঁটবেন।
১০. অপ্রয়োজনে ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তায় যানবাহনে ভ্রমণ করবেন না।
১১. কুয়া থেকে পানি তুলবেন না বা টিউবওয়েল চেপে পানি তুলবেন না।
১২. কোমরে মালিশ করবেন না এবং হাইহিল জুতা পরবেন না।
১৩. শরীরের অতিরিক্ত ওজন কমাতে হবে। যে-কোনো কাজের সময় সতর্ক থাকতে হবে।
১৪. ব্যথার স্থানে গরম পানিতে তোয়ালে বা গামছা ভিজিয়ে সেঁক দেবেন।
১৫. সিঁড়িতে ওঠানামার সময় ধীরে ধীরে রেলিং ধরে সোজা হয়ে উঠবেন এবং নামবেন।
১৬. কাজের সময় বা ভ্রমণের সময় করসেট বেল্ট ব্যবহার করবেন। ব্যায়াম করার সময় এবং ঘুমানোর সময় বেল্ট খুলে রাখুন। গাড়ি ড্রাইভ করার সময় সিটবেল্ট ব্যবহার করুন।
১৭. প্রয়োজনে অর্থোপেডিক ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

গর্ভবতী মহিলাদের জন্যে কিছু ব্যায়াম

গর্ভবতী মায়েরা সামান্য কিছু ব্যায়ামের দ্বারাই নিজের শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখতে পারেন। সন্তান প্রসবের ব্যাপারে সাধারণত সব মেয়েরই একটা ভয় কাজ করে। তাই গর্ভাবস্থায় ব্যায়ামের মাধ্যমে পেটের মাংসপেশিকে মজবুত রেখে শিশুর বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে পারবেন। এছাড়া পেলভিস মাংসপেশির স্থিতিস্থাপকতা ঠিক রেখে নিরাপদে প্রসব করতে পারবেন।

সবসময় একটা কথা মনে রাখবেন, গর্ভাবস্থায় সঠিকভাবে দম নেয়া উচিত। তাতে শরীরের দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যেতে সাহায্য করে এবং ব্যায়ামের ফলে শরীরে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায় বলে শরীর সুস্থ ও সবল রাখে।

প্রতিদিন ১০/১৫ মিনিটের মতো ব্যায়ামই যথেষ্ট, এর বেশি করার প্রয়োজন নেই। বেশি ব্যায়াম গর্ভবতী মায়েদের জন্যে খুবই ক্ষতিকর।

গর্ভবতী মহিলাদের প্রতিদিন সকালে ব্যায়াম করা ভালো।

গর্ভবতী মহিলারা ব্যায়াম শেষে অবশ্যই ১০ মিনিট শবাসনে বিশ্রাম নিন এবং মনে মনে এ অবস্থা কল্পনা করুন—পরম করুণাময় আপনাকে একটি সুস্থ সুন্দর মেধাবী শিশু প্রসব করার ক্ষমতা দিয়েছেন। আপনি বেশ ভালো বোধ করছেন।

ব্যায়াম শেষে বিশ্রাম নেয়ার পরে কুসুম গরম পানি দিয়ে গোসল অথবা তোয়ালে ভিজিয়ে সমস্ত শরীর মুছে ফেলুন।

গর্ভবতী মহিলারাও খোলামেলা আলো-বাতাসপূর্ণ ঘরে ব্যায়াম করুন। শীতের সময় ঘরে ব্যায়াম করার পূর্বে বাতাস চলাচল করিয়ে নিয়ে ব্যায়াম করুন।

শেষ কথা হলো, গর্ভধারিণীর অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ব্যায়াম করা উচিত। সবসময় ডাক্তারের পরামর্শে চলা

উচিত। ১৫ দিন অন্তর ডাক্তারের পরামর্শ নিন। ডাক্তারের পরামর্শে গর্ভধারণের নয় মাস পর্যন্ত ব্যায়াম করতে পারেন। তবে অবশ্যই মনে রাখবেন, চিকিৎসক যদি আপনাকে ব্যায়াম করতে নিষেধ করেন কিংবা নির্দিষ্ট ব্যায়ামগুলোর মধ্যে যে-কোনোটি বিশেষভাবে বারণ করেন তাহলে করবেন না। কেননা একজন চিকিৎসকই এসময় আপনার সম্পর্কে এবং অভ্যন্তরীণ শিশুর পজিশন সম্পর্কে ভালো বুঝবেন। নিজে নিজে ব্যায়াম করতে গিয়ে হিতে বিপরীত করবেন না।

গর্ভবতী মায়েদের গর্ভাবস্থায় নানান জটিলতা দেখা যায়। যেমন কারো কারো বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়। গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব একটু একটু করে হয়ে থাকে। আরো নানান অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। গর্ভবতী মায়েদেরকে ডাক্তাররা অনেক সময় সম্পূর্ণরূপে বেড রেস্ট নিতে বলেন। কাজেই যদি আপনার কখনো এরকম অবস্থা হয় আর আপনি ব্যায়াম করেন তাহলে আপনার মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। তাই গর্ভবতী মায়েরা সবসময় ডাক্তারের পরামর্শেই ব্যায়াম করবেন।

এ অধ্যায়ে গর্ভবতী মায়েদের জন্যে কিছু ব্যায়াম করার পদ্ধতি আলোচনা করা হলো, যা একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে করতে পারেন।

বি.দ্র. : *গর্ভাবস্থায় কোনো মতেই তাড়াহুড়ো করে ব্যায়াম করা উচিত নয়। প্রতিটি ব্যায়াম করার পর ২০/৩০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিয়ে তবে অন্য একটি ব্যায়াম করতে হবে। ব্যায়ামের সময় আরামদায়ক পোশাক পরা উচিত।*

১ নম্বর ব্যায়াম

প্রথমে মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে দুই হাঁটু ভাঁজ করে পায়ের পাতা দুটো মাটিতে রাখুন। হাত দুটো শরীরের দুপাশে রাখুন। এবার ধীরে ধীরে গভীরভাবে নাক দিয়ে দম নিতে নিতে হাত দুটো তুলে এনে (২নং ছবির মতো) মাথার পেছনে রাখুন। হাতের পিঠ মাটিতে, তালু ওপরের দিকে থাকবে। এরপর ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে দম ছাড়তে ছাড়তে হাত দুটো পূর্বের অবস্থায় শরীরের দুপাশে এনে রাখুন। হাতের তালু মাটিতে থাকবে। এভাবে দুই বার করুন।

ছবি– ১

ছবি– ২

দিনে কমপক্ষে ২০ বার বলুন–
‘শোকর আলহামদুলিল্লাহ!
আমি বেশ ভালো আছি।’

২ নম্বর ব্যায়াম

প্রথমে শরীরের দুপাশে হাত লাগিয়ে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ান–'নীল ডাউন'-এর মতো করে (১নং ছবির মতো)। এবার গভীরভাবে দম নিতে নিতে ধীরে ধীরে হাত দুটো (২নং ছবির মতো) কাঁধের দুপাশে রাখুন। তারপর ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে দম ছাড়তে ছাড়তে হাত দুটো আগের অবস্থায় নিয়ে আসুন। এভাবে দুই বার করুন।

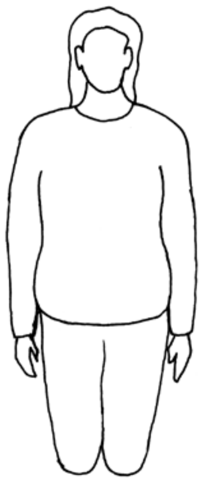

ছবি– ১

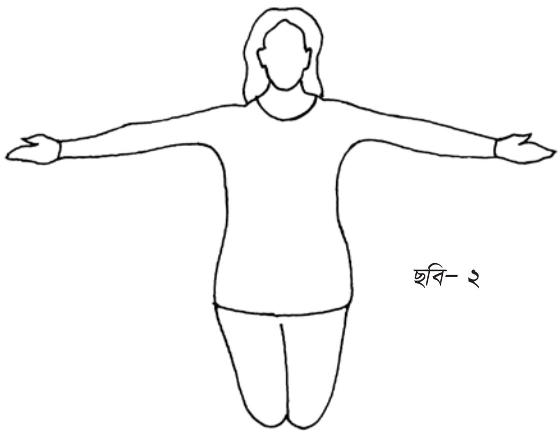

ছবি– ২

সবসময় মনে রাখুন–
রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন।

৩ নম্বর ব্যায়াম

প্রথমে দুই পা জোড় করে মাটিতে বসুন এবং হাত দুটো শরীরের দুপাশে রাখুন; হাতের আঙুলগুলো বাইরের দিকে ফেরানো থাকবে। (১নং ছবির মতো) এবার দম নিতে নিতে (২নং ছবির মতো) যতদূর সম্ভব কষ্ট না করে আরাম করে পা দুটো ফাঁক করুন। এর পর দম ছাড়তে ছাড়তে পূর্বের অবস্থায় (১নং ছবির মতো) ফিরে আসুন।

ছবি– ২

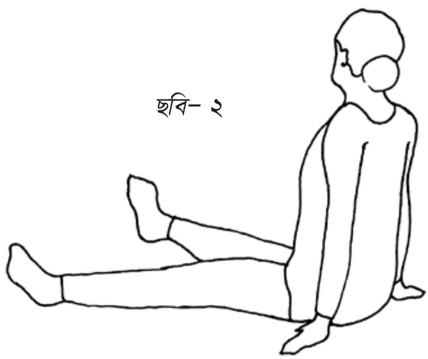

পৃথিবী সাহসী মানুষের জন্যে।
তাই সবসময় মনে মনে বলুন–
'আমি সাহসী। আমি নির্ভীক।'

৪ নম্বর ব্যায়াম

প্রথমে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। পা দুটো ভাঁজ করে এবং হাত দুটো শরীরের দুপাশে রাখুন (১নং ছবির মতো)। এবার দম নিতে নিতে হাত ও কনুই এবং পায়ের ওপর ভর দিয়ে কোমর আস্তে আস্তে (২নং ছবির মতো) ওপরে তুলুন। এরপর দম ছাড়তে ছাড়তে ১নং ছবির অবস্থায় ফিরে আসুন।

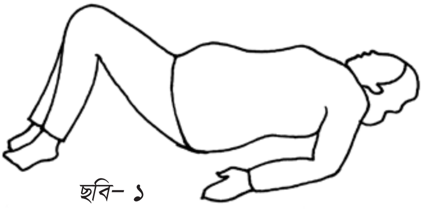

ছবি– ১

ছবি– ২

মানুষ যা ভাবতে পারে, যা বিশ্বাস করতে পারে, তা অর্জন করতে পারে।

৫ নম্বর ব্যায়াম

প্রথমে (১নং ছবির মতো) হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ান। এরপর (২নং ছবির মতো) কোমরে হাত দুটো রেখে দম নিতে নিতে শরীরের ওপরের অংশ ডানদিকে ঘোরান এবং দম ছাড়তে ছাড়তে পূর্বের অবস্থায় অর্থাৎ এক নম্বর পজিশনে নিয়ে আসুন। পুনরায় এভাবে কোমরে হাত রেখে শরীর এবার বাঁ দিকে ঘোরান এবং পূর্বের অবস্থায় (১নং ছবির মতো) ফিরিয়ে নিয়ে আসুন। ইচ্ছে করলে এ ব্যায়ামটি সোজা হয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত রেখেও করতে পারেন। তবে নিয়ম একই হবে। এভাবে দুই বার করতে পারেন।

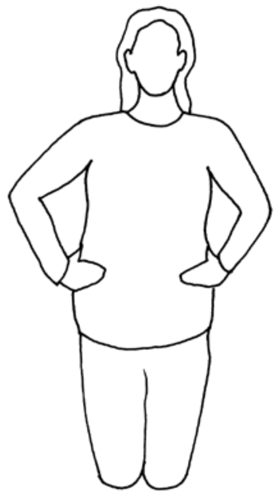

ছবি– ১

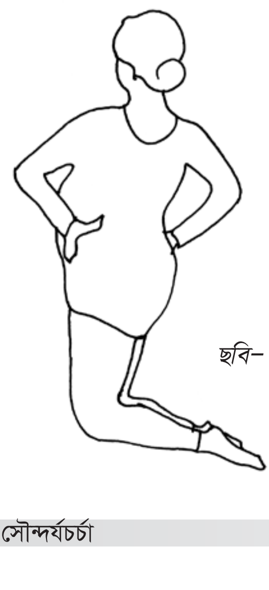

ছবি– ২

ছবি– ৩

৬ নম্বর ব্যায়াম

প্রথমে পা দুটো সামান্য ফাঁক রেখে সোজা হয়ে মাটিতে দাঁড়ান (১নং ছবির মতো)। এবার দম নিতে নিতে কোমর থেকে শরীরের ওপরের অংশ সামান্য সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন (২নং ছবির মতো)। এবার দম ছাড়তে ছাড়তে আগের অবস্থায় ফিরে আসুন। এভাবে দুই বার করতে পারেন।

ছবি– ১

ছবি– ২

প্রকৃতির সাথে একাত্ম হোন।
প্রকৃতি মন, দেহ ও আত্মার মাঝে
সবসময় ভারসাম্য এনে দেয়।

৭ নম্বর ব্যায়াম

প্রথমে পা সামান্য ফাঁক রেখে কোমরে হাত রেখে মাটিতে সোজা হয়ে দাঁড়ান (১নং ছবির মতো)। এবার দম নিতে নিতে কোমর থেকে শরীরের ওপরের অংশ ডানদিকে একটু বাঁকিয়ে দিন (২নং ছবির মতো)। এবার দম ছাড়তে ছাড়তে পূর্বের অবস্থায় (১নং ছবির মতো) ফিরে আসুন। একইভাবে দম নিতে নিতে শরীরের ওপরের অংশ বামদিকে একটু বাঁকিয়ে দিন (৩নং ছবির মতো) এবং দম ছাড়তে ছাড়তে পূর্বের অবস্থায় (১নং ছবির মতো) ফিরে আসুন। এভাবে দুই বার করতে পারেন।

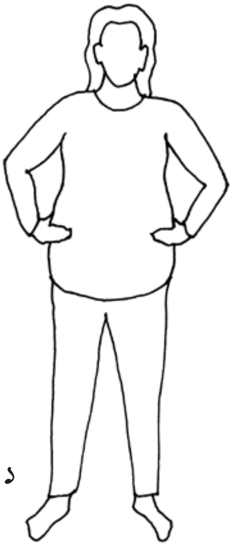

ছবি– ১

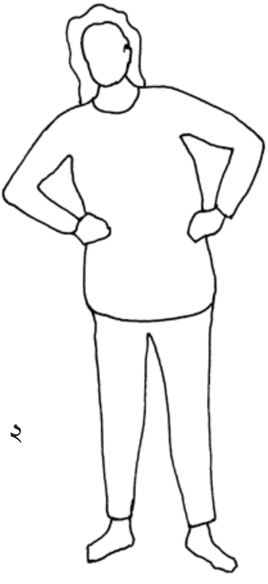

ছবি– ২

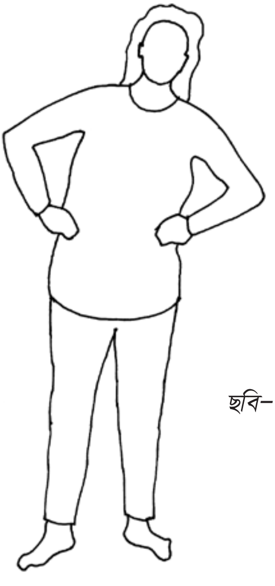

ছবি– ৩

৮ নম্বর ব্যায়াম

প্রথমে চেয়ারের পেছনে ডান হাত রেখে মাটিতে সোজা হয়ে দাঁড়ান। এবার দম নিতে নিতে ধীরে ধীরে (১নং ছবির মতো) বাঁ পা ওপরে তুলুন। মাটি থেকে এক ফুট পরিমাণ ওপরে। দম ছাড়তে ছাড়তে ধীরে ধীরে বাঁ পা নামান। এরপর ডান পা মাটি থেকে এক ফুট ওপরে তুলুন। দম ছাড়তে ছাড়তে ডান পা নামান (২নং ছবির মতো)।

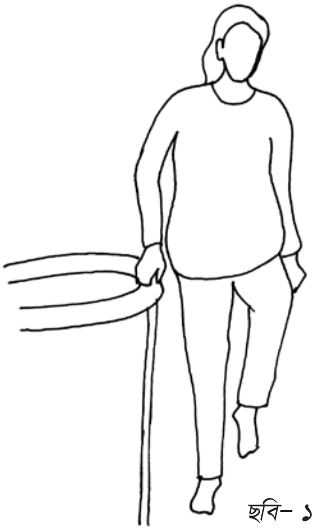

ছবি– ১

ছবি– ২

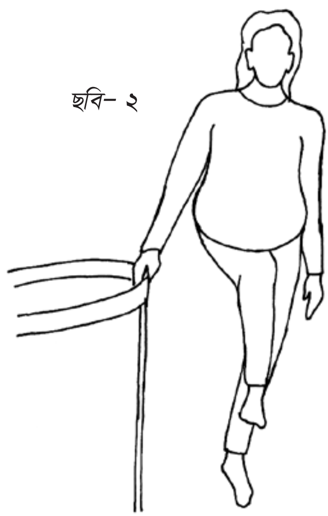

বিশেষভাবে খেয়াল রাখুন যেন চেয়ারের ওপর বেশি ভার না পড়ে।

বি.দ্র. : *গর্ভবতী মহিলারা এই আটটি ব্যায়াম একদিনেই করবেন না। প্রতিদিন তিন/ চারটি করে ব্যায়াম করতে পারেন। যদি একদিনেই করতে চান তাহলে কোনো ব্যায়ামই একবারের বেশি করবেন না।*

সবসময় সুন্দর, সুস্থ ও মেধাদীপ্ত নবজাতকের মনছবি দেখুন।

প্রসবপরবর্তী ব্যায়াম

অনেক মহিলা ভেবে থাকেন বাচ্চা প্রসবের পর ব্যায়াম করা যায় না। এটা ঠিক নয়। গর্ভাবস্থায় যেমন ব্যায়াম করা দরকার তেমনি প্রসবের পরেও প্রত্যেক মহিলার ব্যায়াম করা প্রয়োজন, যদি প্রসবের পর প্রসূতি মায়ের কোনো শারীরিক অসুবিধা না থাকে। শারীরিক অসুবিধা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ব্যায়াম করবেন।

***বি.দ্র.** : প্রসবপরবর্তী রক্তস্রাব সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ব্যায়াম করুন।*

- ☐ সকালবেলা নাশতার ঘণ্টাখানেক পরে ব্যায়াম করতে হবে।
- ☐ প্রতিটি ব্যায়াম খুব ধীরেসুস্থে করুন; তাড়াহুড়ো করবেন না।
- ☐ প্রতিদিন ১০ মিনিটের বেশি ব্যায়াম করবেন না।
- ☐ প্রসবের পর ব্যায়াম করলে পেটের মাংসপেশি মজবুত রেখে জরায়ুকে সঠিক স্থানে ধরে রাখে এবং জরায়ু ও ডিম্বাশয়ের রক্ত চলাচল বৃদ্ধি করিয়ে তাদের সুস্থ ও সবল রাখে।
- ☐ ব্যায়াম করার পর সবশেষে অবশ্যই ১০ মিনিট শবাসনে বিশ্রাম নিন এবং কল্পনা করুন আপনার ফিগার খুব সুন্দর হচ্ছে, স্বাস্থ্য ভালো হচ্ছে।

এবার ব্যায়ামের পদ্ধতিগুলো জেনে নিন।

১ নম্বর ব্যায়াম

প্রথমে চিৎ হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ুন। হাত দুটো শরীরের দুপাশে রাখুন। হাতের তালু যেন মাটিতে লেগে থাকে (১নং ছবির মতো)। এবার নাক দিয়ে দম নিতে

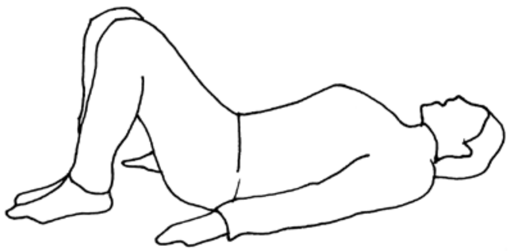

ছবি– ১

নিতে হাত ও পায়ের ওপর ভর দিয়ে কোমর আস্তে আস্তে (২নং ছবির মতো) ওপরে তুলুন। এরপর দম ছাড়তে ছাড়তে আগের অবস্থায় (১নং ছবির মতো) ফিরে আসুন। এভাবে দুই বার করতে পারেন।

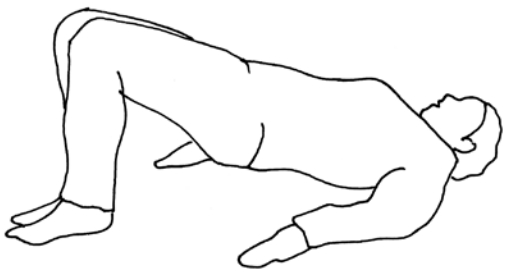

ছবি– ২

প্রশান্ত মনই হচ্ছে শক্তির আসল ফল্গুধারা।

২ নম্বর ব্যায়াম

ছবি– ১

প্রথমে মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে হাত দুটো শরীরের দুপাশে রাখুন। হাতের তালু মাটিতে লেগে থাকবে (১ নং ছবির মতো)। এবার নাক দিয়ে দম নিতে নিতে পা দুটো হাঁটু থেকে ভাঁজ করে পায়ের গোড়ালি দুটোকে যতদূর সম্ভব (২নং ছবির মতো) নিতম্বের কাছে নিয়ে আসুন এবং দম ছাড়তে ছাড়তে আগের অবস্থায় (১নং ছবির মতো) পা দুটো সোজা করে রাখুন। এভাবে দুই বার করুন।

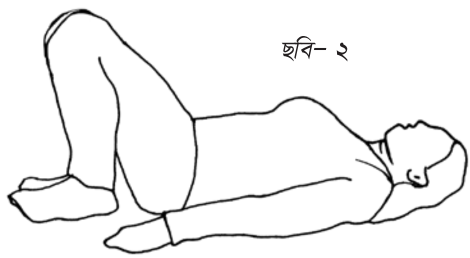

ছবি– ২

দেহ ও মনে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারি–
এ বিশ্বাসই পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্যে
প্রথম প্রয়োজন।

৩ নম্বর ব্যায়াম

ছবি– ১

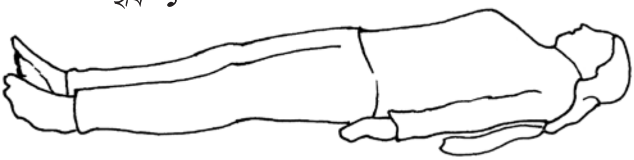

চিৎ হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ুন। হাত দুটো শরীরের দুপাশে রাখুন। হাতের তালু মাটিতে লেগে থাকবে (১নং ছবির মতো)। এবার নাক দিয়ে দম নিন। এরপর দম ছাড়তে ছাড়তে কনুই দুটোর ওপর ভর দিয়ে শরীরের ওপরের অংশ কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত ওপরে তুলুন (২নং ছবির মতো)। এবার দম নিতে নিতে শুয়ে পড়ুন আগের মতো। এভাবে দুই বার করুন।

ছবি– ২

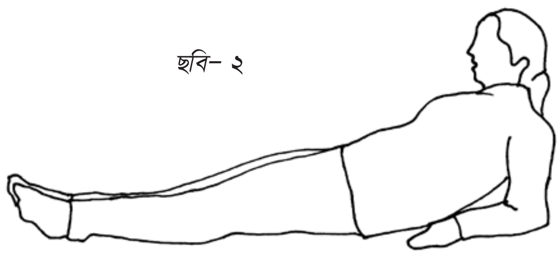

সবসময় হাসিমুখে কথা বলুন। এতে আপনি শুধু নিজেই আনন্দিত হবেন না, অন্যরাও খুশি হবে।

৪ নম্বর ব্যায়াম

ছবি– ১

চিৎ হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ুন। হাত দুটো শরীরের দুপাশে রাখুন। হাতের তালু মাটিতে লেগে থাকবে। এবার নাক দিয়ে দম নিতে নিতে পা দুটো হাঁটু থেকে ভাঁজ করে জোড় অবস্থায় (২নং ছবির মতো) বুকের কাছে নিয়ে আসুন এবং দম ছাড়তে ছাড়তে পা দুটো সোজা করে নিন। এভাবে দুই বার করতে পারেন।

ছবি– ২

ক্ষোভ হচ্ছে এমন এক বিষ,
যা আপনি নিজে পান করছেন
আর ভাবছেন মারা যাবে
আপনার প্রতিপক্ষ।

৫ নম্বর ব্যায়াম

ছবি– ১

প্রথমে হাত দুটো ভাঁজ করে তার ওপর মাথা রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন (১নং ছবির মতো)। এবার নাক দিয়ে দম নিতে নিতে পা দুটো হাঁটু থেকে ভাঁজ করে (২নং ছবির মতো) ওপরের দিকে উঠিয়ে রাখুন। এবার দম ছাড়তে ছাড়তে পা দুটো সোজা করুন। (১নং ছবির অবস্থায় নিয়ে আসুন) এভাবে দুবার করুন।

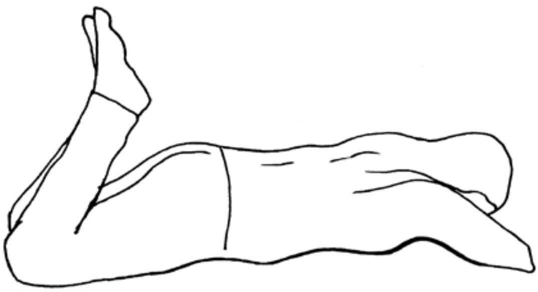

ছবি– ২

দিনে বা রাতে, প্রকাশ্যে বা গোপনে, সচ্ছল বা অসচ্ছল অবস্থায় নিয়মিত দান স্রষ্টার রহমত আনে।

৬ নম্বর ব্যায়াম

ছবি– ১

শরীরের দুপাশে হাত রেখে মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। হাতের তালু মাটিতে লেগে থাকবে। এবার প্রথমে পা দুটো হাঁটু থেকে ভাঁজ করে পেটের ওপর নিয়ে আসুন (১নং ছবির মতো)। এর পর (২নং ছবির মতো) একটার পর একটা পা বাই-সাইকেল চালানোর মতো ওঠান ও নামান। এভাবে দুই বার করতে পারেন।

ছবি– ২

এভাবে তিন মাস এ ব্যায়ামগুলো করার পর আস্তে আস্তে কোয়ান্টাম যোগের সব ব্যায়ামই করতে পারবেন। অবশ্য শারীরিক কোনো বিশেষ অসুখ থাকলে ব্যায়ামে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বি.দ্র. : *ব্যায়াম করার পূর্বে অবশ্যই ব্যায়ামের নিয়মাবলি পড়ে নেবেন।*

যে-সব মহিলা অপারেশনের মাধ্যমে বাচ্চা প্রসব করেছেন, তারা শারীরিক বিশেষ কোনো অসুখ কিংবা অসুবিধা না থাকলে প্রথমদিকে হাঁটাচলা এবং তিন মাস পর সব ব্যায়ামই করতে পারবেন।

ব্যায়াম করার পূর্বে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন।

যে রোগ নিরাময়ে যে ব্যায়াম অনুশীলন করবেন

ব্যাকপেইন

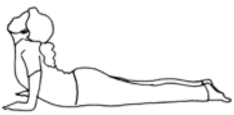

ভুজঙ্গাসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

অর্ধচন্দ্রাসন
(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

ত্রিকোণাসন
(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন
(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

গোমুখাসন
(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

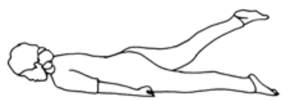

অর্ধশলভাসন
(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

টনসিল, ঠান্ডা/ সর্দি/ কাশি

মৎস্যাসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

স্বরায়ন
(পাঁচ থেকে ছয় বার)

সর্বাঙ্গাসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

শশাঙ্গাসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

ভুজঙ্গাসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

হলাসন
(তিন বার)

ডায়াবেটিস

জানুশিরাসন
(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

হলাসন
(তিন বার)

অর্ধশলভাসন
(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

অনিদ্রা

বজ্রাসন
(পাঁচ থেকে ১০ মিনিট)

গোমুখাসন
(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

কোষ্ঠকাঠিন্য

হলাসন
(তিন বার)

উষ্ট্রাসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

সর্বাঙ্গাসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

ধনুরাসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

হস্তপদাসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

বিপরীত করণীতে অশ্বিনীমুদ্রা
(১০ থেকে ২০ প্রস্থ)

উচ্চ রক্তচাপ

গোমুখাসন
(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

ভুজঙ্গাসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

নিম্ন রক্তচাপ

হস্তপদাসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

পাইলস্/ অর্শরোগ

গোমুখাসন ও গোমুখাসনে অশ্বিনীমুদ্রা
(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

শীর্ষাসন
(দুই থেকে তিন বার)

সর্বাঙ্গাসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

বজ্রাসন ও বজ্রাসনে অশ্বিনীমুদ্রা
(পাঁচ থেকে ১০ মিনিট)

বিপরীত করণীতে অশ্বিনীমুদ্রা
(১০ থেকে ২০ প্রস্থ)

সুপ্ত ভদ্রাসনে অশ্বিনীমুদ্রা
(১০ থেকে ২০ প্রস্থ)

হাঁপানি

মৎস্যাসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

পবনমুক্তাসন
(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

শীর্ষাসন
(দুই থেকে তিন বার)

পদ্মাসন ও পদ্মাসনে প্রাণায়াম
(এক থেকে পাঁচ মিনিট)

আমাশয়/ পেটের পীড়া

পশ্চিমোত্তানাসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

মাইগ্রেন/ মাথাব্যথা দূর

শীর্ষাসন
(দুই থেকে তিন বার)

নাসায়ন বা একনাসা প্রাণায়াম
(এক থেকে পাঁচ মিনিট)

আর্থ্রাইটিস

বজ্রাসন
(পাঁচ থেকে ১০ মিনিট)

গোমুখাসন
(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

পদ্মাসন
(এক থেকে পাঁচ মিনিট)

উৎকট আসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

হৃদরোগীরা যে ব্যায়াম করলে উপকৃত হবেন

গোমুখাসন
(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

বজ্রাসন
(পাঁচ থেকে ১০ মিনিট)

শবাসন
(পাঁচ থেকে ১০ মিনিট)

সতর্ক থাকুন!

- পীহা, ও যকৃত স্বাভাবিকের তুলনায় যাদের বড়, যাদের উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, স্লিপড ডিস্ক, সারভাইক্যাল বা লাম্বার স্পন্ডিলাইটিস, চোখের কঠিন অসুখ আছে তারা ***হস্তপদাসন*** করবেন না।
- সামনে ঝোঁকা নিষেধ থাকলে ***জানুশিরাসন*** করা যাবে না।
- যারা হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের রোগে ভুগছেন তারা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ***উষ্ট্রাসন*** করবেন না।
- ১২ বছরের কম বয়সী যারা এবং হৃদরোগীরা ***সর্বাঙ্গাসন*** করা থেকে বিরত থাকবেন।
- গলগণ্ড রোগ এবং লাম্বার স্পন্ডিলাইটিস-এ যারা ভুগছেন তারা ***ধনুরাসন*** করা থেকে বিরত থাকবেন। এ আসনে কটিদেশীয় কশেরুকায় অত্যধিক চাপ পড়ে বলে কোমরের ব্যথা বেড়ে যেতে পারে।
- যাদের হার্নিয়া বা এপেন্ডিসাইটিসের সমস্যা আছে ও যাদের পীহা, যকৃৎ অত্যধিক বড় বা রুগ্ণ তারা ***পশ্চিমোত্তানাসন*** করা থেকে বিরত থাকুন।
- যাদের উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ আছে তারা ***শীর্ষাসন*** করা থেকে বিরত থাকবেন।
- যাদের চোখের কঠিন অসুখ আছে তারা ***শীর্ষাসন*** ও ***দৃষ্টিদান*** করা থেকে বিরত থাকবেন।
- ***পবনমুক্তাসন*** করার সময় অবশ্যই প্রথমে ডান পা তুলে করবেন। কারণ, যদি প্রথমে বাম পা তুলে করেন তাহলে পেটের মধ্য কোলনে যে বায়ু জমে আছে তা বের না হয়ে অবরোহী কোলন থেকে আরোহী কোলনে প্রবেশ করবে। ফলে বায়ুর বহির্গমন হবে না। তাই প্রথমেই ডান পা তুলে করতে হবে।

উপকৃত হবেন

- আলস্য দূর ॥ শীর্ষাসন, ত্রিকোণাসন
- লম্বা হওয়ার জন্যে ॥ শশাঙ্গাসন, হস্তপদাসন, পশ্চিমোত্তানাসন
- পেটের চর্বি কমার জন্যে ॥ জানুশিরাসন, উষ্ট্রাসন, উত্থিতপদাসন, অর্ধশলভাসন, পশ্চিমোত্তানাসন
- মাসিকের ব্যথা নিরাময় ॥ শশাঙ্গাসন, ভদ্রাসন, ভুজঙ্গাসন, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, বিপরীত করণীতে অশ্বিনীমুদ্রা
- পায়ের শক্তি বাড়ানো ॥ উৎকট আসন, বৃক্ষাসন
- গলার স্বর সুন্দর করা, তোতলামি দূর করা ॥ স্বরায়ন
- কানের পর্দা ভারী থাকলে ও শ্রবণশক্তি বাড়ানোর জন্যে ॥ স্বরায়ন
- দৃষ্টিশক্তি বাড়ানো ॥ শীর্ষাসন, চোখে পানির ঝাপটা, দৃষ্টিদান
- হজম শক্তি বৃদ্ধি ॥ বজ্রাসন, ভুজঙ্গাসন, পশ্চিমোত্তানাসন, উত্থিতপদাসন, পবনমুক্তাসন, বিপরীত করণীতে অশ্বিনীমুদ্রা
- সারাক্ষণ প্রাণপ্রাচুর্যে থাকা ও কর্মক্ষম থাকা ॥ প্রাণায়াম, ভ্রমণ প্রাণায়াম
- হরমোনের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে দেহের গঠন সুন্দর করে ॥ শীর্ষাসন, শশাঙ্গাসন, ভুজঙ্গাসন, উষ্ট্রাসন, মৎস্যাসন
- ওজন নিয়ন্ত্রণ ॥ উত্থিতপদাসন, হলাসন, উষ্ট্রাসন, ধনুরাসন
- মেয়েলি সমস্যা ॥ হলাসন, শশাঙ্গাসন, ভদ্রাসন, গোমুখাসন, উত্থিতপদাসন, সুপ্ত ভদ্রাসনে অশ্বিনীমুদ্রা, ভুজঙ্গাসন

প্রতিদিন ৩০ মিনিট ব্যয় করুন সুস্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য ধরে রাখুন

প্রতিদিন ১৭ মিনিট ব্যায়াম ও ১৩ মিনিট শিথিলায়ন করুন। সব মিলিয়ে প্রতিদিন ৩০ মিনিটের প্রোগ্রাম।

সকালে : ভোর ৫টা থেকে দুপুর ১২টার মধ্যে

বিকেলে : বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে

সন্ধ্যার পর : সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে

শনি থেকে বৃহস্পতি–সপ্তাহে ছয় দিন এর যে-কোনো একটি প্রোগ্রাম অনুসরণ করতে পারেন। প্রথমে উজ্জীবন করে একটু ওয়ার্ম-আপ করে নিন। তারপর আসন শুরু করুন।

ক্রমিক	আসনের নাম	বার বা প্রস্থ	ভঙ্গিমায় অবস্থান	মোট সময়
১.	হস্তপদাসন	তিন বার	১০ সে. করে	৩০ সে.
২.	অর্ধচন্দ্রাসন	তিন প্রস্থ	১০ সে. করে	৬০ সে.
৩.	জানুশিরাসন	তিন প্রস্থ	১০ সে. করে	৬০ সে.
৪.	শশাঙ্গাসন	তিন বার	১০ সে. করে	৩০ সে.
৫.	ভদ্রাসন	তিন বার	২০ সে. করে	৬০ সে.
৬.	গোমুখাসন	তিন প্রস্থ	২০ সে. করে	৬০ সে.
৭.	উষ্ট্রাসন	তিন বার	১০ সে. করে	৩০ সে.
৮.	উত্থিতপদাসন	পাঁচ বার	১০ সে. করে	৫০ সে.
৯.	ভুজঙ্গাসন	পাঁচ বার	১০ সে. করে	৫০ সে.
১০.	অর্ধশলভাসন	তিন প্রস্থ	১০ সে. করে	৬০ সে.
১১.	সর্বাঙ্গাসন	একবার		৬০ সে.
১২.	মৎস্যাসন	একবার		৬০ সে.
১৩.	পবনমুক্তাসন (তিন রাউন্ড। ডানে-বামে মিলে এক রাউন্ড)			৯০ সে.
১৪.	দৃষ্টিদান ডানে-বামে মিলে			৬০ সে.
১৫.	অশ্বিনীমুদ্রা অথবা যে-কোনো একটি মুদ্রা			৩০ সে.
১৬.	নাসায়ন অথবা যে-কোনো একটি প্রাণায়াম			তিন মি.
১৭.	শীর্ষাসন			এক মি.

মোট : ১৭ মিনিট ১০ সেকেন্ড ব্যায়াম। ১৩ মিনিট (ব্যায়ামের আগে তিন মিনিট এবং শেষে ১০ মিনিট) সহজ শিথিলায়ন বা শবাসন।

বি.দ্র. : *প্রতিদিন এই ৩০ মিনিট ব্যায়াম অনুশীলনের মধ্যে যদি কারো শারীরিক বিশেষ অসুবিধার কারণে কোনো ব্যায়াম নিষেধ থাকে, তাহলে সেটি বাদ দিয়ে করবেন।*

ব্যায়ামের নিয়মাবলি ভালোভাবে পড়ে দেখুন−শারীরিক যে-সব সমস্যার কথা লেখা হয়েছে সে-সব অসুবিধা আপনার আছে কিনা। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শে শরীর চেক-আপ করিয়ে শারীরিক অসুবিধা জেনে নিয়ে নিয়মাবলি মেনে ব্যায়াম করুন।

মাসে একদিন বা ১৫ দিনে একদিন সকাল বেলা বাসি পেটে বমন ধৌতি করে নিয়ে ১০ মিনিট শবাসন করুন। অন্য ব্যায়াম সেদিন না করলেও চলবে। এরপর নাশতা করে আধা ঘণ্টা শিথিলায়ন করুন।

বজ্রাসন দুই/ তিন বেলা খাবার পর করুন। এতে হজম শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

কোয়ান্টাম ব্যায়ামের মাত্র ৩০ মিনিট প্রোগ্রামে একজন মানুষের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্ব অঙ্গের ব্যায়াম হয় এবং অভ্যন্তরীণ শিরা-ধমনী,স্নায়ু গ্রন্থি−সব সুস্থ রাখা যায়। কোন ব্যায়ামে শরীরের কোন অংশের উপকার হয় তা বর্ণনা করা হলো :

১. **মাথা ও কপাল**
শীর্ষাসন, শশাঙ্গাসন, হলাসন, বিপরীত করণী মুদ্রা, প্রাণায়াম

২. **গলা**
সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, শশাঙ্গাসন, হলাসন, বিপরীত করণী মুদ্রা

৩. **কাঁধ**
গোমুখাসন, উষ্ট্রাসন, অর্ধচন্দ্রাসন, ভুজঙ্গাসন, সর্বাঙ্গাসন

৪. **বুক**
ভুজঙ্গাসন, ধনুরাসন, উষ্ট্রাসন, প্রাণায়াম

৫. **পেট**
হস্তপদাসন, জানুশিরাসন, উত্থিতপদাসন, পবনমুক্তাসন, অর্ধকূর্মাসন পশ্চিমোত্তানাসন

৬. মেরুদণ্ড

ভুজঙ্গাসন, শলভাসন, অর্ধশলভাসন, ধনুরাসন, উষ্ট্রাসন, অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন, অর্ধচন্দ্রাসন

৭. ঊরু এবং তার সংযোগস্থল

জানুশিরাসন, পশ্চিমোত্তানাসন, মুণ্ডকাসন

৮. নিতম্ব

বজ্রাসন, উষ্ট্রাসন, ধনুরাসন, অর্ধচন্দ্রাসন

৯. কোমর

অর্ধচন্দ্রাসন, ত্রিকোণাসন, উষ্ট্রাসন, লেগ সার্কেলিং

১০. হাত

ত্রিকোণাসন, শীর্ষাসন (হাতের ওপর ভর করে)

১১. পা

বজ্রাসন, উৎকট আসন, বৃক্ষাসন, ভদ্রাসন

১২. হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস

প্রাণায়াম

১৩. জননেন্দ্রিয়

ভদ্রাসন, উষ্ট্রাসন, শশাঙ্গাসন

১৪. চোখ

দৃষ্টিদান

১৫. কণ্ঠ

স্বরায়ন

দেহকাঠামো

মেরুদণ্ড

আমরা আজকাল প্রায়ই ব্যাকপেইন (Backpain)-এর কথা শুনে থাকি। অনেকেই বলে থাকেন ব্যাকপেইনে ভুগছি কিংবা কোমরের কাছে ভীষণ ব্যথা, উঠতে-বসতে পারি না। ঘাড়ের কাছে ব্যথা ইত্যাদি। এ ধরনের ব্যথার পেছনে কী কারণ রয়েছে, তা আমাদের জানা উচিত। সবকিছুই জানা সম্ভব না হলেও সম্যক জ্ঞান না থাকলে আমরা ব্যায়ামের গুরুত্ব কতখানি তা হয়তো অনুধাবন করতে পারব না। মেরুদণ্ড সম্পর্কে সামান্য কিছু বর্ণনা করা গেল।

আমাদের দেহের পেছন দিকে করোটির (Skull) নিচ থেকে যে দেহকাণ্ডটি বস্তি-প্রদেশ পর্যন্ত নেমে গেছে তাকে মেরুদণ্ড বলে।

৩৩টি ছোট ছিদ্রযুক্ত অস্থি দ্বারা এই মেরুদণ্ড গঠিত। একখণ্ড অস্থিকে কশেরুকা (Vertebrae) বলে। প্রতিটি কশেরুকা দেখতে একরকম না হলেও এদের আকৃতিগত অনেক মিল রয়েছে। প্রতিটি কশেরুকার মধ্যে একটি করে ছিদ্র আছে। এ ছিদ্রকে নিউরাল গহ্বর (Neural Cavity) বলে। এই নিউরাল ক্যাভিটির ঠিক সামনে একটি অস্থিময় নল আছে। এ নলটিকে বলা হয় সেন্ট্রাম (Centram)। ঠিক তার অপরদিকে নিউরাল ক্যাভিটির চারদিকে কতগুলো ছোট ছোট উদ্ভূত অংশ আছে আর এ অংশেই কশেরুকাগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই যুক্ত অঞ্চলের কশেরুকার সঙ্গে আবার বুকের পাঁজরের অস্থিগুলো যুক্ত থাকে। এই সংযোগস্থলেও অনুরূপ উদ্ভূত অংশ আছে। এখানে সেন্ট্রাম থাকে সামনের দিকে এবং উদ্ভূত অংশগুলো থাকে পেছন দিকে। প্রতি দুটো কশেরুকার মাঝখানে তরুণাস্থির (Cartilage) একটি পুরু আস্তরণ আছে, যা Intervertebral disc নামে পরিচিত। এই

তরুণাস্থির সুস্থতার ওপর নির্ভর করে মেরুদণ্ডের স্থিতিস্থাপকতা।

দুটো কশেরুকার মাঝে এই তরুণাস্থি বা Intervertebral disc থাকায় শরীর যে-কোনো দিকে বাঁকানো সম্ভব হয়। আবার কশেরুকাগুলো এমনভাবে একের পর এক সাজানো রয়েছে যে, ওদের নিউরাল ক্যাভিটিগুলো মিলে একটি ফাঁপা নলের সৃষ্টি হয়েছে। এই নলের ভেতর দিয়েস্নায়ুকাণ্ডটি (Spinal cord) প্রবাহিত হয়েছে।

মেরুদণ্ডের বিভিন্ন অংশের কাজ অনুযায়ী তাকে পাঁচটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন :

১. গ্রীবাদেশীয় অংশ
(Cervical vertebrae)

২. বক্ষদেশীয় অংশ
(Thoracic vertebrae)

৩. কটিদেশীয় অংশ
(Lumbar vertebrae)

৪. ত্রিকাস্থি
(Sacral vertebrae)

৫. অনুত্রিকাস্থি
(Coccygeal vertebrae)

খুলি ও মেরুদণ্ড

গ্রীবাদেশীয় অংশ

এ অংশ প্রথম সাতটি কশেরুকা নিয়ে গঠিত।

বক্ষদেশীয় অংশ

গ্রীবাদেশীয় অংশের পরের **১২**টি কশেরুকা নিয়ে এ অংশটি গঠিত। প্রতিটি কশেরুকার সঙ্গে বুকের পাঁজরের এক জোড়া করে অস্থি যুক্ত আছে।

কটিদেশীয় অংশ

বক্ষদেশীয় অংশের পরবর্তী পাঁচটি কশেরুকা নিয়ে এ অংশ গঠিত।

ত্রিকাস্থি

কটিদেশীয় অংশের পর পাঁচটি কশেরুকা নিয়ে এ অংশ গঠিত। পরিণত বয়সে এই পাঁচটি অস্থি একসঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

অনুত্রিকাস্থি

মেরুদণ্ডের **৩৩**টি অস্থির অবশিষ্ট চারটি কশেরুকা নিয়ে এ অংশ গঠিত।

এই মেরুদণ্ডের হাড়ে কোনো না কোনোভাবে কিংবা কোনো দুর্ঘটনায় হাড় ভেঙে গেলে অথবা ডিস্ক সরে গেলে অথবা হঠাৎ করে ভারী জিনিস তুলতে গিয়ে ডিস্ক সরে গেলে মেরুদণ্ডে নানান সমস্যা হয়ে থাকে। এ সমস্যাগুলোর বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন–স্লিপড ডিস্ক, স্পন্ডিলাইটিস, ব্যাক পেইন, সায়াটিকা ইত্যাদি।

এন্ডোক্রাইন সিস্টেম

কোয়ান্টাম ব্যায়াম করতে হলে আপনার Endocrine System বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা থাকা দরকার। তাহলে ব্যায়ামে আপনার একাগ্রতা বাড়বে এবং এর উপকারিতা অনুধাবন করতে পারবেন।

মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি :

১. পিটুইটারি গ্রন্থি
২. থাইরয়েড গ্রন্থি
৩. প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি
৪. থাইমাস গ্রন্থি
৫. সুপ্রারেনাল গ্রন্থি
৬. অগ্ন্যাশয়
৭. ওভারি
৮. টেস্টিস

মানবদেহের এন্ডোক্রাইন সিস্টেম

আমাদের দেহে দুধরনের গ্রন্থি রয়েছে।

প্রথমত, বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বা এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড।

দ্বিতীয়ত, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বা এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড।

তাছাড়া দেহে এমনও গ্রন্থি আছে, যার এক অংশ নালীযুক্ত এবং অপর অংশ নালীবিহীন। যেমন : অগ্ন্যাশয়, লালা-স্রাবী গ্রন্থি, অশ্রু-স্রাবী গ্রন্থি, ঘর্ম গ্রন্থি। এগুলো হচ্ছে বহিঃস্রাবী নালীযুক্ত গ্রন্থি।

লালা গ্রন্থি থেকে লালা নিঃসরণ হয়। আমাদের মুখে খাদ্যের সাথে মিশে খাদ্যবস্তু পাকস্থলীতে পৌঁছাতে এবং হজমে সাহায্য করে। তেমনি ঘর্ম গ্রন্থির মাধ্যমে আমাদের দেহ থেকে ঘাম বেরিয়ে যায়।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলো থেকে নিঃসৃত রসকে হরমোন বলা হয়। হরমোন শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ Hormao থেকে। যদিও রক্তে এদের পরিমাণ খুব কম তবুও দেহের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এর প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন সরাসরি রক্তে মিশে যায় এবং দেহের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। হরমোন রক্তের সঙ্গে মিশে দেহের গঠন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে সরাসরি অংশ নেয়। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন অত্যন্ত সক্রিয় পদার্থ, রক্তে এর পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য হলেও জীবদেহের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ওপর এর প্রভাব এত বেশি যে, দেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি, আকৃতি, প্রকৃতি, যৌনাঙ্গের গঠন, কার্যকলাপ ইত্যাদি সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এই এন্ডোক্রাইন গ্রন্থিগুলো।

এই এন্ডোক্রাইন গ্রন্থিগুলোর মধ্যে যেগুলো নারীদেহের ওপর বিশেষভাবে কাজ করে সেগুলো নিয়ে আমরা এখন সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। এ থেকে আমরা বুঝতে পারব, কোয়ান্টাম ব্যায়াম ছাড়া এমন কোনো ব্যায়াম নেই যা দেহের এই অভ্যন্তরীণ গ্রন্থিগুলোকে সুস্থ ও সবল রাখতে সাহায্য করে। প্রথমেই আসা যাক পিটুইটারি গ্রন্থির কথায়।

পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland)

আমাদের দেহে পিটুইটারি গ্রন্থির ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দেহের অন্যান্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে বলে পিটুইটারিকে মাস্টার গ্ল্যান্ড বলা হয়। আমাদের মস্তিষ্কের নিচের দিকে একটি ক্ষুদ্র অস্থি গহ্বরে এ গ্রন্থিটি রয়েছে। এই পিটুইটারি গ্রন্থির আবার রয়েছে তিনটি অংশ–

ক. পুরোভাগ খ. মধ্যভাগ গ. পশ্চাৎভাগ

পিটুইটারির পুরোভাগ থেকেই যৌনগ্রন্থিতে উত্তেজক হরমোন নিঃসরণ হয়। নারীদেহের যৌনগ্রন্থিগুলোর কাজকে এটি নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন :

প্রোলান ‘এ’ (Folicle Stimulating Hormone)

এর কাজ হলো ডিম্বাশয় থেকে ইসট্রোজেন হরমোন নিঃসরণকে নিয়ন্ত্রণ

করা। নারীদেহে ইসট্রোজেন কমবেশি হওয়ার জন্যে নারীত্বের প্রকাশও কমবেশি হয় এবং ডিম্বাশয় পরিপুষ্ট হতে পারে না।

প্রোলান 'বি' (Lutinsing Hormone)

এটি মেয়েদের করপাস লিউটিয়াম (Corpus Luteum) গঠন, প্রজেসটেরোন হরমোন নিঃসরণ এবং একই সঙ্গে এর কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে জরায়ুতে ভ্রূণ সৃষ্টি হয় এবং ভ্রূণের বৃদ্ধির কাজ ঠিকমতো হয়। কিন্তু কোনো কারণবশত প্রোলান 'বি'-এর কাজ ব্যাহত হলে সন্তান সৃষ্টির পথে বাধা আসে অর্থাৎ গর্ভপাত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

প্রোলাকটিন (Prolactin)

এর কাজ হলো মেয়েরা গর্ভবতী হলে তার স্তনকে ঠিক রেখে স্তনে দুধ তৈরি করা।

পিটুইট্রিন (Pituitrin or oxytocin)

পিটুইটারির পশ্চাদভাগের হরমোনের নাম হলো পিটুইট্রিন। এর প্রধান কাজ গর্ভবতী মায়ের জরায়ুর পেশিকে সংকুচিত করে প্রসবে বিশেষভাবে সাহায্য করা। তবে প্রত্যক্ষভাবে এটি যৌনগ্রন্থির ওপর কাজ করে না।

থাইরয়েড (Thyroid)

থাইরয়েড গ্রন্থি আমাদের দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। থাইরয়েড থেকে নিঃসৃত হরমোনকে থাইরক্সিন (Thyroxin) বলে। আর এই থাইরক্সিন যদি কোনো কারণে কম হয় তাহলে মেয়েদের যৌনগ্রন্থিগুলোর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তার কার্যকলাপে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। থাইরক্সিন দেহের বিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে।

থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোনের অভাব হলে কিংবা ঘাটতি দেখা দিলে দেহে নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেমন : শিশু লম্বায় বাড়ে না, মোটা হয়, ক্রমে বামন হয়ে যায়। শিশুদের হাড়ের বৃদ্ধি হয় না। শিশুর বয়স বাড়লেও প্রায়ই বুদ্ধিহীনের মতো আচরণ করে। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে চালচলন, হাবভাব, কথা বলার ক্ষমতা, চিন্তাশক্তি–সব ঝিমিয়ে আসে। টিস্যু মোটা ও শক্ত হয়ে দেহে স্ফীতিরোগ দেখা দেয় যা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় মিক্সিডিমা নামে পরিচিত। চুল পড়ে। দেহের তাপমাত্রা কমে যেতে পারে।

আমাদের দেহে আয়োডিনের প্রয়োজন অত্যন্ত কম, কিন্তু এর অভাব ঘটলে গলগণ্ড বা ঘ্যাগ রোগ হয়। তাই থাইরয়েড গ্রন্থিকে সুস্থ রেখে হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে কোয়ান্টাম ব্যায়ামের কোনো বিকল্প নেই।

সুপ্রারেনাল বা এড্রিনাল গ্রন্থি

এড্রিনাল গ্রন্থির দুটো অংশ রয়েছে। একটি ওপরের অংশ, অন্যটি ভেতরের অংশ। এটির ওপরের অংশের হরমোনের নাম কর্টিকো-স্টেরয়েড। মেয়েদের শরীরে যৌন হরমোনের ওপর এরা কাজ করে। এরা যৌনগ্রন্থির সবরকম কাজকেই সাহায্য করে। যদি কোনো কারণে এড্রিনাল গ্রন্থির নিঃসরণ কম হয়, তাহলে নারীর যৌন ক্ষমতা অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি যৌন দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। তাই আমাদের উচিত এই অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোকে সুস্থ রাখার জন্যে নিয়মিত কোয়ান্টাম ব্যায়াম করা।

স্ত্রী প্রজননতন্ত্র

স্ত্রী প্রজননতন্ত্র

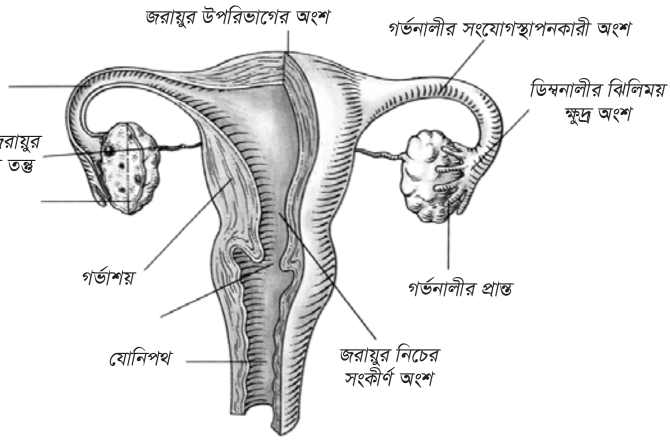

নারীদেহে প্রজননতন্ত্রের মধ্যে রয়েছে :

১. ডিম্বাশয় ২. গর্ভনালী ৩. জরায়ু

ডিম্বাশয় (Ovary)

মেয়েদের নিচের পেটে অর্থাৎ তলপেটে জরায়ুর দুপাশে এবং জরায়ু থেকে খানিকটা দূরে থাকে দুটো ডিম্বাশয়। আর এই ডিম্বাশয় থেকে গুরুত্বপূর্ণ দুটো হরমোন নিঃসরণ হয়। একটি হলো ইসট্রোজেন; আর একটি হলো প্রজেসটেরোন। ডিম্বাশয় থেকে ডিম্ব নিঃসরণ হয়। ইসট্রোজেন এবং প্রজেসটেরোন-এর প্রভাবেই মাসে মাসে অর্থাৎ ২৮ দিন অন্তর নিয়মিতভাবে এবং চক্রাকারে যে পরিবর্তন ঘটে তারই ফলে হয় মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাব।

গর্ভনালী (Fallopian tubes)

জরায়ুর দুদিক থেকে যে দুটো মাংসপেশির নালী ডিম্বাশয় পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে পরস্পরকে সংযুক্ত করেছে তাদের নাম গর্ভনালী। প্রত্যেকটি নালী আনুমানিক সাড়ে চার ইঞ্চি লম্বা। যৌবনের শুরুতে পিটুইটারি গ্রন্থির নিয়ন্ত্রণে মাসে একবার করে একটি পরিণত ডিম্বকোষ ওভারি থেকে বেরিয়ে এসে

ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে প্রবেশ করে ২৪ ঘণ্টা অবস্থান করে। যদি এই ডিম্বকোষটি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্পার্ম বা শুক্রাণুর দ্বারা নিষিক্ত না হয়, তবে তা নষ্ট হয়ে যায় এবং দুসপ্তাহ পর মাসিক শুরু হয়। যদি শুক্রাণু ডিম্বাণুটিকে নিষিক্ত করে, তবে এই নিষিক্ত ডিম্বাণু এক থেকে দুই দিনের মধ্যে জরায়ুতে প্রবেশ করে জরায়ুর পেছনে দেয়ালে প্রবেশ করে এবং বৃদ্ধি পেতে থাকে।

জরায়ু (Uterus)

জরায়ুর অবস্থান মেয়েদের তলপেটের মাঝামাঝি মূত্রাধার ও মল-নালীর মাঝখানে। এটি মেয়েদের সন্তান ধারণের থলি। সাধারণত জরায়ু তিন ইঞ্চি লম্বা হয়। তবে গর্ভবতী মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা সন্তান বৃদ্ধির সাথে সাথে আকারে বড় হতে থাকে। সন্তান প্রসবের পর এটা আস্তে আস্তে আগের অবস্থায় ফিরে আসে। জরায়ুর মূলকে বলা হয় সারভিক্স (Cervix)। এর ভেতরের গায়ে যে শ্লেষ্মাঝিলি (Mucous membrane) থাকে তাকে বলা হয় এন্ডোমেট্রিয়াম (Endometrium)।

উপসংহারে বলা যায়, সকল অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিকে সুস্থ রাখার জন্যে কোয়ান্টাম ব্যায়াম করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

প্রতিটি গ্ল্যান্ডের জন্যে সুনির্দিষ্ট আসনের তালিকা নিচে দেয়া হলো :

পিটুইটারির জন্যে : শশাঙ্গাসন, শীর্ষাসন, হস্তপদাসন

থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েডের জন্যে : সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, হলাসন, শশাঙ্গাসন

থাইমাসের জন্যে : শশাঙ্গাসন, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, জানুশিরাসন

সুপ্রারেনাল বা এড্রিনাল-এর জন্যে : ভুজঙ্গাসন, ধনুরাসন, অর্ধচন্দ্রাসন

জননগ্রন্থির জন্যে : ভদ্রাসন, ভুজঙ্গাসন, শশাঙ্গাসন, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন

মাসিক ঋতুচক্র

মাসিক ঋতুচক্র (Menstruation) মেয়েদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথমেই আমাদের জানা উচিত সাধারণত মেয়েরা কোন বয়সে ঋতুমতী বা সাবালিকা হয়ে থাকে।

সাধারণত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মেয়েরা একটু আগেই ঋতুমতী হয়ে থাকে। ১১ বছর থেকে শুরু করে ১৪ বছরের মধ্যেই বেশিরভাগ মেয়ের ঋতুচক্র শুরু হয়ে থাকে। আর ৪০ থেকে শুরু করে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত ঋতু চলতে পারে। তবে ৪০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যেই সাধারণত ঋতু বন্ধ বা মেনোপজ (Menopause) হয়ে থাকে। এ সময়টিও মেয়েদের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শীতপ্রধান দেশের মেয়েরা সাধারণত ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সে প্রথম ঋতুমতী হয়ে থাকে।

যদি কোনো কারণে দেখা যায় যে, ১৫ বছর বয়সের পরও কোনো মেয়ে ঋতুমতী হচ্ছে না, তাহলে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া উচিত।

আবার সন্তান ধারণের সময় মেয়েদের মাসিক বন্ধ থাকে–এটা স্বাভাবিক নিয়ম। যদি সন্তান ধারণকালে মাসিক শুরু হয়, তৎক্ষণাৎ একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত।

মাসিক সাধারণত ২৮ দিন অন্তর অন্তর হয়। কারো কারো ৩০/৩৫/৪০ দিন অন্তর হয়। সাধারণত চার/ পাঁচ দিন স্থায়ী থেকে বন্ধ হয়। কারো কারো ক্ষেত্রে তিন দিন হয়ে বন্ধ হয় আবার কারো ক্ষেত্রে সাত দিন হয়ে বন্ধ হয়। চার/ পাঁচ দিন স্থায়ী ঋতুই স্বাভাবিক বলে ধরা হয়।

ঋতুচক্র শুরুর কারণ

কৈশোর থেকে যখন কোনো মেয়ে নারীত্বে পদার্পণ করে তখন কিছু শারীরিক-মানসিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আর এর পেছনে রয়েছে পিটুইটারি গ্রন্থি। এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন অন্যান্য গ্রন্থিগুলোকে সক্রিয় ও নিয়ন্ত্রণ করে। তাই কৈশোরের শেষে পিটুইটারির পরিচালনায় থাইরয়েড, ওভারি গ্রন্থিগুলোর কার্যকলাপ শুরু হয়। ওভারির অপরিণত ডিম্বকোষগুলো এ

সময় পরিণত হয়ে ওঠে এবং তারা ইসট্রোজেন নামে এক প্রকার হরমোন নিঃসৃত করে। এ হরমোনের প্রভাবে মেয়েদের মধ্যে নারীসুলভ লাবণ্য লক্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং মেয়েদের যৌন অঙ্গাদি ঠিকভাবে গঠিত হয়।

যৌবনের শুরুতে পিটুইটারির নিয়ন্ত্রণে মাসে একবার করে একটি পরিণত ডিম্বকোষ ওভারি থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং গর্ভনালীতে প্রবেশ করে। এটি ঘটে ঋতুচক্রের ১০/১৫ দিনের মধ্যে।

ডিম্বকোষটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ওভারিতে সৃষ্টি হয় একটি হলুদ রঙের তরল পদার্থ। এ থেকেই 'প্রজেসটেরোন' নামে এক প্রকার হরমোন নিঃসৃত হয়ে জরায়ুর বৃদ্ধি ও নিয়মিত মাসিকের সূত্রপাত ঘটায়।

জরায়ুর ভেতরের গায়ে শেষ্মা ঝিলির আবরণে 'ইসট্রোজেন' ও 'প্রজেসটেরোনের' সম্মিলিত ক্রিয়া শুরু হয়। সেই ঝিলির বিবর্তনের ফল ঋতুস্রাব। ইসট্রোজেন ও প্রজেসটেরোনের প্রভাবেই ২৮ দিন অন্তর চক্রাকারে পরিবর্তনের ফলে হয় নিয়মিত মাসিক ঋতুস্রাব।

তবে সন্তানসম্ভবা মেয়েদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটে। যৌন মিলনের পর পুরুষের শুক্রাণু ডিম্বকোষটির সঙ্গে মিলিত হলে ডিম্বকোষের সে অবস্থাকে বলা হয় 'নিষিক্ত ডিম্বাণু' (fertilized ovum)। সাধারণত শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটে ফেলোপিয়ান টিউবের মধ্যে এবং সেখান থেকে নিষিক্ত ডিম্বাণুটি চলে যায় জরায়ুতে এবং ২৮০ দিন থাকার পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এসময়ের মধ্যে ডিম্বাশয়ে আর ডিম্ব প্রস্তুত হয় না। ফলে ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে এবং সন্তান বৃদ্ধির কাজ চলতে থাকে।

মাসিকপূর্ব লক্ষণ

মাসিক বা ঋতুচক্র শুরু হওয়ার পূর্বে দুধরনের সমস্যা (Pre-Menstrual Symptoms) দেখা যেতে পারে। এগুলো হচ্ছে :

ক. শারীরিক লক্ষণ

খ. মানসিক লক্ষণ

শারীরিক লক্ষণ

১. মাসিক শুরু হওয়ার দুই/ একদিন পূর্বে অথবা মাসিক চলাকালীন মাথাব্যথা

২. পিঠে ব্যথা

৩. পেটে ব্যথা

৪. মাথা ঝিমঝিম ভাব

৫. সাইনুসাইটিস

৬. একনি বা মুখে ব্রণ

৭. স্তন ভারী লাগা বা স্তনে ব্যথা

৮. পায়ের গোড়ালির গাঁটে ব্যথা

৯. হাঁটু, ঊরু ইত্যাদির ব্যথা

১০. খাবারে অরুচি

১১. কোমরে ব্যথা

মানসিক লক্ষণ

১. হঠাৎ আচরণ পরিবর্তন

২. টেনশন

৩. অস্বস্তিবোধ

৪. বিষণ্নতা বা কান্নাকান্না ভাব

৫. মনোযোগের অভাব

৬. আলস্য ভাব

৭. অল্পে রেগে যাওয়া

৮. চুপচাপ বসে থাকা

ঋতু সংক্রান্ত সমস্যা

ক. বাধক বেদনা (Dysmenorrhoea)

এটা মাসিক শুরু হওয়ার দুই/ একদিন পূর্বে হতে পারে অথবা মাসিক চলাকালীন নিচের পেটে প্রচণ্ড ব্যথা অথবা হালকা হালকা ব্যথা অনুভব হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মাসিক শুরু হয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় দিন উপযুক্ত পরিমাণে স্রাবের পর ব্যথার উপশম হতে দেখা যায়। কারো কারো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা দিতে পারে। যেমন : জরায়ু বাঁকা, জরায়ুতে টিউমার, ক্যান্সার ইত্যাদি কারণেও ব্যথা হতে পারে। এক্ষেত্রে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণের পর ব্যায়াম করা উচিত। বাধক বেদনার কারণ :

১. গৃহবন্দি জীবনযাপন
২. অতৃপ্ত কামনাবাসনা
৩. অসংযমী জীবনযাপন
৪. সুষম খাদ্যের অভাব
৫. কোষ্ঠকাঠিন্য
৬. অজীর্ণ
৭. মানসিক অস্থিরতা
৮. যৌনাঙ্গের গঠনের গোলমাল

বাধক বেদনা থেকে নিরাময়ের ব্যায়াম

১. শশাঙ্গাসন	২. ভদ্রাসন	৩. ভুজঙ্গাসন
৪. সর্বাঙ্গাসন	৫. মৎস্যাসন	৬. বিপরীত করণীতে অশ্বিনীমুদ্রা

খ. অনিয়মিত মাসিক ঋতু

মেয়েদের স্রাব বা মাসিক সাধারণত ২৮ দিন অন্তর হয়ে থাকে এবং চার/ পাঁচ দিন স্থায়ী থেকে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। কারো কারো ক্ষেত্রে এর অনিয়ম দেখা যায়। যেমন কারো সাত দিন থাকে। কারো তিন দিন থাকে। আবার কারো ৩০/৩৫/৪০ দিন পার হয়েও অনিয়মিতভাবে ঋতুস্রাব হয়ে

থাকে। আবার কারো কারো ১৫ দিন পর পর হতে দেখা যায়। আবার কারো ১৫/২০ দিন বন্ধ থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব হতে পারে। রক্তের রং কালচে চাক চাক হয়ে থাকে। তখন তলপেটে ব্যথা এবং খাবারে অরুচি সৃষ্টি হয়।

অনিয়মিত ঋতুচক্র নিরাময়ে ব্যায়াম

১. হস্তপদাসন ২. শশাঙ্গাসন ৩. ভদ্রাসন ৪. ভুজঙ্গাসন
৫. পশ্চিমোত্তানাসন ৬. সর্বাঙ্গাসন ৭. মৎস্যাসন

এর সাথে প্রোটিনযুক্ত খাবার, প্রচুর পানি পান, শাকসবজি, টাটকা ফলমূল বেশি খেতে হবে। আয়রন ট্যাবলেট/ ক্যাপসুল খাওয়া যেতে পারে। যদি যৌন রোগ থাকে, যেমন : সিফিলিস, গনোরিয়া বা কোনো জীবাণুঘটিত রোগ, তাহলে ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধও খেতে হবে।

গ. বিলম্বিত মাসিক

মাসিক একবার শুরু হলে তা ২৮ দিন অন্তর হওয়াই স্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্যসম্মত। অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা দিতে পারে। যেমন : ৩০/৩৫/৪০ দিন পরও হতে দেখা যায়। একে বলে বিলম্বিত মাসিক।

বিলম্বিত মাসিকের কারণ :

১. হরমোন সমস্যা ২. রক্তশূন্যতা ৩. পুষ্টির অভাব

মূলত হরমোন সমস্যাই এর প্রধান কারণ হিসেবে দেখা যায়।

লক্ষণ : দেরিতে মাসিক দেখা দিলে স্রাবের পরিমাণ বেশি হতে পারে। হঠাৎ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। স্তনে, তলপেটে ব্যথা, ঊরু ভারীবোধ হওয়া, ক্লান্তি অনুভব, শরীর মোটা হয়ে যাওয়া অথবা রোগা হয়ে যাওয়া; এর সাথে আরো উপসর্গ, যেমন : অরুচি, মাথাধরা, শরীর ম্যাজম্যাজ করা ইত্যাদি শারীরিক সমস্যা হতে পারে।

বিলম্বিত ঋতুচক্র নিরাময়ের ব্যায়াম

১. শশাঙ্গাসন ২. ভদ্রাসন ৩. ভুজঙ্গাসন
৪. হলাসন ৫. সর্বাঙ্গাসন ৬. মৎস্যাসন

ঘ. অধিক স্রাব (Menorrhagia)

অধিক স্রাব জরায়ু সংক্রান্ত একটি প্রধান রোগ। এটি নানান কারণে হতে পারে। যেমন :

১. হরমোন সমস্যা
২. জরায়ু বা যোনির ভেতর থেকে রক্তস্রাব হয়
৩. জরায়ুর স্থানচ্যুতি
৪. জরায়ু বা যোনিপথে টিউমার
৫. বার বার গর্ভপাত
৬. জরায়ুতে ক্যান্সার

এছাড়া অনেকের জরায়ু ও ডিম্বাশয়ে প্রদাহ হয়, এমনকি পুঁজও জন্মে। এর জন্যে ব্যথার সৃষ্টি হয়। এসব ক্ষেত্রে তলপেটে রক্ত চলাচল যাতে ভালোভাবে হয় তার জন্যে তলপেটে চাপ পড়ে এমন সব ব্যায়াম নিয়মিত করা দরকার। যদি অন্য কোনো রোগ ছাড়া শুধু হরমোনগত কারণে এ রোগ হয়ে থাকে তাহলে ব্যায়ামের মাধ্যমেই এ রোগ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। হরমোন সংক্রান্ত সমস্যায় ওষুধ খেলে তেমন কোনো ফল পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে কোয়ান্টাম ব্যায়ামই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এটা পরীক্ষিত ও প্রমাণিত।

তাই একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শে আপনার শারীরিক সমস্যা জেনে নেয়ার পর ব্যায়াম করতে পারেন। প্রয়োজনে ওষুধও খেতে পারেন।

অধিক স্রাব নিরাময়ের ব্যায়াম

১. শশাঙ্গাসন ২. ভদ্রাসন ৩. অর্ধকূর্মাসন ৪. পবনমুক্তাসন
৫. ভুজঙ্গাসন ৬. সর্বাঙ্গাসন ৭. মৎস্যাসন

এছাড়া ভিটামিন সমৃদ্ধ কাঁচা ফলমূল, সবজি প্রচুর পরিমাণে খেতে হবে। প্রতিদিন ছোট এক বাটি সালাদ ও চার/ পাঁচটি লেবু খাবারের সাথে খেতে হবে। লেবুতে ভিটামিন সি রয়েছে–এক্ষেত্রে যা অত্যন্ত উপকারী।

ব্যায়াম প্রশিক্ষণ ও গবেষণায় ২২ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, শুধু তিন জন রোগী পেয়েছি যাদের জীবনের প্রথম মাসিক শুরু হয়ে কোনো দিনই তা আর বন্ধ হয় নি। রোগিণীকে সবসময় হরমোন পিল অর্থাৎ বার্থ কন্ট্রোল পিল খেয়ে মাসিক বন্ধ রাখতে হতো। ওষুধ ছেড়ে দিলে সাথে সাথেই শুরু হতো। প্রথম জনের বয়স তখন ১৯/২০ বছর। এক পর্যায়ে

হরমোন ওষুধ খেতে খেতে তার নানান সমস্যা দেখা দিল। দেশে-বিদেশে প্রচুর ডাক্তার দেখিয়েও কোনো ফল পায় নি বলে শেষ পর্যন্ত এলো যোগ ব্যায়াম করতে। আমি তার কথা শুনে বুঝেছিলাম হরমোন সমস্যা। আমি তাকে মাত্র ছয়টি ব্যায়াম এবং প্রতিদিন এক বাটি সালাদ এবং ছয়টি লেবু খেতে দিয়েছিলাম। আলাহর অসীম করুণায় সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়েছিল মাত্র ছয় মাস নিয়মিত দুবেলা ব্যায়াম করে ও খাবার খেয়ে। তার যেহেতু সবসময়ই পিরিয়ড হতো তাই প্রথম দিকে পিল খেয়ে মাসিক বন্ধ রেখে ব্যায়াম করতে হয়েছিল, কেননা মাসিকের সময় ব্যায়াম করা নিষেধ। পরবর্তীতে পিল না খেয়েই সে ব্যায়াম করতে পেরেছিল। তবে তিন মাস পর পিল ছেড়ে দেয়ায় দেখা গেল, মাসিক ১৩ দিন বন্ধ থেকে আবার শুরু হয়েছে। তারপর আবার পিল খেয়ে পিরিয়ড বন্ধ রেখে পুনরায় ব্যায়াম শুরু করল। পাঁচ মাস পার হওয়ার পর দেখা গেল, আর মাসিক হচ্ছে না। যেখানে ওষুধ ছেড়ে দিলেই সাথে সাথে তার মাসিক শুরু হতো সেখানে ব্যায়ামের পর অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ছয় মাস পর থেকে ২৮ দিনের ঋতুচক্র ঠিকমতো শুরু হয়েছে। মেয়েটি ছিল অবিবাহিতা এবং তাকে বলেছিলাম, সারাজীবন যেন ঐ ছয়টি ব্যায়াম করে–অন্ততপক্ষে যত দিন মেনোপজ না হয়। ব্যায়ামগুলো ছিল :

১. শশাঙ্গাসন : পাঁচ বার ১০ সেকেন্ড করে
২. ভদ্রাসন : পাঁচ বার ২০ সেকেন্ড করে
৩. ভুজঙ্গাসন : পাঁচ বার ১০ সেকেন্ড করে
৪. সর্বাঙ্গাসন : তিন বার ১০ সেকেন্ড করে
৫. মৎস্যাসন : একবার এক মিনিট
৬. শীর্ষাসন : দুই থেকে তিন মিনিট

প্রতিদিন দুই বেলা একবাটি করে সালাদ ও ছয়টি কাগজিলেবু খাবারের সাথে খেতে বলেছিলাম।

ঙ. কম মাসিক হওয়া বা অল্পরজঃ (Oligomenorrhoea)

যাদের মাসিক বা ঋতু শুরু হওয়ার পর সঠিক পরিমাণে না হয়ে অল্প পরিমাণে স্রাব হয়, তাকে অল্পরজঃ বলে। এসময়ে নিচের পেটে ব্যথা থাকতে পারে। আবার কারো কারো ক্ষেত্রে ব্যথা না-ও হতে পারে। আবার একদিন

মাসিক হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। কারো কারো ক্ষেত্রে ঠিক সময়ে মাসিক শুরু হয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে আসে এবং বেশ কয়েকদিন, যেমন আট/ দশ দিনও হতে পারে। নানা কারণে এ রোগ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে। রোগী দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে যেতে পারে। ক্লান্তিবোধ, মাথা ঝিমঝিম করা, মেজাজ খিটখিটে হওয়া, সব কিছুতে অসহ্য লাগা, একা একা থাকতে ভালো লাগা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বি.দ্র. : *গর্ভাবস্থায় যদি কারো এরকম ফোঁটা ফোঁটা রক্ত যাওয়া দেখা দেয়, তাহলে অবশ্যই স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে ব্যায়াম করা উচিত। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিষেধ করলে অবশ্যই ব্যায়াম করবেন না।*

কম মাসিক বা অল্পরজঃ হওয়ার কারণ

১. প্রধান কারণ হরমোনের অভাব অথবা হরমোন নিঃসরণের ক্ষেত্রে অনিয়ম
২. জরায়ু বা ডিম্বাশয়ে কোনো কারণে প্রদাহ
৩. যৌনরোগ, যেমন : সিফিলিস, গনোরিয়া জাতীয় রোগে আক্রান্ত হওয়া
৪. ডিম্বাশয়ের জন্মগত ত্রুটি
৫. দেহে রক্তশূন্যতা অথবা অত্যধিক চর্বি হলে জরায়ু ও ডিম্বাশয়ের পাশে চর্বি জমে। এর ফলেও মাসিক কম হয়।
৬. অপুষ্টি ইত্যাদি কারণে মাসিক কম হতে দেখা যায়।

কম মাসিক হওয়া থেকে নিরাময় ও সঠিকভাবে হওয়ার ব্যায়াম

১. শশাঙ্গাসন ২. ভদ্রাসন ৩. ভুজঙ্গাসন ৪. সর্বাঙ্গাসন
৫. মৎস্যাসন ৬. উষ্ট্রাসন ৭. লেগ সার্কেলিং

এছাড়াও যারা অত্যধিক মোটা তারা সঠিক নিয়মে ডায়েট করে শর্করা জাতীয় খাবার কম খেয়ে নিয়মিত ব্যায়াম করে শরীরের ওজন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারেন।

যারা রক্তশূন্যতায় ভুগছেন তারা প্রোটিন জাতীয় খাবার, টাটকা তরকারি, ফলমূল, মুরগির স্যুপ, আয়রন সমৃদ্ধ খাবার এবং ডাক্তারের পরামর্শে আয়রন ক্যাপসুল খেতে পারেন। তবে এ রোগ থেকে চিরতরে মুক্ত হতে চাইলে নিয়মিত কোয়ান্টাম ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

চ. শ্বেতপ্রদর (Leucorrhoea)

মেয়েদের জরায়ু ও যোনিনালীর ঝিলির নিচে ফোসকার মতো ছোট ছোট গ্রন্থি আছে। এসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসে যোনিনালী ভেজানো থাকে। যার ফলে বাইরের জীবাণু সহজে আক্রমণ করতে পারে না। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তখনই, যখন কোনো কারণে ঐ গ্রন্থি থেকে রস বেশি পরিমাণে নিঃসৃত হয়। এই বেশি পরিমাণ রস নিঃসৃত হওয়াকেই শ্বেতপ্রদর বলে।

শ্বেতপ্রদরের কারণ

১. বাইরের ময়লা রোগ-জীবাণু ঢুকে এ রোগ সৃষ্টি হতে পারে।
২. নোংরা প্যাড কিংবা নোংরা কাপড় ব্যবহার করলে।
৩. রক্তস্রাব বন্ধ হলে বা মাসিক কমে গেলে জরায়ুর ক্রিয়া কমে যায়। তখন সাদাস্রাব বেশি হয়।

বি.দ্র. : *সাদাস্রাব বেশি হলে দুর্বল লাগা, মাথা ঝিমঝিম করা, চোখে ঝাপসা লাগা, খাবারে অরুচি ইত্যাদি হয়ে থাকে। এর থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে হলে ব্যায়াম করা প্রত্যেক মেয়েরই কর্তব্য।*

শ্বেতপ্রদর নিরাময়ের ব্যায়াম

১. ভদ্রাসন	২. ভুজঙ্গাসন	৩. ধনুরাসন	৪. শশাঙ্গাসন
৫. পবনমুক্তাসন	৬. শলভাসন	৭. পশ্চিমোত্তানাসন	৮. জানুশিরাসন

ছ. স্রাব বন্ধ (Menopause)

মেয়েদের সাধারণত স্বাভাবিক নিয়মেই ৪০ থেকে শুরু করে ৫০ বছর বয়সের মধ্যে মাসিক বন্ধ হয়ে যায়। এটা কোনো রোগ নয়। প্রাকৃতিক নিয়মেই যেমন নির্দিষ্ট বয়সে মেয়েরা সাবালিকা হয়ে থাকে তেমনি প্রাকৃতিক নিয়মেই নির্দিষ্ট বয়সে ঋতু বন্ধ হয়ে যায়। দুটো সময়ই মেয়েদের জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে এসময় কিছু উপসর্গ হয়ে থাকে। মাথার তালু জ্বালা অনুভব হয়। অনিয়মিত ঋতুস্রাব হয়। কারো কারো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও দেখা যায়, যেমন : ৫০ বছর পরেও ঠিকমতো মাসিক হয়ে যাচ্ছে আবার কারো কারো ক্ষেত্রে ৪০ বছর না হতেই মেনোপজের লক্ষণ দেখা দেয়। আর এর ফল হিসেবে দেখা দেয় নানা উপসর্গ : কানে সোঁ সোঁ শব্দ, হাত-পা ঝিমঝিম,

কোমরে-পিঠে ব্যথা, হজমে অসুবিধা, কোষ্ঠকাঠিন্য, কখনো কখনো স্রাব খুব বেশি হতে পারে। এমন হলে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। কখনো পাঁচ/ছয় মাস পরেও স্রাব হতে পারে। চেহারায় রুক্ষভাব আসতে পারে। যে-সব মহিলা মেনোপজকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে চান না তাদের ক্ষেত্রে মানসিক জটিলতা দেখা দেয়। যেমন : স্বামীর সঙ্গে সহবাস হয়তো পূর্বের মতো হবে না–এই হীনম্মন্যতায় ভোগা, বুড়ি হয়ে গেছি, আমার প্রয়োজন বোধ হয় স্বামীর কাছে নেই ইত্যাদি ভাবা, ক্লান্তি-অবসাদ অনুভব করা, নিজেকে অসহায় ভাবা, অল্পে রেগে যাওয়া ইত্যাদি নানা মানসিক অবস্থার শিকার হতে পারেন।

স্রাব বন্ধের (Menopause) কারণ

মেয়েদের জীবনে কমবেশি সবার ক্ষেত্রেই ৪০ বছর পার হলেই স্ত্রী হরমোন (ইসট্রোজেন) নিঃসরণ কম হতে থাকে। কয়েক বছর পর একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। আবার পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ঐ সময় গোনাডোট্রাপিন নামক এক প্রকার হরমোন নিঃসরণ বাড়তে থাকে; তার ফলে ঋতু বন্ধ হয়ে যায়।

প্রকৃতির এই স্বাভাবিক নিয়ম সব মেয়েরই মেনে নেয়া উচিত। এতে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই।

দেহের সঠিক মাপ

দেহের সঠিক মাপ বা Perfect body measurement নিয়ে পাশ্চাত্যে বাড়াবাড়ির শেষ নেই। দেহের মাপ ও অনুপাতের চেয়ে সুস্থ, কমনীয় ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দেহই হচ্ছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবুও এ ব্যাপারে পাশ্চাত্যে প্রচলিত মাপ ও চার্ট নিচে দেয়া হলো :

১. **বুক (Bust)**

১০ থেকে ১২ ইঞ্চি বেশি হবে কোমর থেকে। অর্থাৎ কোমর যা হবে তার থেকে বুক ১০/১২ ইঞ্চি বেশি হবে।

২. **কোমর (Waist)**

বুক এবং নিতম্বের চেয়ে ১০/১২ ইঞ্চি ছোট হবে। অর্থাৎ নিতম্ব এবং বুকের মাপ যত হবে তার থেকে ১০/১২ ইঞ্চি কম হবে কোমরের মাপ।

৩. **নিতম্ব (Hip)**

নিতম্বের উঁচু অংশের থেকে ফিতা দিয়ে মাপলে সেটা সাধারণত বুকের মাপ অথবা তার থেকে দুই/ তিন ইঞ্চি বেশি হতে পারে।

৪. **ঊরু (Thigh)**

ঊরুর চওড়া অংশ ২১ ইঞ্চি থেকে ১৮ ইঞ্চির মধ্যে হওয়া উচিত।

৫. **হাঁটু (Knee)**

ঊরু থেকে ছয় ইঞ্চি কম থাকতে হবে। অর্থাৎ ঊরু যা হবে তার থেকে ছয় ইঞ্চি ছোট হবে হাঁটুর মাপ।

৬. **কাফ মাস্‌ল (Calf)**

হাঁটুর পরে পায়ের যে অংশে একটু মোটা মাস্‌ল রয়েছে তাকে কাফ মাস্‌ল বলে। এটা ঊরুর মাপের থেকে সাত ইঞ্চি ছোট হবে।

৭. **এংকেল (Ankle)**

কাফ মাস্‌লের চেয়ে সাড়ে চার বা পাঁচ ইঞ্চি ছোট হবে এংকেলের মাপ।

যিনি যত মোটা কিংবা পাতলা হোন না কেন, আনুপাতিক মাপ থাকলে দেখতে সুন্দর লাগবে। সাধারণত উচ্চতা অনুসারেও ওজন মাপ হয়ে থাকে।

উচ্চতা অনুসারে দেহের ওজন সারণি ॥ মহিলা

ফুট	মিটার	হালকা	মাঝারি	চওড়া
		কেজি		
৪'৮"	১.৪২	৪২.৩	৪৫	৪৯.৫
৪'৯"	১.৪৪	৪৩.৩	৪৫.৯	৫০.৯
৪'১০"	১.৪৭	৪৪.৫	৪৭.৭	৫২.২
৪'১১"	১.৫০	৪৫.৯	৪৮.৬	৫৩.৬
৫'	১.৫২	৪৬.৮	৪৯.৫	৫৫.০
৫'১"	১.৫৬	৪৮.৬	৫০.৯	৫৬.৪
৫'২"	১.৫৮	৫০.০	৫২.৭	৫৭.৭
৫'৩"	১.৬১	৫০.৯	৫৫.০	৫৯.৫
৫'৪"	১.৬৩	৫২.৭	৫৬.৮	৬১.৩
৫'৫"	১.৬৬	৫৪.৬	৫৮.৬	৬৫.০
৫'৬"	১.৬৮	৫৬.৪	৬০.৫	৬৬.৩
৫'৭"	১.৭১	৫৮.৬	৬২.৩	৬৮.৫
৫'৮"	১.৭৩	৬০.৫	৬৪.১	৭০.৮
৫'৯"	১.৭৬	৬১.৭	৬৫.৯	৭২.৬
৫'১০"	১.৭৮	৬৩.১	৬৭.৭	৭৩.৬
৫'১১"	১.৮১	৬৪.১	৬৮.৭	৭৪.৬

উচ্চতা অনুসারে দেহের ওজন সারণি ॥ পুরুষ

ফুট	মিটার	হালকা	মাঝারি	চওড়া
		কেজি		
৫′১″	১.৫৬	৫১.৮	৫৫.০	৫৯.১
৫′২″	১.৫৮	৫৩.৬	৫৬.৮	৬০.৯
৫′৩″	১.৬১	৫৫.০	৫৭.৭	৬২.৩
৫′৪″	১.৬৩	৫৫.৯	৫৯.৫	৬৩.৬
৫′৫″	১.৬৬	৫৭.৩	৬০.৯	৬৭.৭
৫′৬″	১.৬৮	৫৯.১	৬২.৩	৬৯.৫
৫′৭″	১.৭১	৬০.৯	৬৫.০	৭১.৮
৫′৮″	১.৭৩	৬২.৭	৬৬.৮	৭৩.২
৫′৯″	১.৭৬	৬৪.৮	৬৮.৬	৭৫.৯
৫′১০″	১.৭৮	৬৬.৮	৭০	৭৬.৯
৫′১১″	১.৮১	৬৭.৮	৭২	৭৭.৯
৬′	১.৮৪	–	৭৩	৭৮.৭
৬′১″	১.৮৬	–	৭৪.৫	৮০.৪
৬′২″	১.৮৯	–	৭৬.৬	৮২.৩
৬′৩″	১.৯১	–	৮০.৯	৮৬.৪

আহার

সুষম খাবারই প্রতিটি মানুষের খাওয়া উচিত। অতিরিক্ত তেল, চর্বি, মসলা বেশি মাত্রায় প্রোটিন ইত্যাদি খাবার মানুষের শরীরের জন্যে ক্ষতিকর। সুষম খাবার বলতে বোঝায়–যে খাবারে থাকবে শর্করা প্রোটিন,হেপদার্থ ভিটামিন মিনারেল বা খনিজ পদার্থ ইত্যাদি।

১. মানুষের জন্যে খাবার পরম করুণাময়ের নেয়ামত। তাই খাবার শুরুতে তাঁর নাম নিয়ে খাওয়া শুরু করুন। তাড়াহুড়ো করে, অন্যমনস্কভাবে খাওয়া ঠিক নয়। খাবার সময় ভাবুন–যে খাবার খাচ্ছেন তা আপনার শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগান দেবে। সঠিকভাবে সব হজম হবে। বিরক্তি নিয়ে কোনো খাবার খাবেন না। খাবার সময় মনে মনে বলুন, যা খাব মজা করে খাব, যা খাব সব হজম হবে।

২. খাওয়ার জন্যে বাঁচা নয়, বাঁচার জন্যে খাবার গ্রহণ করুন। খাওয়ার জন্যে বাঁচতে চাইলে খাবার মৃত্যু ডেকে আনবে, আর বাঁচার জন্যে খেলে খাবার আপনাকে প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত করবে।

৩. প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়ার অভ্যাস করুন।

৪. রাতে খাবার খেয়ে সাথে সাথে শুয়ে পড়বেন না, কমপক্ষে ১০ মিনিট বজ্রাসনে বসুন। একটু হাঁটুন।

৫. খাদ্যবস্তু ভালো করে চিবিয়ে খাবেন। এতে হজম ভালো হবে।

৬. কখনো খাবার অপচয় করবেন না। যতটুকু খেতে পারবেন ততটুকুই পেটে নিন।

৭. খাবারের মধ্যে পানি পান করা উচিত নয়। খাওয়ার আধ ঘণ্টা পর পানি পান করুন।

৮. নবীজী (স)-এর নির্দেশ অনুসারে পাকস্থলীর একভাগ খাবার, একভাগ পানি আর একভাগ ফাঁকা রাখুন।

৯. খিদে অনুভব না করলে খাবার খাবেন না। একটু খিদে রেখেই খাবার শেষ করবেন।

১০. সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে কুলি করুন। তারপর খালি পেটে এক গ্লাস (প্রয়োজনে চার গ্লাস হতে পারে) পানি পানের অভ্যাস করুন। এতে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হবে, সহজে পেটের কোনো পীড়া হবে না।

১১. অতিরিক্ত পরিশ্রম করে এসেই খাবার খাবেন না। মুখ-হাত ধুয়ে পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে তারপর খান।

১২. খালি পেটে কফি বা চা পান করবেন না। এটি স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর।

১৩. দৈনন্দিন খাবার তালিকায় মাছ ও গোশতের পরিমাণ সীমিত রাখুন। করলা বাঁধাকপি ডাঁটা লালশাক পুঁইশাক সজনেসহ মৌসুমি ও আঁশজাতীয় সবজি পর্যাপ্ত পরিমাণে খান। আধা সেদ্ধ শাকসবজি সহজে হজম হয়।

১৪. সামুদ্রিক মাছ খাওয়ার অভ্যাস করুন।

১৫. মসুর মুগ মাশ বুট মটর অড়হরসহ যে-কোনো ডাল প্রতিদিনের খাবারে পরিমিত রাখুন। রাতে মসুর ডাল না খাওয়া ভালো।

১৬. ঘন ডালের চেয়ে পাতলা ডালে উপকার বেশি।

১৭. পুষ্টিগুণ বজায় রাখতে মাড়সহ ভাত রান্না করুন। শাকসবজি ভালোভাবে ধুয়ে তারপর কাটুন।

১৮. নিয়মিত মাশরুম খান। প্রোটিন, খনিজ উপাদান ও ভিটামিন বি-১ সমৃদ্ধ এ সবজি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, হৃদরোগ ও ম্যালেরিয়ার ঝুঁকি কমায়।

১৯. প্রতিদিন ৫/১০ গ্রাম স্পিরুলিনা খান। প্রচুর প্রোটিন, বিটা কেরোটিন ও লৌহ সমৃদ্ধ এ খাবার দেহকোষকে প্রাণবন্ত করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

২০. নিয়মিত সব ধরনের বাদাম খাওয়ার অভ্যাস করুন।

২১. দেশীয় মৌসুমি ফল পর্যাপ্ত খান। মৌসুমি ফল সে মৌসুমের রোগব্যাধির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

২২. বর্ষাকালে বা যখনই বাজারে আনারস ওঠে তখন থেকেই নিয়মিত খাওয়া শুরু করুন। ফ্লু থেকে মুক্ত থাকবেন।

২৩. ঠান্ডা-সর্দি থেকে রেহাই পেতে শীতকাল আসার আগেই প্রতিদিন জাম্বুরা খাওয়ার অভ্যাস করুন।

২৪. শীতকালে নিয়মিত পালংশাক টমেটো ব্রোকোলি ও গাজর খান। গরমের দিনে সকালে ও দুপুরে শসা বা ক্ষীরা খান। শসা-ক্ষীরা রাতে খাবেন না।

২৫. প্রতিদিন খাবারে সালাদ খান। সালাদে লেটুস ক্যাপসিকাম টমেটো শসা গাজর ধনেপাতা পুদিনাপাতা ও লাল বাঁধাকপি ব্যবহার করুন।

২৬. রাতে চর্বিদার-গুরুপাক খাবার (গরু-খাসি-পাঁঠার মাংস, বিরিয়ানি/ কাচ্চি) গ্রহণ এবং খেয়েই শুয়ে পড়া দুঃস্বপ্ন বা হার্ট অ্যাটাকের কারণ হতে পারে।

২৭. খাবারে অতিরিক্ত মশলা, টেস্টিং সল্ট, ঝাল ও ভাজাপোড়া বর্জন করুন। রেস্তোরাঁ ও বাইরের খাবার যত কম খাবেন তত ভালো।

২৮. যাদের ওজন বেশি তারা তেলেভাজা খাবার এবং আইসক্রিম চকলেট কেক বিস্কুট পরিহার করুন।

২৯. যারা মোটা তারা বিকেলের নাশতার পর্ব পরিহার করুন।

৩০. ভাতের বিকল্প হিসেবে মাঝেমধ্যে আলু খান। বিশেষত শিশুকে খাওয়ান। এতে দেহের পুষ্টি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ার সাথে সাথে রং উজ্জ্বল হবে, উচ্চতাও বাড়বে।

৩১. দুধ-চায়ের পরিবর্তে শুধু লিকার চা বা সবুজ চা পান করুন।

৩২. সাদা চিনির পরিবর্তে ব্রাউন সুগার বা গুড় খাওয়ার অভ্যাস করুন।

৩৩. যারা দিনে চার/ পাঁচ বার চা পান করেন তারা শুধু দুবার চায়ে মিষ্টি নিন; বাকি সব বার মিষ্টি ছাড়া চা পান করুন।

৩৪. দেহের রেচন প্রক্রিয়াকে স্বাভাবিক রাখতে প্রতিদিন কমপক্ষে ছয় গ্লাস বা দেড় লিটার পানি পান করুন। প্রচুর শাক ও আঁশযুক্ত সবজি খান।

৩৫. প্রত্যেকবার খাওয়ার পর দাঁত ভালো করে পরিষ্কার করুন। তাহলে দাঁতে ক্যারিজ হবে না।

৩৬. গরম কোনো খাবার বা পানীয় খেয়েই সাথে সাথে ঠান্ডা খাবার বা পানীয় খাওয়া উচিত নয়, এতে দাঁতের ক্ষতি হয়।

৩৭. সকালে ভরপেট নাশতা করুন, দুপুরে তৃপ্তির সাথে খান আর সন্ধ্যার পর পরই রাতের হালকা খাবার গ্রহণ করুন।

৩৮. সপ্তাহে অথবা ১৫ দিনে একদিন রোজা বা উপবাস করতে পারেন।*

৩৯. সেহরিতে সামান্য সবজি-ভাত কিংবা খেজুর-কলা খান। প্রোটিন জাতীয় খাবার পানির তৃষ্ণা বাড়ায় বলে তা পরিহার করুন। ভাজাপোড়া বাদ দিয়ে শুধু খেজুর-পানি দিয়ে ইফতার করুন। মাগরিবের নামাজের পর রাতের খাবার (মাছ-মাংস-ডালসহ অন্যান্য সুষম খাবার) খেয়ে নিন। এ খাদ্যাভ্যাস পুরো রমজানে আপনাকে সারাদিন ঝরঝরে রাখবে, পানির তৃষ্ণা কম হবে।

৪০. শিশুকে ফর্মুলা ফুড, ইনস্ট্যান্ট নুডলস একেবারেই খাওয়াবেন না। নিয়মিত বিশেষ কোনো ব্র্যান্ডের চিপস-চকলেট-আইসক্রিম খেতে নিরুৎসাহিত করুন। ছোটবেলা থেকে তাকে চা পানে অভ্যস্ত করে তুলবেন না।

৪১. ফাস্ট ফুড, জাংক ফুড, প্রক্রিয়াজাত ও প্যাকেটজাত কৃত্রিম খাবারে রয়েছে কালার, ফ্লেভার, টেস্টার এবং এডিক্টিভ উপাদান। নিয়মিত এসব খাবার গ্রহণ শরীরের মেদ বৃদ্ধি ছাড়াও ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। হাড়, দাঁত ও চোখের জটিলতা, এমনকি কিডনি ও মূত্রাশয়ের ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ হতে পারে।

৪২. ধূমপান, মাদকদ্রব্য, পান-বিড়ি-সিগারেট ও সব ধরনের কোমল পানীয় ও এনার্জি ড্রিংকস থেকে নিজেকে পুরোপুরি মুক্ত রাখুন।

** সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন কঠোরভাবে খাবার নিয়ন্ত্রণের চেয়ে একদিন স্বাভাবিক খাওয়াদাওয়া এবং তার পরদিন কিছুই না খাওয়া–এরকম অভ্যাস অনেক ভালো ফল দিতে পারে। আর এর কারণ হচ্ছে 'সবিরাম উপবাস' দেহে প্রোটিনের উৎপাদন বাড়িয়ে ব্রেনসেলের ক্ষয় রোধ করে এবং নার্ভসেলের উৎপাদন বাড়ায়। যার ফলে স্ট্রোক, আলঝেইমার, হান্টিংটন বা পার্কিনসন্সের মতো ব্রেনের বয়সজনিত রোগগুলো হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। তবে একটি সুস্থ ব্রেনই রোজা বা উপবাসের একমাত্র উপকার নয়। এর ফলে কোষের গ্লুকোজ পরিপাকের ক্ষমতা বাড়ার কারণে ডায়াবেটিসও প্রতিরোধ হয়। এমনকি হৃৎপিণ্ডের সুস্থতাও তাতে বেড়ে যায়।*

গবেষণায় আরো দেখা গেছে, রোজা বা উপবাস ব্যায়ামের চেয়েও কার্যকরভাবে হার্টবিট ও ব্লাডপ্রেশার কমাতে পারে। অনাহারের ফলে যে সাময়িক শক্তি সংকট, তা ব্রেনসেলগুলোকে প্রোটিন উৎপাদনে উৎসাহ দেয়, যা উদ্বেগজনক পরিস্থিতি মোকাবেলার সামর্থ্য যোগায়। আর পুরো দেহেই ইনসুলিন ছড়িয়ে পড়ে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায়।

৪৩. সফট ড্রিংকস আপনার শরীরের জন্যে অত্যন্ত হার্ড। সফট ড্রিংকস বা কোমল পানীয়ের প্রতিটি চুমুক আর্সেনিকের মতোই ধীরে ধীরে শরীরের অন্তর্গত শক্তি ক্ষয় করে। শরীরের মেদ বৃদ্ধি ও আসক্তি সৃষ্টি ছাড়াও এ পানীয় হাড়ক্ষয়, অকালবার্ধক্য, বদহজম, শ্বাসকষ্ট, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি করে এবং কিডনির বিনাশ ঘটায়।

৪৪. এনার্জি ড্রিংকসের উচ্চমাত্রার ক্যাফেইন আপনার নার্ভাসনেস, বদমেজাজ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, পেশির খিঁচুনি, অনিদ্রা, মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্ট ছাড়াও সন্তান ধারণে জটিলতা, এমনকি অক্ষমতার কারণ হতে পারে।

৪৫. কোমল পানীয় ও এনার্জি ড্রিংকস নিজে পান ও অন্যকে পরিবেশন করা থেকে বিরত থাকুন।

৪৬. প্রার্থনা খাবারের তৃপ্তি বাড়ায়। তাই খাওয়ার আগে প্রার্থনা করুন। আর খাওয়া শেষে বলুন, শোকর আলহামদুলিলাহ/ থ্যাংকস গড/ হরি ওম বা প্রভু ধন্যবাদ, বেশ তৃপ্তির সাথে খেয়েছি।

খাবারের প্রার্থনা

হে করুণাময়!
তোমারই নেয়ামত এখন আমাদের সামনে।
এত ভালো খাবার এখন অনেকের সামনেই নেই।
এই সুস্বাদু খাবারের জন্যে
তুমি আমাদের শুকরিয়া গ্রহণ করো।
সবাইকে সুস্বাদু খাবার, সুস্বাস্থ্য, সম্মান ও প্রাচুর্য দান করো।
সত্যের আলোয় আলোকিত করো। আমিন!

পরিমিত খাদ্য তালিকা

পৃথিবীতে সব মানুষেরই বেঁচে থাকার জন্যে প্রথমেই প্রয়োজন অক্সিজেন; তারপরই সুষম খাদ্যের। খাদ্য দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয় পূরণ এবং দেহে তাপ সৃষ্টি করে দেহযন্ত্রকে সক্রিয় রাখে। তাই আমাদের প্রতিদিন খাবারের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখা প্রয়োজন–খাবারে যেন প্রোটিন শর্করা স্নেহ আয়রন ক্যালসিয়াম আয়োডিন ও খনিজ লবণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় মাত্রায় থাকে। পরিমিত খাদ্য তালিকায় এসব উপাদানসমৃদ্ধ খাবার থাকা প্রয়োজন। আর এ প্রয়োজন মেটাতে পরিমিত খাবারের একটি তালিকা নিচে দেয়া হলো।

খাবারের সাথে সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। যেমন ধরুন, সকালের নাশতা দুপুরে, দুপুরের খাবার বিকেলে আর বিকেলের খাবার রাতে খেলে তা দেহের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। মনে রাখতে হবে, দেহ তার নিজস্ব গতি এবং ছন্দে চলে আর তার জন্যে সঠিক সময়ে তাকে খাবার ও বিশ্রাম দিতে হবে।

সকালের নাশতা

সকাল ৭টা থেকে সকাল ৯টার মধ্যে হওয়া ভালো।

দুপুরের খাবার

দুপুর ১টা থেকে দুপুর ২:৩০ মিনিটের মধ্যে হওয়া ভালো।

বিকেলের নাশতা

বিকেল ৪:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে হওয়া ভালো।

রাতের খাবার

রাত ৮টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে হওয়া ভালো।

সকালের নাশতা

শনিবার

□ ডিম ১টি □ আটার রুটি ৩/৪/৫/৬টি □ সবজি ১ কাপ □ মধু ১ চা চামচ □ যে-কোনো ফ্রেশ জুস ১ গ্লাস অথবা পছন্দমতো যে-কোনো ১টি ফল নাশতার সাথে খান, যেমন : আপেল ১টি/ আমলকি ২টি/ কলা ১টি/ কমলা বা মোসাম্বি ১টি/ আমড়া ১টি/ আনারস জুস ১ গ্লাস।

রবিবার

□ বিভিন্ন ধরনের ডাল এবং সবজি মিলিয়ে খিচুড়ি □ পছন্দমতো ১টি ফল □ ১ চা চামচ মধু।

সোমবার

□ পাউরুটি ৩/৪/৫ পিস। বয়স ও ওজন ভেদে কমবেশি হতে পারে।
□ মাখন ১ চা চামচ □ মধু ১ চা চামচ খান।

মঙ্গলবার

□ আটার রুটি ৩/৪/৫/৬ পিস। বয়স ও ওজন ভেদে কমবেশি হতে পারে।
□ বিভিন্ন ধরনের তরকারি মিলিয়ে রান্না করা সবজি ১ কাপ পরিমাণ
□ মধু ১ চা চামচ □ ফল যে-কোনো ১টি অথবা ফ্রেশ জুস ১ গ্লাস।

বুধবার

□ আটার রুটি ৩/৪/৫/৬ পিস। □ ডিম ১টি □ সবজি ১ কাপ □ মধু ১ চা চামচ □ যে-কোনো ফ্রেস জুস/ পছন্দমতো ১টি ফল।

বৃহস্পতিবার

□ খিচুড়ি □ ১ চা চামচ মধু □ যে-কোনো ফল : কলা ১টি/ কমলা/ আপেল/ আমলকি ২টি/ আমড়া অর্থাৎ মৌসুমি ফল বাজারে যা পাওয়া যায়।

শুক্রবার

□ আটার রুটি ২/৩/৪/৫ পিস। বয়স ও ওজন ভেদে কমবেশি □ ডিম ১টি □ সবজি ১ কাপ □ মধু ১ চা চামচ □ যে-কোনো মৌসুমি ফল।

***বি.দ্র.:** শিশুদের প্রতিদিন ১টি ডিম, এক গ্লাস দুধ ও ১টি কলা দিতে পারেন।*

দুপুরের খাবার

শনিবার

☐ ভাত/ রুটি ওজন ও বয়স ভেদে কমবেশি ☐ ছোট মাছ (যে-কোনো ধরনের) ☐ শাক (যে-কোনো ধরনের) ☐ করলা ☐ মসুর ডাল মাঝামাঝি ঘন ☐ সালাদ : ধনেপাতা/ পুদিনাপাতা/ পার্সলি/ সেলারি/ শসা/ ক্ষীরা/ গাজর/ বিট/ টমেটো/ বাঁধাকপির ভেতরের কচি অংশ/ লেটুস/ রেড ক্যাবেজ/ লেবুর রস/ বিট লবণ/ খাবার লবণ ইত্যাদি মিলিয়ে সালাদ তৈরি করে নিন। (একজনের জন্যে ১ কাপ পরিমাণ) ☐ যে-কোনো ফল ১টি (তবে প্রতিদিন একই ফল খাবেন না। বিভিন্ন ধরনের ফল খাবেন। স্বাদে বৈচিত্র্য আসবে)

রবিবার

☐ ভাত/ রুটি ওজন ও বয়স ভেদে কমবেশি ☐ করলা ☐ মুগ ডাল মাঝামাঝি ঘন ☐ বড় মাছ (যে-কোনো ধরনের) ১ পিস (মাঝারি আকারের)। ☐ যে-কোনো ফল ১টি অথবা ফ্রেশ জুস ১ গ্লাস। ☐ সালাদ জনপ্রতি ১ কাপ।

সোমবার

☐ ভাত/ রুটি ওজন ও বয়স ভেদে কমবেশি ☐ করলা অথবা যে-কোনো তেঁতো শাক ☐ ছোলার ডাল ☐ মাংস যে-কোনো ধরনের ☐ মৌসুমি ফল যে-কোনো ধরনের ☐ সালাদ ১ কাপ।

মঙ্গলবার

☐ ভাত/ রুটি ওজন ও বয়স ভেদে কমবেশি ☐ যে-কোনো ধরনের ভর্তা/ ভাজি ☐ সব ধরনের (মুগ মসুর ছোলা অড়হর) মেশানো ডাল ঘন করে রান্না ☐ সালাদ ১ কাপ ☐ পছন্দমতো যে-কোনো মৌসুমি ফল।

বুধবার

☐ ভাত/ রুটি ওজন ও বয়স ভেদে কমবেশি ☐ যে-কোনো ধরনের শাক (বিভিন্ন শাক খাবেন, সবসময় একই রকম শাক খাবেন না)। ☐ মসুর ডাল ☐ যে-কোনো ধরনের মাংস ☐ সালাদ ১ কাপ ☐ যে-কোনো মৌসুমি ফল।

বৃহস্পতিবার

□ ভাত/ রুটি ওজন ও বয়স ভেদে কমবেশি □ সব ধরনের তরকারি মিশিয়ে ভাজি □ ছোলার ডাল □ যে-কোনো ধরনের মাছ □ সালাদ ১ কাপ □ যে-কোনো মৌসুমি ফল।

শুক্রবার

□ ভাত/ রুটি ওজন ও বয়স ভেদে কমবেশি □ ছোট মাছ (যে-কোনো ধরনের) □ মসুর ডাল □ সালাদ ১ কাপ □ যে-কোনো মৌসুমি ফল।

সপ্তাহে একদিন মাছ-মাংস পরিহার করুন।

বিকেলের নাশতা

যাদের ওজন বেশি তারা বিকেলের নাশতা পরিহার করুন। যাদের ওজন কম তারা খেতে পারেন। তবে অতিরিক্ত তেলেভাজা খাবার খাবেন না। বাচ্চারা ১ গ্লাস দুধ ও তার সাথে ঘরে তৈরি যে-কোনো খাবার এবং বড়রা ১ কাপ লিকার চা ও তার সাথে সামান্য কিছু স্ন্যাক্স খেতে পারেন।

রাতের খাবার

শনিবার

□ আটার রুটি ১টি/ পাউরুটি ২ পিস (যাদের ওজন কম তারা এর চেয়ে বেশি নিতে পারেন, কিন্তু যাদের ওজন বেশি তারা এ নিয়মে নেবেন)
□ দুধ ১ গ্লাস (যাদের ওজন বেশি তারা ফ্যাট ছাড়া দুধ খাবেন)।
□ মৌসুমি ফল : আম/ পাকা পেঁপে ৪ পিস/ আপেল ১টি/ মোসাম্বি ১টি।

রবিবার

□ পাউরুটি ১ পিস (যাদের ওজন কম তারা রুটি পরিমাণে বেশি খেতে পারেন) □ দুধ ১ গ্লাস □ যে-কোনো ফল : আপেল ১টি/ পেঁপে ৩ পিস।

সোমবার

□ আটার রুটি ১টি/ পাউরুটি ২ পিস □ মুড়ি ১ কাপ □ দুধ ১ গ্লাস
□ মৌসুমি ফল যে-কোনো ১টি।

মঙ্গলবার

□ ভাত ২ কাপ/ আটার রুটি ১টি □ সবজি ১ কাপ □ দুধ ১ গ্লাস
□ মৌসুমি ফল যে-কোনো ১টি।

বুধবার

□ আটার রুটি ২টি □ যে-কোনো ভাজি ১ কাপ □ দুধ ১ গ্লাস
□ মৌসুমি ফল যে-কোনো ১টি।

বৃহস্পতিবার

□ পাউরুটি ২/৩ পিস □ আটার রুটি ১ পিস □ দুধ ১ গ্লাস
□ মৌসুমি ফল যে-কোনো ১টি।

শুক্রবার

□ ভাত আধা কাপ/ পাউরুটি ২/৩ পিস/ আটার রুটি ১ পিস □ দুধ ১ গ্লাস
□ মৌসুমি ফল যে-কোনো ১টি।

বি.দ্র. : *বয়স ও ওজন ভেদে খাবার কমবেশি হতে পারে। এ খাদ্য তালিকা মূলত মেয়েদের জন্যে।*

স্পিরুলিনা খাওয়ার অভ্যাস করুন। এতে প্রচুর পুষ্টি রয়েছে।

ছোট মাছ বলতে শুধু কাঁচকি মাছই ভাববেন না। টাকি বাতাসি কাজরি পাবদা টেংরা পুঁটি ফলি মলা ঢেলা কৈ মাগুর শিং ইত্যাদিকেও ছোট মাছের আওতায় ধরা হয়েছে।

বড় মাছ বলতে রুই কাতল মৃগেল কোরাল আড় ইত্যাদি বড় ধরনের মাছকে বোঝানো হয়েছে।

মাংসের প্রোটিনের চেয়ে মাছের প্রোটিন স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী। মাংসে স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে।

লবণ খেলে আয়োডিনযুক্ত লবণ খাবেন।

অত্যধিক ভুনা, ভাজা, তেল-ঝাল-মশলা খাবেন না।

প্রতিদিন তিন পদের বেশি খাবার খাবেন না।

রোগগ্রস্ত হলে ডাক্তারের বিধিনিষেধ মেনে খাবার খাবেন।

সৌন্দর্যচর্চার ইতিহাস

যুগে যুগে মানুষ নিজেকে অন্যের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে কিংবা কখনো আত্মতৃপ্তি লাভে নিজেকে সাজিয়েছে বিভিন্ন ভাবে। আদি থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সময়ের সাথে তারা নিজেদেরকে সাজিয়েছে নানান কৌশলে রঙে বর্ণে আবরণে এবং আভরণে।

প্রসাধনের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখব–আজ থেকে ২০ হাজার বছর আগের ক্রো-ম্যানোরাই এই প্রসাধন রীতির সর্বজনস্বীকৃত প্রবর্তক। তখন মানুষ ছিল অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তারা বুঝত না, জানত না–আকাশে বজ্রপাত কেন হয়, দাবানল কেন জ্বলে। ঝড়বৃষ্টি কেন হয়, বন্যা কেন তাদের ঘরবাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যায়–এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর মৃত্যুকে তারা ভীষণ ভয় করত। মহান প্রভু কী, আলাহর মহিমা কী–কিছুই তারা বুঝত না। ভয়ই ছিল তাদের নিয়ন্ত্রক। আর এই ভয়কে জয় করার জন্যে তারা নানান রঙে-বর্ণে-অলঙ্কারে নিজেকে সাজিয়ে কল্পিত দেবতাকে সন্তুষ্ট করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ভয় থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করত।

মেয়েরা তখন থাকত মন্ত্র সুরক্ষিত গুহায়। আর পুরুষরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বেরোত শিকারে। গায়ে, মুখমণ্ডলে রং-এর জাদু মেখে। কালের প্রবাহে সভ্যতা এসে পৌঁছল ইতিহাসের দরজায়। ততদিনে মানুষ চাষ করতে শিখেছে। জাপানের নব্য প্রস্তর যুগে (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০০-২০০০) বা নীল নদের উপত্যকায় গড়ে উঠেছে চাষীদের ছোট ছোট বসতি। মিশরে শুরু হয়েছে প্রি-ডাইন্যাস্টি সভ্যতা।

মানুষের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিধিও ততদিনে বেড়েছে। ভয় কমেছে দুর্যোগের। তারা নিজেদের ক্ষমতা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। ক্রমশ ভয় বিভক্ত হলো দেখা এবং না দেখায়। এখন নীল নদে কবে পাবন আসবে, ঘন মেঘ কবে আকাশ ছেয়ে ফেলবে, মানুষ এখন তার গাণিতিক নির্ভুলতায় এর ভবিষ্যদ্বাণী

করতে শিখেছে। সুতরাং এসবে তার ভয় নেই। তবু ভয় আছে মৃত্যুকে। একদিন অজ্ঞাত বিপদকে জাদু বলে দূরে রাখতে সে যে প্রসাধনের সূত্রপাত করেছিল, এখন তা-ই পরিব্যাপ্ত হয়েছে চেনা শত্রুদের বিরুদ্ধেও। হিংস্র পশু এবং তার চেয়ে হিংস্র ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের বিরুদ্ধে ভয় পেয়ে নয়—ভয় দেখাতে বা আত্মগোপন করতে তারা মুখ ও সারা শরীর চিত্রিত করা আরম্ভ করল।

সময়ের বিবর্তনে ধীরে ধীরে এসব ছোট ছোট গোষ্ঠীতে গড়ে উঠল পুরোহিত সম্প্রদায়। সাধারণ মানুষ ভাবত এরা চির রহস্যময় মৃত্যুর রাজ্যের খবর এনে দেবে। বিপদে-আপদেও জনসাধারণকে পথ দেখাবে, উদ্ধার করবে। এরাই তখন হয়ে উঠল প্রসাধনের সর্বময় কর্তা। এভাবে প্রসাধন হলো ধর্মের অঙ্গ। প্রসাধনের জটিলতাও বাড়ল। প্রাচীন মিশরীয়রা শরীরে উল্কি আঁকত। তারা রেড়ির বীজ থেকে তেল বের করে গায়ে মাখত সূর্যের আলো থেকে চামড়া বাঁচাতে। এছাড়া তারা মুখ ও চোখের পাতা রাঙাতে শুরু করল বুনো রেড়ির তেলে সবুজ ম্যালাকাইট (তামার আকর) গুলে।

মিশরের বেনী হাসান নামক স্থানে রয়েছে খুমোটোপের সমাধি। পুরাতাত্ত্বিকেরা এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন এসব প্রসাধনের নিদর্শন। আর সমাধি গাত্রে আঁকা রয়েছে এমন সব ছবি, যা দেখে বোঝা যায় তখনকার দিনে দূর-দূরান্তে প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবসা চলত। মিশরে তখন চোখে কাজল দেয়ার প্রথা চালু হয়। কাজল সীসার একরকম যৌগ, যার ইংরেজি নাম গ্যালেনা। এই কাজল হলো সুরমার পূর্বসূরী, যা তৈরি অ্যানটিমনি ধাতু থেকে।

পরবর্তীকালে অর্থাৎ ফেরাউনদের আমলে মিশরে চোখের পাতায় বা ভ্রু আঁকতে এর ব্যবহার অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ফারাও আখেন-আটেনের রানি নেফারতিতি সুরমা দেয়া হরিণ চোখের জাদু দিয়ে বিচ্ছিন্ন উত্তর এবং দক্ষিণ নীল উপত্যকাকে সঙ্ঘবদ্ধ করেছিলেন এক সাম্রাজ্যের অধীনে। এর ফলে মিশরে কী পরিমাণ সমৃদ্ধি এসেছিল তা বোঝা যায় নেফারতিতির জামাতা বিখ্যাত ফারাও টুটেন খামেনের সমাধি দেখে। এরও বহু পরে সর্বজনজ্ঞাত মিশর সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার কাজল চোখের দৃষ্টি কী করে পৃথিবীর ইতিহাসটাই পাল্টে দিয়েছিল তা অনেকেরই অজানা নয়।

তৎকালীন মিশরে প্রসাধনী রং বলতে ছিল কালো এবং সবুজ রং। রামেসিস ও টলেমিদের সময় মেয়েদের ঠোঁটে এবং কপালে গেরি মাটি বা কারমাইন-এর লাল রং প্রসাধন চালু হয়। তখন সবুজ রং তৈরি হতো

ম্যালাকাইট-এর পরিবর্তে সবুজ কপার হাইড্রো সিলিকেট দিয়ে। পিঁপড়ার ডিম বেটে তারা চোখে পেইন্ট করত। কিন্তু এর ব্যবহার ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে।

শরীর রং করার এ ইতিহাস থেকে বোঝা যায়, একসময় হয়তো প্রথাটির ধর্মীয় তাৎপর্য ছিল গভীর। আবার সূর্যালোক থেকে শরীরের ত্বক রক্ষা এবং শারীরিক সৌন্দর্যবৃদ্ধির কথাও বাদ দেয়া যায় না। হয়তো শেষ পর্যন্ত প্রসাধনে রং ব্যবহারের কারণ হিসেবে মানুষের সৌন্দর্যের অনুভূতিই প্রাধান্য লাভ করেছিল।

এই সূত্রে শরীর রং করার আরেক বিকল্প প্রথাও উলেখযোগ্য—যার নাম উল্কি। অন্য বহু প্রসাধনের মতো উল্কি (শরীরকে রং দিয়ে চিত্রিত করা) প্রসাধনেরও উৎপত্তি প্রাচীন মিশরে—খ্রিষ্টপূর্ব চার থেকে দুই হাজার বছরের মধ্যে। এরপর প্রথাটি ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর সর্বত্র। আড়াই হাজার বছর আগে ক্রিট হয়ে গ্রিস, পারস্য, আরব এবং আরো প্রায় পাঁচ শত বছর পরে চীনে। চীন থেকে আইনুরা প্রথাটি জাপানে চালু করে। ক্রমশ জাপানি শিল্পীদের হাতে এটা কারুকলায় উন্নীত হয়। সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে সুমাত্রা, বোর্নিও, ফিলিপাইনসহ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহে।

নিউজিল্যান্ডের মাওরিদের মধ্যে উল্কির ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখা যায়। এর উৎপত্তি পলিনেশিয়ায়। পরে অবশ্য প্রথাটি মাওরিদের সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে ওঠে। সেখানে উল্কির স্থানীয় নাম অ্যামোকো। ওরা বাদাম পুড়িয়ে সেই ছাই দিয়ে উল্কি করত। ওরা এত উল্কিপ্রিয় যে, প্রক্রিয়াটি যন্ত্রণাদায়ক হলেও তারা উল্কি আঁকতে যন্ত্রণা সহ্য করত। সৌন্দর্যবোধ ছাড়াও উল্কির ব্যবহার একেক দেশে একেক তাৎপর্য বহন করে। মালয়ের অধিবাসীরা কলেরার প্রতিষেধক হিসেবে শরীরে সাদা, কালো ও লাল রঙের উল্কি আঁকত। আবার আফ্রিকার কোনো কোনো আদিবাসী নারী নিজেদের বিধবা বোঝাতে ব্যবহার করে উল্কি। অ্যামেরিয়রা বিশ্বাস করত উল্কি দিয়ে শুধু এই জীবনে নয়, মৃত্যুর পরেও তাদেরকে ঠিক চিনে নিতে পারবে তাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবরা।

রং দিয়ে উল্কি করে শরীরকে নানান রঙে সাজানোর উত্তাল তরঙ্গ মিশরের ফারাওদের যুগেও দেখা গিয়েছিল। ওল্ড টেস্টামেন্টে 'পেইন্টেড লেডি' জিজাবেলের কথা পড়ে মনে হয় বডি পেইন্টিং-এর প্রথাটি মিশর থেকে মধ্য প্রাচ্যে এসেছে।

কালের বিবর্তনে আজকের সভ্য জগতেও নারীর সৌন্দর্য প্রসাধনের পাশে উল্কির প্রচলন শুরু হয়েছে। তবে সেটি প্রাচীন প্রক্রিয়ায় শারীরিক নির্যাতন

সহ্য করে নয়। অত্যন্ত সহজ উপায়ে আধুনিক নারীরাও উল্কি এঁকে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে থাকেন। আজকাল বিউটি পার্লারে গিয়ে মেয়েরা হাতে, গলায়, পায়ে ও গালে ফুল ফোঁটা এঁকে থাকেন। এগুলো অতীতের উল্কিরই বিকল্প পদ্ধতি। গ্রিসে মেয়েরা শরীরে রং-এর প্রলেপ ব্যবহার করত। ভূমধ্যসাগরীয় একরকম লতাগুল্ম থেকে অ্যালকানেট নামে লাল রং বের করে তারা গালে লাগাত। আর মুখে এবং গায়ে সাদা রং-ও ব্যবহার করত।

এ থেকেই হয়তো-বা আধুনিক প্রসাধনে এসেছে গালে রুজ এবং ব্লাশার লাগানোর প্রচলন। আধুনিক প্রসাধনে এগুলো তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন রং-এ। গায়ের রং অনুসারে আজকের নারীরা তা ব্যবহার করছে সৌন্দর্যকে আরো ফুটিয়ে তুলতে। কে না চায় গাল দুটো দেখাক আপেলের মতো। তাই তো আপেল রং-এর গাল বানাতে ব্যবহৃত হচ্ছে রুজ, ফেস পাউডার, ব্লাশারের মতো প্রসাধনী। বিশ্বের নানাদেশে বহু নামি দামি কোম্পানি প্রসাধন সামগ্রী বানাতে ব্যস্ত। প্রসাধন বিজ্ঞানীরা রীতিমতো গবেষণা চালাচ্ছেন এর মান নিয়ে। সারা বিশ্বে প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবসা এক বিরাট লাভজনক ব্যবসা। তাই নিত্য নতুন আঙ্গিকে প্রসাধনের প্রসার ঘটছে সারা বিশ্বে। পালা দিয়ে চলছে একেক কোম্পানি।

রূপচর্চার ইতিহাস বলতে গেলে চার জন রমণীর নাম অবশ্যই আগে আসে। তারা হলেন–

ক. মিশরের ক্লিওপেট্রা

খ. বাইজানটিয়ার থিওডোরা

গ. ফ্রান্সের মাদাম পঁপিদু এবং

ঘ. ভারতের সম্রাজ্ঞী নূরজাহান

কথিত আছে, ক্লিওপেট্রার অপরূপ সৌন্দর্য এবং বুদ্ধিমত্তা ছাড়াও তিনি ছিলেন বহুগুণের অধিকারিণী। ধাত্রীবিদ্যা ও ভেষজবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তিনি। ক্লিওপেট্রা প্রসাধন শিল্পকে পুরোহিতদের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে একে চিকিৎসাবিদ্যার সাথে সংযোজন করেন। পরাক্রমশালী ফারাওদের সময় থেকেই প্রসাধনের ওপর পুরোহিতদের আধিপত্য কমতে শুরু করেছিল। ক্লিওপেট্রার মতো সুন্দরী লাবণ্যময়ী প্রসাধন বিশেষজ্ঞরা যখন ভেষজবিদ্যার চর্চা শুরু করলেন তখন পুরোহিতদের জাদুমন্ত্র সম্পূর্ণ খসে পড়ল। তাছাড়া আজকাল মুখের চামড়া পেলব রাখতে মেয়েরা যে ‘ফেস মাস্ক’ নামক প্রসাধন ব্যবহার করে–রানী ক্লিওপেট্রাই তার প্রবর্তক। মধু, ডিমের সাদা অংশ এবং

'গাধার খুর' নামে এক প্রকার গাছের পাতার রস মিশিয়ে তিনিই এই প্রাকৃতিক অভিনব ফেস প্যাকটি তৈরি করতেন। প্রাচীন মিশরীয় প্রসাধনে আইবিস, বিড়াল, কুমিরের রক্ত, কাঁকড়া, বিছার লেজ, ইঁদুরের নখ, গাধার খুর ইত্যাদি যতসব উদ্ভট উপাদানের নাম পাওয়া যায়, পরবর্তীতে আবিষ্কৃত হয় যে, এগুলো হলো এক রকম উদ্ভিজ্জ্য উপাদানের আটপৌরে নাম।

খ্রিষ্টের সমসাময়িক রোমে প্রসাধন বিস্তারের বর্ণনা দিয়ে গেছেন দার্শনিক পিনি এবং কবি ওভিড, যাকে আজও 'প্রসাধনের কবি' নামে অভিহিত করা হয়। পিনির বই 'ন্যাচারাল হিস্ট্রি' থেকে জানতে পারা যায়, তখনকার দিনে মেয়েরা ঠোঁটে 'লিপস্টিক', চোখে 'আইশ্যাডো' ছাড়াও গালে ব্যবহার করত ভিনেগারে ভেজানো 'পুপেসেরিয়াম' নামে একরকম শেকড়, যা থেকে পাওয়া যেত রুজ কিংবা সিঁদুর। গায়ের রং ধবধবে সাদা করতে ব্যবহার করা হতো চক পাউডার। ওভিডও Ars Amatoria (art of love) নামে একটা বই লিখেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন, 'Cura dabit faciem; facies neglecta perbit'–অর্থাৎ উপযুক্ত যত্ন নিলে (রূপ পরিচর্যা করলে) সবাই সুন্দর; অবহেলা করলেই কুৎসিত। ওভিডের অধিকাংশ আলোচনা কেশচর্চা নিয়ে। পিনির আলোচনা পারফিউম নিয়ে।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাইজেনটাইন সভ্যতার প্রাক্কালে কনস্ট্যানটিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) শহরটির পত্তনের পর অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে যায়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে সেখানে রাজত্ব করতেন খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী রাজা জাসটিনিয়ন, যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন দ্বিতীয় এক রোম সাম্রাজ্যের। সে স্বপ্ন তার সফল হয় নি। আর তারই রানি থিওডোরা আমাদের দিয়েছিলেন বিজ্ঞানভিত্তিক প্রসাধনের ধারণা। অসামান্য রূপের অধিকারিণী ছিলেন কনস্ট্যানটিনোপল শহরের হিপোড্রোমের ভালুক পালকের মেয়ে। জন্ম তার সাধারণ পরিবারে হলেও নারীত্বে তিনি ছিলেন মহিয়সী আর প্রসাধনে ছিলেন অসাধারণ জ্ঞানবতী। নানারকম গাছগাছড়া নিয়ে তিনি নতুন নতুন প্রসাধন সামগ্রী তৈরি করতেন তার নিজের গবেষণাগারে। এ ব্যাপারে রাজচিকিৎসক ইতওস ছিলেন তার সুযোগ্য সহকারী। এছাড়া তিনি ছিলেন প্রসাধন শিল্পের পৃষ্ঠপোষক।

একাদশ শতাব্দীতে কনস্ট্যানটিনোপলের সিংহাসনে আমরা আরেক সম্রাজ্ঞীর অধিষ্ঠান দেখতে পাই। জোই (Zoe) নামে। তিনি যৌবনকে ধরে রেখেছিলেন। তাকে বলা হতো অনন্তযৌবনা। তিনি ৫০ বছর বয়সে বাইজানটাইন সিংহাসনে তার খুলতাত অষ্টম কনস্ট্যানটিনোপলের

স্থলাভিষিক্ত হন। এই অনন্তযৌবনা নারী নিজের আবিষ্কৃত প্রসাধনপ্রণালী দিয়ে বার্ধক্যকে দূরে রেখেছিলেন। ৭২ বছর বয়সে যখন তিনি মারা যান তখনো তার মুখ দেখাত ষোড়শী তন্বীর মতো।

উপমহাদেশে রূপচর্চার ইতিহাসও একইভাবে প্রাচীন। মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্যগুলোয় আবরণ, আভরণ ও প্রসাধনে তৎকালীন বঙ্গ ললনাদের সৌন্দর্য কীভাবে বিকশিত হয়ে উঠত তার নিখুঁত বর্ণনা আমরা পাই। যেমন :

হস্তে লীলা কমলম্ অলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্র প্রসব রজসা পাণ্ডুতাম্ আননশ্রীং।
চূড়াপাশে নবকুরু বকং চারু কনে শিরিষং
সীমন্তে চ তুদুপগমজং যত্র নীণং বধুনাম্।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উপমহাদেশে যুক্ত হয় আরবীয় প্রসাধনচর্চা। সপ্তম থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান–সব কিছুতেই এগিয়ে চলার জোয়ার বইছিল। সে-সময় একদিকে আমরা যেমন আবু ইবনে সিনার মতো হেকিমের নাম শুনতে পাই, তেমনি ইসহাক-ইবন মুরাদ বা হাজি-জৈন-আল আত্তার প্রভৃতি প্রসাধনবিশেষজ্ঞরাও সে-সময় জন্মেছিলেন। মোঘলরা প্রসাধনচর্চায় এনেছিল নতুন উদ্যম। জাতি হিসেবে মোঘলরা ছিল জাঁকজমকপ্রিয় এবং প্রসাধনবিলাসী।

মোঘল সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ছিল অনেক গুণ। তিনি সাহিত্যচর্চা করতেন, কবিতা লিখতেন, চিত্রশিল্পেও তার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। নূরজাহান সুরুচিসম্পন্ন সাজগোজ অর্থাৎ প্রসাধন ব্যবহার করতেন। তিনি বিভিন্ন প্রসাধনসামগ্রীও তৈরি করতে পারতেন। বিশেষ করে সুগন্ধিদ্রব্য (Perfume) প্রস্তুত করতেন। বিভিন্ন ফুল থেকে নির্যাস নিয়ে তাদের সংমিশ্রণে নতুন নতুন সুগন্ধি তৈরি করা ছিল তার শখ।

চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর যে প্রামাণ্য গ্রন্থ ম্যানডেভিল তিনি রচনা করে গেছেন তার ২৪ পরিচ্ছেদেই রয়েছে প্রসাধন সংক্রান্ত আলোচনা। সেখানে সাবানের উলেখ আছে। বইটির ১০টি অধ্যায়ে জরাকে ঠেকিয়ে রাখার উপায় লিপিবদ্ধ আছে। হেনরীর ছাত্র গাই-দ্য-শৌলক (১৩০০-১৩৬৮ খ্রিষ্টাব্দ) প্রসাধনবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি করেছিলেন। সে দেশে কসমেটিক সার্জারি চালু করার কৃতিত্বও তার।

মধ্যযুগে ইংল্যান্ডে প্রসাধনের ব্যাপারটা অতীত ঐতিহ্য অনুযায়ী

সম্পূর্ণরূপে চার্চের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। রানি প্রথম এলিজাবেথের সময় এর বাঁধন ছেঁড়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়। যদিও রানি চার্চকে সন্তুষ্ট করতে ফরমান জারি করেছিলেন যে, কোনো রমণী যদি কৃত্রিম কেশ, স্পেনীয় হেয়ার প্যাড, মেক-আপ, ফলস হিপ, হাইহিল জুতো ব্যবহার করে সম্রাজ্ঞীর কোনো প্রজাকে প্রলুব্ধ করে বিবাহ করে তবে তাকে ডাইনীর উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে; অথচ রানি এবং তার বোন মেরী ছিলেন অত্যন্ত প্রসাধনপ্রিয়। সুগন্ধির প্রতি রানির এতই দুর্বলতা ছিল যে, পার্শ্বচরেরা সবসময় গায়ে গন্ধ মেখে ঘুরে বেড়াত। শোনা যায়, এলিজাবেথ এতই প্রসাধন ব্যবহার করেছিলেন যে, পরবর্তীতে তার ত্বকের অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল–শেষ জীবনে তিনি লজ্জায় কারো সামনে খুব একটা বেরোতেন না।

প্রসাধনের ব্যাপারে ইউরোপে নব জাগরণ এনেছিল ফ্রান্স। ফ্রান্সকে সমগ্র ইউরোপের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরা হতো। তাই আজও ফরাসি পারফিউম সারা পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান দখল করে রেখেছে।

সৌন্দর্যচর্চা ॥ মৌলিক সত্য

যুগে যুগে মানুষ নিজেকে সুন্দর রাখার, সৌন্দর্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। এ জন্যে উদ্ভাবন করেছে নানা কৌশল। এজন্যে সে কখনো প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করেছে, আবার কখনো ব্যবহার করেছে কৃত্রিম উপাদান। তবে কৃত্রিম উপাদানের চেয়ে প্রাকৃতিক উপাদানই বেশি ভালো। কারণ এতে নেই কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, নেই কোনো বাড়তি খরচ। অনায়াসেই যা হাতের কাছে পাওয়া যায়, তা-ই আপনি আপনার রূপচর্চায় কাজে লাগাতে পারেন। প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম–যে-কোনো উপাদান দিয়েই রূপচর্চা করেন না কেন, আগে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে আপনার ত্বকের ধরন, চুলের ধরন ইত্যাদি তথ্য। তবে পরিপূর্ণ রূপবতী কিংবা রূপবান বলতে কেবল শারীরিক সৌন্দর্যকেই বোঝায় না, এর সাথে থাকে বিশেষ কিছু গুণ। যেমন :

১. সুস্থ দেখানো
২. বয়সের তুলনায় কম বয়সী মনে হওয়া
৩. ব্যক্তিত্ব এবং শিষ্টাচার

৪. সাজপোশাক
৫. মার্জিত ভাব
৬. মানবিক গুণাবলি
৭. শিক্ষা

এসব মিলিয়ে একজন মানুষকে সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে বিচার করা হয়।

পৃথিবীতে জন্মগতভাবেই যদি কেউ সৌন্দর্যের অধিকারিণী হয়ে থাকে, তবে সেটা তাদের জন্যে করুণাময়েরই বিশেষ দান। কিন্তু বাকি সব গুণাবলি মানুষকে অর্জন করতে হয়। আর জন্মগত সৌন্দর্যও চিরস্থায়ী নয়, তাকে বেশিদিন ধরে রাখার জন্যে প্রয়োজন পরিচর্যার। তাই আজ যে এ সচেতনতা হয়েছে তা নয়। অতীতেও এ সচেতনতা ছিল। আগের দিনের নারীরা ঘরে বসেই রূপচর্চা করত। কালের প্রবাহে এর প্রসার ঘটেছে। এখন ঘরের বাইরেও এজন্যে রয়েছে বহু প্রতিষ্ঠান, যা বিউটি পার্লার নামে পরিচিত। এখন মেয়েরা পার্লারে গিয়ে রূপচর্চা করে। আর যারা জন্মগতভাবে সৌন্দর্যের অধিকারিণী নন, তারাও হতাশ হবেন না, তারাও অনায়াসে সৌন্দর্যচর্চার মাধ্যমে নিজেকে পরিণত করে তুলতে পারেন রূপসী রমণীতে।

তবে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোনো চর্চাই আলাদিনের চেরাগের মতো আপনাকে রাতারাতি বদলে দেবে না। এজন্যে প্রয়োজন ধৈর্য। আর এটা ভাবাও ঠিক নয় যে, আপনি সারাজীবনই আপনার যৌবনকে ধরে রাখবেন, রূপকে ধরে রাখতে পারবেন। প্রকৃতির নিয়মেই ধাপে ধাপে বয়সের সাথে সাথে আপনাকে এগোতে হবে এক এক পর্যায়ের সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশে। তবে সৌন্দর্যচর্চা করলে আপনার বয়স যখন ৪০ তখন হয়তো আপনাকে দেখতে লাগবে ৩০ বছর বয়সী। এটাই বা কম কী। বয়সের তুলনায় ১০ বছর কম লাগা সহজ ব্যাপার নয়।

অনেকে গায়ের রং নিয়ে ভাবেন—ফর্সা না হলে বুঝি সুন্দরী হওয়া যায় না; এটা আসলে ভুল ধারণা। সুন্দরী মানে যদি শুধু ফর্সাকেই বোঝানো হতো, তাহলে প্রতিযোগিতায় আফ্রিকার কালো মেয়েটি বিশ্বসুন্দরী হতে পারত না। কাজেই সুন্দরী মানেই রং ফর্সা হতে হবে—এ কথাটি সত্য নয়। রং যা-ই হোক না কেন, পরিচর্যার মাধ্যমে আপনি হয়ে উঠতে পারেন অপরূপ সুন্দরী।

সর্বোপরি মনে রাখতে হবে সৌন্দর্যচর্চা মানে শুধু মুখমণ্ডলের চর্চা নয়, দেহের মাথা থেকে পা পর্যন্ত যত্ন নেয়া, পরিচর্যা করাই রূপচর্চার পূর্ণাঙ্গ রূপ।

এর সঙ্গে রয়েছে ব্যায়াম, পরিমিত ও স্বাস্থ্যসম্মত আহার, সাজপোশাক, আপনার ব্যক্তিত্ব, শিষ্টাচার, মানবিক গুণাবলি, শিক্ষা, কথা বলার ভঙ্গি, হাঁটা-চলা-বসার ভঙ্গি ইত্যাদি। এসব মিলিয়েই একজন মানুষকে সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে বিচার করা হয়।

সৌন্দর্যচর্চা ॥ গোসল

সুস্বাস্থ্য ও ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষায় গোসলের কোনো জুড়ি নেই। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে ঘাম, ময়লা ও ক্লান্তিজনিত অবসাদ দূরীকরণে মনের মতো গোসল কাজ করে টনিকের মতো। একারণেই যুগ যুগ ধরে গোসলকে শুধু আবশ্যিক কাজ হিসেবে দেখা হয় নি; বরং একে আনন্দময় ও কার্যকর করার জন্যে নানা মাত্রা সংযোজন করা হয়েছে। কথিত আছে, মিশরের রানি ক্লিওপেট্রা প্রতিদিন একশত গাধার দুধ দিয়ে গোসল করতেন। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের গোসলে লাগত সহস্র গোলাপ।

গোসল করার জন্যে বিভিন্ন দেশে তৈরি হয়েছিল হাম্মামখানা। আর মরুভূমির মানুষেরা সবসময়ই স্বপ্ন দেখত দরিয়ার হাম্মামে গোসল করার। দরিয়ার হাম্মাম মানে প্রবহমান নদী। পলী বাংলায় গ্রামের ধার দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীতে যে কেবল পুরুষেরাই গোসল করত তা নয়; কলসি কাঁখে দল বেঁধে পলীবালারাও পানিতে অবতরণের আনন্দে মেতে উঠত। নদীর পানিতে সাঁতার কেটে গোসল করার যে আনন্দ, তা থেকে শহরবাসীরা বঞ্চিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে একটু সহজ বুদ্ধি প্রয়োগ করলেই গোসল যেমন ত্বক পরিষ্কারে সহায়ক হতে পারে, তেমনি ক্লান্তি-অবসাদও দূর করতে পারে।

তাই আসুন গোসলের পূর্বে কী করলে আপনার ত্বকের সৌন্দর্য ও মনের প্রফুলতা বজায় থাকবে তা নিয়ে আলোচনা করি।

গোসল করার আগে শরীরকে অবশ্যই ঠান্ডা করতে হবে। বাইরে থেকে ঘাম নিয়ে অথবা রান্না ঘরের কাজ সারার পর পরই গোসল করতে যাবেন না। অবশ্যই ১০ মিনিট শরীরটাকে জুড়িয়ে নেবেন।

সাবান ও বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান বাদে প্রাকৃতিক উপায়েও আপনি সুন্দরভাবে পরিপূর্ণ এবং তৃপ্তিকর গোসল করতে পারেন। তবে এর আগে

আপনাকে আপনার ত্বক সম্পর্কে সচেতন হতে হবে; জানতে হবে আপনার ত্বক শুষ্ক, স্বাভাবিক, তৈলাক্ত না মিশ্র। যা-ই হোক না কেন–এর পরিচর্যায় প্রাকৃতিক ভেষজ উপাদান রয়েছে, যার কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

গোসলের জন্যে সাবানের পরিবর্তে অল্প খরচে বেসন বা আটা অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন। হাত-পায়ের দাগ, ময়লা তোলার জন্যে এক টুকরো লেবু নিতে পারেন। গা ঘষার জন্যে ব্যবহার করতে পারেন ধুনদুলের খোসা কিংবা ছোট তোয়ালেকে ব্যান্ডের মতো করে মুখে ইলাস্টিক লাগিয়ে নিজেই গ্লাভস-এর মতো বানিয়ে নিতে পারেন।

শুষ্ক ত্বক হলে বেসনের সাথে মধু মিশিয়ে মুখে মেখে নিন এবং গোসলের পাঁচ মিনিট আগে সারা শরীরে মাখন অথবা অলিভ অয়েল বা নারকেল তেল ভালো করে মেখে নিন। এবার সারা শরীরে পানি ঢেলে দিন। এবার পানি দিয়ে তৈরি বেসন বা আটার পেস্ট সারা শরীরে সাবানের মতো ঘষে নিয়ে পানি ছেড়ে গোসল করতে পারেন। মনে রাখবেন সুস্থ শরীরে কখনোই অতিরিক্ত ঠান্ডা পানি বা শরীরের তাপমাত্রার চেয়ে উষ্ণ পানি ব্যবহার করবেন না। আপনার ত্বক তৈলাক্ত হলে বেসন বা আটার সাথে শুধু পানি মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে সমস্ত শরীরে, মুখে ব্যবহার করতে পারেন।

মিশ্র ত্বক হলে শুষ্ক স্থানে মধু ও বেসনের পেস্ট এবং তৈলাক্ত স্থানে পানি ও বেসনের পেস্ট লাগিয়ে নেবেন। তারপর পর্যাপ্ত পানি দিয়ে ভালোভাবে গোসল সেরে নিন।

এবার যদি আপনি সুগন্ধিযুক্ত পানি গোসলে ব্যবহার করতে চান তবে তা প্রাকৃতিক উপায়ে বানানোর পদ্ধতি জেনে নিন।

ক. এক বালতি পানিতে কয়েকটি তাজা লেবুপাতা চটকে নিতে পারেন। ঐ পানি শরীরে ঢেলে নিলে শরীর থেকে লেবুর হালকা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসবে।

খ. এক মগ পানিতে কমলা লেবুর খোসা পাঁচ মিনিট ফুটিয়ে নিয়ে ঠান্ডা করে এক বালতি পানিতে মিশিয়ে শরীরে ঢালতে পারেন। এতে মিষ্টি সুন্দর গন্ধ পাওয়া যাবে।

গ. এক বালতি পানিতে কয়েকটি তাজা গোলাপের পাপড়ি পাঁচ/ ছয় ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে তা দিয়েও গোসল করতে পারেন। এই পানি ব্যবহার করলে শরীর থেকে গোলাপের হালকা গন্ধ আসবে। এভাবে বেলি ফুল দিয়েও পানি তৈরি করে নিতে পারেন।

ঘ. গোলাপ ফুলের পরিবর্তে অল্প গোলাপ জল পানিতে ঢেলে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন।

ঙ. যারা অতিরিক্ত ঘামেন তারা গোসল সেরে বালতির পানিতে অল্প ফিটকিরি মিশিয়ে গায়ে ঢেলে নিতে পারেন। এতে সেই দিন আপনি ঘাম ও ঘামের দুর্গন্ধ থেকে রেহাই পাবেন।

এবার ভেজা তোয়ালে বা গামছা দিয়ে শরীর ভালোভাবে মুছে ফেলুন।

গোসলের সময় আপনার যে-সব প্রয়োজনীয় জিনিস দরকার তা হলো—

১. শরীর ঘষার ব্রাশ বা ছোবড়া (ধুনদুলের ছোবড়া হাতে সেলাই করে নিতে পারেন)

২. নাইলনের তৈরি স্পঞ্জ—যা স্টেশনারি দোকানে পাওয়া যায়

৩. তোয়ালে বা গামছা

৪. সাবান বা প্রাকৃতিক উপাদান (বেসন, আটা কিংবা ময়দা)

৫. তেল (গোসলের একঘণ্টা পূর্বে ভালো করে শরীরে ম্যাসাজ করে নিন, এতে ত্বক মসৃণ থাকে)

প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কেশ পরিচর্যা

'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'—ঘন কালো চুলের এর চেয়ে সুন্দর উপমা হয়তো আর হয় না। তবে চুল শুধু কবির কল্পনাকেই প্রভাবিত করে নি; বরং চুলের সৌন্দর্যে যুগে যুগে সৌন্দর্যপিপাসুরা মোহাবিষ্ট হয়েছে। তাই চুলের পরিচর্যা চলে আসছে সুপ্রাচীন কাল থেকেই। সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার চুলও ছিল ঘন ও লম্বা। মিশরীয় সভ্যতায়ও কেশ পরিচর্যার প্রমাণ মেলে। বেণি বাঁধার রীতি মিশর থেকে গ্রিসে প্রচলিত হয়। রোমান নারীদের দুর্বলতা ছিল বব চুলের প্রতি, আর বাঙালি নারীর চুলের খোঁপা, সে-তো ভুবনবিখ্যাত। চুল আজানুলম্বিত হোক অথবা বব ছাঁট, বয়-কাট হোক অথবা পুষ্পিত খোঁপা—চুলের যথাযথ যত্ন না নিলে আপনার গর্বিত চুল ঝরে যাবে অকালেই।

চুল পরিচর্যার প্রাথমিক পদক্ষেপ হচ্ছে শ্যাম্পু। কিন্তু বাজারে প্রচলিত

অধিকাংশ রাসায়নিক শ্যাম্পু চুলের উপকারের পরিবর্তে ক্ষতিই করে বেশি। এ কারণে আজকাল সৌন্দর্যসচেতন নারীরা দেশি-বিদেশি রাসায়নিক শ্যাম্পুর পরিবর্তে প্রাকৃতিক শ্যাম্পু ব্যবহার করছেন। আমরা এবার প্রাকৃতিক উপায়ে চুল পরিষ্কার করার কয়েকটি প্রণালি সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রাকৃতিক উপায়ে চুল পরিষ্কার

শ্যাম্পু বা সাবান দিয়ে চুল পরিষ্কার করলে যাদের চুল পড়ে যায় বা এলার্জি হয় তারা প্রাকৃতিক উপায়ে চুল পরিষ্কার করতে পারেন। এতে চুলের ক্ষতিও হবে না এবং চুল পড়বেও অনেক কম। যারা ঘরের বাইরে বেশি যান তারা সপ্তাহে দুদিন অবশ্যই চুল পরিষ্কার করবেন। বাইরের ধুলোবালির জন্যে চুলের গোড়ার লোমকূপগুলো বন্ধ হয়ে যেতে চায়। এতে চুল বেশি পড়ে। যাদের চুল তৈলাক্ত তাদের চুলে ময়লা আটকায় বেশি।

মানুষের মুখের ত্বকের মতো চুলেরও বিভিন্ন ধরন আছে। যেমন :

১. তৈলাক্ত চুল
২. রুক্ষ চুল
৩. স্বাভাবিক চুল

তাই আপনার চুল যে ধরনেরই হোক না কেন, প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে পরিষ্কার করলে চুলের কোনো ক্ষতি হবে না। রাসায়নিক সামগ্রী ব্যবহার করলে তার অনেক বিধিনিষেধ মানতে হয়, কিন্তু প্রাকৃতিক সামগ্রীর তেমন কোনো বিধিনিষেধ নেই। এটি একটি বিরাট সুবিধা। এবার জেনে নিন কী কী উপায়ে প্রাকৃতিক শ্যাম্পু বানিয়ে আপনি মাথা পরিষ্কার করতে পারেন।

প্রথম পদ্ধতি

উপকরণ : দুই চামচ মেথি, চারটি শুকনো আমলকি (বিচি বাদ দিয়ে), মেহেদি পাতা বাটা এক টেবিল চামচ, খুসবু করার জন্যে এক টুকরো সোন্দা ও এক টুকরো লেবু।

প্রস্তুত প্রণালি : মেথি, আমলকি ও সোন্দা একত্রে ধুয়ে এক কাপ পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। মনে রাখবেন, যেদিন মাথা ধোবেন তার একদিন আগেই এগুলো ভেজাতে হবে। মেথি, আমলকি ও সোন্দা ভিজে ফুলে নরম হবে। এবার শিলপাটায় মেথি পিষে নেবেন। মেথি ভেজানো পানি ফেলবেন না। ঐ পানি একত্রে মিশিয়ে নেবেন। এবার একটি পাত্রে বাটা মেহেদি, মেথি,

লেবুর রস একসঙ্গে চটকে নরম পেস্টের মতো করে নিন। এই পেস্ট চুলে তেল দেয়ার মতো বিলি কেটে চামড়ায় এবং চুলে ভালো করে লাগিয়ে দুঘণ্টা রাখবেন। কমপক্ষে একঘণ্টা রাখলেও হবে। গোসলের সময় প্রথমে মাথায় পানি ঢেলে একটু নরম হলে আস্তে আস্তে ঘষে ঘষে পানি ঝেড়ে মাথা পরিষ্কার করবেন। এ পদ্ধতিতে চুল পরিষ্কার করতে একটু ঝামেলা মনে হলেও চুলের জন্যে বিশেষ উপকারী। মেথি পিচ্ছিল বলে এতে বেশি পানি দিয়ে মাথা পরিষ্কার করতে হয়।

তৈলাক্ত চুল হলে গোসলের শেষে এক টুকরো লেবুর রস মগে একটু পানির সাথে মিশিয়ে চুলে মেখে নিতে পারেন। এতে চুল যেমন নরম হবে তেমনি চকচকও করবে এবং মিষ্টি সুগন্ধ ভেসে আসবে।

রুক্ষ ও স্বাভাবিক চুলেও এ পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। চুলের পরিমাণ বুঝে একই অনুপাতে দ্রব্য বাড়িয়ে নিতে পারেন। এ পদ্ধতিতে চুল ধুলে চুলে খুশকি হয় না এবং চুলের গোড়া শক্ত হয়।

যারা প্রাকৃতিক উপায়ে চুলে রং করতে চান তারা মেহেদি পাতা বাটা বেশি করে দিলে আস্তে আস্তে কিছুদিন পর লালচে আভা আসবে। মেহেদি পাতার রস চুলের গোড়া শক্ত করে।

রিঠার সাহায্যে চুল ধোয়া

মাথার চুল পরিষ্কার করার কাজে রিঠা ফলের গুরুত্ব আজও অপরিসীম। স্যাপিনডাস প্রজাতির গাছের ফল রিঠা। রিঠা ফল দেখতে দুধরনের–বড় ও ছোট। রিঠা ফলের শাঁস সাধারণত পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যবহৃত হয়। এতে ১২ শতাংশ স্যাপেনিন নামক ফেনক (সাবান) রয়েছে বলে এটি মাথার চুলকে বেশ পরিষ্কার করে এবং ঝরঝরে রাখে।

রিঠা বীজের তেল সাবান তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। রিঠার নির্যাসের মধ্যে অল্প অল্প তেল থাকায় এটি চুলের কিউটিক্‌লের জন্যে বেশ উপকারী। আগে যখন শ্যাম্পু ছিল না তখন আমাদের মা-দাদীরা চুল ধোয়ার জন্যে রিঠা ব্যবহার করতেন। ফলে তাদের চুল ঘন, কালো আর লম্বা হতো। আজকাল যত রাসায়নিক সামগ্রী আমরা ব্যবহার করছি তত আমাদের চুল ঝরে পড়ছে।

প্রস্তুত প্রণালি : কয়েকটি রিঠা ধুয়ে নিয়ে শিলপাটায় ভেঙে ভেতরের বিচি বের করে ফেলুন। এবার চুলোয় পরিষ্কার হাড়ি বসিয়ে এক মগ পরিমাণ

পানিতে রিঠার খোসা ছাড়িয়ে ফুটিয়ে নিন। তিন/ চার মিনিট ফোটানোর পর ঠান্ডা করে হাত দিয়ে চটকে রসটাকে ভালো করে বের করে নিন। মাথাটা একটু ভিজিয়ে নেবেন; তারপর রিঠার রস দিয়ে আস্তে আস্তে মাথা ঘষতে শুরু করবেন। মাথা ঘষার পর বেশি পানি দিয়ে চুল ধুতে হবে। তা না হলে রিঠার রস চুলে থেকে যাবে এবং চুল একটু আঠা আঠা মনে হবে। বাজারে মনোহারি দোকানে রিঠা কিনতে পাবেন। এ ফলটি দেখতে ঘন বাদামি ও গোলাকার।

সর্ষের খৈল

সর্ষে যে কেবল আমাদের রান্নাবান্নায় ব্যবহৃত হয় তা নয়; রূপচর্চায়ও এর অবদান অনেক। আপনারা হয়তো বলবেন–চুল তো স্বাস্থ্যগত কারণেই ধোয়া দরকার, তার আবার রূপচর্চার সাথে সম্পর্ক কী? হ্যাঁ, আজকাল আর চুল শুধু ধুয়েই আমরা ক্ষান্ত নই। এখন এটিকে রূপচর্চার অঙ্গ হিসেবেও দেখছি।

আমরা যতই সাজগোজ করি না কেন, মাথায় তেল চিটচিটে চুল দেখলেই তাকে বলি–একেবারে গেঁয়ো। চুল ধুয়ে আমরা দেখি চুল চিকচিক করছে কিনা কিংবা সিল্কের মতো মনে হচ্ছে কিনা ইত্যাদি। তারপর রয়েছে নানা ঢং-এ চুল কাটা, বাঁধা ইত্যাদি। কারণ কেশবতী নারীর রূপই আলাদা।

এবার আসি সর্ষের কথায়। যে-কোনো বয়সের বাচ্চা হোক না কেন–খাঁটি সর্ষের তেল গায়ে মাখার রেওয়াজ আছে আমাদের দেশে। কিন্তু গ্রাম-বাংলায় সর্ষে খৈল দিয়ে চুল ধোয়ার রেওয়াজ সম্পর্কে আমরা কজনই বা জানি! হাতের কাছের সস্তা জিনিস ব্যবহার করেও আমরা চুলকে স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে পারি। এবার জেনে নিন কীভাবে সর্ষে খৈল দিয়ে চুল পরিষ্কার করবেন।

প্রস্তুত প্রণালি : প্রথমে কিছুটা সর্ষের খৈল একটি বাটিতে নিয়ে সারারাত ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন ভালো করে চটকে নিয়ে ছাঁকনি দিয়ে ভালোভাবে ছেঁকে সে পানি মাথার চুলে ভালো করে মেখে ঘণ্টা খানেক রাখুন। তারপর গোসলের সময় মাথা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করুন। বেশি করে পানি দিয়ে পরিষ্কার করে নিন। তারপর ভালোভাবে চুল শুকিয়ে নিন। দেখবেন চুল ঝরঝরে হয়ে বেশ ফুলে উঠেছে। তৈলাক্ত চুল হলে এক টুকরো লেবুর রস পানিতে মিশিয়ে চুলে ঢেলে নিতে পারেন। খৈল দিয়ে চুল ধুলে চুলে খুশকি হয় না।

মসুরের ডালের বেসন

রান্নার উপকরণ দিয়েও আপনি চুল পরিষ্কার করতে পারেন। বেসন দিয়ে যেমন শরীর পরিষ্কার করা যায়, তেমনি চুল পরিষ্কারের কাজেও এর অবদান কম নয়। আমাদের মা-দাদীরা বেসন দিয়ে চুল পরিষ্কার করতেন।

প্রস্তুত প্রণালি : চুলের পরিমাণ বুঝে মসুর ডাল নিয়ে ধুয়ে একটি পাত্রে পরিষ্কার পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর শিলপাটায় বেটে নিন। পানি মিশিয়ে পেস্টের মতো করে চুলে বিলি কেটে ঘণ্টাখানেক রেখে চুল ভালোভাবে পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলুন। ভালোভাবে চুল শুকালে আঁচড়ে ফেলুন। দেখবেন চুল ঝরঝরে হয়েছে। আপনার যদি গ্রাইন্ডিং মেশিন থাকে তবে তাতেও ডাল গুঁড়ো করে বেসন তৈরি করে নিতে পারেন। বেসনের সাথে পানি মিশিয়ে পেস্টের মতো তৈরি করে মাথায় ব্যবহার করতে পারেন।

চুল ধোয়ার পর কন্ডিশনার হিসেবে লেবু পানি চুলে ঢেলে দিতে পারেন। এতে চুলের খুশকিও দূর হয়। যে-কোনো ডালের বেসন দিয়েই চুল ধোয়া যায়, তবে মসুরের ডালের বেসনই সবচেয়ে ভালো।

পেঁয়াজের রস

এককালে বলা হতো, 'বউ ভালো লাজে, সালুন (তরকারি) ভালো পেঁয়াজে'–একথা হয়তো আমরা অনেকেই জানি। এর সাথে হয়তো আমরা অনেকেই জানি না যে, পেঁয়াজের রস চুলের এক মহৌষধ। চুলের খুশকি দূর করতে পেঁয়াজের রসের জুড়ি নেই। এমনকি পেঁয়াজের রস মাথায় ঘষলে নতুন চুলও গজায়।

প্রস্তুত প্রণালি : ছোট পেঁয়াজ কিছু পরিমাণ নিয়ে থেঁতো করে রস বের করে সম্পূর্ণ মাথায় বিলি কেটে তেল দেয়ার মতো করে ত্বকে ও চুলে রস মেখে নিন। ঘণ্টাখানেক রেখে বেশি করে পানি দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন। দেখবেন–চুল শুকালে রেশমের মতো ফুরফুরে হয়ে উঠেছে। অনেকে গন্ধের জন্যে পেঁয়াজ দিতে চান না। এক্ষেত্রে মাথা ধোয়ার শেষে পানির সাথে সুগন্ধি কিছু মিশিয়ে নিয়ে মাথায় ঢেলে নিতে পারেন। যেমন, এক মগ পানিতে দুই টুকরো শরবতি লেবুর রস মিশিয়ে মাথা ধোয়ার পর সমস্ত চুল লেবু পানি দিয়ে ধুয়ে দিলে শরবতি লেবুর খুসবু আসবে। আর যারা কৃত্রিম উপায়ে শ্যাম্পু দিয়ে ধুতে চান তারা চুলের উপযোগী শ্যাম্পু দিয়ে ধোবেন।

তেঁতুলের ক্বাথ

আপনার চুলের পরিমাণ অনুযায়ী তেঁতুল নিয়ে একটি বাটিতে পানির সাথে মিশিয়ে ঘন পেস্টের মতো বানিয়ে মাথায় বিলি কেটে ১০/১৫ মিনিট রেখে ভালো করে মাথা ধুয়ে নিলে দেখবেন চুল শুকানোর পরে কেমন ফুরফুরে, নরম ও সিল্কি হয়েছে।

যাদের অন্য কিছু স্যুট করে না তারা তেঁতুল দিয়ে চুল ধুলে উপকৃত হবেন এবং চুলও ছিঁড়বে না। চুলে কন্ডিশনার হিসেবে কিছু ব্যবহার করতে হবে না।

কেশ পরিচর্যা

খুব সাধারণ প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে চুল পরিষ্কার করার পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। চুলের প্রকার ভেদে বিভিন্ন উপাদানের প্রয়োগ সম্পর্কে আপনারা জেনেছেন। এবার কীভাবে চুলের যত্ন করতে হয় সে-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

১. চুল আঁচড়ানো

চুলকে সুন্দর, উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যে প্রত্যেকের উচিত চুল আঁচড়ানো। এতে চুলে আটকে থাকা ধুলোবালি ও মরা চুল দূর হয়। চুল আঁচড়ানো বা ব্রাশ করার ফলে মাথার ত্বকে রক্ত চলাচল বেড়ে গিয়ে চুলের পুষ্টি যোগায়।

চুল আঁচড়ানো চুলের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় হলেও অনেকে খুব বেশি চুল আঁচড়ান। এটা ঠিক নয়। এতে চুল ফেটে গিয়ে ভেঙে যেতে পারে। আবার আঁচড়ানোর জন্যে ব্যবহৃত ব্রাশ বা চিরুনি খারাপ হলে চুলের ক্ষতি হতে পারে। এজন্যে ব্রাশ বা চিরুনি কেনার সময় দেখে নেবেন এর দাঁতগুলো যেন বেশি তীক্ষ্ণ বা ধারালো না হয়। দাঁতের শেষ অংশ যেন গোলাকার বা মসৃণ হয়।

২. আঁচড়ানোর নিয়ম

প্রথমে মাথার ওপর থেকে চিরুনি বা ব্রাশ বসিয়ে টেনে চুলের নিচের অংশ–যাকে আমরা আগা বলি–সে পর্যন্ত নামাতে হবে। এভাবে ডান পাশ থেকে শুরু করে আঁচড়াতে আঁচড়াতে বাম পাশে যাবেন। আবার বাম পাশ থেকে ডান পাশে আসবেন। এভাবে ৭০ বার চুল আঁচড়ান। এবার সমস্ত চুল উঠিয়ে মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে নিয়ে গোড়া থেকে শুরু করে আগা পর্যন্ত

টেনে টেনে ব্রাশ করুন ৩০ বার। মোট ১০০ বার ব্রাশ করুন। এ পদ্ধতিতে প্রতিদিন একবার আঁচড়ান। এতে চুলের ঔজ্জ্বল্য বাড়বে এবং ময়লা জমতে পারবে না। রক্ত চলাচল বেড়ে গিয়ে চুল দীর্ঘায়ু হবে। চুল ঝরবেও কম। তাছাড়া আপনি যদি বজ্রাসনে বসে ব্রাশ করতে পারেন, তবে আপনার চুল অকালে পাকবেও না এবং ঝরবেও না। এটা অতি পরিচিত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে আপনি দুসপ্তাহের মধ্যেই ফল পাবেন। জাপানী মেয়েরা এভাবে বসেই চুল আঁচড়ায়।

৩. চিরুনি ও ব্রাশের যত্ন

চুলের যত্নের সাথে সাথে চিরুনি ও ব্রাশের যত্নও আপনাকে নিতে হবে। যেমন প্রতি দুদিন পর আপনি চিরুনি ও ব্রাশ পরিষ্কার করবেন–

ক. গরম পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে সাবান বা জেট পাউডার দিয়ে ব্রাশ পরিষ্কার করে পরে কয়েক ফোঁটা ডেটল বা স্যাভলন পানির সাথে মিশিয়ে ধুয়ে নেবেন।

খ. একটি পাত্রে পানি নিয়ে এক টেবিল চামচ খাবার সোডা মিশিয়ে সেই পানিতে প্রথমে চিরুনি বা ব্রাশ পরিষ্কার করে নিয়ে পরে সাবান পানিতে ধুয়ে নিতে পারেন।

৪. চুলকে সজীব ও সুন্দর রাখার জন্যে করণীয়

ক. একদিন কিংবা দুদিন অন্তর চুলের গোড়ায় ভালো করে তেল মালিশ করবেন। মালিশ করার সময় হাতের আঙুলের ডগার মাংসপিণ্ড দিয়ে মালিশ করবেন। তাড়াহুড়ো করে মালিশ করবেন না। আস্তে আস্তে ঘষবেন যেন মাথার তালুর ওপরই ঘষাটা লাগে, চুলের ওপরে নয়। এতে চুলের গোড়ায় রক্ত সঞ্চালন বাড়বে। চুল প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাবে। তেল শুধু চুলের গোড়ায় লাগাবেন। পরে চিরুনি বা ব্রাশ দিয়ে আঁচড়ালে সব চুলে তেল মেখে যাবে।

খ. সপ্তাহে একদিন অথবা দুদিন মাথা পরিষ্কার করবেন। এছাড়া চুল অপরিষ্কার মনে হলেই ধুয়ে নেবেন।

গ. শ্যাম্পু দিয়েই পরিষ্কার করুন কিংবা প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে চুল ধোয়ার একদিন আগে মাথায় তেল মালিশ করবেন। যে তেলই হোক, তেলটা সামান্য গরম করে নেবেন। এতে খুশকিও দূর হয় এবং চুল ধোয়ার পর বেশ নরম ভাব থাকে।

৫. মাথায় খুব খুশকি হলে

চুল ধোয়ার আগে তেল গরম করে মাথায় মালিশ করে তারপর একটা তোয়ালে গরম পানিতে ভিজিয়ে পানি নিংড়ে মাথায় ১০ মিনিট জড়িয়ে রাখবেন। তারপর খুশকি দূর করার ওষুধ বা শ্যাম্পু দিয়ে মাথা পরিষ্কার করবেন। এছাড়া প্রাকৃতিক উপায়েও আপনি খুশকি দূর করতে পারেন। যেমন : কাঁচা পেঁয়াজের রস মাথায় ভালোভাবে দিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিট রাখবেন। তারপর চুল ভালো করে পরিষ্কার করবেন। এভাবে কিছুদিন করার পর খুশকি দূর হবে। প্রতিদিন নিজস্ব চিরুনি বা ব্রাশ দিয়ে চুল আঁচড়াবেন। কখনো অন্যের ব্রাশ, চিরুনি ব্যবহার করবেন না।

৬. চায়ের লিকারের সাথে পাতি লেবুর রস

চায়ের কড়া লিকারের সাথে পাতি লেবুর কয়েক ফোঁটা রস মিশিয়ে মাথা ধোয়ার পর এই লিকার পানি দিয়ে চুল ধুয়ে নেবেন। এতে চুল পড়া কমবে এবং চুল চকচক করবে।

৭. শুকনো আমলকি

শুকনো আমলকি দুধে চার/ পাঁচ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখবেন। নরম হলে বেটে পেস্টের মতো করে মাথায় বিলি কেটে চুলের গোড়ায় ঘষে ঘষে লাগাবেন। অন্ততপক্ষে একঘণ্টা রেখে মাথা ধুয়ে ফেলবেন। আমলকির সাথে কয়েকটা মেহেদি পাতা দিতে পারলে খুব ভালো। এ পদ্ধতিতে চুল খুব ভালো থাকে।

৮. দুর্বাঘাস ও নারকেল তেল

একমুঠো দুর্বাঘাস খাঁটি নারকেল তেলের মধ্যে সারা রাত ভিজিয়ে রাখবেন। পরের দিন এ তেল রোদে ভালোভাবে গরম করে নিয়ে মাথায় বিলি কেটে লাগালে চুল ঘন হয়। এ তেল বোতলে রেখে দিতে পারেন। তবে রোজ রোদে দিতে হবে। মাথায় দেয়ার সময় রোদে গরম করে নেবেন।

৯. চুলে উকুন হলে কী করবেন

উকুন চুলের জন্যে যেমন ক্ষতিকর তেমনি অস্বস্তিকর। 'পেডিকুলসি ক্যাপিটিস' জাতের উকুন পরাশ্রয়ী জীবাণু। উকুন একজনের মাথা থেকে অন্যের মাথায় ছড়ায়। এরা মাথার ত্বকের ওপর বাস করে। এদের ধূসর বা সাদা রঙের লিক বা ডিম চুলের গোড়া থেকে একটু দূরে চুলের গায়ে গেঁথে থাকে। এর চিকিৎসা খুবই সহজ। বাজারে আজকাল উকুননাশক সাবান ও

শ্যাম্পু পাওয়া যায়। এ দিয়েও আপনি উকুন দূর করতে পারেন। এ-ছাড়া :

ক. সাড়ে পাঁচ গ্রাম ডিডিটির সঙ্গে সাড়ে তিন আউন্স ট্যালকম পাউডার মিশিয়ে একটা চূর্ণ তৈরি করে রাতে শোবার আগে চুলের ওপর বেশি করে দিয়ে একটা কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতে হবে। পরের দিন চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াতে হবে। এভাবে দু-তিন দিন ওষুধ প্রয়োগ করলে উকুন মরে যাবে।

খ. নারকেল তেলের সাথে ন্যাপথালিন গুঁড়ো করে মিশিয়ে চুলে লাগিয়ে ঘণ্টা খানেক রেখে দেবেন। তারপর মাথা ধুয়ে ফেলবেন। এভাবে কয়েক দিন লাগানোর পর উকুন মরে যাবে।

গ. প্রাকৃতিক উপায়েও উকুন দূর করা যায়। তুলসী পাতার রস উকুন নিধনে উপকারী। এর রস মাথায় বিলি কেটে দিয়ে ঘণ্টা খানেক রাখবেন। পরে মাথা ধুয়ে ফেলবেন।

ঘ. ধুতরা পাতার রস, পানের রস ও কর্পূর একসঙ্গে মিশিয়ে মাথায় লাগালে উকুন মরে যায়। এরপর মাথা ভালোভাবে ধুয়ে ফেলবেন।

১০. চুলের ডগা ফেটে গেলে

চুলের ডগা ফেটে গেলে মনে করবেন চুলের সর্বনাশ হয়েছে। কাজেই ডগা ফাটলে ডগা ছেঁটে ফেলবেন। এ-ছাড়া কোনো উপায় নেই। তা না হলে চুল আর বাড়বে না। ধৈর্য ধরে চুল ব্রাশ করবেন। নিয়মিত খাবারের মধ্যে ভিটামিন 'সি' জাতীয় খাবার রাখবেন। তাহলে উপকার পাবেন। নিয়মিত তেল মালিশ করবেন। সপ্তাহে দুদিন চুল ধোবেন। খাবারের মধ্যে 'এ' জাতীয় ভিটামিন রাখবেন। তাহলে চুল ও ত্বক উভয়ই সুন্দর হবে। গাজরে প্রচুর ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। আমড়া আমলকি লেবু পেয়ারায় প্রচুর 'সি' ভিটামিন পাওয়া যায়। মৌসুমের সময় এগুলো খেলে উপকার পাবেন। সন্তান প্রসবের পরও অনেক মায়ের চুল পড়ে যায়। ক্যালসিয়াম ও আয়রনের অভাব হলে এটা হয়ে থাকে। তখন ডাক্তার দেখিয়ে পরামর্শ নিতে পারেন। মনে রাখবেন চুল নারীর সৌন্দর্যের এক অপরিহার্য অঙ্গ। একে অবহেলা করা উচিত নয়।

সব ধরনের চুলের যত্নে করণীয়

১. সবসময় চিরুনি, ব্রাশ পরিষ্কার রাখবেন।

২. অন্যের চিরুনি, ব্রাশ ব্যবহার করবেন না।

৩. খুব ঘন ঘন চুল ছাঁটবেন না। অন্ততপক্ষে একমাস বা দেড় মাস অন্তর ছাঁটবেন।
৪. চুলের আগা ফাটলে ছেঁটে ফেলবেন।
৫. চুল খুব শক্ত কিংবা টান টান করে বাঁধবেন না।
৬. চুলে রাসায়নিক দ্রব্য পারতপক্ষে ব্যবহার করবেন না।
৭. অন্ততপক্ষে সপ্তাহে দুদিন চুলে তেল মালিশ করবেন।
৮. অতিরিক্ত সূর্যের আলো চুলের জন্যে খারাপ। তাই এর হাত থেকে চুলকে রক্ষা করবেন।
৯. বাইরে থেকে এসে চুল ব্রাশ করবেন, যাতে চুলে ধুলোবালি জমতে না পারে।
১০. খাবারের সাথে ভিটামিন 'এ', ভিটামিন 'সি', ভিটামিন 'বি' কমপেক্স ও প্রোটিন রাখবেন। এতে চুলের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং চুল অকালে পাকবে না।
১১. ছোট মাছ খাবেন।
১২. সর্বোপরি জাজেন বা বজ্রাসনে বসে ছোটবেলা থেকে প্রতিদিন ১০০ বার চুল ব্রাশ করলে চুল অকালে পাকবে না। চুলে খুশকি হবে না।

ত্বকের যত্ন

আপনার যা জানা উচিত

আমরা একজন মানুষের বয়স, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বুঝতে চেষ্টা করি তার মুখের দিকে তাকিয়ে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং বয়সের ভারে মানুষের মুখে ক্লান্তিবোধ এবং বয়সের ছাপ পড়ে। বয়সের জন্যে ত্বক কুঁচকে যায় এবং মুখে বলিরেখার জন্ম নেয়। কেউ কেউ আবার ত্বকের ওপর বয়সের ছাপ পড়তে দিতে নারাজ। এটি একান্তই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। তবে এ সবকিছুর পেছনেই রয়েছে সুস্পষ্ট কিছু শারীরিক ও মানসিক কারণ।

১. পাশ্চাত্যে ট্যানিং অবসর বিনোদনের অবলম্বন হিসেবে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ট্যানিং হলো শরীরের ত্বককে এমনভাবে tuned করা, যাতে রোদ ত্বকের কোনোরকম ক্ষতি করতে না পারে।

২. তীব্র রোদে ঘোরাফেরা করলে ত্বকে কতগুলো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেমন : বিশেষজ্ঞরা বলছেন অতিরিক্ত রোদে পোড়ার কারণে ত্বকে ক্যান্সার হয়, ত্বক কুঁচকে যায় এবং পিগমেন্ট (ত্বকের বর্ণ নিয়ন্ত্রক পদার্থ) পরিবর্তিত হয়।

৩. অতিরিক্ত তাপে ত্বকের আর্দ্রতা হ্রাস পায়।

রেটিন 'A'-এর আবিষ্কারক ড. কিগম্যান বলেছেন যে, মহিলারা যদি সূর্যালোক এড়িয়ে চলেন তবে তাদের মুখের ত্বক বাহুর ত্বকের মতোই টানটান, মসৃণ ও কোমল থাকবে। লোক ভেদে, জাত ভেদে ত্বকের বর্ণও পরিবর্তিত হয়। জন্ম থেকেই যাদের ত্বকের রং ফ্যাকাসে-সোনালি এবং মাথার চুল লাল, তাদের রোদে পুড়িয়ে ত্বক কালো করে ফেললে স্বাভাবিক বাদামি রং পেতে পারেন।

রোদ পোহানো যাদের খুব প্রিয় তাদের মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই। তারা রোদের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে বাঁচার জন্যে 'সানস্ক্রিন' নিয়ে রোদ লাগাতে পারেন যতক্ষণ খুশি।

সবারই জানা উচিত বয়স বাড়লে মানুষের ত্বকের চর্বি গঠিত ডারমাসিসের (নিচের সাপোর্টিং অংশ) স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা কমতে থাকে।

ডারমাসিসে পানি এবং কিছু কোষ থেকে 'কোলাজেন' ও 'ইলাস্টেন' তৈরি হয়। কোলাজেন ও ইলাস্টেন ত্বককে দৃঢ় করে এবং স্থিতিস্থাপকতা ধরে রাখতে সাহায্য করে; যাকে আমরা সজীবতা, তারুণ্য ইত্যাদি বলি। বয়স বাড়লে ডারমাসিস আর আগের মতো পানি এবং চর্বি ধরে রাখতে পারে না। নতুন কোষ উৎপাদন কমে যায়, ফলে ওপরের ত্বকে পুরনো কোষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এ সময়ই মানুষের মধ্যে বয়সের ছাপ স্পষ্ট হয়। গালে গলায় ত্বকে ভাঁজ পড়ে, চামড়া কুঁচকে যায় এবং বিবর্ণ হয়ে পড়ে।

সবসময় মনে রাখবেন, অসুখ সারানোর চিকিৎসা করার চেয়ে আগে থেকে অসুখ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ভালো। ত্বকের যত্ন নেয়ার তিনটি বিষয় মনে রাখতে হবে। এক. ত্বক পরিষ্কার রাখা, দুই. ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখা, তিন. ত্বক আর্দ্র রাখা। যত্নের সঙ্গে ত্বক পরিষ্কার করলে মেক-আপ, সারাদিনের ময়লা এবং দেহনিঃসৃত ঘাম ইত্যাদি দূর হয়। ত্বকের লোমকূপ পরিষ্কার থাকে। কৃত্রিম উপায়ে ত্বক আর্দ্র রাখলে বয়সজনিত শুষ্কতা হতে পারে না এবং ত্বক সজীব থাকে।

আপনি যদি নিয়মিত রোদ এড়িয়ে চলেন, ত্বকের যত্ন নেন, ব্যায়াম করে ত্বককে কর্মক্ষম রাখেন এবং প্রচুর পানি পান করেন তাহলে আপনার ত্বক কখনো স্বাভাবিক সজীবতা ও লাবণ্য হারাবে না। আর বয়স আপনাকে কখনো ছুঁতে পারবে না।

মনে রাখবেন, সূর্য থেকে যে অতিবেগুনি রশ্মি বেরোয় তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে শরীরে অতিরিক্ত পরিমাণ মেলানিন তৈরি হয়। আর এই অতিরিক্ত মেলানিন তৈরি হওয়ার কারণে ত্বকের রং বদলে যেতে পারে। অতিবেগুনি রশ্মি থেকে ত্বক বাঁচাতে রোদে ছাতা ব্যবহার করুন। বিদেশে অবশ্য সানব্রেলা বলে ছাতা পাওয়া যায়।

তাছাড়া ত্বকের যত্নে রয়েছে খাবারের বিশেষ ভূমিকা। নিচে উলিখিত জিনিসগুলো মিলিয়ে একটা হালকা নাশতা জাতীয় খাবার তৈরি করে নিন। এ খাবার আপনার ত্বককে আরও পরিপুষ্ট করবে।

এককাপ দই, একটি কলা, আধা কাপ জাম, তিন টেবিল চামচ আটা, এক টেবিল চামচ ইস্ট, এক টেবিল চামচ হেসিথিন, এক চা চামচ দানাদার ভিটামিন সি, ডিমের আস্ত একটি কুসুম। পরিমাণমতো জেলাটিন পাউডার। গন্ধ ও স্বাদ বর্ধক হিসেবে এক চা চামচ মধু মিশিয়ে নিতে পারেন।

মুখের যত্ন

কথায় বলে, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। তাই আমাদের জানা উচিত, কীভাবে নিজেকে সুন্দর রাখা যায়। মানুষ সুন্দর হয়ে জন্মালেও যত্নবান না হলে সৌন্দর্য বেশিদিন টেকে না। আমরা অনেকেই মনে করি, গায়ের রং ফর্সা হলেই বুঝি সে সুন্দর। আসলে তা নয়। রং আপনার যা-ই হোক না কেন, যদি তাতে গ্ল্যামার বা লাবণ্য থাকে, তাকেই আজকাল সুন্দর বলে। ঘোলাটে, নির্জীব, দাগযুক্ত ত্বক যেমন নিজের কাছে খারাপ লাগবে তেমনি অন্যের কাছেও খারাপ লাগবে। আলাহ আপনাকে যেমনই বানান না কেন, একটু চেষ্টা করলেই আপনি অনেকখানি আকর্ষণীয় হতে পারেন সবার কাছে। তার জন্যে শুধু দরকার ধৈর্য ও নিয়ম মাফিক পরিচর্যা।

মেয়েদের ২৪/২৫ বছর বয়স থেকেই বিশেষভাবে ত্বকের যত্ন,

খাওয়াদাওয়া, ব্যায়াম ইত্যাদির দিকে নজর দেয়া উচিত। তাহলে ৫০ বছর বয়সেও নিজের রূপ ও সৌন্দর্য ধরে রাখা সম্ভব। সঠিক পদ্ধতি জেনে নিয়ে ধৈর্য ধরে নিজের পরিচর্যা করতে হবে।

ত্বককে সুন্দর ও সতেজ রাখার জন্যে আপনাকে জানতে হবে আপনার মুখমণ্ডলের ত্বক কী ধরনের। যেমন–

১. স্বাভাবিক ত্বক
২. তৈলাক্ত ত্বক
৩. শুকনো ত্বক
৪. মিশ্র ত্বক

আপনার ত্বক কী ধরনের তা বোঝার জন্যে আপনি রাতে ভালোভাবে মুখ ধুয়ে মুছে ঘুমোবেন। মুখে কিছু লাগাবেন না। এবার সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আয়নার সামনে দাঁড়ালেই বুঝতে পারবেন। যদি দেখেন মুখটা ভীষণ তেলতেলে হয়ে আছে, তবে বুঝবেন আপনার মুখ তৈলাক্ত। একটি টিস্যু পেপার দিয়ে মুছে দেখবেন টিস্যু পেপারটি তেলতেলে হয়ে গেছে। আর যদি দেখেন মুখমণ্ডলে হালকা তৈলাক্ত ভাব, শুধু নাক ও কপাল একটু চকচক করছে, কিন্তু চোখের কোণ খানিকটা শুকনো মনে হয়, টিস্যু পেপার দিয়ে মুখ মুছলেও খুব একটা তেল ভাব হয় না, তবে বুঝবেন আপনার ত্বক স্বাভাবিক ধরনের। আর শুকনো ত্বক দেখেই বুঝবেন। এ ত্বকে তেলতেলে ভাব দূরের কথা সতেজ ভাবও দেখা যায় না। এ ত্বকে অল্পতেই বলিরেখা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা বেশি। এ ত্বক টিস্যু পেপার দিয়ে মুছলেও তেলতেলে ভাব মনে হবে না। আর মিশ্র ত্বকে মুখের বিভিন্ন অংশের ত্বকের প্রকৃতি বিভিন্ন রকম। নাক ও কপাল দেখা গেল তেলতেলে ভাব আবার গাল হতে পারে শুকনো। এ জাতীয় ত্বক হচ্ছে মিশ্র ত্বক। এ ত্বকের যত্নে শুকনো অংশের জন্যে শুকনো ত্বকের বিশেষ পরিচর্যা ও তৈলাক্ত অংশের জন্যে তৈলাক্ত ত্বকের উপযোগী বিশেষ পরিচর্যা গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের ত্বকের পরিচর্যা করা একটু ঝামেলার। তবে ধৈর্য ধরে করলে সুফল পাবেন। এবার জেনে নিন ত্বকের প্রকারভেদ অনুসারে কীভাবে ত্বকের পরিচর্যা করতে হবে।

স্বাভাবিক ত্বক

ক. এ ধরনের ত্বকে সাধারণত সমস্যা অনেক কম। তাই অনেকে মনে করেন, এ ধরনের ত্বকের আর যত্নের দরকার কী? এমনিতেই ভালো

আছে। কিন্তু একটা বয়সের পর ত্বক নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। তাই এ জাতীয় ত্বকের প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করা উচিত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মানেই যেমন ধোয়া-মোছা তেমনি ত্বকের পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রেও ধোয়া-মোছাই প্রথম। দিনে-রাতে মিলিয়ে কম করে পাঁচ বার মুখ স্বাভাবিক পানি দিয়ে ধোবেন। এতে ধুলোবালি লোমকূপের গোড়ায় আটকে থাকতে পারবে না। ত্বক সজীব মনে হবে। সাবান অথবা বেসন ব্যবহার করে মুখমণ্ডল পরিষ্কার করতে পারেন। তবে সাবান বেশি না দেয়াই ভালো। প্রাকৃতিক উপাদান, যেমনঃ বুটের বেসন দিয়ে মুখমণ্ডল পরিষ্কার করতে পারেন। সাবানে যাদের এলার্জি তারা অনায়াসেই বেসন ব্যবহার করতে পারেন।

খ. রাতে শোবার আগে কুসুম গরম পানি নিয়ে বেসন দিয়ে মুখ ধুয়ে নেবেন। পরে মুখ মুছে গ্লিসারিনের সাথে সমপরিমাণ পানি মিশিয়ে মুখে মেখে নিতে পারেন। এতে মুখের ত্বক নরম থাকবে এবং খসখসে হবে না। এছাড়া আপনি কোন স্কিন টনিক বা ফ্রেশনারও লাগাতে পারেন।

গ. সপ্তাহে অন্ততপক্ষে দুই/ তিন দিন ফেসপ্যাক লাগাবেন। ফেসপ্যাক লাগানোর ১৫/২০ মিনিট পরে মুখমণ্ডল ভালোভাবে স্বাভাবিক ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন। এতে মুখের উজ্জ্বলতা বাড়বে।

ঘ. বাইরে থেকে ঘরে ফিরে অবশ্যই মুখমণ্ডল ভালোভাবে ধোবেন, যাতে মেক-আপ লেগে না থাকে। বাইরের ধুলোবালি লোমকূপের গোড়ায় যেন আটকে না থাকে। তাহলে ব্রণ হওয়ার ভয় থাকে না।

ঙ. মাঝে মাঝে মুখে গরম পানির ভাপ নিতে পারেন। এতে লোমকূপের গোড়া খুলে গিয়ে তেল-ময়লা জমতে পারবে না এবং ব্রণ হওয়ার আশঙ্কা কমে যাবে।

প্রতি রাতে অবশ্যই খুব ভালোভাবে মুখ ধুয়ে পরিষ্কার করে ঘুমোবেন। অসুবিধা হলে নিয়মিত ক্রিম লাগাতে পারেন। যে ক্রিম আপনার ত্বকে স্যুট করবে সেটাই ব্যবহার করবেন।

স্বাভাবিক ত্বকের জন্যে কয়েকটি ফেসপ্যাক

এই ফেসপ্যাক থেকে যে-কোনো একটি সপ্তাহে দুই/ তিন দিন ব্যবহার করতে পারেন।

১. কমলালেবুর খোসা বাটা + অলিভ অয়েল + কাঁচা ডিমের কুসুম। এগুলো একত্রে মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে মুখমণ্ডলে লাগিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট রেখে স্বাভাবিক ঠান্ডা পানিতে মুখ ধুয়ে ফেলবেন।

২. কয়েকটি চীনাবাদাম ভিজিয়ে বেটে নিন + কয়েক ফোঁটা খাঁটি মধু একত্রে মিশিয়ে মুখে ২০ মিনিট রেখে প্রথমে হালকা গরম পানি ও পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

৩. কমলালেবুর খোসা বাটা + কয়েক ফোঁটা মধু একত্রে মিলিয়ে মুখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট রেখে প্রথমে হালকা গরম পানি ও পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৪. কাঁচা ডিমের কুসুম + এক চামচ বেসন ও দুধের সর একত্রে পেস্টের মতো করে মুখে ১৫/২০ মিনিট রেখে প্রথমে কুসুম গরম পানি, পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৫. কাঁচা ডিমের কুসুম + এক চামচ অলিভ অয়েল একত্রে মিশিয়ে মুখে ১৫ মিনিট রেখে স্বাভাবিক ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৬. কাঁচা ডিমের কুসুম + অলিভ অয়েল ও মধু একত্রে মিশিয়ে মুখে মেখে ১৫/২০ মিনিট রেখে ঠান্ডা পানিতে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

৭. ছোলার ডালের বেসন + মধু একত্রে মিশিয়ে মুখে ১৫/২০ মিনিট রেখে প্রথমে হালকা গরম পানি, পরে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে ফেলুন। এ পদ্ধতি মুখের রং উজ্জ্বল করে এবং ত্বক নরম রাখে।

৮. মসুরের ডাল বাটা বা ডালের বেসন + কাঁচা দুধ + কয়েক ফোঁটা লেবুর রস + কয়েক ফোঁটা মধু একত্রে পেস্টের মতো করে মুখে লাগিয়ে ২০ মিনিট রাখুন। তারপর ঠান্ডা পানিতে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

তৈলাক্ত ত্বক

তৈলাক্ত ত্বক দেখলেই সহজে বোঝা যায়। তৈলাক্ত ত্বককে ভালো ত্বক বলা হলেও এর সমস্যা সবচেয়ে বেশি। তবে এ ত্বক বেশি বয়স পর্যন্তও সজীব থাকে এবং বলিরেখা সহজে পড়ে না। গরমকালে এ ত্বক থেকে বেশি পরিমাণে তেল বের হয়। তাই অন্যান্য ত্বকের তুলনায় এ ত্বকের যত্ন বেশি নিতে হয় এবং পরিষ্কার রাখতে হয়। দিনে-রাতে মিলিয়ে ৮/১০ বার মুখ ধুয়ে এ ত্বক পরিষ্কার করলে ভালো। তা না হলে ব্রণ, ব্ল্যাক হেডস, একনি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে মুখে দাগ সৃষ্টি হয়ে বিশ্রী হয়ে যায়।

ক. এ জাতীয় ত্বক সাবান বা বেসন দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার রাখা উচিত।

খ. সবসময় হালকা গরম পানি দিয়ে ধোবেন এবং পরে নরম তোয়ালে বা গামছা দিয়ে মুখ ভালোভাবে মুছে নেবেন।

গ. মেক-আপ করার আগে কোনো অ্যাস্ট্রিনজেন্ট লোশন তুলোয় করে নিয়ে মুখে লাগাবেন। এর ফলে মুখ থেকে বেশি তেল বেরিয়ে মেক-আপ নষ্ট হবে না।

ঘ. মুখে ব্রণ হলে হাত দিয়ে খোঁটাখুঁটি করবেন না।

ঙ. বেশি তেল ঘি ভাজাপোড়া মশলা খাবেন না। ডাক্তারের পরামর্শে ভিটামিন-এ, ভিটামিন-ডি, ভিটামিন-সি মাঝে মধ্যে খেতে পারেন।

চ. প্রতিদিন দুই/ তিন লিটার পানি পান করবেন।

ছ. রাতে ঘুমানোর আগে হালকা গরম পানি, মসুর ডালের বেসন দিয়ে মুখ ভালোভাবে ধুয়ে শোবেন। শীতের দিনে গ্লিসারিন সমপরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে নিয়ে মুখে মেখে নিতে পারেন। গরমকালে কিছু দেয়ার দরকার হবে না।

জ. ক্রিমজাতীয় জিনিস তৈলাক্ত মুখে না দেয়াই ভালো। এতে ব্রণ হওয়ার আশঙ্কা খুব বেশি।

ঝ. বাইরে থেকে ঘরে ফিরে অবশ্যই মুখমণ্ডল খুব ভালো করে ধুয়ে নেবেন। তা না হলে বাইরের ধুলোবালি লোমকূপের গোড়ায় আটকে ব্রণ উঠতে পারে। প্রথমে হালকা গরম পানি দিয়ে, পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ ধোবেন।

ট. সবসময় নিজের তোয়ালে ও চিরুনি পরিষ্কার রাখবেন।

ঠ. সপ্তাহে দুদিন মুখে ফুটন্ত পানির ভাপ নিতে পারেন। ভাপ নেয়ার আগে মুখে কোনো নারিশিং ক্রিম ভালো করে মালিশ করে নেবেন। এতে ব্ল্যাক হেডগুলো (কালো মুখওয়ালা ব্রণ) নরম হয়ে উঠবে। তখন একটা স্টেরিলাইজড তুলো জড়ানো সরু কাঠি দিয়ে ব্ল্যাক হেডগুলোর চারপাশে চাপ দিলে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে। তবে সাবধানে করতে হবে। নতুবা খোঁচা লেগে দাগ হতে পারে। একদিনে না বেরোলে জোর করে বের করতে যাবেন না। পরের দিন আবার চেষ্টা করবেন।

ড. যদি ভাপ নিতে না চান তবে গরম পানিতে সামান্য বোরিক পাউডার

মিশিয়ে তুলো ভিজিয়ে সেঁক দিতে পারেন। তাতেও উপকার পাবেন। এতে ব্রণের মধ্যকার জিনিস বেরিয়ে যায়। তবে ব্রণে যেন কোনো আঘাত না লাগে সেদিকে খেয়াল করতে হবে। একদিনে না বেরোলে দু-তিন দিনে বের করবেন। একদিনে চেপে বের করতে গেলে ক্ষতি হতে পারে।

তৈলাক্ত ত্বকের কয়েকটি ফেসপ্যাক

১. মসুরের ডালের বেসন + খাঁটি সর্ষের তেল একত্রে মিশিয়ে পাতলা পেস্টের মতো করে মুখে লাগিয়ে তিন/ চার ঘণ্টা রেখে হালকা গরম পানি দিয়ে ঘষে ঘষে ধুয়ে ফেলুন। ঘষার সময় দেখবেন সাবানের ফেনার মতো হচ্ছে। এতে মুখের দাগ উঠে যায়, রং ফর্সা হয়। এই প্যাকে পানি লাগাবেন না। বেসনের সাথে তেল মেশান।

২. মসুরের ডাল বাটা + দুধের সর একত্রে ১৫/২০ মিনিট মুখে রেখে প্রথমে হালকা গরম পানি দিয়ে, পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৩. ডিমের সাদা অংশ + কয়েক ফোঁটা লেবুর রস একত্র করে ১৫ মিনিট রেখে স্বাভাবিক ঠান্ডা পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন।

৪. মসুরের ডালের বেসন + মধু একত্র করে ১৫/২০ মিনিট মুখে রেখে প্রথমে হালকা গরম পানি এবং পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৫. অলিভ অয়েল + কাঁচা ডিমের কুসুম + মসুরের ডাল বাটা একত্রে মুখে মেখে ১৫/২০ মিনিট রেখে ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

শুকনো ত্বক

শুকনো ত্বকের খুব বেশি যত্নের প্রয়োজন হয়। তা না হলে বয়স হলেই বলিরেখা পড়তে চায় এবং কুঁচকে যেতে চায়।

ক. শুকনো ত্বকে সবসময় তৈলাক্ত জিনিস ব্যবহার করা প্রয়োজন। বেশি সাবান ব্যবহার করা উচিত নয়। বেসন ব্যবহার করা উচিত। ছোলার ডালের বেসন এ ত্বকের জন্যে উপকারী। সাবান ব্যবহার করলে গ্লিসারিন সাবান ব্যবহার করা যেতে পারে।

খ. মুখ ধোয়ার পর সবসময় কোনো স্কিন টনিক বা ফ্রেশনার লাগাবেন। এতে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়বে।

গ. মেক-আপের আগে ভালোভাবে ময়েশ্চারাইজার লাগাবেন। এতে

মুখের ত্বক নরম ও ভেজা থাকবে।

ঘ. শুকনো ত্বকে কখনও অ্যাস্ট্রিনজেন্ট লোশন লাগাবেন না। এতে ত্বক আরও রুক্ষ হবে।

ঙ. গোসলের আগে প্রতিদিন, তা না পারলে সপ্তাহে দুদিন অলিভ অয়েল কিংবা সর্ষের তেল ১৫/২০ মিনিট ধরে ঘষে ঘষে লাগাবেন। আধঘণ্টা পরে ছোলার ডালের বেসন ও দুধের সর বা কাঁচা দুধ মেশানো পেস্টের মতো করে গায়ে ও মুখে মেখে গোসল করবেন।

চ. রাতে ঘুমানোর আগে এক চা চামচ কাঁচা দুধ নিয়ে তুলোয় ভিজিয়ে মুখে মেখে ১০ মিনিট রেখে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে ফেলবেন।

ছ. শসার রস ১০ মিনিট মুখে মেখে ধুয়ে ফেলবেন। এতে রং ফর্সা হয় ও উজ্জ্বলতা বাড়ে।

জ. বাইরে থেকে এসে মুখ ভালোভাবে ধুয়ে ফেলবেন।

ঝ. রাতে মুখ ধুয়ে সমপরিমাণ পানির সাথে গ্লিসারিন মিশিয়ে মুখে মাখতে পারেন। মুখ নরম থাকবে। খসখসে ভাব হবে না।

ঞ. প্রচুর পানি খাবেন। ভিটামিন-সি, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-ডিযুক্ত খাবার খাবেন। প্রতিদিন দুধ খাবেন।

ট. রাতে হালকা গরম পানি ব্যবহার করে ছোলার বেসন দিয়ে মুখ ধুয়ে কোনো ক্রিম বা গ্লিসারিন মেখে নেবেন। স্বাভাবিক ত্বকের ফেসপ্যাকগুলো শুকনো ত্বকেও ব্যবহার করা যায়।

মিশ্র ত্বক

ত্বকের যত্নে ত্বক পরিষ্কার রাখাটা সব ত্বকের বেলায় এক। তাই মিশ্র ত্বক হলেও দিনে-রাতে কমপক্ষে পাঁচ বার ধুতে হবে। মিশ্র ত্বকের যত্নও স্বাভাবিক ত্বকের মতো। মিশ্র ত্বক দেখলেই বোঝা যায়। যেমন : সাধারণত নাকের ডগা, চিবুক তেলতেলে হয়ে থাকে। এ ত্বকের শুকনো জায়গায় শুকনো ত্বকের পরিচর্যার দরকার হয়। তাই মুখ ধোয়ার পর তৈলাক্ত অংশে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট লোশন এবং শুকনো অংশে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হয়। এ ত্বকের বেলায়ও কিছু নিয়ম মানতে হয়, যেমন–

ক. মাঝে মাঝে ভাপ নিতে হয়।

খ. সপ্তাহে তিন/ চার দিন ফেসপ্যাক লাগাতে হয়।

গ. রাতে শোবার আগে ভালোভাবে মুখ ধুয়ে ক্রিম লাগাবেন। শুকনো অংশে তৈলাক্ত ক্রিম এবং তৈলাক্ত অংশে লোশন ক্রিম লাগাবেন।

ঘ. বাইরে থেকে এসে সবসময় মুখ ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করুন।

ঙ. বেশি করে পানি পান করবেন। খাবারে ভিটামিন-সি, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-ডি রাখবেন।

মিশ্র ত্বকের জন্যে কয়েকটি ফেসপ্যাক

১. ডিমের একটু সাদা অংশ + দুই চামচ কমলালেবুর রস + এক চা চামচ মধু মিশিয়ে মুখে মেখে ১৫ মিনিট রাখুন। এরপর ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন।

২. দুধের সর + বেসন বা ওটমিল + লেবুর রস মিলিয়ে মুখে ১৫ মিনিট রেখে প্রথমে হালকা গরম, পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৩. কাঁচা হলুদ + ময়দা + দুধের সর একত্রে মেখে ১৫ মিনিট রেখে প্রথমে হালকা গরম, পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৪. শসার রস ও কয়েক ফোঁটা লেবুর রস ১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।

মুখের পরিচর্যায় সবসময় মনে রাখবেন–

১. যে প্যাকটি আপনার ত্বকের সাথে সবচেয়ে মানিয়ে যাবে সেটি ব্যবহার করবেন।

২. প্রতিদিন সাত/ আট ঘণ্টা ঘুমোনো উচিত।

৩. তেল-মশলা, ভাজাপোড়া খাবার কম খাবেন।

৪. সবজি, কাঁচা ফলমূল ও সালাদ বেশি পরিমাণে খাবেন।

৫. পানি বেশি করে পান করবেন।

৬. ভিটামিন-সি, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-ডি এবং ভিটামিন-ই যুক্ত খাবার প্রতিদিনই খাবেন। এতে ত্বক ভালো থাকবে।

৭. সপ্তাহে অন্তত দুদিন প্যাক ব্যবহার করবেন।

৮. প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে কুসুম গরম পানি, প্রাকৃতিক উপাদান অথবা আপনার পছন্দের সাবান দিয়ে মুখ ভালো করে পরিষ্কার করে মুছে নিন। পরে ময়েশ্চারাইজিং লোশন দিয়ে পাঁচ মিনিট হালকাভাবে মুখ ম্যাসাজ করুন।

কম খরচে প্রাকৃতিক উপায়ে রূপচর্চা

আজকাল প্রসাধন সামগ্রীর দাম শুনলে আঁতকে উঠতে হয়। আর দামের কথা বাদ দিলেও রাসায়নিক প্রসাধনী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু আপনি তরিতরকারি ও দৈনন্দিন খাবারে ব্যবহৃত সামগ্রী দিয়েও সহজেই নিজেকে অপরূপ করে তুলতে পারেন। এতে ব্যয়ও যেমন কম, আর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে।

১. আটা

ক. রান্না ঘরের আটা আপনার ত্বক পরিচর্যায় অনেক সহায়ক হতে পারে। যে ধরনেরই ত্বক হোক না কেন, আটা সব ত্বকের জন্যেই ভালো কাজ করে। এক টেবিল চামচ পরিষ্কার আটা নিয়ে তার সাথে গরুর কাঁচা দুধ, একটু কাঁচা হলুদ বাটা মিশিয়ে মুখে মেখে ১০/১৫ মিনিট রেখে মুখ ধুয়ে ফেলবেন।

খ. আটা পানিতে ফুটিয়ে পেস্টের মতো করে মুখমণ্ডলে লাগালে মুখের ছিট ছিট তিলে দাগ অনেক হালকা হয়ে যায়।

গ. বেসনের মতো আটা হাতে নিয়ে পানি দিয়ে পেস্ট করে মুখে লাগিয়ে সাবানের মতো মুখ পরিষ্কার করা যায়।

ঘ. দুধের সরের সাথে আটা ও কাঁচা হলুদ মিশিয়ে মুখে মেখে ১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলবেন।

২. হলুদ

হলুদের গুণের কথা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। রূপচর্চায় হলুদের ভূমিকা অনেক। অতীতে নানী-দাদীরাও হলুদ ব্যবহার করতেন। নানান রোগের জন্যে কাঁচা হলুদের রসও খেতেন। ঘরোয়া চিকিৎসাতেও হলুদের অবদান অনেক। অনেক ফেসপ্যাক কাঁচা হলুদ দিয়ে তৈরি করা হয়। অনেকের গায়ের রং ফ্যাকাসে সাদা। তারা যদি একটু কাঁচা হলুদ বেটে তার সাথে অলিভ অয়েল মিশিয়ে গায়ে, হাতে এবং পায়ে মেখে প্রতিদিন গোসল করেন, তাহলে দেখবেন ফ্যাকাসে ভাব নেই। সুন্দর সোনা বর্ণের আভা চলে

আসছে দেহে। কাঁচা হলুদের সাথে দুধের সরও মিশিয়ে নিতে পারেন।

হলুদ লোমনাশক, নিয়মিত মাখলে শরীরের লোম বাড়ে না। এতে ওয়াক্সিং-এর কাজ হয় ভালো। আগেকার দিনে মা-দাদীরা কাঁচা হলুদ বাটার সাথে নিম পাতা বেটে বড়ি বানিয়ে রোদে শুকিয়ে রাখতেন। তারপর প্রতিদিন বাসি পেটে খেতেন। এতে পেটের দোষ হতো না, লিভার ভালো থাকত। এতে মুখে লিভার স্পট পড়ে না। অনেক মেয়েলি অসুখেও ফল পাওয়া যায়। কাঁচা হলুদ আখের গুড়ের সাথে খালি পেটে খেলে রক্ত পরিশোধিত হয় বলে স্বাস্থ্যরক্ষা ও রূপচর্চায় হলুদের অবদান অতুলনীয়।

৩. ডাব ও ঝুনো নারকেল

ক. ডাবের পানিতে ১৯টি খনিজ উপাদান রয়েছে। প্রতিদিন অন্ততপক্ষে দুটো ডাব খেলে ত্বকের কমনীয়তা বাড়ে।

খ. বসন্ত হলে কচি ডাবের পানি দিয়ে মুখ ধুলে দাগ চলে যায়।

গ. মুখে ব্রণের দাগ হলে ডাবের পানি দিয়ে ধুলে দাগ চলে যায়।

ঘ. একটু তুলো ডাবের পানিতে ভিজিয়ে মুখে লাগিয়ে শুকোতে দিন। তারপর হাত দিয়ে আস্তে আস্তে মুখ ঘষে দেবেন। এতে মুখে সুন্দর উজ্জ্বল একটা ভাব চলে আসবে। মুখের ত্বক কোমল ও মসৃণ হবে।

নানী-দাদীরা সেকালে নারকেল দিয়ে চুল ধুতেন। এতে চুলের উজ্জ্বলতা যেমন বাড়ত তেমনি চুলও পড়ত না। অনেক সময় ঝুনো নারকেল নষ্ট হয়ে যায়। এই নষ্ট নারকেল না ফেলে শিলে পিষে মাথায় ঘষে দিয়ে ঘণ্টা খানেক পরে মাথা ধুলে চুল শুকোনোর পর দেখবেন চুল তেল দেয়ার মতো হয়েছে। চুলের পরিচর্যায় নারকেল বেশ উপকারী।

ঙ. একটা নারকেলের অর্ধেক নিয়ে কুরিয়ে আধা কাপ অথবা এক কাপ গরম পানির সাথে ভালো করে চটকে দুধ বের করে নিয়ে পরিষ্কার দুধের সাথে একটা কাগজিলেবুর রস মিশিয়ে মাথায় বিলি কেটে চামড়ায় ভালোভাবে ম্যাসাজ করে ২০/৩০ মিনিট রেখে হালকা গরম পানিতে চুল ধুয়ে নিন। এ পদ্ধতি সপ্তাহে একদিন করলে চুল ওঠা বন্ধ হবে। তারপরেও চুল পড়লে ভিটামিন ও আয়রন খেতে হবে। ক্যালসিয়ামের অভাবেও চুল পড়ে। সেজন্যে ডাক্তারের পরামর্শে ক্যালসিয়াম খেতে পারেন।

৪. গোলাপ জল

গোলাপ জল চেনে না এমন লোক বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিয়েবাড়ি বলুন, মিলাদ মাহফিল বলুন, রূপচর্চা বলুন–গোলাপ জলের চাহিদা আছেই। রান্নাবান্নায় গোলাপ জল তো চাই-ই চাই। গোলাপ ফুলের নির্যাস থেকেই এ পানি বানানো হয়। পানি সুগন্ধি করতে গোলাপ জলের দরকার হয়। গ্লিসারিনের সাথে সমপরিমাণ গোলাপ জল মিশিয়ে ঠোঁটে মাখলে ঠোঁট ফাটে না এবং ঠোঁটের রং-ও সুন্দর হয়। গোলাপ জল দিয়ে স্কিন-ফ্রেশনার টনিক আপনি নিজেই বানাতে পারেন। আধা কাপ গোলাপ জল, একটা লেবুর রস, ক-ফোঁটা মধু একত্রে মিশিয়ে নিলে স্কিন-ফ্রেশনার টনিক হয়ে গেল। এ টনিক দিনে দুবার তুলোয় করে মুখে লাগাতে পারেন। যাদের মুখের চামড়া খসখসে তারা রাতে মুখ ভালোভাবে ধুয়ে সমপরিমাণ গোলাপ জলের সাথে গ্লিসারিন মুখে, হাতে এবং পায়ে মেখে নিতে পারেন। ভোরে কুসুম গরম পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলবেন। এতে মুখের খসখসে ভাব থাকবে না এবং ত্বক কোমল হবে।

৫. মধু

মধুর গুণের কথা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। মধু এবং দুধকে বলা হয় বেহেশতের নেয়ামত। মধু ত্বকের জন্যে খুবই উপকারী। বহু ফেসপ্যাক মধু দিয়ে তৈরি হয়। কয়েক ফোঁটা মধু ও কাঁচা দুধ একত্রে মুখে মাখলে মুখের রং উজ্জ্বল, কোমল ও মসৃণ হয়।

মধু ও বেসন একত্রে মিশিয়ে ফেসপ্যাক বানিয়ে মুখে মেখে ১৫/২০ মিনিট রেখে হালকা গরম পানি ও পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুলে মুখের ত্বক খুব সুন্দর ও মসৃণ হয়।

কয়েক ফোঁটা মধু + কয়েক ফোঁটা লেবুর রস + এক চা চামচ গাজরের রস + এক চা চামচ ছোলার ডালের বেসন একত্রে পেস্টের মতো করে মুখে মেখে ২০/৩০ মিনিট রেখে স্বাভাবিক পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এতে মুখ মসৃণ ও কোমল হয়ে উঠবে। এ প্যাকটি শুষ্ক ও স্বাভাবিক ত্বকের জন্যে উপকারী।

মধু খেলেও নানা রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। মধু কফনাশক। প্রতিদিন এক চামচ মধু খেলে ঠান্ডা লাগতে পারে না। আয়ুর্বেদী বহু চিকিৎসায় মধু ব্যবহৃত হয়। বাসক পাতার রসের সাথে কয়েক ফোঁটা মধু নিয়মিত খেলে ঘুম ভালো হয়।

৬. খাবার সোডা

খাবার সোডা রুটি, বিস্কুট, চটপটি ইত্যাদি বহুবিধ রান্নায় ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু রূপচর্চা বা কোনো কিছু পরিষ্কার করার কাজেও যে সেটি ব্যবহার হয় তা হয়তো অনেকেই জানেন না। রূপোর গয়না একটু খাবার সোডা দিয়ে ব্রাশ করে ধুলে দেখবেন ঝকঝকে হয়ে উঠছে। অনেকের মুখের দাঁত দেখতে হলদেটে ভাব। তারা যদি একটু খাবার সোডা দাঁত মাজার ব্রাশের ওপর নিয়ে মেজে নেন, তাহলে দেখবেন দাঁতগুলো মুক্তোর মতো ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। তবে, এ পদ্ধতিটি আপনি রোজ করতে যাবেন না। এতে মাড়ির ক্ষতি হবে।

৭. আলু

শুধু রান্নাবান্না, খাবারদাবারে যে আলুর ব্যবহার হয় তা নয়। রূপচর্চায় আলুর অবদান একেবারে কম নয়। অনেকে গায়ের রং ফর্সা করার জন্যে নানান জিনিস ব্যবহার করে থাকেন। তারা হয়তো অনেকেই জানেন না, আলু ব্যবহার করেও শরীরের রং উজ্জ্বল করা যায়। গোল আলু খোসাসহ গোল গোল করে কেটে নিয়ে কিছুক্ষণ ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে রেখে তারপর পানি থেকে তুলে হাতে পায়ে মুখে গলায় ঘষে ঘষে মেখে নিয়ে কিছুক্ষণ পর ধুয়ে ফেলুন। এভাবে নিয়মিত করলে দেখবেন গায়ের রং উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

৮. ডিম

সৌন্দর্যচর্চায় ডিম এক অতুলনীয় ভূমিকা পালন করে। ডিম দিয়ে মাথা ধোয়া, ডিমের তৈরি প্যাক বিভিন্নভাবে ত্বকের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ডিমের প্যাকে মুখের লাবণ্য ফিরে আসে। ডিমের কুসুমের প্যাক শুকনো ত্বকের পক্ষে খুবই ভালো। শুকনো ত্বকের জন্যে ডিমের কয়েকটি প্যাক :

ক. ডিমের হলুদ অংশ + আধা চা চামচ অলিভ অয়েল + কয়েক ফোঁটা লেবুর রস। এ প্যাকটি মুখ ধুয়ে, পরিষ্কার মুখে লাগিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট পরে প্রথমে কুসুম গরম পানিতে মুখ ধুয়ে ও পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিলে ত্বকের জন্যে খুবই ভালো ফল হবে।

খ. ডিমের কুসুম ও তার সাথে অ্যালমন্ড অয়েল অথবা অলিভ অয়েল আধা চা চামচ মিশিয়ে মুখে মেখে ১৫ মিনিট রেখে প্রথমে কুসুম গরম পানি, পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন। সাধারণত সপ্তাহে

দুই/ তিন দিনের বেশি লাগানোর দরকার নেই। এতে আপনার ত্বক সতেজ হয়ে উঠবে।

৯. ময়দা

প্রত্যেক বাড়িতেই রান্না ঘরে ময়দা পাওয়া যায়। আর এ ময়দা রূপচর্চার কাজে ব্যবহার করে আপনি হতে পারেন রূপবতী নারী। সাবানের পরিবর্তে ময়দা পানিতে গুলিয়ে হাতে, পায়ে ও মুখে মেখে গোসল করতে পারেন। আবার ময়দা + কাঁচাহলুদ বাটা + দুধের সর মিশিয়ে হাতে, পায়ে, মুখে আস্তে আস্তে মেখে প্রথমে কুসুম গরম পানিতে, পরে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে নিলে দেখবেন গায়ের রং কিছু দিনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

১০. পেঁয়াজ

রূপচর্চায় পেঁয়াজের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বহু রোগ সারাতেও পেঁয়াজের জুড়ি নেই। কাঁচা পেঁয়াজে ভিটামিন-বি ও ভিটামিন-সি রয়েছে। কাঁচা পেঁয়াজের রস ও আদার রস সমপরিমাণে নিয়ে সামান্য গরম করে এক বা দুই চা চামচ খেলে নতুন সর্দির উপশম হয়। যদি কারো নাক থেকে অনবরত পাতলা পানির মতো শেষ্মা পড়ে তাহলে কাঁচা পেঁয়াজ ও আদা সামান্য তেলে ভেজে নিয়ে খেলে শেষ্মা ঘন হয়। মাথার খুশকিতে কাঁচা পেঁয়াজের রস ওষধি হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া কাঁচা পেঁয়াজের সাথে সামান্য কয়েকটি সর্ষে বেটে মাথায় বিলি কেটে দিলে নতুন চুল গজায়।

১১. শসা

শসার গুণের কথা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। শসা যেমন রান্নাবান্নায়, খাওয়াদাওয়ায় ব্যবহৃত হয় তেমনি ব্যবহৃত হয় রূপচর্চায়।

ক. মুখে কোনো কালো দাগ পড়লে কচি শসার রস মুখে লাগিয়ে ১৫ মিনিট রেখে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে নেবেন। এভাবে কিছুদিন নিয়মিত লাগালে দাগ উঠে যায়।

খ. শসার রসের সাথে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মুখে মেখে শুকিয়ে গেলে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে নিলে মুখের রং উজ্জ্বল ও কোমল হয়। তবে নিয়মিত কিছুদিন করতে হবে।

গ. অনেক সময় দেখা যায় চোখের নিচে অনেকেরই কালো দাগ পড়ে। শসার রস নিয়মিত মাখলে এ দাগ দূর হবে।

ঘ. মনে রাখবেন যদি কেউ ফর্সা হতে চান তবে নিয়মিত শসার রসের সাথে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে মুখে, হাতে ও গায়ে নিয়মিত মাখলে গায়ের রং ফর্সা হয় অথবা শসা পাতলা পাতলা করে কেটে মুখে ঘসে নিতে পারেন। পরে শুকোলে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে নেবেন। তৈলাক্ত ত্বকের জন্যে শসা খুবই উপকারী। তবে কাঁচা ব্রণের ওপর লেবুর রস লাগালে দাগ হয়। তার জন্যে শুধু শসার রসই ভালো।

ঙ. মুখকে রোদ থেকে বাঁচাতে, মুখের দাগ তুলতে ও ময়লা থেকে যদি রেহাই পেতে চান তবে শসার সাহায্যে একটি ফেসপ্যাক বানিয়ে ২৫/৩০ মিনিট রেখে প্রথমে গরম পানি, পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়ে আপনি নিশ্চিন্তে বাইরে বেড়িয়ে আসতে পারেন। এতে ত্বক সারাদিনের জন্যে যেমন চকচকে, মসৃণ ও কোমল থাকবে তেমনি বাইরের নানান জীবাণু থেকে ত্বক রেহাই পাবে।

এবার জেনে নিন কীভাবে প্যাকটি তৈরি করবেন। একটি কচি শসা পাতলা করে কেটে থেঁতো করে তার সাথে একটি ডিমের কাঁচা কুসুম, এক টেবিল চামচ গুঁড়ো দুধ মিশিয়ে মিক্সার মেশিন অথবা ব্লেন্ডারে মিশিয়ে নিয়ে মুখে, গলায় ও হাতে মেখে নেবেন। ব্লেন্ডার না থাকলে হাতেই ভালো করে মিশিয়ে নেবেন।

১২. গাজর

রূপচর্চায় গাজরের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। গাজরে প্রচুর ভিটামিন-এ এবং ক্যারোটিন রয়েছে। প্রতিদিন একটি করে কাঁচা গাজর খেলে আপনার শরীরে ভিটামিন-এ-এর অভাব হবে না। এতে চোখ, ত্বক–উভয়ের জন্যেই উপকার। আমাদের দেশে শীতকালে প্রচুর গাজর পাওয়া যায় এবং দামও খুব কম থাকে। তাই সস্তায় আপনি প্রচুর ভিটামিন গ্রহণ করতে পারেন। গাজর খেলে দাঁতও চকচকে হয়। গায়ের রং ফর্সা হয়। পায়খানা পরিষ্কার হয়। চুল পড়ে না। চুলের উজ্জ্বলতা বাড়ে। মনে রাখবেন, ভিটামিন-এ ত্বকের সৌন্দর্যের জন্যে খুবই দরকার আর তা আপনি গাজর থেকে অল্পতেই পেতে পারেন। অর্থাৎ গাজর খেলে আপনার ত্বক চোখ দাঁত ঠোঁট চুল–সব কটি অঙ্গেরই উপকার হচ্ছে। আবার গাজর দিয়ে সুন্দর ফেসপ্যাকও তৈরি করে নিতে পারেন। এ প্যাক মিশ্র ত্বকের পক্ষে খুবই উপকারী। কীভাবে প্যাক তৈরি করবেন জেনে নিন :

এক টেবিল চামচ অথবা আপনার পরিমাণ মতো ছোলার ডালের বেসন + গাজরের রস + অলিভ অয়েল কয়েক ফোঁটা নিয়ে পেস্টের মতো বানিয়ে মুখে মেখে ১৫/২০ মিনিট রেখে প্রথমে হালকা গরম পানিতে, পরে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে ফেলবেন। গাজর দিয়ে আপনি আরও একটি ফেসপ্যাক তৈরি করে নিতে পারেন। এ প্যাক স্বাভাবিক ও শুষ্ক–উভয় ত্বকের জন্যেই উপকারী।

একটি (মিহি কোরানো) গাজর + দুই চা চামচ গরুর দুধ + এক চা চামচ বেসন মিশিয়ে মুখে মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। কাঁচা গাজর নিয়মিত খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে।

১৩. টমেটো

শীতকালে আমাদের দেশে প্রচুর টমেটো পাওয়া যায়। এসময় দামও কম থাকে। টমেটোতে প্রচুর ভিটামিন-সি থাকে। তাই কাঁচা টমেটো খাওয়া খুবই উপকারী। টমেটোতে ভিটামিন-বিও রয়েছে। ভিটামিন-বি, ভিটামিন-সি এগুলো ত্বকের জন্যে বেশ উপকারী। টমেটো খেয়ে এবং ফেসপ্যাক তৈরি করে আপনি রূপচর্চা করতে পারেন অনায়াসে।

ফেসপ্যাক তৈরির পদ্ধতি

মাঝারি ধরনের তিনটি টমেটোর রসের সঙ্গে দুই চা চামচ গ্লিসারিন, তিন চামচ লেবুর রস, চার চামচ অলিভ অয়েল নিয়ে ভালো করে মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে মুখে, গলায় ও হাতে ভালো করে মেখে নিয়ে ১৫/২০ মিনিট রেখে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন, মুখটি কেমন সুন্দর মনে হচ্ছে।

১৪. বাঁধাকপি

বাঁধাকপিতে রয়েছে ভিটামিন-বি, ভিটামিন-এ ও ভিটামিন-সি। এছাড়া বাঁধাকপিতে ভিটামিন-কে-ও রয়েছে। ভিটামিন-কে রক্ত জমাট বাঁধতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। দেহের হাড় গঠন ও পুষ্টিতে ভিটামিন-কে বিশেষ প্রয়োজন। বাঁধাকপিতে সালফার রয়েছে প্রচুর। সালফার আমাদের চুল ও দেহের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষা করে।

বাঁধাকপির সাহায্যে আমরা মুখের ত্বককে অনায়াসে কোমল করে তুলতে পারি। প্রথমে বাঁধাকপির পরিষ্কার দু-তিনটি পাতা নিয়ে রস বের করুন। এবার এর সঙ্গে এক চামচের চার ভাগের একভাগ ইস্ট মেশান এবং এর সাথে এক চামচ মধু মিশিয়ে ঘন পেস্টের মতো তৈরি করে নিয়ে সমস্ত মুখে

মেখে ১৫ মিনিট রেখে প্রথমে হালকা গরম পানি, পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এছাড়া বাঁধাকপির সাহায্যে সুন্দর স্কিন-ফ্রেশনার টনিক বানাতে পারেন নিজ হাতেই। প্রথমে বাঁধাকপির কয়েকটি টাটকা পাতা পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়ে কুচিয়ে এক কাপ পানিতে কুচানো কপি ফুটিয়ে ভালো করে সেদ্ধ করে সেই পানি ভালোভাবে ছাঁকনিতে ছেঁকে নিন। তৈরি হয়ে গেল আপনার স্কিন-ফ্রেশনার। মুখ ভালোভাবে বেসন অথবা সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে একটু তুলো ঐ পানিতে ভিজিয়ে সারা মুখে, হাতে ও পায়ে লাগিয়ে নিন এবং শুকোতে দিন। মুখ মুছে ফেলবেন না। এতে এর গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। পানি গরম অবস্থায় দেবেন না। ঠান্ডা করে দেবেন। যেদিন বানাবেন সেদিন ব্যবহার করবেন, বাসি করবেন না।

১৫. লেটুস পাতা

বাঁধাকপির মতো লেটুস পাতায়ও রয়েছে ভিটামিন-সি। এছাড়াও আছে ম্যাঙ্গানিজ। লেটুস হজমকারক। তাই লেটুস পাতা খাওয়া খুবই ভালো। আমরা সালাদে লেটুস ব্যবহার করে থাকি। লেটুস দিয়ে আবার স্কিন-ফ্রেশনার টনিকও তৈরি করা যায়। শীতকালে ঘরে বসেই আপনি স্কিন-ফ্রেশনার টনিক বানাতে পারেন। বাঁধাকপির মতোই লেটুস কুচিয়ে পানিতে ফুটিয়ে ভালোভাবে সেদ্ধ করে ছেঁকে নিয়ে ঠান্ডা হলে তুলোয় করে মুখে, হাতে ও পায়ে মেখে নিতে পারেন।

১৬. মটর দানা

মটরেও রয়েছে নানান ভিটামিন। মটর খেতে আমরা সবাই ভালবাসি। মটর দিয়েও সুন্দর ফেসপ্যাক তৈরি করা যায়। তৈলাক্ত ত্বকের জন্যে মটরের সাহায্যে আপনি সুন্দর ফেসপ্যাক বানাতে পারেন। মটর প্রসেস করে রেখে বহুদিন ব্যবহার করতে পারবেন।

প্রস্তুত প্রণালী : এক কাপ মটর নিয়ে গরুর দুধে সারারাত ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন দুধ থেকে তুলে নিয়ে শুকিয়ে নেবেন এবং এই শুকনো মটর গ্রাইন্ডারে গুঁড়ো করে অথবা শিলপাটায় গুঁড়ো করে রেখে দিতে পারেন। যখন প্রয়োজন হবে কিছুটা নিয়ে পানি মিশিয়ে পেস্টের মতো করে মুখে লাগাতে পারবেন। ১৫ মিনিটের মতো মুখে রেখে ধুয়ে ফেলবেন। এ প্যাকটি ব্রণের জন্যে খুবই উপকারী।

১৭. পুদিনাপাতা

পুদিনাপাতার চাটনি অত্যন্ত মজাদার। আর এই পুদিনাপাতা রূপচর্চারও অনবদ্য উপকরণ। তৈলাক্ত মুখে সারা সময়ই একটা/ দুটো ব্রণ লেগে থাকে। আর তা সারাতে পুদিনাপাতার জুড়ি নেই। শীতের সময় এর ফলন হয় বেশি এবং সারাবছরও বাজারে কমবেশি পাওয়া যায়।

এবার জেনে নিন রূপচর্চায় এর ব্যবহার–

প্রথমে পুদিনা গাছ থেকে শুধু পাতা নিন। ভালোভাবে ধুয়ে মিহি করে বেটে পেস্টের মতো বানিয়ে রাতে মুখে ভালোভাবে লাগিয়ে রেখে দিন। পরের দিন ভোরে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এভাবে মাস খানেক লাগানোর পর দেখবেন আপনার মুখে আর আগের ব্রণ নেই। দাগও নেই।

মনে রাখবেন, যে-কোনো রূপচর্চাই ধৈর্য ধরে বহুদিন না করলে আপনি তার সঠিক ফল ভোগ করতে পারবেন না।

ঘরের জিনিস দিয়েই অনেক কম খরচে সৌন্দর্যচর্চা করে আপনি হয়ে উঠতে পারেন সুকোমল ত্বকের অধিকারিণী। বিউটি পার্লারে গিয়ে পয়সা ও সময় নষ্ট করে আপনাকে এসব করতে হবে না। অনায়াসে নিজেই এগুলো তৈরি করে নিতে পারেন। আর প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি বলে এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। শুধু দেখে নিন কোনটি আপনার জন্যে বেশি প্রযোজ্য।

ভ্রুর যত্ন

দেহের গঠনের মতো ভ্রুরও প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন কারো ভ্রু মোটা এবং ঘন। আবার কারো ভ্রু সরু কিংবা চিকন। কারো ভ্রু চ্যাপটা ধরনের এবং মোটা। কারো ভ্রু পাতলা, কারো ভ্রু লম্বাটে আবার কারো ভ্রু খাটো ধরনের। তবে যে ধরনেরই হোক না কেন আজকাল আর এটা কোনো সমস্যা নয়। যাদের ভ্রুতে কেশের পরিমাণ কম তারা প্রতিদিন রাতে ভালো ক্যাস্টর অয়েল অরেঞ্জ স্টিক অথবা হাতের আঙুল দিয়ে ভ্রুতে লাগাতে পারেন। এভাবে তিন মাস লাগালে দেখবেন আপনার ভ্রু ঘন কালো হয়ে উঠছে।

আর যাদের ভ্রু মোটা তারা আজকাল বিউটি পার্লারে গিয়ে নিজের পছন্দ মতো ভ্রূর আকার তৈরি করে নিতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, আপনার

মুখের সাথে যে-রকম ভ্রু দেখতে সুন্দর স্বাভাবিক মনে হবে সে-রকম সাইজ করে নেবেন। কাউকে চিকন এবং সরু ভ্রুতে বেশি মানায় দেখে আপনিও তা-ই করতে যাবেন না। মনে রাখবেন, সবাইকে সবটাতে মানায় না। এছাড়া আপনি নিজেও শন দিয়ে ভ্রু তুলে সুন্দর সাইজ করে নিতে পারেন। তবে ভালোভাবে করতে পারলেই করবেন। তা না হলে বিউটি পার্লারে গিয়ে অভিজ্ঞ বিউটিশিয়ান দিয়ে করিয়ে নেয়াই ভালো।

একটি কথা মনে রাখবেন, ভ্রুর পুরো আকার বদলে না ফেলে ছোটখাটো কিছু ত্রুটি সংশোধনের মাধ্যমেই একে আরো সুন্দর করে তোলা যায়—যাতে আপনার ভ্রু দেখে স্বাভাবিক সুন্দর মনে হয়। সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে যত স্বাভাবিকতা বজায় রাখা যায় ততই ভালো। আপনার মেক-আপ, সাজপোশাক যত সুন্দর হোক, যদি ভ্রু মানানসই না হয়, তাহলে পুরো মুখমণ্ডলের সাজটাই লাগবে বিশ্রী।

ভ্রু সাজানোর জন্যে প্রয়োজন শুধু একটি আই-ব্রো পেন্সিল। পেন্সিলের রং হোক কালো কিংবা বাদামি—কোনো অসুবিধে নেই।

প্রথমে ভ্রু ব্রাশ করে নিন। তারপর পেন্সিলের সাহায্যে হালকাভাবে পুরোটা এঁকে ফেলুন। খেয়াল রাখবেন যেন গাঢ় করে এঁকে না ফেলেন। এমনভাবে আঁকুন দেখতে যেন স্বাভাবিক মনে হয়, একটু উজ্জ্বলও লাগে। আঁকার পরে আবার ব্রাশ করে নেবেন।

চোখের যত্ন

চোখ আমাদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। চোখে দৃষ্টিশক্তি না থাকলে পৃথিবী অন্ধকার। কালো হরিণ চোখ নিয়ে কজনই বা জন্মায়। তাই বলে যারা হরিণ-নয়না নন তাদেরও হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আপনি যদি চোখ দুটোকে সত্যিই সুন্দর করে তুলতে চান তাহলে নিয়মিত চোখের ব্যায়াম করবেন। আর চোখে মেক-আপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম অনুসরণ করলে চোখের সমস্যা থেকে অনেকটাই মুক্ত থাকতে পারবেন।

চোখে মেক-আপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম

১. চোখের মেক-আপ ব্যবহারের সময় তাড়াহুড়ো করবেন না।

২. চোখের পাতার ওপর যেখানে আই-শ্যাডো ব্যবহার করা হয় সেখানে মানানসই আই-শ্যাডো ব্যবহার করুন। পোশাকের সাথে রং মিলিয়ে করতে পারলে সবচেয়ে সুন্দর লাগবে। আর যদি তা না হয় তাহলে এমন শ্যাডো ব্যবহার করুন যেন স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। হালকা ব্রোঞ্জ কিংবা হালকা গোল্ডেন ব্রোঞ্জ রঙের শেড সাধারণভাবে ভালো লাগে।

৩. দিনের বেলায় উজ্জ্বল গাঢ় রং ব্যবহার করবেন না।

৪. রাতের বেলায় উজ্জ্বল গাঢ় রং ব্যবহার করতে পারেন।

৫. আপনার চোখ যদি ছোট হয় তাহলে চোখের বাইরের দিকে পেন্সিল দিয়ে প্রায় নিচে এঁকে নিলে আপনার চোখ একটু বড় দেখাবে। চোখের পাপড়ি বড় দেখানোর জন্যে মাসকারা ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে মাসকারা ব্যবহার করারও নিয়ম রয়েছে। যেমন, মাসকারার ব্রাশটি নিচ থেকে টেনে ওপরের দিকে উল্টিয়ে লাগাবেন ওপরের পাপড়িতে। নিচের পাপড়িতে খুব যত্ন করে লাগাতে হবে, যাতে চোখের নিচের ত্বকে লেগে না যায়। মাসকারার ব্রাশ এ-ক্ষেত্রে টানবেন নিচের পাপড়ির ওপর বসিয়ে নিচের দিকে। প্রথম একবার লাগানোর পর শুকোতে দিন। তারপর দ্বিতীয়বার লাগালে এতে চোখের পাপড়ি ঘন ও বড় দেখাবে।

   যাদের চোখ বড় তাদের বেলায় তেমন সমস্যা নেই। যেভাবেই পেন্সিল দিয়ে আঁকুন, খারাপ লাগবে না। তবে তারা যদি আই-শ্যাডো লাগানোর পর পেন্সিল দিয়ে শুধু ওপর থেকে এক চোখের কোণের দিকটা একটু ঘন কালো করে নিচের অংশে সামান্য হালকা চিকন করে আঁকেন, তাহলে ভালো লাগবে। তারপর মাসকারা লাগিয়ে দিন, দেখতে অপরূপ লাগবে।

চোখের বিশেষ যত্ন নেয়ার পদ্ধতি

১. চোখের ব্যায়াম করতে হবে। মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে চোখের বিশ্রাম দিতে হবে।

২. অনেকের চোখের কোণের দিকটায় কাকের পায়ের মতো চিরিক ফাটা রেখা দেখা যায়—একে বলে বলিরেখা। এ বলিরেখা আপনি প্রাকৃতিক উপায়ে দূর করতে পারেন। কাঁচা গোল আলু থেঁতো করে

বলিরেখাগুলোর ওপর দিয়ে ১৫/২০ মিনিট চোখ বন্ধ করে রাখুন। এরপর ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। মনে রাখবেন ভ্রু কুঁচকে চোখ কুঁচকাতে থাকবেন না। তাহলে অল্প বয়সে বলিরেখা পড়তে পারে। সবসময় স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকাবেন।

৩. অনেকের চোখের তলায় কালো দাগ পড়ে থাকে। সে-ক্ষেত্রে বেশি রাত জাগবেন না। প্রচুর পরিমাণে পানি খাবেন। রোজ পাঁচ/ সাত মিনিট কচি শসার রস লাগিয়ে রাখুন। তারপর ধুয়ে ফেলুন।

৪. চোখ ক্লান্ত লাগলে চোখ বন্ধ করে কাঁচা শসার দুটো চাক দুচোখের ওপর রেখে শুয়ে থাকুন ১০ মিনিট। পা দুটো বালিশের ওপর রাখুন। কিছুক্ষণ পর দেখবেন দুচোখে ঠান্ডা-সতেজ অনুভব হচ্ছে।

৫. সূর্যের আলোতে অনেকেরই চোখ জ্বালা করে, চোখে পানি আসে, চোখ কুঁচকে তাকাতে হয়, এটা চোখের জন্যে ক্ষতিকর। চোখ কুঁচকে তাকানোর ফলে বলিরেখা পড়তে পারে। তাই দিনের বেলা সূর্যের আলো থেকে চোখকে বাঁচাতে সানগ্লাস ব্যবহার করবেন।

৬. চোখে মেক-আপ নিয়ে থাকলে তা অবশ্যই কোনো ক্রিম বা অলিভ অয়েল তুলোয় ভিজিয়ে তুলে নিয়ে ভালোভাবে চোখ ধুয়ে নেবেন।

৭. রাতে কখনোই চোখে মেক-আপ নিয়ে শোবেন না।

৮. দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখার জন্যে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাবার খাবেন।

কানের যত্ন

সৌন্দর্যচর্চায় কানের যত্ন নিতে ভুলবেন না। নিয়মিত কানের ভেতর ও বাইরের দিকটা পরিষ্কার করবেন। গোসলের সময় প্রতিদিনই কানের বাইরের দিকটা নরম তোয়ালেতে সাবান লাগিয়ে অথবা বেসন গুলিয়ে কিংবা আটা গুলিয়ে লাগিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন। গোসল শেষে কানের ভেতরের পানি অরেঞ্জ স্টিক দিয়ে সতর্কতার সাথে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুছে নিন। খেয়াল রাখুন, কানের ভাঁজের মধ্যে যেন ময়লা বাসা বেঁধে না থাকে।

বি.দ্র. : *কানের অভ্যন্তর পরিষ্কারের প্রয়োজন হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। নিজে নিজে খোঁচাখুঁচি করবেন না।*

ঠোঁটের যত্ন

ঠোঁট সবসময়ই হওয়া উচিত কোমল, মসৃণ এবং স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আর্দ্র। ঠোঁট শুকিয়ে গেলে ফেটে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ঠোঁটের চামড়ায় দাগ পড়ে। এ অবস্থায় লিপস্টিক লাগালে ভালো দেখায় না। ঠোঁটের জন্যে প্রয়োজন তাই পরিচর্যার। অতিরিক্ত গরম কিংবা ঠান্ডা আবহাওয়া ঠোঁটের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তখন ঠোঁট শুকিয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে শীতকালে ঠোঁটের প্রতি বাড়তি নজর রাখতে হবে। শীত শুরু হওয়ার আগেই ঠোঁটের যত্ন নিন। তাহলে ঠোঁটের চামড়া-ওঠা, ঠোঁট-ফাটা ইত্যাদি থেকে রেহাই পাবেন। ঠোঁটও থাকবে কোমল, মসৃণ।

যত্ন নেয়ার প্রক্রিয়া

১. প্রতিদিন কুসুম গরম পানি দিয়ে ঠোঁট পরিষ্কার করে তাতে কোনো ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম অথবা চ্যাপস্টিক লাগিয়ে রাখুন। এছাড়া রাতে ঘুমোনোর আগে গোলাপ জলে মেশানো গ্লিসারিন পানি ঠোঁটে লাগিয়ে শুতে পারেন অথবা ভালো পেট্রোলিয়াম জেলির প্রলেপ লাগিয়ে নিতে পারেন।

২. গ্লিসারিন পানি তৈরির নিয়ম : সমপরিমাণ গ্লিসারিন ও গোলাপ জল অথবা খাবার পানি মিশিয়ে নিলেই হলো। তবে একবারে বেশি পরিমাণে বানাবেন না। নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই অল্প অল্প করে বানিয়ে ব্যবহার করবেন।

ঠোঁটের ক্ষেত্রে বর্জনীয়

অনেককেই দেখা যায় জিভ দিয়ে ঠোঁট বার বার ভিজিয়ে রাখতে চান, এটি একটি বদভ্যাস। কারো সামনে এরকম করলে দৃষ্টিকটু লাগে। এছাড়া ঠোঁটের ওপর অতিরিক্ত জিভ বোলালে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন–

ক. ঠোঁট শুকিয়ে যেতে পারে

খ. ঠোঁটে জ্বালা-যন্ত্রণা সৃষ্টি হতে পারে

এছাড়া অতিরিক্ত ঠান্ডা থেকেও এক ধরনের যন্ত্রণার সৃষ্টি হতে পারে। ঠোঁটে ফুসকুড়ির মতো উঠতে পারে। তারপর এগুলো শক্ত হয়ে যায়। দেখে

মনে হবে ঠোঁটের ঐ অংশে সর পড়েছে। প্রায় ১০/১৫ দিন থাকার পর তা ঝরে যায়। এটি সাধারণত শীতের শেষ দিকে এবং বসন্তের প্রথম দিকে দেখা যায়। এ অবস্থায় সার্জিক্যাল পরিচর্যা করা যায়। এছাড়া এর প্রতিষেধক হিসেবে বাজারে বিভিন্ন ধরনের এন্টি-ভাইরাল ক্রিম পাওয়া যায়। এগুলো ডাক্তারের পরামর্শে ব্যবহার করতে পারেন।

৩০ বছর পার হওয়ার পরই ঠোঁটে কতগুলো উপসর্গ দেখা দিতে পারে :

১. ঠোঁটের চারপাশে সূক্ষ্ম রেখা বিস্তার লাভ করতে আরম্ভ করে। এছাড়া ঠোঁট ঘন ঘন সংকুচিত করলেও এরকম হতে পারে। যে-সব ছেলেমেয়ে ধূমপান করে, তাদের ক্ষেত্রে এ রেখাগুলো বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তাই সুন্দর ঠোঁটের প্রত্যাশা করলে এসব অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে।

২. সকালে ও রাতে ঠোঁটের যত্নে ঠোঁটে ক্রিম ব্যবহার করুন। রাতে গ্লিসারিন মেখে রাখতে পারেন। তবে গ্লিসারিনের সাথে সম পরিমাণ পানি মিশিয়ে নিতে হবে।

ঠোঁটের মেক-আপ

ঠোঁটের ক্ষেত্রে যে মেক-আপটি ব্যবহৃত হয়, আমরা সবাই জানি তার নাম লিপস্টিক। আর এই লিপস্টিক ব্যবহারেরও কিছু নিয়ম আছে। যেমন :

মুখমণ্ডলের সমস্ত মেক-আপ শেষে লিপস্টিক লাগান। যাদের শুষ্ক ত্বক তারা এমন লিপস্টিক ব্যবহার করুন যাতে তেলতেলে ভাব আছে। আর যাদের ত্বক তৈলাক্ত তারা বেছে নিন বেশি তেলতেলে নয় এমন লিপস্টিক। লিপস্টিক সাধারণত দু-ধরনের দেখতে পাওয়া যায়। পার্লি ও নন-পার্লি। আজকাল পার্লি পেন্সিলও পাওয়া যায়। পার্লি লিপস্টিকে বাড়তি লিপগ্লস ব্যবহার না করলেও চলে।

ঠোঁটে মেক-আপের পদ্ধতি

ঠোঁট যেমন সরু, মোটা, চ্যাপটা–বিভিন্ন ধরনের তেমনি লিপস্টিক লাগানোর কায়দাও বিভিন্ন।

১. লিপস্টিক লাগানোর সময় প্রথমে ঠোঁটে একটু পাউডার লাগিয়ে নিলে ভালো হয়। তারপর লিপ পেন্সিল দিয়ে হালকা করে আউট লাইন এঁকে নিন। তারপর ঠোঁটের মধ্যভাগ লিপ ব্রাশের সাহায্যে

লিপস্টিক লাগিয়ে ভরে দিতে পারেন অথবা সরাসরি লিপস্টিক দিয়েও ভরে নিতে পারেন। এরপর একটা টিস্যু পেপার দিয়ে চেপে অতিরিক্ত লিপস্টিক রং তুলে ফেলুন।

২. গ্রীষ্মে দিনের বেলায় কটকটে রঙের লিপস্টিক লাগানো উচিত নয়। তবে রাতে ব্যবহার করতে পারেন–পার্টি বা যে-কোনো অনুষ্ঠানে।

৩. শীতের সময় অবশ্য দিনে কিংবা রাতে–দুসময়ই গাঢ় রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করতে পারেন।

৪. সাধারণত পোশাকের রঙের সাথে ম্যাচ করে লিপস্টিক লাগালে বেশ স্মার্ট লাগে। তবে মেরুন লিপস্টিক সব পোশাকেই মানায়।

৫. বেশি সরু ঠোঁটে একটু ভারি করে লিপস্টিক লাগান। অপরপক্ষে বেশি মোটা ঠোঁটে চিকন আউটলাইন করে লিপস্টিক লাগান।

৬. চ্যাপটা ঠোঁটে বেশি ছড়িয়ে লিপস্টিক লাগাবেন না। একটু ওভাল শেপ করে লিপস্টিক লাগান, তাতে চ্যাপটা ভাব কম দেখাবে।

লিপগ্লস

এটি লিপস্টিক ব্যবহার করার পর ঠোঁটের ওপর লাগানো যেতে পারে। এতে ঠোঁট একটু ভেজা ভেজা, উজ্জ্বল, চকচকে দেখায়। লিপগ্লস সাধারণত লিপস্টিকের রঙের সাথে মিলিয়ে লাগাতে হয়। লিপগ্লস বিভিন্ন রং–এমনকি স্বচ্ছ রঙেরও হয়। স্বচ্ছ রঙের লিপগ্লস যে-কোনো রঙের লিপস্টিকের ওপর লাগাতে পারবেন।

দাঁতের যত্ন

কথায় বলে, ‘দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না’। এটা শুধু কথার কথা নয়। আসলে আমরা কজনই বা সঠিকভাবে দাঁতের যত্ন নিয়ে থাকি! সুস্থ দাঁত ও মাড়ির জন্যে প্রয়োজন সঠিক পরিচর্যা। আপনি যতই সুন্দরী হোন না কেন দাঁত সুন্দর না হলে আপনাকে হাসলে দেখাবে বিশ্রী, মুখ থেকে গন্ধ বেরোলে অনুষ্ঠানে পাবেন লজ্জা। তাই সুস্থ-সুন্দর দাঁত ও মাড়ির যত্ন কীভাবে নেবেন তা জেনে নিন :

আমাদের নিজেদের অবহেলার কারণেই আমাদের দাঁত ও মাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দাঁত আমাদের মহা মূল্যবান সম্পদ। তাই এর প্রতি যত্নবান হতে হবে ছোটবেলা থেকেই। আমাদের দাঁতের ক্ষয়ের পেছনে মিষ্টিজাতীয় খাবার এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। চিনি থেকে জীবাণু উৎপন্ন হয় বহুগুণে। এ জীবাণু বিস্তার লাভ করে এবং এক ধরনের এসিড সৃষ্টি হয়। আর এ এসিড দাঁতের এনামেলে আক্রমণ চালায়। এক সময় দাঁতের এনামেলের প্রলেপ ছিদ্র করে এসিড দাঁতের ভেতরে ঢুকে পড়ে। তখন আমাদের দাঁতে ব্যথা হয়। দাঁত হয় ক্ষতিগ্রস্ত। তাই সুস্থ-সুন্দর দাঁতের জন্যে জেনে নিন কিছু নিয়ম :

১. সুস্থ দাঁতের জন্যে প্রয়োজন সঠিক পদ্ধতিতে দাঁত ব্রাশ করা।
২. প্রতিদিন অন্তত দুবার দাঁত মাজা উচিত। রাতে খাবার পর ও দুপুরে খাবার পর। সকালে নাশতার পর ভালো করে কুলকুচা করে নিন।
৩. প্রতিবার যা কিছু খান না কেন সাথে সাথে মুখে পানি নিয়ে কুলকুচা করুন, যাতে মুখের ভেতরে কোনো খাদ্যকণা থাকতে না পারে।
৪. ফ্লুরাইড দাঁতের ক্ষয় রোধ করে। দাঁতের এনামেলের সঙ্গে মিশে ফ্লুরাইড এনামেলকে শক্তিশালী করে তোলে।
৫. আপনার টুথব্রাশের টাফট হবে নাইলনের, ব্রিসল হবে মিডিয়াম। যখনই দেখবেন ব্রাশের টাফটগুলো আর সোজা অবস্থায় নেই তখন সেটা আর ব্যবহার করবেন না।
৬. প্রতি দাঁতের সবগুলো দিক ব্রাশ করবেন। ব্রাশ চালাবেন ওপর-নিচ, নিচ-ওপর–এভাবে।
৭. বছরে দুবার আপনার ডেন্টিস্টের কাছে পরামর্শ নেবেন।
৮. মাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় দাঁতের ওপর পাকের কারণে। এই পাক হলো দাঁতের ওপর পাতলা পাতের মতো ময়লা আস্তর। দাঁতে পাক দেখা দিলে অতিসত্বর পাক পরিষ্কার করে নেবেন।
৯. পাকের ভেতর জীবাণু থাকে। জীবাণু থেকে বিষ তৈরি হয় এবং সে বিষ দাঁতের পাশ দিয়ে মাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে। সে-ক্ষেত্রে মাড়ি জ্বালাপোড়া করতে পারে। লাল হয়ে যেতে পারে। এমনকি মাড়ি থেকে রক্তও পড়তে পারে।
১০. যদি আপনার দাঁত উঁচুনিচু বা অসমান হয় তাহলে ডেন্টাল সার্জনের

পরামর্শে ঠিক করিয়ে নিতে পারেন।

১১. মুখে গন্ধ হলে ভালো কোনো মাউথ ওয়াশ পানিতে মিশিয়ে অথবা গরম পানিতে লবণ মিশিয়ে মুখ ধোবেন।

১২. দাঁত যদি ঝকঝকে করতে চান, তাহলে একটু খাওয়ার সোডা ব্রাশে নিয়ে দাঁত মাজলে দাঁত ঝকঝকে সাদা হয়ে উঠবে। তবে এটি সবসময় করবেন না। এতে দাঁতের এনামেলের ক্ষতি হতে পারে।

১৩. নিয়মিত ভিটামিন-সি ও ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার খাবেন।

ঘাড় ও গলার যত্ন

মুখের যত্ন পরিচর্যা যতই করুন না কেন ঘাড় ও গলার সৌন্দর্য না থাকলে আপনার সৌন্দর্যের আকর্ষণীয় দিকটা ঢেকে যাবে অনেকখানি। কথায় বলে 'মরাল গ্রীবা' অর্থাৎ রাজহাঁসের মতো মসৃণ গলা অর্থাৎ লম্বাটে গলা সুন্দরী নারীর আকর্ষণীয় দিক। আপনার যদি মরাল গ্রীবা না-ও থাকে, তবুও একটু সতর্কভাবে পরিচর্যার মাধ্যমে সুন্দর করে তুলতে পারেন আপনার গ্রীবা।

আমাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে ত্বক শুষ্ক হয়ে ওঠে। শরীরের অন্যান্য এলাকার তুলনায় গলার ভাঁজ বা শুষ্ক ত্বক বেশি চোখে পড়ে। গলার ত্বকের দিকে তাকিয়ে বয়স সহজেই অনুমান করা যায়। তাই গলার বাড়তি যত্ন নেয়া প্রয়োজন। বয়স বাড়ার সাথে গলার মাংসপেশিগুলো ক্রমান্বয়ে ঝুলে পড়ে। তাই ঘাড় ও গলার নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত। যারা নিয়মিত ব্যায়াম করেন না তারাও অন্ততপক্ষে নিচের নিয়মে ব্যায়ামটি করুন ও কিছু নির্দেশনা পালন করুন। দেখবেন বহু বছর পর্যন্ত আপনার ঘাড় ও গলা সুন্দর থাকবে।

ঘাড়ের ব্যায়াম ও কিছু নির্দেশনা

১. কাঁধ না নাড়িয়ে প্রথমে আপনার মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন। তারপর আস্তে আস্তে ডান দিকে কয়েক সেকেন্ড রাখুন। তারপর পেছনে, এরপর বাঁ দিকে, পুনরায় সামনে–এভাবে ছয়/ সাত বার ব্যায়ামটি করুন। এ ব্যায়াম মাটিতে বসে মেরুদণ্ড সোজা রেখে বজ্রাসনে বসে অথবা এমনি বসেও করতে পারেন। অথবা দাঁড়িয়ে

দুপায়ের মাঝে সামান্য ফাঁক রেখে কাঁধ স্থির রেখেও করতে পারেন। এভাবে বৃত্তাকারে ডানে-বামে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রতিদিন একবার করে ঘাড়ের এ ব্যায়ামটি করুন।

২. যখন দাঁড়ানো অবস্থায় থাকবেন–সবসময় মেরুদণ্ড সোজা টানটান করে দাঁড়াবেন। যদি কুঁজো হয়ে বা এঁকেবেঁকে দাঁড়ান বা আপনার চিবুক যদি ঝুলে থাকে তবে আপনাকে অনাকর্ষণীয় ও বেঁটে দেখাবে। এতে গলায় ভাঁজ বা বলিরেখা পড়ার সম্ভাবনা বেশি।

৩. সবসময় ঘাড় সোজা রেখে চলাফেরা করুন। ঘাড় নুইয়ে বসা, হাঁটাচলার অভ্যাস ত্যাগ করুন। তা না হলে অল্প বয়সেই গলায় বলিরেখা দেখা দেবে।

৪. ঘাড়, গলা পরিষ্কার করার সময় কখনো ঘষাঘষি করবেন না। বেশি ঘষাঘষিতে ত্বক কুঁচকে যেতে পারে। বরং ক্লিনজিং মিল্ক ব্যবহার করতে পারেন।

৫. রাতে শোবার আগে হালকাভাবে বডি লোশন কিংবা অলিভ অয়েল নিয়ে আস্তে আস্তে নিচ থেকে ওপরে টেনে টেনে ম্যাসাজ করুন।

হাতের যত্ন

আমাদের দেশের মেয়েরা সাধারণত মুখের যত্ন নিতেই ব্যস্ত থাকেন। হাত-পায়ের যত্নের ব্যাপারে তারা বেশ উদাসীন। কিন্তু হাত আমাদের যেমন প্রয়োজনীয় অঙ্গ তেমনি কোমল হাত ও কনকচাঁপার কলির মতো আঙুল সৌন্দর্যে যোগ করে নতুন মাত্রা। জন্মগতভাবে সুন্দর হাতের অধিকারিণীর সংখ্যা খুবই কম। তবে যত্নের মাধ্যমে যে-কেউ সুন্দর হাতের অধিকারিণী হতে পারেন। হাতের যত্নের জন্যে সামান্য কিছু নিয়ম পালন করতে হবে। তাহলে অনেক বয়স পর্যন্ত হাতের সৌন্দর্য ধরে রাখতে পারবেন।

মেয়েদের প্রধানত রান্নাবান্না ও গৃহস্থালি কাজ বেশি করতে হয়। হাতই সেখানে ব্যবহৃত হয় বেশি। তরকারি ও তেল-মশলার দাগ প্রায় সময়ই হাতে লাগে। একটু লেবুর রস কিংবা তেঁতুলপানি দিয়ে হাতটা অনায়াসে পরিষ্কার করে নিতে পারেন।

কেবল হাতের পাতা বা নখের যত্ন নিলেই হবে না, বাহুর যত্নও নিতে হবে। বাহু হতে নখ পর্যন্ত পুরোপুরি যত্ন নিলেই হবে হাতের যত্ন নেয়া।

গোসলের সময় বেসন গুলিয়ে বাহুসহ সম্পূর্ণ হাতে ঘষে গোসল করতে পারেন। অনেকের কনুইয়ে কালো ছাপ পড়ে। সে-ক্ষেত্রে প্রতিদিন এক টুকরো লেবু নিয়ে ঘষে নিলে দাগ উঠে যাবে। কুসুম গরম পানিতে হাত পরিষ্কার করা ভালো। গোসল শেষে কোনো হ্যান্ড লোশন কিংবা একটু গ্লিসারিন সমপরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে হাতে মেখে নিতে পারেন। তবে গ্লিসারিন মেখে রোদ লাগাবেন না। এতে চামড়া পুড়ে কালো হয়ে যাবে। গোসলের আগে অলিভ অয়েল হাতে ভালোভাবে মালিশ করে নিতে পারেন। এতে হাত ভালো থাকবে। অনেকের হাতে আবার অসংখ্য লোম, যা অনেকে পছন্দ করেন না। ইচ্ছে করলে আপনি ওয়াক্সিং করে অনায়াসে সে হাত লোমমুক্ত করে নিতে পারেন। অনেকের হাত দেহের তুলনায় মোটা। তারা সহজ কোয়ান্টাম ব্যায়ামের মাধ্যমে হাত সুন্দর করে তুলতে পারেন।

এবার আসা যাক হাতের আঙুল ও নখের যত্ন প্রসঙ্গে। হাতের আঙুলের নখের যত্নকে বলা হয় ম্যানিকিওর। এই ম্যানিকিওর সপ্তাহে একদিন, না পারলে ১৫ দিনে একদিন করলে ভালো হয়। এতে হাতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে, পুরানো মরা চামড়া ও ময়লা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হবে।

ম্যানিকিওর করার জন্যে কিছু জিনিস দরকার হয়। যেমন :

১. নেইল পলিশ তোলার জন্যে রিমুভার
২. এক বাটি হালকা গরম পানি ও সাবান
৩. একটি ছোট তোয়ালে
৪. নখ পরিষ্কার করার ব্রাশ
৫. কিউটিকল ছুরি
৬. হাতে ব্যবহারের ক্রিম বা অলিভ অয়েল
৭. গ্লিসারিন বা গোলাপ পানি
৮. নরম কাঠের কাঠি বা অরেঞ্জ স্টিক
৯. এমারি বোর্ড বা শিরিশ বোর্ড

পরিচর্যার পদ্ধতি

প্রথমে–নখে যদি নেইল পলিশ লাগানো থাকে তবে তা রিমুভার দিয়ে

তুলে ফেলুন। ভালো করে নিজের ইচ্ছেমতো শেপ দিয়ে নখ কাটুন। তবে ডিম্বাকৃতি শেপ সুন্দর লাগে বেশি। এরপর এমারি বোর্ড দিয়ে নখগুলো ধীরে ধীরে সুন্দরভাবে ফাইল করে নিন। একটা বাটিতে হালকা গরম সাবান পানি নিয়ে তার মধ্যে হাত দুটো ১৫/২০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। দেখবেন নখের চারপাশের ত্বক (cuticle) নরম হয়ে গেছে।

এবার ব্রাশের সাহায্যে ব্রাশ করে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিন।

কিউটিকলের মরা ত্বক কিউটিকল ছুরি দিয়ে পরিষ্কার করে নিন। তারপর তোয়ালে দিয়ে হাত ভালোভাবে শুকনো করে মুছে নিয়ে ক্রিম ম্যাসাজ করে নিন অথবা অলিভ অয়েল হালকা গরম করেও ম্যাসাজ করতে পারেন। অরেঞ্জ স্টিকের ভোঁতা দিক দিয়ে নখের গোড়ায় ক্রিম লাগিয়ে নিন। রাতে শোবার আগে গ্লিসারিনের সাথে সমপরিমাণ গোলাপ পানি মিশিয়ে হাতে মেখে নিতে পারেন। এতে হাতের ত্বক নরম থাকবে এবং হাত ফাটবে না। এছাড়া আপনি কোনো ভালো হ্যান্ড লোশন ব্যবহার করতে পারেন কিংবা অলিভ অয়েল ম্যাসাজ করে নিতে পারেন। হাতে নেইল পলিশ লাগালে ভালো দেখে লাগাবেন। প্রথমে একবার পাতলা করে দিয়ে শুকিয়ে নিয়ে, দ্বিতীয়বার লাগাবেন। এভাবে তৃতীয়বারও লাগিয়ে নিতে পারেন। এছাড়া মেহেদি দিয়েও হাত রাঙাতে পারেন।

নখের যত্নের টুকিটাকি

১. নখ পাতলা হলে বা ভেঙে গেলে মাস তিনেক প্রতিদিন জেলাটিন খেলে ঠিক হয়ে যাবে।

২. নখের পুষ্টির জন্যে এ, বি, সি ও ডি ভিটামিনযুক্ত খাবার খাবেন।

৩. সপ্তাহে দু/ তিন দিন ক্যাস্টর অয়েল লাগাবেন অথবা অলিভ অয়েল হালকা গরম করে নখে মালিশ করবেন।

৪. প্রতিদিন হাতের ব্যায়াম ও ম্যাসাজ করবেন।

৫. লাল আভাযুক্ত নীল দেখলে বুঝবেন নখের স্বাস্থ্য ভালো। নীল আভাযুক্ত দেখলে বুঝবেন নখের রক্ত প্রবাহ দুর্বল।

৬. অতিরিক্ত গরম পানি বা অতিরিক্ত ঠান্ডা পানিতে নখ ভেজাবেন না।

৭. হাত সারাক্ষণ পানিতে ভেজাবেন না। এতে হাতের ত্বক ফেটে যেতে পারে। হাত কম ভেজানোই ভালো।

৮. সপ্তাহে একদিন ম্যানিকিওর করা উচিত।

৯. প্রতিদিন রাতে হাত ধুয়ে ভালোভাবে মুছে নিয়ে কোনো ভালো ক্রিম, লোশন বা অলিভ অয়েল হালকা গরম করে ম্যাসাজ করতে পারেন। অল্প খরচে গ্লিসারিনের সাথে সমপরিমাণ পানি মিশিয়ে হাতের বাহু হতে আঙুলের ডগা পর্যন্ত মেখে নিতে পারেন।

১০. হাতের আঙুল গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত একটু হালকাভাবে মোচড় দেয়ার মতো মালিশ করবেন। এতে আঙুলের গাঁট যাদের মোটা তারা উপকার পাবেন।

১১. প্রতিদিন ১০ বার হাতের ব্যায়াম করলে হাতে রক্ত সঞ্চালন ভালো হয়ে হাত সুন্দর থাকবে। হাত মুষ্টিবদ্ধ করে মুষ্টি খুলে আঙুলগুলো যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে দেবেন। এভাবে একবার মুষ্টিবদ্ধ করবেন, একবার ছাড়বেন। এভাবে প্রতিদিন ১০ বার করুন।

১২. সবসময় পুরানো নেইল পলিশ তুলে ফেলে নতুন নেইল পলিশ লাগাবেন। গরমের দিনে হালকা মিষ্টি রঙের নেইল পলিশ ভালো লাগবে। শীতে গাঢ় রং ভালো লাগবে। রাতের অনুষ্ঠানে আপনি গাঢ় রঙের নেইল পলিশ ব্যবহার করতে পারেন।

১৩. আজকাল অল্পবয়সী মেয়েরা নখের ওপর লাগানোর জন্যে নেইল পলিশ দেয়ার পর বিভিন্ন রঙের ফুল বা ডিজাইন ব্যবহার করে বৈচিত্র্য এনে থাকে। তবে পোশাকের সাথে মিলিয়ে পার্লি অথবা নন-পার্লি নেইল পলিশ ব্যবহার করলে কোমল সৌন্দর্য ফুটে ওঠে।

পায়ের যত্ন

হাতের যত্নের মতো পায়ের যত্নও আপনাকে নিতে হবে নিয়মিত। অনেকেই মনে করেন পা তো ঢাকাই থাকে, তার আবার যত্নের প্রয়োজন কী! কিন্তু কথাটা মোটেই ঠিক নয়। কেননা সারাদিনে আপনার এ শরীরের ভার বহন করছে পা দুটোই। কাজেই ভেবে দেখুন এর অবদান কত। তাই এর যত্ন নেয়া দরকার শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো। আর শুধু পায়ের পাতা বা

নখের যত্ন নিলেই পায়ের যত্ন হবে না, ঊরু থেকে শুরু করে আঙুলের ডগা পর্যন্ত যত্ন নিলেই হবে পায়ের যত্ন নেয়া। অনেকের উরু খুব ভারী; আবার মোটা হওয়ার দরুন অনেকের ঊরুতে চর্বি জমে যায়। সে-ক্ষেত্রে নিয়মিত ব্যায়াম করে অনায়াসে সে চর্বি কমিয়ে সুন্দর করে তুলতে পারেন। প্রতিদিন ঊরু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত তেল মালিশ করা ভালো। তাতে পা সজীব থাকবে। পায়ের যত্ন হাতের যত্নের মতোই নিতে হয়। পায়ের যত্নকে পেডিকিওর বলা হয়। পেডিকিওর এর জন্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী :

১. লবণ/ গরম পানি
২. সাবান
৩. পা ধোয়ার ব্রাশ
৪. পিউমিশ স্টোন
৫. নেইল কাটার
৬. অলিভ অয়েল
৭. পায়ে মাখার লোশন
৮. গ্লিসারিন ও গোলাপ জল
৯. ট্যালকম পাউডার
১০. তোয়ালে
১১. তুলো
১২. নেইল রিমুভার

সর্বোপরি সুস্থ-সতেজ পা চাইলে পায়ের ব্যায়াম করতে হবে। তাতে পায়ের পেশি সতেজ হবে, রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পাবে।

মাঝে মাঝে পা দুটোকে বিশ্রাম দিন। যেমন, বিছানায় শুয়ে পা দুটোকে একটু উঁচু জায়গায় রেখে দিন। এভাবে ১০/১৫ মিনিট বিশ্রাম দিন।

প্রতিদিন দুই/ তিন বেলা ১০/১৫ মিনিট করে বজ্রাসনে বসুন।

কীভাবে যত্ন নেবেন

১. হালকা গরম পানিতে কিছুটা লবণ ফেলে সে পানি একটি গামলায় নিয়ে তাতে পায়ের পাতা দুটো ১০/১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। অথবা খাবার সোডা সোডিয়াম বাই-কার্বনেট হালকা গরম পানিতে মিশিয়ে

তাতেও পা ১০/১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে পারেন। এতে পায়ের ত্বক নরম হবে।

২. পিউমিশ স্টোন দিয়ে ঘষে ঘষে পায়ের মরা ত্বক উঠিয়ে ফেলুন।

৩. ব্রাশে সাবান লাগিয়ে পায়ে ভালোভাবে লাগিয়ে নখের চারপাশ, গোড়ালি, পায়ের পাতার চারপাশ ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৪. তোয়ালে দিয়ে ভালোভাবে পা শুকনো করে মুছে নিন।

৫. এবার তুলো ভিজিয়ে কোনো লোশন লাগিয়ে নিন অথবা গ্লিসারিন সমপরিমাণ গোলাপ পানি বা নরমাল পানি মিশিয়ে পায়ে মেখে নিন। এতে পা নরম থাকবে। পা ফাটবে না। শীতকালে অনেকের পা ফাটে, তাই এ পদ্ধতি শীতকালে উপকারী। গরমকালে অবশ্য পা ধোয়ার পর হালকাভাবে ট্যালকম পাউডার ছিটিয়ে নিতে পারেন।

৬. পা ধোয়ার আগেই নখ ভালোভাবে কেটে এমারি বোর্ডের সাহায্যে ঘষে নিন। পায়ের নখ গোল করে কাটা উচিত নয়। স্কয়ার শেপ করে কাটাই ভালো।

৭. পায়ে নেইল পলিশ দেয়ার সময় ফাঁকে ফাঁকে তুলো ঢুকিয়ে নিলে নেইল পলিশ দেয়া সহজ হবে। হাতে ও পায়ে একই রং ব্যবহার করা উচিত।

৮. পা সবসময় ভেজা থাকা ভালো নয়, এতে পায়ের ত্বক ফেটে যায়।

৯. পায়ের নখ সুন্দর-সজীব রাখার জন্যে অলিভ অয়েল হালকা গরম করে মালিশ করলে উপকার পাবেন।

১০. প্রতিদিন পায়ের ব্যায়াম করা উচিত।

১১. প্রতিদিন ভালোভাবে পা ধুয়ে শুকনো করে মুছে কোনো ভালো লোশন কিংবা গ্লিসারিন সমপরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে মালিশ করে নিলে পায়ের ত্বক নরম থাকে এবং পা ফাটবে না। মনে রাখবেন সুন্দর পা নারীর সৌন্দর্যকে অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়।

পায়ের বিভিন্ন সমস্যা

ক্লান্ত পা

পায়ের যে-কোনো অসুবিধায় বা অসুখে আপনার পায়ে ক্লান্তিবোধ জাগতে পারে। এ-ক্ষেত্রে আপনি পা দুটোকে কিছুটা উঁচু স্থানে ২০ থেকে ৩০ মিনিট রাখুন। প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ১০ মিনিট পা হালকা ম্যাসাজ করুন। আপনি যদি নিয়মিত বজ্রাসনে ১০/১৫ মিনিট বসেন এবং প্রতিদিন একঘণ্টা হাঁটেন তাহলে এগুলোর প্রয়োজন হবে না ।

পা ফাটা

শীতের সময় অনেকেরই পা ফাটে। এছাড়া অনেকের আবার ১২ মাসই পা ফাটা থাকে। ফাটা পা দেখতে কুৎসিত মনে হয়। যাদের শীতে পা ফাটে তারা শীত শুরু হওয়ার আগেই পায়ের যত্ন শুরু করবেন। কুসুম গরম পানিতে বেশি করে লবণ ফেলে তার মধ্যে পা ১০/১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। এরপর পা ঘষে ঘষে ফাটা জায়গা পরিষ্কার করে ভালোভাবে তোয়ালে দিয়ে মুছে শুকিয়ে নিন। এরপর কোনো লোশন কিংবা গ্লিসারিনের সাথে সমপরিমাণ গোলাপ পানি কিংবা নরমাল পানি মিশিয়ে প্রতিদিন রাতে পায়ে ম্যাসাজ করবেন।

খাবারে প্রতিদিন ভিটামিন-এ, ভিটামিন-বি, ভিটামিন-সি রাখবেন। শীতের সময় প্রচুর কাঁচা গাজর খাবেন। মনে রাখবেন, ত্বকের পেলবতার জন্যে 'ভিটামিন-এ'-এর প্রয়োজন। এছাড়া ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার খাবেন। কচু শাকে প্রচুর ক্যালসিয়াম রয়েছে। আগে থেকেই নিয়মিত পায়ের যত্ন নিলে পা ফাটবে না।

পায়ের ফোসকা

অনেক সময় নতুন জুতোর কারণে পায়ে ফোসকা পড়ে। এ ফোসকা বড় না হলে একটা সুই স্যাভলন পানিতে রেখে ফোসকা ছিদ্র করে দিলে ভেতর থেকে পানি বেরিয়ে যাবে। তারপর ঐ স্থানে অ্যান্টিসেপটিক স্যাভলন ক্রিম লাগিয়ে নিতে পারেন। যদি ফোসকা পেকে অসুবিধে সৃষ্টি করে তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়াই ভালো।

আঙুল ফোলা

বেশি শীতপ্রধান দেশে কিংবা পাহাড়ি অঞ্চলে অনেকের পায়ের আঙুল লাল হয়ে ফুলে ওঠে এবং ভীষণ চুলকাতে থাকে। এ অবস্থায় গরম পানিতে লবণ কিংবা বরিক পাউডার মিশিয়ে পা ১০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে পরে শুকনো করে পা মুছে চিকিৎসকের পরামর্শে যে-কোনো অ্যান্টিসেপটিক মলম লাগাতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, এ অবস্থায় যেন পায়ে ঠান্ডা না লাগে। উলের মোজা পরে থাকবেন।

পায়ের স্ফীতি

নানা কারণে পায়ের স্ফীতি হতে পারে। যেমন গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে কিংবা হৃদরোগেও এ লক্ষণ দেখা দিতে পারে। যারা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করেন তাদের বেলায়ও হতে পারে অথবা যারা অস্বাভাবিক রকম মোটা তাদেরও হতে পারে। এ-ক্ষেত্রে গোসলের পর পায়ে লেবুর রস ঘষে ১৫/২০ মিনিট পা দুটোকে শিথিল করে শরীর থেকে কিছুটা উঁচু স্থানে রেখে বিশ্রাম দিতে পারেন। এতে বেশি সুফল পাবেন। পায়ের ব্যায়াম নিয়মিত করলে এসব হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

কুনি নখ

নখ কাটার দোষে অনেক সময় নখের কোণা মাংসের মধ্যে ঢুকে গিয়ে পাশগুলো ফুলে ওঠে ও পেকে যায়—একে বলে কুনি নখ। এটা বেশ বেদনাদায়ক। এ-ক্ষেত্রে গরম পানিতে বোরিক পাউডার মিশিয়ে দিনে চার/ পাঁচ বার সেঁক দিলে ব্যথার উপশম হবে। পরে কোনো অ্যান্টিসেপটিক মলম লাগিয়ে নিতে পারেন।

পায়ের কড়া

বার বার চাপ বা ঘষা লাগার জন্যে পায়ে কড়ার সৃষ্টি হয়। এ কড়া নখের মতো শক্ত হয়ে ব্যথা করে। তাই জুতো কেনার সময় খেয়াল করে কিনতে হবে যেন তা আরামদায়ক হয়। তা না হলে পরে চাপে চাপে কড়া পড়বে। প্রথম দিকে কর্ন ঝামা বা পিউমিশ স্টোন দিয়ে ঘষে ঘষে কড়া নিবারণ করা যায় কিংবা ধারালো ব্লেড বা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলা যায়। এখন বাজারে অনেক লোশন বেরিয়েছে যা কড়ার ওপর লাগালে নরম হয়ে পড়ে যায়। অবশ্য যে-কোনো ওষুধ লাগানোর আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।

একজিমা

একজিমা দুধরনের হতে পারে—শুষ্ক ও আর্দ্র। একজিমা যে ধরনেরই হোক না কেন, এর প্রতিকারও আছে এবং পরিচর্যাও সহজ। একজিমা চুলকায়। সঠিক সময়ে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এর প্রতিকার করুন। তা না করলে একজিমা আপনাকে ভোগাবে।

ছত্রাকজনিত রোগ

পায়ের আঙুলের ফাঁকে এ ব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। কারণ এ সব জায়গায় ঘাম হয়। যে-সব জায়গায় ঘাম হয়, ভেজা থাকে, সে-সব জায়গায় ছত্রাকজনিত জীবাণুর আক্রমণ সহজে হয়। এ-ক্ষেত্রে পা নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে ধুয়ে শুকনো করে মুছে ফেলতে হবে। পা শুষ্ক রাখলেই অনেক ক্ষেত্রে এ রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। ছত্রাকের আক্রমণ প্রবল হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

সোরিয়াসিস

সোরিয়াসিসে আক্রান্ত ত্বকের স্থান দেখতে শুষ্ক ও আঁশযুক্ত থাকে। ত্বকের ওপর হালকা গোলাপি রঙের দাগের মতো দেখায়। সূর্যের আলো সোরিয়াসিস দূর করে। যে দেশে সূর্যের আলো নেই সেখানে আল্ট্রা ভায়োলেট ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা আছে। প্রথম অবস্থায় সূর্যের আলো, লোশন বা মলমেই সেরে যায়। তবে এ অবস্থা বেশিদিন চললে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

হাত-পায়ের যত্নে ও সৌন্দর্যচর্চায় মেহেদি

'হলুদ বাটো মেন্দি বাটো বাটো ফুলের মৌ' বাঙালি নারীর সৌন্দর্যচর্চায় অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানের মতো মেহেদির ব্যবহারও সার্বজনীন। ঈদের দিনে বিশেষ সাজগোজের মধ্যে মেহেদি একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। আজকাল গ্রাম বা শহর—যেখানেই হোক, ঈদের দিনে হাত-পা মেহেদিরঞ্জিত না হলে যেন সাজটাই অপূর্ণ থেকে যায়।

সৌন্দর্যচর্চায় মেহেদির ব্যবহার আজ নতুন নয়। প্রাচীনকাল থেকেই এর

ব্যবহার চলে আসছে। পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরের মেয়েরা হাতে, পায়ে ও চুলে মেহেদি লাগাত। এমনকি মৃত্যুর পর মমির চুল ও নখ মেহেদি দিয়ে রঞ্জিত করে দিত। বাগদাদের খলিফাদের যুগে নারীর সৌন্দর্যচর্চার অন্যতম প্রধান উপকরণ ছিল মেহেদি। উপমহাদেশে মেহেদির প্রচলন হয় মোঘল আমল থেকে। মোঘল রমণীদের সৌন্দর্যচর্চায় মেহেদির ভূমিকা ছিল অনন্য। হাতে-পায়ে মেহেদির নকশী কাজ তখন থেকেই চালু হয়। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান মেহেদির নকশী কাজ খুবই পছন্দ করতেন। মোঘল হেরেম থেকে রাজপুত নারীদের মধ্যে মেহেদির প্রচলন শুরু হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে তা উপমহাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আর এখন এর ব্যবহার করে না এমন মহিলার সংখ্যা খুবই কম।

মেহেদি শুধু সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্যেই নয়, হাত-পায়ের ত্বকের জন্যেও অত্যন্ত উপকারী। মেহেদি পাতা ছাড়াও এর ফল-ফুল ও মূল বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করা হয়। এই ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন স্থানে এর পরিচিতি বিভিন্ন নামে। মেহেদি কোথাও মেদি, মেন্দি, কোথাও মৌকা, কোথাও মদয়ন্তিকা, আবার কোথাও গিরিমলিকা বা বনমলিকা নামে পরিচিত। মধ্য এশিয়ায় এটি পরিচিত 'আল-খান্না' নামে। আর আরবে পরিচিত 'হেন্না' নামে। ইংরেজি হেনা (Henna) শব্দটি এসেছে আরবি হেন্না শব্দ থেকে। মেহেদির বোটানিকেল নাম হচ্ছে Lawsonia Inermis Linni। এটি Lythreaceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

হাতে মেহেদি লাগানো কঠিন কাজ নয়। সাধারণভাবে আমাদের দেশের মেয়েরা গাছ থেকে প্রয়োজন মতো পাতা তুলে নিয়ে ডাঁটা-বোঁটা ফেলে ধুয়ে শিলপাটায় মিহি করে বেটে নেয়। বাটা যত মিহি হবে পেস্ট তত সুন্দর, লাগানো তত সহজ এবং রং তত উজ্জ্বল হবে। অনেক সময় শহরে টাটকা মেহেদি পাতা যোগাড় করতে অসুবিধা। তাই আপনি ইচ্ছে করলে টাটকা পাতা রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে চেলে শিশি ভরে কিংবা পলিথিন প্যাকে মুখ আটকে রেখে দিতে পারেন। প্রয়োজনে একটু গরম পানি দিয়ে পেস্টের মতো বানিয়ে হাতে-পায়ে নিজের ইচ্ছেমতো ডিজাইন করে নিতে পারেন। এছাড়া বাজারে আজকাল গুঁড়ো মেহেদি এবং পেস্ট মেহেদিও পাওয়া যায়। তা দিয়েও হাত রাঙাতে পারেন। তবে তাজা মেহেদির রঙের উজ্জ্বলতাই ভিন্ন।

হাতে ডিজাইন করার ক্ষেত্রে সাধারণত মেয়েরা কাঠি, শলা, টুথপিক দিয়ে তুলে তুলে ডিজাইন করে থাকে। এতেও সুন্দর নকশা আঁকা যায়। তবে সময়

বেশি লাগে। আজকাল কম সময়ে সূক্ষ্ম ডিজাইন করার জন্যে পাস্টিক কোণ ব্যবহার করা হয়। পাস্টিক কোণ বানানো এমন কঠিন কিছু নয়। আপনি নিচের ছবি দেখে অনায়াসে নিজেই এই কোণ বানাতে পারেন।

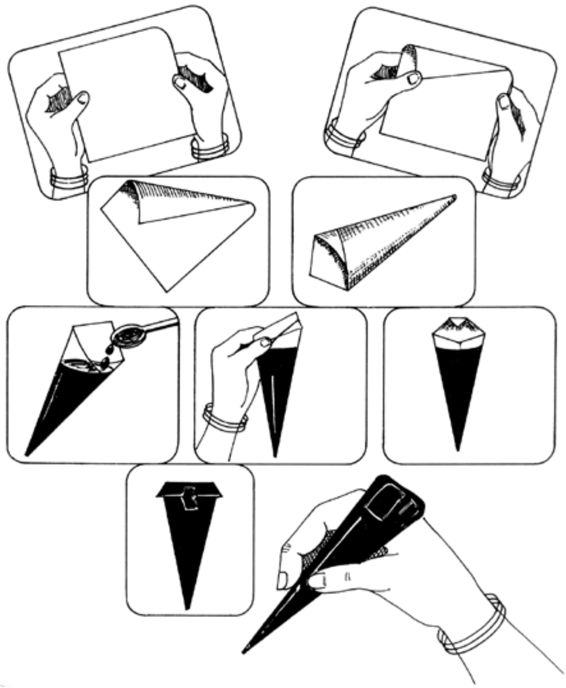

মেহেদির পেস্ট বানানোর পদ্ধতি

১. শুধু পরিষ্কার কাঁচা পাতা মিহি করে বেটে নিতে পারেন।

২. মিহি করে বাটা কাঁচা পাতার পেস্টের সাথে একটু লেবুর রস মিশিয়ে নিতে পারেন।

৩. কাঁচা পাতার পেস্টের সাথে চা বা কফির কড়া লিকার মেশাতে পারেন। এতে মেহেদির রং গাঢ় হয়।

৪. কাঁচা পাতার পেস্টের সাথে সামান্য পান খাওয়ার খয়ের মেশাতে পারেন। এতেও রং গাঢ় হবে।

৫. মেহেদি পাতার শুকনো গুঁড়ো হলে তা দিয়ে পেস্ট বানানোর জন্যে একটু গরম পানিতে মিশিয়ে একঘণ্টা রেখে দিতে হবে। তাহলেই পেস্ট ব্যবহারের উপযোগী হবে।

৬. গুঁড়ো পেস্টের সাথেও লেবুর রস, চা বা কফির লিকার বা খয়ের মেশাতে পারেন।

৭. পেস্টের ঘনত্ব ঠিক করার জন্যে প্রয়োজনমতো লেবুর রস ও একটু চিনি গোলানো পানি পেস্টের সাথে মিশিয়ে নিতে পারেন।

এভাবে পেস্ট বানিয়ে নিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো ডিজাইন করে হাতে-পায়ে লাগিয়ে নিতে পারেন। মেহেদি লাগানোর পর যদি দেখেন উঠে যেতে চায়, তাহলে লেবুর রস ও চিনি গোলা পানি ভিন্ন পাত্রে নিয়ে তুলোতে ভিজিয়ে মেহেদির প্রলেপের ওপর আস্তে আস্তে চেপে চেপে দেবেন। এতে পেস্ট ঝরে পড়বে না। দুই থেকে চার ঘণ্টা পর্যন্ত মেহেদি হাতে রাখা উচিত। পুরো মেহেদি শুকিয়ে যাওয়ার পর ভোঁতা ছুরি কিংবা চামচ দিয়ে তুলে ফেলবেন। এবার খাঁটি সর্ষের তেল মেখে হাত দুটো চুলোর আগুনের কাছে ধরে দুই/ তিন মিনিট সেঁকে নিন। খেয়াল রাখবেন, সেঁকতে গিয়ে আবার হাত পুড়িয়ে না ফেলেন। রঙের ঔজ্জ্বল্য ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্যে দুই/ তিন ঘণ্টা পানিতে হাত ভেজাবেন না।

সবশেষে মনে রাখবেন, ধৈর্যের সঙ্গে সূক্ষ্ম ডিজাইনে মেহেদি লাগিয়ে অনায়াসেই আপনি আপনার শৈল্পিক মনের পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে পারেন। হতে পারেন আকর্ষণীয়।

কীভাবে সাজবেন

সবকিছু পরিচর্যার পর এবার জানতে হবে আপনি কীভাবে সাজবেন। সাজার জন্যে কী কী প্রসাধন সামগ্রী প্রয়োজন এবং কীভাবে তা ব্যবহার করবেন। সাজগোজের জন্যে আপনার প্রয়োজনীয় প্রসাধন সামগ্রী এবং তা ব্যবহারের নিয়মাবলি :

১. ক্লিনজার

ক্লিনজিং করার জন্যে সাধারণত তিন ধরনের উপকরণ পাওয়া যায়। যেমন : মিল্ক, ক্রিম ও লোশন। গায়ে মাখা সাবান অথবা ত্বক অনুসারে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করতে পারেন।

লাগানোর নিয়ম : সাধারণত হাতের আঙুল অথবা তুলো দিয়ে লাগাবেন। সারা দেহেই ক্লিনজার ব্যবহার করা যায়।

২. ফ্রেশনার

ক্লিনজিং করার পর ফ্রেশনার ব্যবহৃত হয়। স্বাভাবিক, মিশ্র ও শুষ্ক ত্বকের জন্যে টনিক, স্কিন ফ্রেশনার বা টোনার। তৈলাক্ত ত্বকের জন্যে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট লোশন।

লাগানোর নিয়ম : তুলো দিয়ে লাগাবেন। শুধু মুখে ব্যবহার করতে হয় মেক-আপের আগে।

৩. ময়েশ্চারাইজার

ত্বকের আর্দ্রতা বা জলীয়ভাব ধরে রাখার জন্যে ব্যবহার করা হয়। দুধরনের ময়েশ্চারাইজার পাওয়া যায়–ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম ও ময়েশ্চারাইজিং লোশন। হাতের আঙুল দিয়ে লাগাতে হয়।

৪. ব্লেমিশ কভার আপস্টিক

এটি মুখের ছোট ছোট খুঁত বা দাগ ঢাকার জন্যে ব্যবহৃত হয়। মেক-আপ শুরু করার আগে এটি যেখানে যেখানে দাগ বা খুঁত রয়েছে সেখানে–বিশেষ করে চোখের আশপাশের খুঁত থাকলে তা ঢাকতে ব্যবহার করতে পারেন।

এগুলো বিভিন্ন রঙের পাওয়া যায়। যে রং আপনার ত্বকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সে রং লাগাবেন।

৫. ফাউন্ডেশন

এটিকে ময়েশ্চারাইজার লাগানোর ১০ মিনিট পর মেক-আপের বেইজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ফাউন্ডেশন মুখের নানা রকমের দাগ লুকাতে সাহায্য করে। সাময়িকভাবে মুখের ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল করে তোলে। ফাউন্ডেশন আঙুলের ডগা দিয়ে তুলে সারা মুখে-গলায় বিন্দু বিন্দু করে লাগাতে হয়। তারপর আলতো করে ঘষে ঘষে সারা মুখে-গলায় বসিয়ে দিতে হয়। এমনভাবে লাগাবেন যেন বেশি না হয়ে যায়। বেশি হলে বিশ্রী লাগবে। মনে হবে প্রলেপ মেখেছেন। হালকাপাতলা করে লাগাতে হবে, যেন মুখ দেখতে প্রাকৃতিক ফর্সা মনে হয়। ফাউন্ডেশন কেনার সময় গায়ের রঙের সাথে মিলিয়ে কিনুন। ফর্সাদের জন্যে গোল্ডেন ট্যান বা হালকা রোজ ভালো লাগবে। সবসময় ত্বকের রঙের সাথে খাপ খাইয়ে ফাউন্ডেশন লাগাবেন।

৬. কমপ্যাক্ট মেক-আপ বা প্যানকেক

কমপ্যাক্ট মেক-আপকে সম্পূর্ণ মেক-আপ বলা যায়। এটা শুধু আলাদাও লাগানো যায় আবার ফাউন্ডেশনের ওপরও ব্যবহার করা যায়। স্পঞ্জ দিয়ে লাগাতে হয়। এটি মুখমণ্ডলে ব্যবহার করা হয়। রাতের সাজে এটা ভালো। আপনার ত্বকের রঙের সাথে মিলিয়ে কিনুন।

৭. ফেস পাউডার

এটি এমনিতে লাগানো যায়। এর সাথে দেয়া প্যাড দিয়ে লাগাতে পারেন অথবা ব্রাশ দ্বারাও লাগানো যায়। আবার ফাউন্ডেশন লাগানোর পরও ব্যবহার করা যায়। এটিও মুখমণ্ডলে ব্যবহৃত হয়। ফাউন্ডেশনের পর লাগালে ফাউন্ডেশন থেকে এক শেড হালকা রঙের লাগাতে হবে।

৮. ব্লাশ-অন বা রুজ

ব্লাশ-অন বা রুজ দুধরনের। পাউডার ও লিকুইড ক্রিম আকারে। এগুলো বিভিন্ন রঙের পাওয়া যায়। এটি ব্যবহার করতে হয় পাফ, সফট ব্রাশ কিংবা তুলো দিয়ে। মেক-আপ সম্পূর্ণ হলে এটি গালে উজ্জ্বলতার জন্যে ব্যবহার করা হয়। তবে বিভিন্ন মুখমণ্ডলের আকৃতিতে বিভিন্নভাবে লাগাতে হয়। লম্বা মুখের ক্ষেত্রে গালের উঁচু হাড়ের দিক থেকে ব্রাশ টেনে কানের দিক

পর্যন্ত টেনে মিশিয়ে দিলে লম্বাটে মুখ দেখতে ছোট লাগবে। আবার গোল মুখকে লম্বাটে দেখাতে হলে কানের তলা থেকে ব্রাশ টেনে নিয়ে সমগ্র চোয়ালের পাশ ঘিরে কান পর্যন্ত টানতে হবে। তারপর একটা টিস্যু পেপার দিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে।

৯. আইশ্যাডো

চোখের পাতায় লাগাতে হয়। এতে চোখে বাড়তি সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। আইশ্যাডো নানান রঙের পাওয়া যায়। পোশাকের সাথে মিলিয়ে লাগালে বেশ স্মার্ট এবং সুন্দর লাগে। এটি ব্রাশ, ছোট স্টিলের মাথায় স্পঞ্জ প্যাড লাগানো স্টিক, তুলো ইত্যাদির যে-কোনো একটির সাহায্যে লাগাতে পারেন।

১০. আই লাইনার

এটি আইশ্যাডো লাগানোর পর লাগাতে হয়। চোখের ওপরে কিংবা ওপরে-নিচে উভয় পাতায় লাগাতে পারেন। এটি কাজলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যাদের চোখ ছোট তারা চোখের বাইরের দিক দিয়ে সতর্কভাবে সুন্দর করে লাইন টেনে চোখ বড় দেখাতে পারেন। লাইনার কালো বা ব্রাউন রঙের পাওয়া যায়।

১১. মাসকারা

চোখে লাইনার কিংবা কাজল লাগানোর পরই মাসকারা লাগাতে হয়। যাদের চোখের পাপড়ি অল্প তারা এটি ব্যবহার করলে চোখের পাপড়িগুলো ঘন এবং বড় দেখায়। আর যাদের চোখের পাপড়ি বড় তারাও লাগাতে পারেন। দেখতে আরো ভালো লাগবে। মাসকারা দুধরনেরই পাওয়া যায়– লিকুইড এবং শক্ত কেকের মতো। শক্ত মাসকারা লাগানো সহজ। মাসকারা সাধারণত কালো, ব্রাউন, নীলচে রঙের হয়ে থাকে। তবে বাঙালি মেয়েদের জন্যে কালো মাসকারা লাগানো উত্তম।

১২. আই-ব্রো পেন্সিল

ভ্রুতে লাগাতে হয়। দুরঙের পাওয়া যায়। বাদামি ও কালো। এটি ভ্রুকে ঘন, কালো ও উজ্জ্বল দেখাতে ব্যবহৃত হয়।

১৩. লিপস্টিক

ঠোঁট সুন্দর করতে লিপস্টিক ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত পোশাকের সাথে মিলিয়ে ঠোঁটে লাগালে ভালো লাগে। তবে পোশাকের এমন কিছু রং

আছে সে রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করলে সঙ মনে হবে। লিপস্টিক বিভিন্ন রঙের পাওয়া যায়। দিনের বেলা হালকা মিষ্টি রং লাগান, রাতে গাঢ় রং লাগাতে পারেন। লাগানোর আগে ঠোঁটে একটু পাউডার লাগিয়ে নিয়ে তারপর লিপ পেন্সিল বা লিপ ব্রাশ দিয়ে হালকা করে আউট লাইন এঁকে নিয়ে তারপর ভেতরের অংশ লিপস্টিক দিয়ে ভরে দিতে হয়। আজকাল অনেকেই লাইন এমনভাবে টানেন আর মধ্যে হালকা ভরাট করেন যে, মুখের দিকে তাকালে মনে হয় ঠোঁটে আলগা কিছু লাগিয়ে রেখেছেন। আবার অনেকে বাইরে লাইন টানেন এক রঙের পেন্সিল ব্যবহার করে, মধ্যে ভরাট করেন অন্য রঙের লিপস্টিক দিয়ে। এটিও দেখতে বিশ্রী লাগে। মনে হয় কৃত্রিম ঠোঁট। সবসময় মনে রাখবেন, সাজগোজ যত স্বাভাবিক হবে তত আপনাকে রুচিসম্মত মনে হবে। হাল-ফ্যাশনের সবকিছুই দেখতে ভালো লাগে না। ওগুলো ছবির জগতে, বিজ্ঞাপনে দেখতে ভালো লাগে, বাস্তবে নয়।

১৪. লিপগ্লস

লিপস্টিক লাগানোর পর এটি ব্যবহার করতে হয়। এতে ঠোঁট ভেজা ভেজা, উজ্জ্বল ও চকচকে দেখায়। লিপগ্লস বিভিন্ন রঙের পাওয়া যায়। ন্যাচারাল লিপগ্লসও পাওয়া যায়। সাধারণত লিপস্টিকের রঙের সাথে মিলিয়ে লাগাতে হয়। আর যদি রঙের সাথে না মেলাতে পারেন, তাহলে ন্যাচারাল লিপগ্লস লাগাতে পারেন। এতে ঠোঁট সুন্দর দেখায়।

১৫. গ্লিমার

মেক-আপ করার শেষ পর্যায়ে গ্লিমার ব্যবহার করতে হয়। গ্লিমার ব্যবহার করার ফলে মুখমণ্ডলে চকচকে ভাব ফুটে ওঠে। তবে খুব কম পরিমাণে লাগাতে হয়। আঙুলের ডগায় সামান্য নিয়ে কপাল, দুই গালের কিছুটা অংশে এবং চিবুকে লাগালেই হয়। তবে এটি রাতের অনুষ্ঠানে লাগানো উচিত। এছাড়া রোল গ্লিমারও পাওয়া যায়। এটি সরাসরি লাগানো যায়।

১৬. সুগন্ধি বা পারফিউম

সুগন্ধি পছন্দ করে না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কী নারী, কী পুরুষ! মিষ্টি গন্ধ সবার মনেই আবেশ সৃষ্টি করে। শুধু মানুষ কেন, বিধাতাও নিশ্চয়ই পছন্দ করেন সুবাস। তাই তো তিনি প্রকৃতিতে নানা লতাগুল্ম ও পত্রপুষ্পকে করেছেন সুবাসিত। আর মানুষ এই প্রকৃতি থেকেই তৈরি করতে শিখেছে নানা ধরনের সুগন্ধি। প্রাচীন কালে মানুষ নিজ হাতে নানান ফুল-ফল,

লতাপাতা থেকে নির্যাস বের করে তৈরি করত সুগন্ধি। তবে একে সংরক্ষণ করা ছিল কঠিন ব্যাপার। আর এখন বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরি হচ্ছে নানা সুগন্ধি। তা সংরক্ষণ করতেও কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।

ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি সুগন্ধি ব্যবহার করে থাকে। সাজগোজ সেরে একটু সুগন্ধি ব্যবহার না করলে মনে হবে যে সাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

তবে সুগন্ধি লাগালেই হলো না। সুগন্ধি লাগানোরও নিয়ম আছে। আর নিয়মগুলো জানা থাকলেই সুগন্ধি ব্যবহার একটা আর্টে পরিণত হতে পারে।

সবরকম গন্ধের প্রতিই আমাদের সহজাত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। সুন্দর গন্ধ নাকে লাগলে আবেশে চোখ দুটো আপনা থেকেই বন্ধ করে বলি–আহ্! কী চমৎকার! আর বাজে গন্ধ বা উগ্র কোনো গন্ধ পেলে নাক কুঁচকে বলি, ইশ্! কী বাজে! দূরে সরে যাই।

প্রতিটি মানুষের শরীরে স্বাভাবিক গন্ধ আছে। এমনকি সব সৃষ্টিরই নিজস্ব গন্ধ রয়েছে। এজন্যে তাকে আলাদা করে বোঝা যায়।

আমরা দেহের স্বাভাবিক গন্ধ পরিবর্তন করে চমৎকার কোনো মিষ্টি গন্ধ তৈরি করতে চাই। আর এজন্যে আমরা নানা ধরনের পারফিউম, বডি সেন্ট, সুগন্ধি পাউডার, আতর ব্যবহার করে থাকি।

আপনি যেখানে যাবেন বা বসবেন সেখানে সুগন্ধি আবেশ সৃষ্টি করতে চাইলে সঠিক উপায়ে সুগন্ধি ব্যবহার করুন।

বিভিন্ন সুগন্ধির বিজ্ঞাপন দেখলেই কেমন একটা শিহরণ জাগানো আনন্দ এসে আমাদের রোমান্টিক আচ্ছন্নতায় ভরিয়ে তোলে। কিন্তু আমরা কি দোকানে গিয়ে বলব, আমাকে আচ্ছন্নতা সৃষ্টিকারী ও কোনো উত্তেজক সুগন্ধি দিন? নিশ্চয়ই এটি কখনো বলব না।

অনেকেই বাড়ি থেকে বেরোনোর মুহূর্তে খুব তাড়াতাড়ি একটু পারফিউম চেপে লাগিয়ে নেন। কিন্তু সুগন্ধি ব্যবহারের আরো ভালো উপায় আছে।

গোসলের সময় পানিতে বিভিন্ন সুগন্ধি উপাদান ব্যবহার করা যায়। এতে শরীর থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ বেরোবে। আবার ত্বকের কোমলতাও বজায় থাকবে। এছাড়া গোসলের পরও ব্যবহার করার জন্যে কিছু সুগন্ধি আছে। তবুও সুগন্ধি সাবানের বিকল্প নেই। গোসল শেষে বাইরে না বেরোলে আপনি ত্বকে ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন। লোশন ব্যবহার করতে পারেন। যে-সব জায়গা প্রচুর ঘামে সেখানে পাউডার ব্যবহার করতে পারেন। এতে আপনার শরীর থেকে চমৎকার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়বে।

সুগন্ধিযুক্ত বডি লোশন হাতে কিংবা শরীরে মাখলে আপনার শরীর ও হাত থেকে সুন্দর মিষ্টি সুবাস ছড়াবে। আপনি হয়তো রান্নাবান্নার কাজ একটু আগে সেরেছেন। পেঁয়াজের বিশ্রী গন্ধ নাকে লাগছে। হাত ভালো করে ধুয়ে লোশন মেখে নিলে পেঁয়াজের বিশ্রী গন্ধ দূর হবে। পেঁয়াজ-রসুন খাওয়ার পর প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত আমাদের নিঃশ্বাস এবং শরীর থেকে এর গন্ধ বেরোতে পারে, যা আমরা নিজেরা টের পাই না। পাশের কেউ সহজেই বুঝতে পারে। এজন্যে পেঁয়াজ, রসুন এমনকি কিছু গ্রীষ্মকালীন ফলের গন্ধের ব্যাপারেও সাবধান থাকা উচিত।

যদি এলার্জির জন্যে সুগন্ধি লাগাতে না পারেন তাহলে হাঁটুর ভাঁজে সুগন্ধি কোনো পাউডার বা ক্রিম লাগাতে পারেন। হাত বা মুখের পাশে লাগাবেন না। এলার্জি থাকলে স্প্রে-ও ব্যবহার করবেন না। এতে অ্যালকোহল থাকে।

যে সুগন্ধিতে তেলের পরিমাণ বেশি, সে সুগন্ধি ত্বকে বেশিক্ষণ থাকে। যদি আপনার এতে অসুবিধে হয়, তাহলে আপনি আর্দ্র কোনো ক্রিম ব্যবহার করে নিয়ে সেন্ট ব্যবহার করবেন।

গরমে গন্ধ বেশি ছড়ায়, তাই গরমের সময় কোনো কড়া সুগন্ধি ব্যবহার না করাই ভালো। হালকা মিষ্টি গন্ধ ব্যবহার করলে দেখবেন কেমন একটা আমেজ লাগছে। আবার শীতের সময় উষ্ণ এবং কড়া কিছু ব্যবহার করা যায়। সুগন্ধি আবহাওয়া অনুযায়ী অবশ্যই পরিবর্তিত হওয়া উচিত।

সুগন্ধি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিচের তথ্যগুলো জানা প্রয়োজন

১. গ্রীষ্মে কড়া সুগন্ধি ব্যবহার করবেন না।

২. শীতে উষ্ণ কড়া সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারেন।

৩. কাপড়ে সুগন্ধি লাগাবেন না, এতে কাপড়ের সুতো নষ্ট হয় এবং খানিকক্ষণ পরে থাকেও না।

৪. মুক্তোর গহনায় যাতে সুগন্ধি না লাগে খেয়াল রাখবেন। এতে মুক্তোর দ্যুতি নষ্ট হয়।

৫. স্বর্ণালংকার পরে পারফিউম লাগাবেন না। পারফিউম আগে ব্যবহার করুন। পাঁচ মিনিট পরে গহনা পরতে পারেন।

৬. সুগন্ধি অন্ধকারে ঠান্ডা জায়গায় রাখবেন।

৭. সুগন্ধি বেশিদিন ঘরে জমিয়ে রাখবেন না। তাহলে ব্যবহারের যোগ্য থাকে না।

৮. সুগন্ধি বোতলের মুখে স্ফটিক জাতীয় আবরণ থাকলে ওটা কখনো গায়ে লাগাবেন না। আপনার ত্বকে ব্যাকটেরিয়া থাকলে এর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

৯. সুগন্ধিতে এলার্জি থাকলে ব্যবহার করা উচিত নয়।

১০. সুগন্ধি দ্রব্য বাইরে বেরোনোর আগ মুহূর্তে না লাগিয়ে ৫/১০ মিনিট আগে ব্যবহার করুন।

১১. তৈলাক্ত ত্বকে সুগন্ধি বেশিক্ষণ থাকে।

১২. যাদের ত্বক শুষ্ক তারা কোনো ক্রিম, লোশন ব্যবহার করার পর সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারেন।

সুগন্ধি ব্যবহার করলে মনে একটু তাজা ভাব আসে। তবে বিশেষ কোনো মানসিক পরিবর্তন বা আচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয় না। আর সুগন্ধির প্রতিক্রিয়া জনে জনে ভিন্ন হতে পারে। তাই একজনের কাছে যা অমৃত তা অন্যের কাছে হতে পারে বিষ। ব্যক্তিগত রুচিরই প্রাধান্য পায় সুগন্ধি ব্যবহারে।

সুগন্ধি দেহের বিশেষ স্পটে লাগান। যেমন : কনুইয়ের ভাঁজে, কব্জির ভেতর দিকে। হাঁটুর পেছনে। এছাড়া এক টুকরো তুলোয় সুগন্ধি ভিজিয়ে শরীরের ভেতরে পোশাকের মধ্যে সুবিধামতো জায়গায় রেখে দিতে পারেন। গ্রীষ্মকালে হালকা গন্ধের এবং শীতকালে কোনো ভারি ধরনের পারফিউম ব্যবহার করা উচিত। পারফিউমের মধ্যে কয়েকটি শ্রেণি রয়েছে যা শ্রেণি ভেদে শরীরের বিভিন্ন স্থানে লাগাতে হয়। যেমন :

ক. **এন্টি-পারস্‌পিরেন্ট :** এটি ঘাম প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সেজন্যে এটি শুধু বগলেই ব্যবহার হয়।

খ. **ডিওডোরেন্ট :** এই সুগন্ধিটি দেহের অবাঞ্ছিত গন্ধকে দূর করতে সাহায্য করে। তাই সারা দেহেই ব্যবহার করা যায়।

গ. **কোলন :** এই সুগন্ধিটি গোসলের পর ব্যবহার করা হয়। এটি সারা শরীরে লাগাতে পারেন। এর কাজ হলো দেহের তাপ কমিয়ে দেহ ঠান্ডা রাখা।

১৭. টিপ

সবশেষে পোশাকের সাথে মানিয়ে ইচ্ছে অনুসারে কপালে টিপ পরতে পারেন। বাজারে আজকাল হরেক রকমের টিপ পাওয়া যায়। এটি মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি করে। তবে টিপ মুখমণ্ডলের প্রকার ভেদে পরা উচিত।

তা না হলে মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যবৃদ্ধির চেয়ে সৌন্দর্যহানি ঘটাবে। আমাদের মুখাকৃতি বিভিন্ন ধরনের। গোলাকার, লম্বাটে, চ্যাপটা, চৌকো ইত্যাদি। সব মুখেই সব ধরনের টিপ মানায় না। তাই জেনে নিন কোন মুখে কোন ধরনের টিপ পরলে আপনাকে সুন্দর লাগবে।

১. গোলাকার মুখে লম্বা ধরনের টিপ পরুন। এতে মুখ একটু লম্বাটে মনে হবে।
২. লম্বাটে মুখে গোলাকৃতির টিপ পরুন। তাহলে আপনার মুখ খানিকটা গোল মনে হবে।
৩. চ্যাপটাকৃতির মুখে সাধারণত টিপ মানাতে চায় না। তবুও যদি পরেন, লম্বাটে ধরনের টিপ পরবেন।
৪. চৌকো ধরনের মুখে মোটেও টিপ মানাতে চায় না। যদিও পরেন শুধু লম্বাটে ধরনের টিপ পরবেন। লম্বাটে অনেক ধরনের হয়। তার মধ্যে যেটি মানায় সেটি পরবেন।

সাজগোজের ব্যাকরণ অনুসরণ করে আপনি নিজেকে সাজিয়ে তুলতে পারেন অপরূপা নারীতে।

ঋতু অনুযায়ী সাজ

আমরা অনেকেই কোন সময় কী সাজ হওয়া উচিত তা জানি না বা সেভাবে সাজিও না। কথায় বলে, সব সাজ সব জায়গায় মানায় না আর সব কথা সব জায়গায় বলা যায় না। তাই আমাদের জানা উচিত, কোন ঋতুতে কীরকম সাজ হওয়া ভালো। ঋতুর সাথে খাপ খাইয়ে আপনার সাজ হলে সেটা আপনার সুরুচির প্রকাশ পাবে। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। তাই প্রথমেই গ্রীষ্ম ঋতু দিয়ে শুরু করা যাক।

গ্রীষ্মের সাজ

গ্রীষ্মকালে আমরা প্রচণ্ড ঘেমে থাকি। তাই শরীর অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। গরমের দিনে এমনিতেই আপনি অস্বস্তিবোধ করেন। আর এসময় যদি রং চটচটে মেক-আপ করতে যান তাহলে নিজের কাছে তো অস্বস্তি লাগবেই,

অন্যের দৃষ্টিতেও সেটা রুচিহীনতার পরিচয় বহন করবে। কারো কাছে মনে হতে পারে রং মেখে সঙ সেজেছেন। তাই গ্রীষ্মকালে দিনের বেলায় মেক-আপ করবেন হালকা, যা দেখতে লাগে স্বাভাবিকের মতো। তবে রাতের অনুষ্ঠানে বিয়ে বাড়িতে কিছুটা ভারি সাজ করতে পারেন।

মেক-আপের শুরুতে এক টুকরো তুলোতে কয়েক ফোঁটা অ্যাস্ট্রিনজেন্ট লোশন নিয়ে মুখমণ্ডল, গলা, ঘাড়–এসব জায়গায় লাগাবেন। তবে চোখের চারপাশ বাদ দিয়ে, কারণ গরমের দিনে ঘাম বেশি হয়। এটি লাগানোর কিছু পরে মুখের মেক-আপ করতে পারেন। ফাউন্ডেশনের বদলে বেইজ হিসেবে ভ্যানিশিং ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন। তবে প্রথমে আপনাকে ময়েশ্চারাইজিং লোশন মুখমণ্ডলে–বিশেষ করে দুচোখের পাশে লাগাতে হবে। এরপর ধারাবাহিকভাবে সব জিনিস দিয়ে হালকাভাবে সেজে নিয়ে আবারো অ্যাস্ট্রিনজেন্ট লোশন খুব সতর্কভাবে মেক-আপের ওপর আলতোভাবে চেপে লাগান। জোরে ঘষা লাগাবেন না। তাহলে মেক-আপ উঠে যেতে পারে। এভাবে মেক-আপের আগে ও পরে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট লোশন ব্যবহার করলে দুই/ তিন ঘণ্টা মেক-আপ ঠিক থাকবে।

বি.দ্র. : *লিপস্টিক এবং আইশ্যাডো অবশ্যই গরমের দিনে হালকা হতে হবে। সুগন্ধি বা পারফিউম হবে হালকা মিষ্টি গন্ধের।*

বর্ষার সাজ

গ্রীষ্মের পরেই আমাদের দেশে শুরু হয় বর্ষা। কখনো কখনো ৮/১০ দিন পর্যন্ত একনাগাড়ে বৃষ্টি হয়। এসময় বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকে। আর আর্দ্রতা বেশি থাকার ফলে ময়েশ্চারাইজিং লোশন কম পরিমাণে ব্যবহার করলেও চলবে।

বর্ষা ঋতুতে গ্রীষ্মের মতো রৌদ্র-তাপ না থাকলেও ভ্যাপসা গরম বোধ হবে মাঝে মাঝে। তাই এসময় হালকা সাজ হবে রুচির পরিচয়। এসময় ফাউন্ডেশন হিসেবে কমপ্যাক্ট মেক-আপ বা প্যানকেক ব্যবহার করতে পারেন। এতে সামান্য কারণে আপনার মুখ ভিজে গেলেও মেক-আপ উঠে যাবার ভয় নেই। এসময় কাজলের পরিবর্তে আই লাইনার এবং ওয়াটার প্রুফ মাসকারা ব্যবহার করবেন। লিপস্টিক হালকা রঙের ব্যবহার করবেন। তবে দিনটি যদি মেঘে ঢেকে থাকে, অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তাহলে গাঢ় লিপস্টিক সেদিন ব্যবহার করতে পারেন।

শীতের সাজ

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষের জন্যে শীত ঋতু একটা আনন্দের সময়। এসময় বাজারে আসে শীতের হরেক রকম সবজি। তা খেতে যেমন সুস্বাদু ও রুচিকর তেমনি রূপচর্চায়ও এগুলোর ব্যবহার হয়ে ওঠে আনন্দের। শরীরে পুষ্টির জন্যেও পাওয়া যায় প্রচুর ভিটামিনযুক্ত খাবার। আর সাজের সুযোগও চমৎকার। শীতকালে শরীর বেশি ঘামে না বলে সাজগোজ স্থায়ী থাকে বেশিক্ষণ। তৈলাক্ত ত্বক যাদের, তাদের জন্যে সাজগোজ হয় মনের মতো। কারণ এসময় মুখে তেলতেলে ভাব হয় অতিসামান্য। এসময় এ ধরনের ত্বকের মানুষের সাজ হয়ে ওঠে কমনীয়। ভারি মেক-আপ যারা ভালবাসেন এখন তাদের সুসময়। প্রসাধনীর সবকিছু এসময় ব্যবহার করা যায়। প্রথমে ময়েশ্চারাইজিং লোশন মুখমণ্ডলে–বিশেষ করে দুচোখের পাশে সুন্দর করে লাগান। শীতকালে গাঢ় রঙের লিপস্টিক, লিপগ্লস ব্যবহার করতে পারেন। হাত-পায়ে ময়েশ্চারাইজিং লোশন লাগাতে ভুলবেন না। তা না হলে হাতের ত্বক খসখসে ধুলো লাগার মতো মনে হতে পারে।

বসন্তের সাজ

বসন্তকে বলা হয় ঋতুরাজ। এর স্থায়িত্ব খুব কম। বসন্ত ঋতুতে মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই জাগে আনন্দের শিহরণ। এ সময়টাই এমন যে, খুব গরম নয় আবার খুব শীতও নয়। তাই ত্বক হয়ে ওঠে সতেজ, উজ্জ্বল। এসময় সাজগোজ যেভাবেই করুন না কেন, দেখতে লাগবে সুন্দর। তবে এসময় মধ্যম ধরনের সাজগোজই মানায় বেশি। না বেশি গাঢ়, না বেশি হালকা। প্রকৃতি আর আবহাওয়ার কারণেই একটা প্রফুল্লস্নিগ্ধ ভাব আসে।

পোশাক

সাজের সাথে পোশাকের বিরাট সম্পর্ক। তাই এবার জেনে নিন ঋতু ভেদে কীরকম পোশাক পরবেন।

রূপচর্চা ও সাজগোজের পরই আসে পোশাক এবং অলংকার। তাই সময় এবং আচার-অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে এটি নির্বাচনে যদি ভুল করেন, তাহলে যতই রূপচর্চা করুন না কেন, সুন্দরী হোন না কেন, পরিপূর্ণভাবে আপনাকে

সুন্দরী বলা যাবে না। দেখতেও স্মার্ট লাগবে না। নিখুঁত প্রসাধনের সাথে সাথে সুরুচিপূর্ণ পোশাক এবং গহনার একটা সামঞ্জস্য না থাকলে আপনাকে লাবণ্যময়ী মনে হবে না। এটি একটি অন্যটির পরিপূরক। শুধু সাজলেই হবে না, আবার শুধু ভালো ভালো পোশাক পরলেই সুন্দর লাগবে না। সাজের সাথে মানানসই পোশাক যেমন দেহের সৌন্দর্য অপরূপ করে তোলে, ঠিক তার উল্টো হলে আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্যটুকুও দৃষ্টির অগোচরে চলে যেতে পারে। সেজন্যে সাজগোজের সাথে পোশাক নির্বাচন করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করবেন।

নিখুঁত প্রসাধন, সঠিক হেয়ার স্টাইল করার সাথে সাথে মানানসই রুচিসম্মত পোশাক ও অলংকার মিলিয়েই পরিপূর্ণ সাজগোজ বলা যাবে।

আধুনিক কালে বিভিন্ন ধরনের পোশাক আমাদের দেশের মেয়েরা পরলেও শাড়ি এখনও জনপ্রিয়তার দিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে। শাড়িতে শারীরিক অনেক খুঁতই ঢাকা যায়। যেমন ধরুন, একজনের খুব মোটা পা কিংবা খুব মোটা হাত–এগুলো অনায়াসেই শাড়ির অন্তরালে ঢেকে দেয়া যায়। এগুলো সালোয়ার-কামিজ কিংবা প্যান্ট-শার্ট পরে লুকিয়ে রাখার উপায় নেই। শাড়ির যেমন তুলনা নেই তেমনি আবার তাড়াহুড়ো করে কর্মব্যস্ত একজন নারী কর্মক্ষেত্রের জন্যে অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হওয়ার প্রয়োজনে সালোয়ার-কামিজেরও তুলনা হয় না। পোশাক নির্বাচনে প্রথমে আসা যাক শাড়ির কথায়। জেনে নিন কোথায় কখন কেমন শাড়ি পরা উচিত–

শাড়ি

প্রথমে বুঝতে হবে আপনার গায়ের রং, উচ্চতা, বয়স কী ধরনের আর কোথায় অর্থাৎ কী ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানে বা কর্মক্ষেত্রে আপনি যাবেন। এসব দিক খেয়াল রেখে আপনি শাড়ি নির্বাচন করবেন। শুধু শাড়ি নয়, যে-কোনো পোশাকের ক্ষেত্রেই এটি চিন্তা করতে হবে।

প্রথমেই আসা যাক রঙের কথায়। অনেকেই আছেন যাদের প্রায় সব রঙের শাড়িতেই মানিয়ে যায়। আবার অনেকে সুন্দর বা গায়ের রং ফর্সা হওয়া সত্ত্বেও সব রং তাদের মানায় না। আবার যারা সুদেহী তাদের সব শাড়িতেই মানায়। তবে চেহারার সঙ্গে মানানসই শাড়ি কেনাই বুদ্ধিমতীর কাজ। বাজারে বিভিন্ন ধরনের শাড়ি পাওয়া যায়। যেমন দামি শাড়ির মধ্যে কাতান বেনারসি বালুচরি সিল্ক জর্জেট শিফন ফুলভয়েল জামদানি টাঙ্গাইল ধনেখালি শান্তিপুরি মিরপুরি মাদ্রাজি মনিপুরি টিস্যু ইত্যাদি–আরও কত কী। মোটকথা শাড়ি বাছাই করবেন শরীরের গড়ন, বয়স এবং অনুষ্ঠান অনুসারে।

উচ্চতা, গড়ন ও রং অনুসারে কেমন শাড়ি পরা উচিত

মানুষের উচ্চতা তিন ধরনের। লম্বা, মাঝারি, খাটো। তেমনি দেহের গড়নও তিন ধরনের। যেমন পাতলা, মাঝারি ও মোটা। গায়ের রং তিন ধরনের। ফর্সা, শ্যামলা ও কালো।

উচ্চতা অনুসারে শাড়ি পছন্দের প্রক্রিয়া

লম্বা মেয়েরা যদি চওড়া পাড়ের শাড়ি পরেন তাহলে বেশ মানাবে। এতে লম্বা কিছুটা কম লাগবে। প্রিন্ট হলে বড় ধরনের প্রিন্ট পরতে বাধা নেই। শাড়ির কাজগুলো শাড়ির দৈর্ঘ্যের দিকে হলে ভালো। প্রস্থে হলে অর্থাৎ খাড়া হলে দেখতে আরও লম্বা লাগবে।

মাঝারি উচ্চতার মেয়েদের মোটামুটি সব ধরনের পাড় ও প্রিন্টে মানায়। তবে প্রস্থে প্রিন্ট ও কাজ করা হলে একটু লম্বা বেশি মনে হবে। পাড় বেশি চওড়া না, আবার বেশি ছোট নয়–এমন হলে ভালো লাগবে।

খাটো মেয়েদের পোশাক পরার ক্ষেত্রে বেশ বাছবিচার করে পরতে হয়। খাটো মেয়েরা কখনোই বড় পাড়ের শাড়ি, বড় প্রিন্টের বা শাড়ির দৈর্ঘ্যমুখী কাজওয়ালা শাড়ি পরবেন না। এতে আরও খাটো লাগবে। এদের শাড়ির পাড় সরু হলে কিংবা পাড় ছাড়া হলে ভালো লাগবে। প্রিন্ট হলে ছোট প্রিন্টের শাড়িতে কাজ করা কিংবা প্রিন্ট প্রস্থে (খাড়া) হলে ভালো। তাতে লম্বা লাগবে। খাটো মেয়েরা ফোলা শাড়ি পরবেন না, এতেও খাটো লাগবে।

গড়ন অনুসারে শাড়ি পছন্দের প্রক্রিয়া

মোটা গড়নের গোলগাল মেয়েরা অবশ্যই ফুলে থাকে এমন শাড়ি কিংবা খুব ভারি কাজের অর্থাৎ যে-সব শাড়ির পুরো জমিনে কাজ ভর্তি–এমন শাড়ি পরবেন না। এতে আরো মোটা দেখাবে। মোটা গড়নের মেয়েরা শরীরের সাথে লেগে থাকে এমন শাড়ি নির্বাচন করবেন। বেশি গাঢ় রঙের শাড়ি পরলেও মোটা লাগবে। ভারি জরিপাড় ধরনের শাড়িতেও মোটা লাগবে। কাতান পরলে শুধু পাড়-আঁচলে কাজ করা বা মধ্যে হালকা ছিট ছিট কাজ করা শাড়ি পরুন। শিফন হলে কিছুটা ভারি কাজের পরতে পারেন। এ শাড়িগুলো শরীরে লেগে থাকে। টিস্যু, মসলিন, ফুলে থাকা শাড়ি মোটেই পরবেন না। মোট কথা নিজেকে বেশি মোটা লাগে–এমন শাড়ি কখনো পরা উচিত নয়।

মাঝারি গড়নের মেয়েদের সব ধরনের শাড়িই মোটামুটি চলে। তবে বেশি ফুলে থাকে এমন শাড়ি, যেমন–টিস্যু বা মসলিন পরলে স্বাস্থ্য ভারী মনে হবে। তারা মোটামুটি সব কাজের সব প্রিন্টের শাড়িই পরতে পারেন।

পাতলা বা রোগা গড়নের মেয়েরা এমন শাড়ি পরবেন, যা একটু ফুলেফেঁপে থাকে। ভারি কাজের, গাঢ় রঙের–সবই তারা পরতে পারেন, এতে স্বাস্থ্য একটু ভালো দেখাবে। শুধু শরীরের সাথে লেগে থাকে এমন শাড়ি ভুল করেও পরবেন না।

গায়ের রং অনুসারে শাড়ি পছন্দের প্রক্রিয়া

ফর্সা রঙের মেয়েদের গাঢ় রঙের চেয়ে হালকা রঙে বেশি মার্জিত লাগে। ফর্সারও ধরন আছে। সাদা ফর্সা, গোলাপি ফর্সা, হলদে ফর্সা। সাদা ফর্সাদের হালকা রঙের পোশাক বেশি ভালো লাগে। গাঢ় হালকার মিশ্রণেও ভালো মানায়। গোলাপি বা লালচে ফর্সাদের মাঝামাঝি গাঢ় রং কিংবা হালকা–দুটোই মানায়। হলদে ফর্সাদের সব রং-ই মানায়। তাদের পাড় গাঢ় রঙের এবং জমিনে হালকা রং–এসব শাড়ি মানাবে। হালকা গোলাপি, হালকা বেগুনি, সী গ্রীন, মস গ্রীন, ফিরোজাসহ নানাধরনের হালকা রঙের জমিনে গাঢ় কাজ করা ইত্যাদি শাড়ি পরতে পারেন। রাতে বিয়ে বাড়িতে অথবা জমকালো কোনো অনুষ্ঠানে ভারি রঙের শাড়ি পরতে পারেন। অলংকার পরুন সোনালি কাজের শাড়ি হলে সোনার কিংবা ইমিটেশনে সোনার রং অথবা শাড়ির সাথে ম্যাচ করে সে রঙের পাথরের গহনা। তবে রূপালি রঙের কাজের সাথে সোনালি গহনা পরবেন না। এতে বেমানান মনে হবে। সোনালি বা রূপালি–কোনো কাজই নেই–এমন শাড়ি হলে অক্সিডাইস গহনাও পরতে পারেন ম্যাচ করে।

শ্যামলা রঙের মেয়েদের জন্যে বাসন্তি, হলুদ, ডিমের কুসুম হলুদ, হালকা কমলা, মেরুন, সাদার সাথে লালের কম্বিনেশন পাড়, হালকা সবুজ–অর্থাৎ আপনার গায়ে ধরে দেখুন, মাথায় কাপড় ঘুরিয়ে ঘোমটা টেনে আয়নায় দেখে নিন–কী ধরনের রঙে আপনাকে উজ্জ্বল লাগে–সে ধরনের শাড়ি বেছে নিন। কালচে বেগুনি অর্থাৎ ঘন গাঢ় বেগুনি, নীল, গাঢ় ঘন কালচে সবুজ ইত্যাদি রং পরলে গায়ের রং আরও ময়লা লাগবে। তবে

কালচে ব্লুতে (নেভি ব্লু) শ্যামলাদের ভালো লাগে। অনুষ্ঠানে বা পার্টিতে মেরুন রঙের মধ্যে সোনালি পাড় কাজ, নেভি ব্লু-তে জমকালো কাজ, মাস্টার ইয়েলো ইত্যাদি শাড়ি রাতের অনুষ্ঠানে পরতে পারেন।

কালো মেয়েদের জন্যে রং বাছাই করা খুব মুশকিল। তবে ফিগার, চেহারা আকর্ষণীয় হলে শ্যামলা মেয়েদের যা পরলে ভালো দেখায় তাদেরও সে রং ভালো লাগবে। তবে কখনো কটকটে লাল রং পরবেন না। এটা দৃষ্টিকটু লাগবে।

এছাড়া আজকাল নানা শেডের শাড়ি বেরিয়েছে। যে শাড়ি পরলে আপনাকে মানানসই মনে হবে সেটাই পরতে পারেন।

অলংকার সোনা, রুপা, অক্সিডাইস (কালো), অক্সিডাইস (তামাটে) ইত্যাদি যা-ই পরুন না কেন, শাড়ির সাথে কিংবা সালোয়ার-কামিজের সাথে মানানসই হতে হবে।

সালোয়ার-কামিজ যারা পরেন তারাও মোটা, পাতলা, মাঝারি সম্পর্কে উলিখিত বিষয়গুলো অনুসরণ করুন। অর্থাৎ মোটা গড়নের মহিলারা ফুলে থাকে এমন মচমচে কাপড়ের সালোয়ার-কামিজ পরবেন না।

পাতলা গড়নের মহিলারা লেগে থাকে এমন কাপড়ের সালোয়ার-কামিজ পরবেন না। একটু ভারি ধরনের ফোলা কাপড় পরুন।

মাঝারি গড়নের মহিলারা সব ধরনের কাপড় পরতে পারলেও বেশি ফুলে থাকে–এমন সালোয়ার-কামিজ পরবেন না।

অলংকার বা গহনা

প্রাচীনকাল থেকেই গহনা বা অলংকারের প্রচলন। আদিম যুগে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই অলংকার পরত। তখন অবশ্য সোনা রুপা মনিমুক্তার অলংকারের প্রচলন ছিল না। অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হতো ফুল, লতাপাতা, গাছের ছালবাকল, শেকড়, জন্তুজানোয়ারের হাড়, শিং, পাখির পালক ইত্যাদি। অবশ্য অলংকার হিসেবে ফুলের কদর এখনো কমে নি। বিয়েবাড়িতে হলুদের অনুষ্ঠানে এখনো ব্যবহৃত হয় ফুলের গহনা। আর এখন অলংকার হিসেবে এসেছে সোনা রুপা হীরা মুক্তা রত্নরাজি। দামি গহনা অনেকের পক্ষেই হয়তো কেনা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি ম্যাচিং করে মাটির গহনাও পরেন, তাতেও আপনি হয়ে উঠতে পারেন অপরূপা। আবার স্থানকাল চিন্তা না করে খুব দামি গহনা পরেও হাসির পাত্রী হতে পারেন।

আজকাল রুপার গহনা বেশ জনপ্রিয়। এর কারণ সোনার প্রচুর দাম এবং নিরাপত্তার অভাব। আবার অন্য দিকে সোনা বা রুপার বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ইমিটেশন গহনা। এসব গহনার একটা নিজস্ব সৌন্দর্যও রয়েছে। এগুলো পোশাকের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরলে দেখতে খুবই সুন্দর এবং স্মার্ট লাগবে। আর দাম কম হওয়ায় কেনাও সহজ। আজকাল অল্পবয়সী মেয়েরা ইমিটেশন গহনা পরতে ভালবাসে, দেখতেও বেশ লাগে।

পোশাকের মতো গহনায়ও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ডিজাইনের পরিবর্তন ঘটছে। নানী-দাদীরা ভারি গহনা ছাড়া চিন্তাই করতেন না। এখন অনেক অল্প সোনা/ রুপা দিয়েই হালকা ধরনের রুচিসম্মত গহনা তৈরি হচ্ছে, যা আমরা পোশাক ও চেহারার সাথে মিলিয়ে অনায়াসে পরতে পারি।

সাজসজ্জায় পোশাকের সাথে গহনা পরা হয় সৌন্দর্য বাড়াতে। তাই আমাদের জানা প্রয়োজন কোন অনুষ্ঠানে কী শাড়ি ও কীরকম মেক-আপ-এর সাথে কী ধরনের গহনা পরলে বেশি মানানসই হবে। যদি তা আমরা বুঝতে পারি তাহলে অন্যের সামনে অপ্রস্তুত হতে হবে না।

এখন কেউ আর আগের মতো একগাদা গহনা পরাটাকে প্রাধান্য দেয় না। পোশাক ও সাজের সাথে মানানসই হালকা গহনায়ও আপনাকে চমৎকার লাগতে পারে। প্রচুর গহনা থাকলেই যে তা পরবেন, এরকম মনোভাব যেন আপনার না হয়। যেমন–হাতভর্তি চুড়ি পরে সাধারণ অনুষ্ঠানে যাওয়া যায় কিন্তু গলাভর্তি একগাদা গহনা পরলে রুচিবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

অলংকার বা গহনা পরার ছোটখাটো কয়েকটি বিষয়–

রাতের অনুষ্ঠানে বিয়েবাড়িতে ভারি গহনা পরতে পারেন। দিনের বেলার অনুষ্ঠানে হালকা গহনা ব্যবহার করাই ভালো। গহনা পরার ক্ষেত্রে আপনার বয়স বিবেচনায় রাখুন।

বয়স যাদের একটু বেশি তারা হালকা মেক-আপের সাথে সোনার গহনা বা পাথরের গহনা শুধু হাতে, কানে ও গলায় পরবেন। হাতভর্তি চুড়ি বা সে জাতীয় জিনিস পরুন। গলায় লম্বা চেইন বা হালকা নেকলেস পরতে পারেন। তাতে আপনাকে মার্জিত মনে হবে।

যাদের বয়স কম তারা যেমন খুশি তেমন সাজো। তবে মেক-আপের সাথে পোশাকের দিকটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে। আজকাল ইমিটেশনের নানা ধরনের গহনা পাওয়া যায়। তা-ও পরতে পারো। আবার রুপার গহনাও বেশ লাগে। পোশাকের রঙের সাথে মিলিয়ে ইমিটেশন গহনাও ভালো লাগবে।

অনেকেই বাড়ির হালকা অনুষ্ঠানে জড়োয়া গহনা পরে বসেন, এটা করবেন না। এতে রুচিবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়। একমাত্র বিয়েবাড়িতে কিংবা জমকালো অনুষ্ঠান ছাড়া ভারি অলংকার না পরাই ভালো। গহনা আধুনিক কিংবা পুরানো দিনের হতে পারে–শুধু খেয়াল রাখতে হবে কোন অনুষ্ঠানে কী পরবেন।

দেহ ও সাজ পোশাকের সাথে মানিয়ে গহনা পরার নিয়ম

১. কখনোই সোনালি কাজ করা শাড়ির সাথে রুপার গহনা পরবেন না।

২. যাদের গ্রীবা (গলা) লম্বাটে তারা গলায় চিক কিংবা গলার কাছে এঁটে থাকে এমন গহনা পরলে ভালো দেখাবে। কানে মাঝারি বা ছোট জিনিস ভালো লাগবে। গলায় ভারি গহনা পরলে কানে ছোট পরতে পারেন।

৩. যাদের গলা লম্বায় ছোট অর্থাৎ খাটো গলায় কখনোই ভারি বা আঁটসাঁট গহনা পরবেন না। এতে গলা আরো ছোট দেখাবে। ঢিলেঢালা লম্বা হার ও চেইন এবং কানে লম্বাটে ধরনের দুল পরলে লম্বা মনে হবে। মানানসই লাগবে।

৪. যাদের গড়ন রোগাপাতলা, ছোটখাটো তাদের জন্যে ছোট ধরনের গহনাই মানানসই হবে।

৫. লম্বা এবং মাঝারি গড়নের মহিলারা বড় মাপের ভারি গহনা অনায়াসে পরতে পারেন।

৬. যদি গলা ও ঘাড় তুলনামূলক চওড়া হয় তাহলে গলার জন্যে বেছে নিন ভারি গহনা ও কানে পরুন লম্বা ধরনের দুল।

গহনা পরিষ্কার ও ভালো রাখার প্রক্রিয়া

১. ইমিটেশন গহনা সবসময় বাতাস না লাগে এমন বাক্সে রাখুন। প্রয়োজনে তুলো দিয়ে পেঁচিয়ে রেখে দিন। তাহলে রং নষ্ট হবে না।

২. রুপার গহনায় বাতাস লাগলে কালচে হয়ে যায়। তাই এটিতেও বাতাস যাতে না লাগে সেভাবে বাক্সে রেখে দিন এবং ময়লা হলে হালকা গরম পানিতে জেট পাউডার গুলিয়ে তাতে ভিজিয়ে রেখে দিন ১৫/২০ মিনিট। তারপর ব্রাশ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করলেই নতুনের মতো লাগবে। তবে বেশি কালো হলে দোকানে দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে পারেন।

৩. সোনার গহনা বাতাস লাগলেও কালো হয় না, তবে মাঝে মাঝে ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে একেও গরম পানিতে জেট গুলে নিয়ে ১৫/২০ মিনিট ভিজিয়ে ব্রাশ করে ধুয়ে নিলে চকচক করবে। অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগেও পরিষ্কার করে নিতে পারেন।

প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন, দৈহিক সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটে তার সামঞ্জস্যপূর্ণ শারীরিক গড়ন, ত্বকের উজ্জ্বলতা, নিখুঁত সাজ, হেয়ার স্টাইল, রুচিসম্মত পোশাক এবং অলংকারে। তেমনি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য বলতে এর সাথে থাকতে হবে মার্জিত আচরণ চলাফেরা কথাবার্তা আত্মবিশ্বাস আদবকায়দা দাঁড়ানো-হাঁটাচলা-বসার সঠিক ভঙ্গি এবং ব্যক্তিত্ব ও মানবিক গুণাবলি। এসব মিলিয়ে একজন নারী হয়ে উঠতে পারেন পরিপূর্ণ আকর্ষণীয় সুন্দরী। এসব গুণ না থাকলে তাকে পরিপূর্ণ সুন্দরী বলা যাবে না।

মার্জিত ব্যবহার ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ প্রো-একটিভ আচরণের মাধ্যমে আপনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুরুচির পরিচয় দিয়ে সৌন্দর্যের আবেদন অনেকখানি বাড়িয়ে নিতে পারেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শিষ্টাচার, প্রো-একটিভ ব্যবহার ও মার্জিত আচরণের গুরুত্ব এত বেশি যে, তা একজন সাধারণ নারীকেও অসাধারণ করে তোলে। বহু ক্ষেত্রে এ আচরণ রূপের ঘাটতিও ঢেকে দেয়। তাই যে নারী প্রসাধন, অলংকার, সাজপোশাক ইত্যাদির মাধ্যমে সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটান শুধু তাকেই আমরা সুন্দরী বলব না; বরং আমরা তাকেই সুন্দরী বলব, যার সুন্দর আচরণ ও ব্যক্তিত্ব অন্যকে আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত করে।

আচারব্যবহার

একজন মানুষের মধ্যে তার আচারব্যবহার সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান তৈরি হয় ছোট বয়স থেকেই। অন্যের প্রতি কী ধরনের ব্যবহার করা উচিত সে সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা পায় সে তার পরিবার থেকে। তাই আপনাকে আপনার পরিবারে মা-বাবা, স্বামী-স্ত্রী, ভাইবোন, ছেলেমেয়ে ও কাজের লোক বা গৃহকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, নম্র, বিনয়ী, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে

হবে, তেমনি পরিচিত, অন্তরঙ্গদের সাথে, প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনদের সাথেও স্বাভাবিক সুন্দর ব্যবহার করতে হবে।

আপনি যদি পরিবারের সবার সাথে ভালো ব্যবহারে অভ্যস্ত না হন, তবে পরিবারের বাইরে যে বিশাল জগৎ রয়েছে সেখানে কখনো ভালো ব্যবহার করতে পারবেন না। আর আপনার আচরণের ওপর নির্ভর করবে আপনি বা আপনার সঙ্গ অন্যের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য বা আকর্ষণীয়। মনে রাখবেন, আপনি যে-রকম আচরণ করবেন, অন্যের কাছ থেকেও তেমনি আচরণ পাবেন। হয়তো যার সাথে ভালো আচরণ করেছেন সে আপনার সাথে সে-রকম আচরণ না-ও করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে তা অন্য জায়গা থেকে আপনি পাবেন। কোয়ান্টাম মেথডে একে বলা হয় 'Laws of Natural Return'।

কখনো কখনো আমরা শুনে থাকি–আরে, অমুকের মতো লোক হয় না, অমুক মহিলার ব্যবহারের তুলনা হয় না। আসলে এটা তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়। আপনিও ইচ্ছে করলে তা পারবেন। আসল কথা, যে-কোনো পরিস্থিতিতে প্রো-একটিভ থেকে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা যার মধ্যে বেশি সে-ই এ গুণের অধিকারী হতে পারে। একটু চেষ্টা করলে আপনিও ধীরে ধীরে এ গুণের অধিকারিণী হতে পারেন।

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক সমাজে আছে হতাশা, ব্যর্থতা, দুঃখযন্ত্রণা। আপনাকে পরিস্থিতি সামলে নিয়ে শোকরগোজার থাকতে হবে। হতাশ হয়ে, অস্থির হয়ে দুর্ব্যবহার করলে কেউ আপনাকে ভালো দৃষ্টিতে দেখবে না। ক্রমান্বয়ে কাছের মানুষগুলোও আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। কাজেই পরিস্থিতি যা-ই হোক, তাকে সামলে নিয়ে মনকে প্রশান্ত রেখে মিষ্টি ব্যবহার দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

আচারব্যবহারের সাথে আপনাকে অবশ্যই আত্মমর্যাদার দিকে নজর রাখতে হবে। আত্মমর্যাদা বজায় রেখেই আপনি অন্যের সাথে সে-রকম ব্যবহার করবেন। পরিবার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ও কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে ব্যবহারে অবশ্যই সৌজন্যবোধ ও সহৃদয়তার পরিচয় রাখতে হবে।

অহংকার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারলে সবার কাছে আপনি হয়ে উঠবেন আকর্ষণীয়। পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষাপরায়ণতা যদি আপনার মধ্যে থাকে, সেগুলোকে দূর করতে হবে। আত্মমর্যাদা বজায় রাখতে গিয়ে যেন দাম্ভিক না হয়ে ওঠেন, সেদিকে খেয়াল রাখুন। যথাসম্ভব বিনয়ী হোন। তাহলেই আপনি যে-কোনো পরিবেশে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে পারবেন।

কথাবার্তা

কথাবার্তায় যতটা সম্ভব সত্য বলতে চেষ্টা করবেন। বললেন এক, করলেন আরেক। কাউকে কথা দিয়ে কথা রাখলেন না আবার এমন একটা কথা বলে ফেললেন, যেটা অন্যের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াল; অথচ আপনি না বললেও পারতেন। তাই কথাবার্তায় সবসময় সংযমী হতে হবে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কখনো কখনো সত্য বলতে না পারলেও অহেতুক মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। একবার যদি আপনার সম্পর্কে মানুষের এমন ধারণা হয় যে, আপনি যা বলেন তা প্রায়ই মিথ্যা, তাহলে আপনার সত্য কথাকেও মানুষ মিথ্যা ভাববে। আপনার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করবে।

দাঁড়ানো, বসা, হাঁটাচলার ভঙ্গি

দাঁড়ানো, বসা বা হাঁটাচলার ভঙ্গি দেহ সৌন্দর্যকে অনেকখানি আকর্ষণীয় করে তোলে। দাঁড়ানো, হাঁটাচলা, বসার ভঙ্গি হওয়া উচিত ঋজু অর্থাৎ কাঁধ সোজা রেখে ঘাড় উঁচু করে টানটান ভঙ্গিতে দাঁড়াবেন। হাঁটাচলা করবেন দৃষ্টি সামনে রেখে। যার সাথে কথা বলবেন দৃষ্টি তার বরাবর রাখবেন। বাঁকা হয়ে, ঝুঁকে, কুঁজো হয়ে দাঁড়ালে হাঁটলে চললে বা বসলে আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য কমে যাবে। শালীনতা বজায় রেখে শোভন ভঙ্গিতে বসবেন। চেয়ারে বসলে সোজা ভঙ্গিতে বসবেন। কখনো পা দোলাতে থাকবেন না। এটি অশিষ্টাচার। এ ধরনের অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। বহুক্ষণ বসে থাকতে হলে পা পাল্টে বসুন। মাটিতে বসতে হলে দুই পা মুড়ে আরামদায়ক ভঙ্গিতে বসুন কিন্তু খেয়াল রাখবেন, আপনার পা যেন শাড়ি দিয়ে ঢাকা থাকে। তা না হলে দৃষ্টিকটু লাগবে। অর্থাৎ আপনার বসার ভঙ্গি এমন হবে, যাতে আপনার মাঝে শালীনতাবোধের পরিচয় ফুটে ওঠে।

সুন্দরভাবে কথা বলুন

সুন্দরভাবে কথা বলা একটি বিশেষ গুণ। সুন্দর কথা দিয়ে জয় করতে পারেন অনেকের মন। কখনো কারো সাথে আলাপ করলে আপনি অবশ্যই তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। কিছুতেই যেন সে না ভাবে আপনি তাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তাই অন্যের কথা মন দিয়ে শোনার ধৈর্য আপনাকে রপ্ত করতে হবে। মানুষ সহজাতভাবেই চায় তার কথা সকলে শুনুক। কথার মধ্যে কথা বলে ওঠা বিরক্তিকর। তাই একজনের কথা শেষ হতে দিন, তারপর আপনার কথা বলুন। সবসময় গুছিয়ে কথা বলুন। একজন বলল

এক, আপনি বুঝলেন আরেক–এরকম করবেন না। কথার প্রসঙ্গ যা, তার বাইরে বলার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। কখনো কাউকে সরাসরি অপমানজনক কথা বলে আহত করবেন না। প্রয়োজনে পরে তার সাথে আলাপ করে শুধরে দিতে পারেন। কারো কথায় ভুল থাকলে তাকে আক্রমণ না করে তার বিষয়ের ভুল অংশ তুলে ধরে এমনভাবে বলুন, যাতে অন্যেরা বিষয়টি বুঝতে পারে। অহেতুক উত্তেজনা যেন না বাড়ে। সবসময় মার্জিতভাবে নিজের মত প্রকাশ করুন।

কথা বলার সময় এক কথা বার বার উচ্চারণ করবেন না। এটি শ্রুতিকটু লাগবে। কথার মাঝখানে প্রয়োজনে উঠতে হলে নম্র ও বিনয়ের সাথে অনুমতি নিয়ে স্থান ত্যাগ করুন। সবিনয়ে বলুন, আমার একটু জরুরি প্রয়োজন ছিল আমাকে এখন যেতে হয়, যদি অনুমতি দেন আসতে পারি। অনেকেই কথার মধ্যে শব্দ করে, এটাও ঠিক নয়। কেউ কেউ নাক টানেন। এগুলো ত্যাগ করতে হবে। কথার মাঝে হাসির প্রসঙ্গ এসে গেলে স্থান-কাল বিচার করে হাসির বহিঃপ্রকাশ করুন। ঘরোয়া পরিবেশে প্রাণ খুলে হাসুন। সামাজিক অনুষ্ঠানে সংযত থেকে হালকা হাসুন। হাসিঠাট্টা, রসিকতা–সবকিছুই উপভোগ করবেন, তবে এমন করবেন না যেন অশোভন লাগে।

মানবিক গুণাবলি

মানবিক গুণাবলির দিকটিও আপনাকে অর্জন করতে হবে। মানুষের জন্যে ভালবাসা সার্বজনীন হওয়া চাই। আত্মকেন্দ্রিক বা শুধু স্বজনদের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবেন না। কেউ যদি ভাবে আপনি নিজের ও স্বজনদের ছাড়া কিছুই ভাবেন না অর্থাৎ এক কথায় স্বার্থপর–এমন হলে চলবে না। মানুষ হিসেবে স্রষ্টা আপনাকে পাঠিয়েছেন এ পৃথিবীতে মহান কিছু করার জন্যে। সেটা নিজের জন্যে যে-রকম, তেমনি অন্যের জন্যেও।

শিষ্টাচার

মানবীয় গুণাবলির মধ্যে একটি প্রধান গুণ হলো শিষ্টাচার, যা একজনের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলে। সমাজের নানান অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশের শিকার আপনি হতেই পারেন। এতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। একটু বুদ্ধি খাটালেই পরিস্থিতি যেমনই হোক আপনি সামলে নিতে পারবেন। দেখা গেল বাইরে গেছেন, কেউ অশালীন ইঙ্গিত করল, কেউ আগ বাড়িয়ে অযথা আলাপ করতে এলো, এ-ক্ষেত্রে বিষয়টি নিয়ে রাগারাগি না করে না-শোনার বা না-বোঝার ভান করে এড়িয়ে যাবেন। এরকম বিরক্তিকর পরিস্থিতিতে

আপনাকে সাধারণ শিষ্টাচার প্রকাশ করার দায়িত্ব পালন করতে হবে, যাতে সেখানে উপস্থিত আর পাঁচজনকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তে না হয়।

দৈনন্দিন জীবনেও আপনাকে সাধারণ শিষ্টাচার ও সৌজন্য প্রকাশে সচেতন হতে হবে। কর্মস্থলে বা ঘরে কিছু মেহমান নিয়ে হঠাৎ একজন এলে আপনার উচিত হবে নিজে অপরিচিতদের সাথে পরিচিত হওয়া, যাতে তারা অস্বস্তি বোধ না করেন। আবার হোটেল রেস্তোরাঁ বা কোনো অনুষ্ঠানে খাওয়ার সময় কখনোই 'ফুরুত ফুরুত' শব্দ করে তরল জিনিস খাবেন না কিংবা অযথা ছুরি, কাঁটা-চামচ দিয়ে টুংটাং শব্দ করবেন না। খাবার সময় মুখে ভঙ্গিমা করার অভ্যাস থাকলে পরিহার করবেন। এগুলো আদব বা শিষ্টাচারের পরিপন্থী। আসলে শিষ্টাচার আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য বিকশিত করবে। কারো সাথে দেখা হলে বা কেউ আপনার বাড়িতে এলে আগে তাকে সালাম দিন। শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। তার পরিবারের কুশলাদি জিজ্ঞেস করুন। অনুষ্ঠানে যদি দাওয়াত করে থাকেন তাহলে জিজ্ঞেস করুন কোনো রকম অসুবিধে হচ্ছে কিনা ইত্যাদি। আপনার মার্জিত ব্যবহার অন্যদের মাঝে আপনাকে এক মর্যাদাকর আসনে উন্নীত করবে।

ব্যক্তিত্ব

ব্যক্তিত্ব মানবচরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিক। শুধু সাজপোশাক দিয়েই তা ফুটিয়ে তোলা যায় না। এর প্রকাশ ঘটে আচার-আচরণ, কথাবার্তা ও মানবিক গুণাবলি প্রকাশের মাধ্যমে। যারা বয়সে ছোট তাদের সাথে যেমন হতে হবে সহজসরল, তেমনি বয়োজ্যেষ্ঠদের ক্ষেত্রে হবেন শ্রদ্ধাশীল বিনয়ী নম্র ও ভদ্র। জীবন সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে, সেইসাথে থাকতে হবে সঠিক মত প্রকাশের সৎসাহস। অর্থাৎ চিন্তায় সৎ আর যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় সাহসী হতে হবে। জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে হবে। মেধার বিকাশ ঘটিয়ে নিজেকে দক্ষ মানুষে রূপান্তরিত করতে হবে। মনে রাখবেন, ব্যক্তিত্বহীন মানুষকে কেউ পছন্দ করে না। সে অন্যের করুণা পেলেও মর্যাদা পায় না।

পারিবারিক শিষ্টাচার

মানুষ একা বাঁচতে পারে না, সুখী হতে পারে না। সুন্দর ও সামাজিক জীবনই মানুষকে সুখী ও পরিতৃপ্ত করে। আর সমাজের প্রাথমিক একক হচ্ছে পরিবার। জাগতিক ও আত্মিক সুখসমৃদ্ধির ভিত্তিও হচ্ছে পরিবার। পরিবার গড়ে ওঠে একজন নারী ও একজন পুরুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। এ সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ হবে, যত মমতা ও শ্রদ্ধামাখা হবে, পারস্পরিক আচার-আচরণ যত প্রো-একটিভ, সুশৃঙ্খল ও সুপরিকল্পিত হবে, জীবনে তত সুখ, পরিতৃপ্তি ও সার্থকতা আসবে। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, সুখী পরিবারের ভিত্তি হচ্ছে ভালবাসা মমতা শ্রদ্ধা শৃঙ্খলা ও আত্মিক একাত্মতা। সবসময় মনে রাখতে হবে, পরিবারে নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। এই পরিপূরক একাত্মতাই সুখসমৃদ্ধির ভিত্তি। তাই পরিবারে নারী ও পুরুষের বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, অভ্যাস ও আচরণ যত প্রো-একটিভ ও সুশৃঙ্খল হবে ততই পরিপূরক একাত্মতা সৃষ্টি হবে, জীবনে আসবে স্বর্গীয় প্রশান্তি।

সফল পরিবার গঠনের প্রক্রিয়া
পুরুষ ও নারী উভয়ের করণীয়

ব্যক্তিজীবনে

১. সকালে ঘুম ভাঙতেই বলুন–'শোকর আলহামদুলিলাহ/ থ্যাংকস গড/ হরি ওম/ প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ।' জীবনে কী নেই, তা না ভেবে কী আছে–তা নিয়ে ভাবুন।

২. স্রষ্টায় অবিচল বিশ্বাস ও আস্থা রাখুন।

৩. নিয়মিত আবশ্যিক ইবাদত/ উপাসনা করুন।

৪. দায়িত্বশীল ও আত্মবিশ্বাসী হোন।

৫. আত্ম উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত পড়াশোনা করুন।

৬. পরিমিতি ও সংযম অবলম্বন করুন।
৭. সব ব্যাপারে সময় ও নিয়মানুবর্তী হোন।
৮. পরিকল্পিতভাবে সকল কাজ করুন।
৯. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকুন। শালীন ও মার্জিত পোশাক পরিধান করুন।
১০. শুদ্ধ ও সুন্দর ভাষায় কথা বলুন।
১১. পরচর্চা ও গীবত করবেন না। মিথ্যা বর্জনে সচেষ্ট থাকুন।
১২. নিয়মিত আত্মপর্যালোচনা করুন।

আচরণে

১. সবসময় প্রো-একটিভ থাকুন ও হাসিমুখে কথা বলুন।
২. সবসময় মনে রাখুন, রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন।
৩. কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করুন।
৪. নিজেকে আদর্শ মানুষ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করুন।
৫. রাগ ও ক্রোধের বশে কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকুন।
৬. বিতর্ক ও ঝগড়া কৌশলে পরিহার করুন।
৭. সেন্টিমেন্ট ও আবেগ প্রকাশে কুশলী হোন।
৮. কর্মচারী ও গৃহকর্মীর সাথে মানবিক আচরণ করুন।
৯. কাউকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবেন না।
১০. কাউকে ঠকানোর চেষ্টা করবেন না।
১১. কারো প্রতি ক্ষোভ ও ঈর্ষা পোষণ করবেন না।
১২. স্বজ্ঞানে অন্যের ক্ষতি করবেন না।
১৩. জীবনের সর্বক্ষেত্রে অপচয়কে পরিহার করুন।
১৪. সৎ ও বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিতি লাভের চেষ্টা করুন।
১৫. অহংকার ও লোক-দেখানো আচরণ না করে আন্তরিক ও বিনয়ী হোন।

পারিবারিক জীবনে

১. সবসময় 'কী পেতে পারি' নয়, 'কী দিতে পারি'—এ চিন্তা করুন।
২. পরস্পরকে বুঝতে চেষ্টা করুন।
৩. পারিবারিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সবার মতামতকে গুরুত্ব দিন।

৪. অন্যের কথায় কান দেবেন না। নিজেরাই আলাপ-আলোচনা করে ভুল বোঝাবুঝি দূর করুন। তৃতীয় কাউকে এতে জড়াবেন না।
৫. ঘরের কথা বাইরে বলা থেকে বিরত থাকুন।
৬. পরস্পরের জন্যে নিয়মিত দোয়া করুন।
৭. পরিবারে অশান্তি ও কলহ সৃষ্টি হতে পারে এমন কথা বলবেন না।
৮. একান্নবর্তী পরিবার হলে সবার সন্তানকেই এক নজরে দেখুন। সবার জন্যে একই মানের কেনাকাটা করুন।
৯. ভ্রমণ ও বিনোদনের ব্যাপারে পরিবারের বেশিরভাগের মত অনুসারে সিদ্ধান্ত নিন। সবাইকে নিয়ে বেড়ানোর চেষ্টা করুন।
১০. পরিবারের সবাইকে নিয়ে নিয়মিত আত্ম উন্নয়নমূলক আলোচনার আয়োজন করুন।
১১. অপ্রয়োজনে জ্বলে থাকা বাতি বা ফ্যান বন্ধ রাখুন।
১২. টিভি দেখে সময় নষ্ট না করে পরিবারের সদস্যদের সময় দিন।
১৩. পরিমিত পানি খরচ করুন। কল খোলা রেখে পানি অপচয় করবেন না।
১৪. সমাজের চোখে দৃষ্টিকটু সম্পর্ক বর্জন করুন। দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়–এমন সম্পর্ক এড়িয়ে চলুন।
১৫. গৃহকর্মীদেরকে নিজেদের সমমানের খাবার প্রদান করুন।
১৬. পরিবারকে ধূমপান ও নেশামুক্ত রাখুন।

সন্তান পালনে

১. ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সন্তানকে সমান দৃষ্টিতে দেখুন। এক সন্তানকে অন্য সন্তানের সঙ্গে তুলনা করবেন না।
২. সন্তানকে নেতিবাচক কথা বলে তিরস্কার করবেন না। সন্তানকে ধমকে কথা বলবেন না। রাগের মাথায় অভিশাপ দেবেন না।
৩. অন্যের সামনে সন্তানকে বকবেন না, ভুল ধরিয়ে দেবেন না।
৪. সন্তানকে ছোট থেকেই স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলুন।
৫. সন্তানকে সবসময় আদেশ না করে তার করণীয় কাজ যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিন। যে-কোনো ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করুন।
৬. সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দিন। তাদের বন্ধুদের ব্যাপারে সজাগ থাকুন। সন্তানের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করুন ও নিজেদেরকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করুন।

৭. সারাক্ষণ শুধু পড়ার কথা না বলে খেলাধুলা, বেড়ানো, বই পড়া ইত্যাদি সুস্থ বিনোদনের সুযোগ করে দিন।
৮. সন্তান কোনোকিছু চাওয়ার সাথে সাথেই তাকে তা দেয়ার অভ্যাস পরিহার করুন। তাদের অন্যায় আবদার পূরণ করবেন না।
৯. বয়স ১৮ বছর হওয়ার আগে সন্তানকে স্মার্টফোন দেবেন না। বিনোদনের নামে সন্তান অপসংস্কৃতি ও ড্রাগ এডিকশনের শিকার হচ্ছে কিনা, সেদিকে লক্ষ রাখুন।
১০. সন্তানের বয়স ১৮ হলে পারিবারিক পরামর্শে তাকেও অংশীদার করুন।
১১. তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগে দক্ষ মানুষরূপে গড়ে তুলুন।
১২. সন্তানের নৈতিক, মানসিক, আত্মিক ও সৃজনশীল গুণাবলি বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করুন।
১৩. চাকরির পরিবর্তে সন্তানকে স্বাধীন পেশা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করুন।
১৪. আগে সালাম দেয়া ও হাত মেলানোয় অভ্যস্ত করে তুলুন।
১৫. পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য ও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সন্তানকে যথাযথ ধারণা দিন। আর্থিক ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলবেন না।
১৬. সন্তানের ওপর জীবনের লক্ষ্য চাপিয়ে দেবেন না। সিদ্ধান্ত নিতে তাকে সহযোগিতা করুন।
১৭. সন্তানকে আদরের নামে প্রশ্রয় দেবেন না ও শাসনের নামে অত্যাচার করবেন না। আদর ও শাসনের সমন্বয়ে তাকে বিকশিত হতে দিন।

সন্তান হিসেবে

১. মা-বাবাকে সম্মান করুন, তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করুন।
২. মা-বাবার কোনো ভুল আচরণে ক্ষুব্ধ হবেন না। মনে রাখুন–তাদের মাধ্যমেই আপনি পৃথিবীতে এসেছেন।
৩. যে-কোনো ভালো কাজে যাওয়ার আগে তাদের দোয়া নিন।
৪. বয়োবৃদ্ধ মা-বাবাকে নিজের শিশু সন্তানের মতো যত্ন নিন।
৫. ঘরের কাজে সাধ্যমতো সাহায্য করুন।

পরিবারে বয়স্কদের প্রতি

১. সহানুভূতিশীল হোন। তাকে সময় দিন। তার খাওয়াদাওয়া, চিকিৎসা, আর্থিক এবং অন্যান্য প্রয়োজনে খোঁজখবর নিন।

২. পরিবারে বয়স্কদের আগে সালাম দিন।
৩. বাড়ির ছোটদেরকে তার সঙ্গে গল্প করা, সময় কাটানোতে উৎসাহিত করুন।
৪. সবসময় তাকে বলুন, 'আপনি ভালো আছেন' এবং তাকে বুঝতে দিন 'আমরা আপনার পাশে আছি'।
৫. তাকে গুরুত্ব দিন। পারিবারিক সিদ্ধান্তে তার মতামত নিন।
৬. একের পর এক নিষেধাজ্ঞা সরাসরি চাপাবেন না। ক্ষতিকর অভ্যাস বর্জনের জন্যে তাকে উদ্বুদ্ধ করুন।
৭. চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়লে তার প্রতি মানবিক ও সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করুন।

তরুণ বয়সে

১. জ্ঞান অর্জন ও আত্ম উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টিকারী আবেগপ্রবণ সম্পর্ক পরিহার করুন।
২. অতি আবেগ পরিহার করে বাস্তবমুখী মানসিকতার বিকাশ ঘটান।
৩. জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন এবং সে লক্ষ্যে নিজের মেধা, শ্রম ও সময়কে সর্বতোভাবে কাজে লাগান।
৪. বিয়ের আগেই বিবাহ-পরবর্তী আচরণে জড়াবেন না।
৫. বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণকে নিয়ন্ত্রণ করুন।

আত্মনির্মাণে

১. নিয়মিত মেডিটেশন ও কোয়ান্টাম ব্যায়াম করুন।
২. সৎসঙ্ঘে যত বেশি সম্ভব মেধা, শ্রম ও সময় দেয়ার চেষ্টা করুন।
৩. আলোকিত জীবন গড়তে প্রতি মঙ্গলবার আলোকায়ন কার্যক্রমে সবান্ধব আসুন। সকাল ৭.৩০ থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত একঘণ্টার ১০টি সেশনের যে-কোনোটিতে অংশ নিন। আলোচনা, মেডিটেশন ও কাউন্সেলিং ছাড়াও এতে রয়েছে আলোকচিত্র ও ভিডিও প্রদর্শনী।
৪. প্রতি শুক্রবার সকালে নিকটবর্তী সেন্টার/ শাখা/ সেল/ প্রি-সেলের সাদাকায়ন কার্যক্রমে যৌথ মেডিটেশন ও আলোচনায় অংশ নিন।
৫. ধ্যানের আনন্দ ও প্রকৃতির সান্নিধ্য লাভে লামার কোয়ান্টামমে ধ্যানসাফারি এক চমৎকার আয়োজন। সপরিবারে ভ্রমণের বৈচিত্র্যময়

স্বাদ উপভোগ করতে অক্টোবর থেকে মার্চ লামার কোয়ান্টামম এক ব্যতিক্রমী স্থান।

৬. মাসে কমপক্ষে একদিন কোয়ান্টায়নে অংশ নিন।

৭. লামায় কোয়ান্টামমে তিন দিনের কোয়ান্টায়নে অংশ নিন।

৮. প্রযুক্তিদক্ষ হোন। ভার্চুয়াল ভাইরাস–স্মার্টফোন, ফেসবুক, ইউটিউব, ওয়েব সিরিজ, ভার্চুয়াল গেম ও ইন্টারনেট আসক্তি থেকে মুক্ত থাকুন।

সামাজিক ক্ষেত্রে

১. আত্মীয় ও বন্ধুদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখুন।

২. অসুস্থ বা সমস্যাগ্রস্ত বন্ধু, আত্মীয় ও প্রতিবেশীর খোঁজখবর নিন, তাদের জন্যে দোয়া করুন।

৩. ঈদ, পূজা বা আনন্দ-উৎসবে বন্ধু ও আত্মীয়দের সাধ্যমতো ছোটখাটো উপহার দিন।

৪. গৃহকর্মী ও নিরক্ষরদের অক্ষরজ্ঞান দানে সচেষ্ট হোন।

৫. সামাজিক মেলামেশা, কথাবার্তা ও আচার-আচরণে স্থানকালপাত্র বিবেচনা করুন। সর্বাবস্থায় মার্জিত ভাব বজায় রাখুন। নিজেকে বিরক্তিকর করে তুলবেন না।

৬. নিজের মত তর্ক বা জোর করে অন্যের ওপর চাপানোর চেষ্টা করবেন না।

৭. অহেতুক অন্যের প্রতি সমালোচনামূলক মানসিকতা পরিহার করুন।

৮. স্বার্থান্বেষী প্রতারক ও অন্যায়কারী পরিচিতদের সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক ছেদ করুন।

৯. সামাজিক অনুষ্ঠানে উপহার দেয়া-নেয়ার প্রথা বর্জন করুন। কারণ উপহার তা-ই যা স্বেচ্ছায়, আনন্দচিত্তে, নিঃশর্তভাবে দেয়া হয়।

কর্মক্ষেত্রে

১. সবাইকে আগে সালাম দেয়া ও হাত মেলানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

২. পেশাগত ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির রাখুন। পেশাগত দক্ষতা অর্জনে সদা সচেষ্ট থাকুন। লক্ষ্য অনুসারে কর্মকৌশল নির্ধারণ করুন। লক্ষ্য অর্জনের প্রতিটি ধাপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখুন।

৩. সাধারণত পেশা নিজের অন্তর্নিহিত গুণের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ না হলেই

অন্তর্দ্বন্দ্ব হয়। মেজাজ খারাপ থাকে। সহকর্মীদের সাথে দ্বন্দ্ব বাঁধে। প্রো-একটিভ আচরণের পরিবর্তে রি-একটিভ আচরণ সৃষ্টি হয়। সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তাই সর্বাবস্থায় বাস্তববাদী ও প্রো-একটিভ থাকতে চেষ্টা করুন।

৪. বিনয়ী থাকুন। স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বজায় রাখুন। কোনো অন্যায় কাজে সাথী হবেন না। কর্মক্ষেত্রে নিজ দায়িত্ব পালনে আন্তরিকতার পরিচয় দিন। দায়িত্ব পালনকে ভয় পাবেন না।

সৃষ্টির সেবায়

১. সৃষ্টির সেবা বা হক্কুল ইবাদ তৎপরতায় অংশ নিন।
২. নিয়মিত রক্ত দিন ও রক্তদান কার্যক্রমে অংশ নিন।
৩. কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দানের অর্থ জমা রাখুন। তিন মাস পর ফাউন্ডেশনে অথবা নিকটবর্তী সেন্টার/ শাখা/ সেল/ প্রি-সেলে জমা দিয়ে নতুন ব্যাংক সংগ্রহ করুন।
৪. যাকাতকে খয়রাত হিসেবে না দিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আদায়ের জন্যে কোয়ান্টাম যাকাত কার্যক্রমে জমা দিন।
৫. আপনার জমাকৃত মুষ্টিচাল ও পুরানো কাপড় নিয়মিত ফাউন্ডেশনে জমা দেয়ার অভ্যাস করুন।
৬. এতিমান ফান্ড, চিকিৎসাসেবা ফান্ড, ফাতেহা ফান্ডসহ ফাউন্ডেশনের সকল সেবা কার্যক্রমে সাধ্যমতো অংশ নিন।
৭. সেন্টার/ শাখা/ সেল/ প্রি-সেলের হক্কুল ইবাদ কার্যক্রমে এসোসিয়েটদের সম্পৃক্ত করুন।

বন্ধুত্বে

১. বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক থাকুন। চিন্তা, মত ও লক্ষ্যে মিল রয়েছে এমন কারো সাথেই বন্ধুত্ব গড়ে তুলুন। সৎসঙ্ঘে নিবেদিত সদস্যদের বন্ধু হিসেবে অগ্রাধিকার দিন।
২. ওয়াদা ও আমানতদারি রক্ষা করুন।
৩. প্রতিদানের আশা না করেই সাধ্যমতো সহযোগিতা করুন।
৪. অন্যের প্ররোচনায় সিদ্ধান্ত নেবেন না, সম্পর্কচ্ছেদ করবেন না।
৫. ঈর্ষান্বিত হবেন না।

৬. ভুল বোঝাবুঝি আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলুন।
৭. কী পেলেন, তা না ভেবে কী দিতে পারেন–তা নিয়ে ভাবুন।
৮. বোকা ও নেতিবাচক মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকুন। অসৎসঙ্গ সবসময় সর্বনাশের কারণ হয়।
৯. অতিরিক্ত বন্ধুবাৎসল্য দেখাতে গিয়ে নিজের জীবনের লক্ষ্যকে বিসর্জন দেবেন না।

খাবারদাবার

১. পরিমিত খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন।
২. প্রাকৃতিক ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবারকে প্রাধান্য দিন।
৩. পরিবারে শাকসবজি, ফলমূল, সবুজ সালাদ, স্পিরুলিনা ও মাশরুম খেতে অভ্যস্ত হোন।
৪. প্রতিবেলায় তিন/ চার আইটেমের মধ্যে (মাছ অথবা গোশত, সবজি ও ডাল) রান্না সীমিত রাখুন।
৫. সপ্তাহে একদিন পরিবারের সবাইকে নিয়ে সবজিখিচুড়ি খান।
৬. সকালে তৃপ্তির সাথে নাশতা, দুপুরে পরিমিত আহার ও রাতে হালকা খাবার গ্রহণ করুন।
৭. ফাস্ট ফুড, রেস্টুরেন্টের খাবার যত কম খাওয়া যায় তত ভালো।
৮. কৃত্রিম ও কোমল পানীয় এবং দুধ-চা পুরোপুরি বর্জন করুন।
৯. প্রার্থনা করে খাবার শুরু করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

মেহমানদারি

১. মেহমানদারিতে বাহুল্য, অপচয় ও বাড়াবাড়ি বর্জন করুন।
২. সদ্ব্যবহার, সদালাপ ও আন্তরিক পরিমিত পরিবেশনার রেওয়াজ গড়ে তুলুন।
৩. মেহমানদের সঙ্গে সম্ভব হলে ও পরিবেশ অনুকূল থাকলে সৎসঙ্ঘের কার্যক্রম ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করুন।

আপ্যায়ন

১. লেবুর শরবত/ কচি ডাব/ লাল চা/ গ্রিন টি
২. মুড়ি/ চিড়াভাজা/ সেমাই/ পিঠা

৩. সবজিখিচুড়ি/ বিরিয়ানি/ মোরগপোলাও/ ইলিশপোলাও
৪. ফল/ ফিরনি/ পুডিং

উপহার

১. স্মারক ‘কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস’
২. কোয়ান্টাম বুলেটিন, বিভিন্ন কণিকা ও ব্রোশিউর
৩. আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী
। ইসলাম বিজ্ঞান মেডিটেশন : এম শমশের আলী
। ভাঙো দুর্দশার চক্র : আবদুলাহ্ আবু সায়ীদ
৪. । কোয়ান্টাম মেথড । আত্মনির্মাণ
। আলোকিত জীবনের হাজার সূত্র কোয়ান্টাম কণিকা
। জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন
। কোয়ান্টাম ॥ হাজারো প্রশ্নের জবাব (পর্ব ১, ২ ও ৩)
। রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা
। কোয়ান্টাম ভাবনা ॥ সাফল্যগাথা (১ ও ২)
। হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ । বিকশিত হোক শত ভাবনা
। 1001 Autosuggestions to Change Your Life
। সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন । কর্মব্যস্ত সুখী জীবন

পারিবারিক দায়িত্ব
পুরুষ ও নারীর করণীয়

পুরুষ

১. স্বামী হিসেবে নিজেকে পরিবারের প্রধান দায়িত্বশীল মনে করুন।
২. পরিবারে দায়িত্ব পালনকে ইবাদত মনে করুন।
৩. স্ত্রীকে বন্ধু, জীবনসঙ্গী ও ঘরের প্রধান হিসেবে বিবেচনা করুন।
৪. পারিবারিক প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করুন।
৫. স্ত্রীর ভালো কাজ, অবদান ও কৃতিত্বের প্রশংসা করুন।
৬. স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন এবং ভালবাসা ও অনুরাগ প্রকাশ করুন কথা ও আচরণের মাধ্যমে।

৭. কর্মস্থল বা বাইরের রাগ-ক্ষোভ ঘরে এসে স্ত্রী, সন্তান বা গৃহকর্মীর ওপর প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকুন।

৮. নিজের ভুল নিঃসংকোচে স্ত্রীর নিকট স্বীকার করুন। অন্যায় করলে মাফ চেয়ে নিন।

৯. আয় অনুসারে স্ত্রীর প্রয়োজন পূরণ, ছোটখাটো উপহার প্রদান ও হাতখরচ প্রদান করুন এবং হাতখরচ ব্যয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা থেকে বিরত থাকুন।

১০. স্ত্রীর অর্জিত অর্থ ও সম্পদ ব্যয়ে স্ত্রীর স্বাধীনতা হরণ করবেন না।

১১. স্ত্রীর যুক্তিসঙ্গত আবদার পূরণে সচেষ্ট থাকুন।

১২. নিজের আয় সম্পর্কে প্রথমেই স্ত্রীকে সুস্পষ্ট ধারণা দিন ও অবৈধ পন্থায় অর্থোপার্জন করা থেকে বিরত থাকুন। ঋণ করে ব্যয় করবেন না।

১৩. পেশাগত বা পারিবারিক সংকট দেখা দিলে স্ত্রীর সাথে তা খোলামেলা আলোচনা করুন।

১৪. আত্মীয়স্বজনকে উপহার দেয়া বা সাহায্য করার ব্যাপারে স্ত্রীকে অযৌক্তিক বাধা দেয়া থেকে বিরত থাকুন।

১৫. স্ত্রীর আত্মীয়দের নিয়ে তাকে কথা শোনাবেন না।

১৬. স্ত্রীর মা-বাবাকে নিজের মা-বাবার মতো শ্রদ্ধা করুন।

১৭. ঘরের খুঁটিনাটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। ঘরের কাজে সাধ্যমতো সাহায্য করুন।

১৮. স্ত্রীর ভুলত্রুটি নিয়ে সন্তানদের সামনে ভর্ৎসনা করবেন না।

১৯. সপ্তাহে একদিন পুরোপুরি স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে কাটান। ঘরের প্রতিটি কাজ–এমনকি রান্নাবান্নায়ও পিকনিকের মতো অংশ নিন। গ্লাসে পানি ঢেলে খাওয়াসহ নিজের ছোটখাটো কাজ নিজে করুন।

২০. স্ত্রীর যে-কোনো ভুলত্রুটিকে সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করুন এবং রূঢ় ভাষায় সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকুন।

২১. বাইরে কাজ আছে বলে ক্লাব বা 'বন্ধু'দের সাথে তাস খেলে বা ফালতু আড্ডায় সময় নষ্ট না করে পরিবারের আত্মিক ও মানসিক উন্নতির জন্যে সময় ব্যয় করুন।

২২. অন্যের কাছে স্ত্রীর বদনাম করবেন না।

২৩. অপচয় করবেন না। আবেগপ্রসূত কেনাকাটা পরিহার করুন।

২৪. নিজের দোষত্রুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন।

২৫. স্ত্রীর শারীরিক খোঁজখবর নিয়মিত জিজ্ঞেস করুন। অসুস্থ হলে নিজে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন।

২৬. স্ত্রীর যে-কোনো অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শুনুন। কোনো প্রস্তাব বা কথায় প্রথমেই 'না' বলা থেকে বিরত থাকুন।

২৭. স্ত্রীকে গৃহকর্মে ও সন্তান পালনে সাধ্যমতো সাহায্য করুন।

নারী

১. নিজেকে পরিবারের প্রাণ মনে করুন।

২. সংসারের প্রতিটি কাজকে ইবাদত মনে করুন।

৩. স্বামীকে বন্ধু, জীবনসঙ্গী, দিশারি ও পরিবারের প্রধান হিসেবে বিবেচনা করুন।

৪. স্বামীকে লুকিয়ে কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকুন।

৫. স্বামীর ভালো কাজ, অবদান ও কৃতিত্বে গর্ববোধ করুন।

৬. স্বামীর প্রতি সর্বাবস্থায় বিশ্বস্ত থাকুন এবং ভালবাসা ও অনুরাগ প্রকাশ করুন কথা ও আচরণে।

৭. স্বামী-সন্তান বাইরে থেকে আসার সাথে সাথে কোনো সমস্যার কথা বলা বা অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকুন।

৮. কোনো ভুল বা অন্যায় হয়ে গেলে নিঃসংকোচে তা স্বীকার করুন ও স্বামীর কাছে মাফ চেয়ে নিন।

৯. নিজের হাতখরচ থেকে কখনো কখনো সম্ভব হলে স্বামীর জন্যে ছোটখাটো উপহার কিনুন। নিজের অর্জিত অর্থ প্রয়োজনে স্বামী ও সংসারের জন্যে খরচ করুন।

১০. স্বামীর কাছে অযৌক্তিক আবদার করা থেকে বিরত থাকুন।

১১. স্বামীর আয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখুন। আয়ের মধ্যেই সংসারের খরচ সীমিত রাখার চেষ্টা করুন। অতিরিক্ত খরচ ও চাপ সৃষ্টি করে স্বামীকে দুর্নীতিপরায়ণ হতে বাধ্য করবেন না।

১২. যে-কোনো বিপদে বা সংকটে স্বামীর প্রতি পরিপূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন।

১৩. স্বামীর অজ্ঞাতে কাউকে কিছু দেবেন না।

১৪. স্বামীর আত্মীয়স্বজন নিয়ে খোঁটা দেয়া থেকে বিরত থাকুন।

১৫. শ্বশুর-শাশুড়িকে নিজের বাবা-মায়ের মতো শ্রদ্ধা করুন। স্বামীর ভাইবোনদের নিজের ভাইবোনের মতো ভালবাসুন।

১৬. ঘরের খুঁটিনাটি সমস্যা নিজেই সমাধানে সচেষ্ট থাকুন।

১৭. সন্তানের সামনে স্বামীর সাথে ঝগড়া এবং তার ভুলত্রুটি নিয়ে সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকুন।

১৮. চাকরিজীবী হলেও সন্তান ও সংসারের ব্যাপারে যাতে কোনো অবহেলা না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখুন।

১৯. স্বামীর যে-কোনো অক্ষমতা সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করুন।

২০. আত্ম উন্নয়ন ও আত্মিক উন্নয়নে স্বামীকে সহযোগিতা করুন। সুযোগমতো হক্কুল ইবাদ বা সৃষ্টির সেবায় অংশ নিন।

২১. অন্যের কাছে স্বামীকে ছোট করা থেকে বিরত থাকুন।

২২. মা হিসেবে সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো ও সন্তানের মাঝে অনন্য মানুষের গুণাবলিকে বিকশিত করার কাজে সচেষ্ট থাকুন।

২৩. গ্যাসের চুলা প্রয়োজনের বাইরে সবসময় বন্ধ রাখুন। সব ধরনের অপচয়ের বিরুদ্ধে পরিবারের সবার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করুন।

২৪. অভিমান করা, নিজের কষ্টকে বড় করে দেখার প্রবণতা পরিহার করুন।

২৫. ঘরবাড়ি পরিষ্কার ও পরিপাটি রাখার ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকুন।

২৬. পুত্রবধূকে পারিবারিক পরামর্শে অংশীদার করুন।

২৭. শাশুড়ি হিসেবে পুত্রবধূকে প্রতিপক্ষ না ভেবে নিজের কন্যার মতো বিবেচনা করুন এবং পুত্রবধূর ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন।

পরিশেষে বলা যায়—শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির চর্চার পাশাপাশি অন্তরতম সত্তা আত্মাকে আলোকিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্যে স্রষ্টার সরাসরি স্মরণে যদি কিছু সময় ব্যয় করেন, তাহলেই আপনার সৌন্দর্য পূর্ণতা পাবে।

['পারিবারিক শিষ্টাচার' অংশটি মহাজাতকের আত্মনির্মাণ ও আলোকিত জীবনের হাজার সূত্র কোয়ান্টাম কণিকা বই থেকে সংকলিত]

প্রিয় পাঠক,

এ বইয়ের কোনো বিষয় সম্পর্কে আপনার কোনো প্রশ্ন, পরামর্শ বা মতামত থাকলে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে পারেন :

নাহার আল বোখারী
যোগ ফাউন্ডেশন
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৯৩৫৫৭৫৬
মোবাইল : ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮
E-mail : info@quantummethod.org.bd

নাহার আল বোখারী

জন্ম ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬, বৃহত্তর বরিশালের খেপুপাড়া উপজেলার ধানখালী গ্রামে, পিত্রালয়ে। পিতা আধ্যাত্মিক পুরুষ মরহুম হজরত কফিলউদ্দীন আহমেদ (রহ.)। মা মরহুমা মোহতারেমা হাসেনা বানু। নাহার আল বোখারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগ থেকে এমএসএস করেছেন। পারিবারিক জীবনে গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতকের সহধর্মিণী।

কর্মজীবনে যোগ ফাউন্ডেশন ও কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের গুরু দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশে তিনিই প্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মহিলাদের যোগব্যায়াম শিক্ষাদান শুরু করেন ১৯৮৩ সালে যোগ মেডিটেশন কেন্দ্রের মাধ্যমে। তার রান্না শেখানোর জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান 'তাই চি চাইনিজ কুকিং সেন্টার' বন্ধ করে মেডিটেশন ও ব্যায়ামের আধুনিকায়নের গবেষণায় গুরুজীর সাথে আত্মনিয়োগ করেন। সেইসাথে শুরু করেন পরিবার স্বাস্থ্য সৌন্দর্য ও রান্না নিয়ে লেখালেখি। টানা ২২ বছরের গবেষণার ফসল হচ্ছে এই 'রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা'।

quantummethod.org.bd

ISBN 978-984-34-2477-8

রোগ নিরাময়ে
কোয়ান্টাম ব্যায়াম
ও
সৌন্দর্যচর্চা

নাহার আল বোখারী

যোগ ফাউন্ডেশন
quantummethod.org.bd

রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা

নাহার আল বোখারী

প্রকাশক

মায়িশা তাবাসসুম
যোগ ফাউন্ডেশন
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৯৩৫৫৭৫৬, ০৯৬১৩-০০২০২৫
০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮
info@quantummethod.org.bd

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর, ২০০৪

১২ তম মুদ্রণ

অক্টোবর, ২০১৯

প্রচ্ছদ

আবদুলাহ জুবাইর

স্কেচ

চন্দ্রজিৎ কুমার

মুদ্রাকর

উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার
ইসলাম ভবন (২য় তলা)
৬৮ ফকিরাপুল বাজার রোড, ঢাকা-১০০০

মূল্য

৩৮৫ টাকা

Rog Niramoye Quantum Beyam
O Shoundaryacharcha
(Quantum Yoga for Health & Beauty Care)

By : **Nahar El Bukhari**

Published by : Yoga Foundation

Price : $20

ISBN 978-984-34-2477-8

উৎসর্গ

মা মোহতারেমা হাসেনা বানু
আধ্যাত্মিক পিতা হযরত শাহ মোহাম্মদ ইলিয়াস শাহ (রহ.)
ও
দাদা হযরত শাহ মোহাম্মদ আফাজউদ্দীন শাহ (রহ.)
এবং আমার কোয়ান্টাম পরিবারের প্রিয় সন্তানদেরকে

কৃতজ্ঞতা

যোগী, মুনি, ঋষি ও সাধককুল
যাঁদের হাজার বছরের চর্চা ও অনুশীলনের ফসল
পরিবেশিত হয়েছে
'রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা' বইয়ে

সূচিপত্র

প্রসঙ্গকথা ☐ ৫
ব্যায়ামের ভূমিকা ☐ ৮
আসন ১ ॥ শবাসন ☐ ১৭
আসন ২ ॥ উজ্জীবন ☐ ১৯
আসন ৩ ॥ বজ্রাসন ☐ ২৪
আসন ৪ ॥ হস্তপদাসন ☐ ২৬
আসন ৫ ॥ ত্রিকোণাসন ☐ ২৮
আসন ৬ ॥ অর্ধচন্দ্রাসন ☐ ৩০
আসন ৭ ॥ জানুশিরাসন ☐ ৩২
আসন ৮ ॥ শশাঙ্গাসন ☐ ৩৪
আসন ৯ ॥ ভদ্রাসন ☐ ৩৬
আসন ১০ ॥ গোমুখাসন ☐ ৩৭
আসন ১১ ॥ উষ্ট্রাসন ☐ ৩৯
আসন ১২ ॥ উত্থিতপদাসন ☐ ৪১
আসন ১৩ ॥ ভুজঙ্গাসন ☐ ৪২
আসন ১৪ ॥ শলভাসন ☐ ৪৪
আসন ১৫ ॥ সর্বাঙ্গাসন ☐ ৪৬
আসন ১৬ ॥ মৎস্যাসন ☐ ৪৮
আসন ১৭ ॥ উৎকট আসন ☐ ৫০
আসন ১৮ ॥ বৃক্ষাসন ☐ ৫১
আসন ১৯ ॥ মুণ্ডকাসন ☐ ৫৩
আসন ২০ ॥ অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন ☐ ৫৪
আসন ২১ ॥ ধনুরাসন ☐ ৫৬
আসন ২২ ॥ পশ্চিমোত্তানাসন ☐ ৫৮
আসন ২৩ ॥ স্বরায়ন ☐ ৬০
আসন ২৪ ॥ অর্ধকূর্মাসন ☐ ৬২
আসন ২৫ ॥ পবনমুক্তাসন ☐ ৬৩
আসন ২৬ ॥ হলাসন ☐ ৬৫
আসন ২৭ ॥ শীর্ষাসন ☐ ৬৭
আসন ২৮ ॥ পদ্মাসন ☐ ৭০
আসন ২৯ ॥ দৃষ্টিদান ☐ ৭২
আসন ৩০ ॥ সুপ্ত ভদ্রাসন ☐ ৭৪
ধৌতি ☐ ৭৫
মুদ্রা ☐ ৭৭
প্রাণায়াম ☐ ৮০
সহজ ব্যায়াম ☐ ৮৩
হাঁটুর ব্যথায় করণীয় ব্যায়াম ☐ ৮৫
সারভাইক্যাল স্পন্ডিলাইটিসে করণীয় ব্যায়াম ☐ ৮৭
ঘাড়ে ব্যথার রোগীদের জন্যে পরামর্শ ☐ ৮৯
কোমরে ব্যথার রোগীদের পরামর্শ ☐ ৯০
গর্ভবতী মহিলাদের ব্যায়াম ☐ ৯১
প্রসবপরবর্তী ব্যায়াম ☐ ১০১
যে রোগ নিরাময়ে যে ব্যায়াম ☐ ১০৮
সতর্ক থাকুন! ☐ ১১২
উপকৃত হবেন ☐ ১১৩
৩০ মিনিটের প্রোগ্রাম ☐ ১১৪
দেহকাঠামো ॥ মেরুদণ্ড ☐ ১১৭
এন্ডোক্রাইন সিস্টেম ☐ ১২০
স্ত্রী প্রজননতন্ত্র ☐ ১২৪
মাসিক ঋতুচক্র ☐ ১২৬
ঋতু সংক্রান্ত সমস্যা ☐ ১২৯
দেহের সঠিক মাপ ☐ ১৩৬
আহার ☐ ১৩৯
পরিমিত খাদ্য তালিকা ☐ ১৪৪
সকালের নাশতা ☐ ১৪৫
দুপুরের খাবার ☐ ১৪৬
রাতের খাবার ☐ ১৪৭
সৌন্দর্যচর্চার ইতিহাস ☐ ১৪৯
সৌন্দর্যচর্চা ॥ মৌলিক সত্য ☐ ১৫৫
সৌন্দর্যচর্চা ॥ গোসল ☐ ১৫৭
কেশ পরিচর্যা ☐ ১৫৯
ত্বকের যত্ন ☐ ১৬৮
মুখের যত্ন ☐ ১৭০
প্রাকৃতিক উপায়ে রূপচর্চা ☐ ১৭৮
ভ্রুর যত্ন ☐ ১৮৬
চোখের যত্ন ☐ ১৮৭
কানের যত্ন ☐ ১৮৯
ঠোঁটের যত্ন ☐ ১৯০
দাঁতের যত্ন ☐ ১৯২
ঘাড় ও গলার যত্ন ☐ ১৯৪
হাতের যত্ন ☐ ১৯৫
পায়ের যত্ন ☐ ১৯৮
পায়ের বিভিন্ন সমস্যা ☐ ২০১
সৌন্দর্যচর্চায় মেহেদি ☐ ২০৩
কীভাবে সাজবেন ☐ ২০৭
ঋতু অনুযায়ী সাজ ☐ ২১৪
পোশাক ☐ ২১৬
অলংকার বা গহনা ☐ ২২০
আচারব্যবহার ☐ ২২৩
পারিবারিক শিষ্টাচার ☐ ২২৮

প্রসঙ্গকথা

দুই যুগের দীর্ঘ গবেষণা, শ্রম ও ধৈর্যের ফসল রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা। এত নিরবচ্ছিন্ন ও নিরলস যোগব্যায়াম চর্চাকারিণী আমি দেখি নি। ব্যস্ততার অজুহাতে আমার ব্যায়ামচর্চা যেখানে মাঝে মাঝেই বাদ পড়ে যেত, সেখানে তিনি ছিলেন নিয়মিত। সহধর্মিণী হিসেবে ঘরে আসার পর আমার যোগধ্যানচর্চা তার মনে স্বাভাবিক কৌতূহল সৃষ্টি করে। আসনের উপকারিতা বোঝার পর চর্চার কথা আর বলতে হয় নি। আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়ামচর্চায় আমরা হয়ে উঠি একাত্ম।

সংবেদনশীল মন ও তীক্ষ্ণ মেধার কারণে যে-কোনো বিষয় আয়ত্ত করা ও অন্যকে তা বোঝানোর সহজাত ক্ষমতা যোগচর্চার ক্ষেত্রেও তাকে করে তোলে অনন্য। মহিলাদের সুস্থ জীবনের জন্যে যোগচর্চার গুরুত্বকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। ১৯৮৩ সালে যোগ মেডিটেশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশে প্রথম মহিলাদের ব্যায়াম শেখাতে শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি তার চাইনিজ রান্না শেখানোর অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান 'তাই চি চাইনিজ কুকিং সেন্টার' বন্ধ করে মহিলাদের যোগাসন শেখানোর কাজে নিজেকে পুরোপুরি নিবেদিত করেন। বছরের পর বছর শত শত মহিলা তার কাছ থেকে সরাসরি প্রশিক্ষণ নিয়ে চর্চা করে তাদের ব্যাকপেইন, স্পন্ডিলাইটিস, পিরিয়ডের সমস্যাসহ বহু মনোদৈহিক রোগ থেকে মুক্ত হয়েছেন।

যোগাসনের প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে আমরা অনুভব করি, ব্যস্ত জীবনের প্রেক্ষাপটে এর চর্চাকে সহজ করা গেলে আধুনিক মানুষ এ থেকে আরো বেশি উপকৃত হবে। বছরের পর বছর গবেষণা চলতে থাকে অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে। বিভিন্ন আসনে দম নেয়া ও ছাড়া নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে চর্চাকারীরা এক ধরনের বিভ্রান্তি ও জটিলতার সম্মুখীন হতেন। এ বিভ্রান্তি থেকে মুক্তির জন্যে দম স্বাভাবিক রেখে আসনের চর্চা করে দেখা যায়, একই

উপকার চমৎকারভাবে পাওয়া যাচ্ছে। আর এরপর আসনের সাথে যুক্ত করা হলো কোয়ান্টাম মেথড চর্চার আলোকে সুস্থতার মনছবি। উদ্ভাবিত হলো যোগের সবচেয়ে সহজ ও ফলপ্রসূ আধুনিকায়ন–কোয়ান্টাম ব্যায়াম।

রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা বইয়ের প্রথমভাগে আসন, মুদ্রা, প্রাণায়ামের খুব সহজ ও সাবলীল বিবরণ রয়েছে। এর সাথে রয়েছে ব্যায়ামের নিয়মাবলি। প্রতিটি অধ্যায় ভালো করে পড়ে নিলে নিজে নিজেই চর্চা করতে কোনো অসুবিধে হবে না। তবে কোনো জটিল রোগব্যাধি থাকলে ব্যায়াম শুরুর আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া উচিত। এ-ছাড়াও প্রথমভাগে উচ্চতা ও ওজনের চার্ট, ব্যায়ামের সাপ্তাহিক সূচি, সুষম আহার ও খাবার তালিকা, মেরুদণ্ড ও দেহের এন্ডোক্রাইন সিস্টেম ও নারী জননগ্রন্থি নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা প্রতিটি পাঠকের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে এবং স্বাস্থ্য সচেতনতাকে বাড়িয়ে দেবে।

বইটির দ্বিতীয় অংশ অনুসারে সৌন্দর্যচর্চা আপনার আকর্ষণী ক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দেবে। নবীজী (স) বলেছেন, 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক'। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের পরিপূর্ণ পরিচ্ছন্নতা সৌন্দর্যের অর্ধেক। গোসল থেকে শুরু করে কেশ পরিচর্যা, ত্বকের যত্ন, দাঁতের যত্ন, হাত, পা ও নখের যত্ন নেয়ার সাথে সাথে বলা হয়েছে কম খরচে প্রাকৃতিক উপায়ে সৌন্দর্যচর্চার বিস্তারিত প্রক্রিয়া, যা থেকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই উপকৃত হবেন।

রূপচর্চা সংক্রান্ত অনেকগুলো লেখা অধুনালুপ্ত মাসিক ডাইজেস্ট ও উপমা ডাইজেস্টে প্রকাশিত হয়। উলেখ্য, '৮০ ও '৯০-এর দশকে মাসিক ডাইজেস্ট ও উপমা ডাইজেস্টে নিয়মিত 'নীড় সুনিবিড়' ফিচারে তিনি পরিবার, রান্নাবান্না, রূপচর্চা, স্বাস্থ্য ও সংসারের টুকিটাকি তথ্য ও পাঠকের প্রশ্নোত্তর দিয়েছেন। তার এ কলাম তখন পাঠক মহলে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

সৌন্দর্যচর্চা অংশে মেয়েদের জন্যে অতি প্রয়োজনীয় অধ্যায় হচ্ছে 'কীভাবে সাজবেন'। শুধু দামি সুন্দর পোশাক ও অলংকার থাকলেই হয় না। কোন ঋতুতে কোন বেলায় কী ধরনের রং, পোশাক ও সাজ মানাবে–এ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে সুন্দর পোশাকও দৃষ্টিনন্দন না হয়ে দৃষ্টিকটু হয়ে দাঁড়ায়। তাই সাজতে আগ্রহী প্রতিটি নারীই এ অধ্যায় থেকে জানতে পারবেন

কখন কী কাপড় পরবেন, কোন ধরনের মেক-আপ নেবেন, কোন ধরনের অলংকার পরবেন, কোন ধরনের সুগন্ধী ব্যবহার করবেন। আর পারিবারিক শিষ্টাচার অনুসরণ করলে পরিবার হয়ে উঠবে শান্তির নীড়।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বইটি পড়লে যে-কেউ বুঝতে পারবেন লেখিকা ব্যায়াম, সুস্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতাগুলোকেই রাখ-ঢাক না করে পাঠকের উপকারের মানসে সহজসরল ঘরোয়া কথা বলার ঢঙে লিখে গেছেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আগ্রহী পাঠক এ জ্ঞান নির্দ্বিধায় নিজের জীবনে প্রয়োগ করে সুস্থ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত জীবনের অধিকারী হবেন। পরম করুণাময় মানুষের কল্যাণে লেখিকার এই আন্তরিক প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমাদের সবার জীবন হয়ে উঠুক শুভ্র সমুজ্জ্বল।

বিনয়াবনত

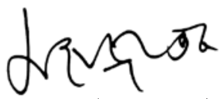

(মহাজাতক)
১ ডিসেম্বর, ২০০৪

ব্যায়ামের ভূমিকা

সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকেই দৈহিক শক্তির জন্যে শরীরচর্চা এবং নিজেকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে সৌন্দর্যচর্চার সূত্রপাত হয়। প্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতা ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় শরীর ও সৌন্দর্যচর্চা ছিল শিক্ষার এক প্রধান অঙ্গ। পরবর্তী প্রতিটি সভ্যতায় আমরা দেখতে পাই এর ছাপ।

আধুনিক কালে বিজ্ঞান আমাদের দৈহিক শ্রমের সুযোগ অনেক কমিয়ে দেয়ায় শরীরচর্চা বা ব্যায়ামের প্রয়োজন আরো বেড়ে গেছে। তাছাড়া যারা দৈহিক শ্রম করেন তাদেরও দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ–যেমন হার্ট, লিভার, কিডনি, অগ্ন্যাশয় ও অন্যান্য এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডগুলো অর্থাৎ দেহের হরমোন প্রবাহ গতিশীল ও সুষম রাখার জন্যেও প্রয়োজন বিশেষ ব্যায়াম। কারণ দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুস্থ ও গতিশীল রাখতে না পারলে পেশিশক্তি এক সময় বিপর্যস্ত হয়ে যায়।

দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্মক্ষমতা গতিশীল করে শরীরকে সুস্থ রেখে নিজেকে যে-কোনো সাধনা বা কর্মোপযোগী করে তোলার লক্ষ্যেই আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে দ্রাবিড় সাধকরা যোগব্যায়াম উদ্ভাবন করেন। বিশ শতকে পাশ্চাত্যে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান অনেক উন্নত, সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ হয়েছে। কিন্তু যোগব্যায়ামের চেয়ে উন্নত কোনো ব্যায়াম তারা আবিষ্কার করতে পারে নি। তাই পাশ্চাত্যে সুস্থ থাকার জন্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিপুল সংখ্যক মানুষ এই যোগব্যায়ামের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। প্রতি বছরই যোগব্যায়ামের প্রতি আগ্রহী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। এমনকি হাঁপানি, হৃদরোগ, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জটিল রোগ নিরাময়ে অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে যোগব্যায়ামের বিভিন্ন আসনকে প্রয়োগ করা হয়েছে।

কোয়ান্টাম ব্যায়াম যোগব্যায়ামেরই সহজ ও আধুনিক সংস্করণ। নতুন সহস্রাব্দের আধুনিক নরনারীর প্রয়োজনকে সামনে রেখে যোগ ফাউন্ডেশনের সিকি শতাব্দীর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার আলোকে এ আধুনিকায়ন করা হয়েছে। যোগের বিভিন্ন আসন কোয়ান্টামের শক্তি নিয়ে হয়ে উঠেছে আরো কার্যকরী ও ফলপ্রসূ। মহিলাদের জন্যে এ বইয়ের ব্যায়ামগুলো বিশেষভাবে গ্রন্থনা করা হলেও একজন পুরুষও তার প্রয়োজনীয় ব্যায়ামগুলো বেছে নিয়ে সমানভাবে উপকৃত হতে পারবেন।

কোয়ান্টাম ব্যায়ামের বিশেষত্ব

প্রচলিত যোগব্যায়ামে বিভিন্ন আসন করার সময় দম নেয়া ও ছাড়ার বিশেষ বিশেষ নিয়ম রয়েছে–যা যথাযথভাবে অনুসরণ করে আয়ত্ত করার জন্যে একজন দক্ষ প্রশিক্ষকের অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে। কিন্তু কোয়ান্টাম ব্যায়াম এই বিশেষ পদ্ধতিতে দম নেয়া ও ছাড়ার ঝামেলামুক্ত। আসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দম স্বাভাবিক রাখতে হয়। ফলে এর চর্চা খুব সহজ। কোনো প্রশিক্ষক ছাড়া অনুশীলন করতেও কোনো অসুবিধে নেই।

দ্বিতীয়ত, কোয়ান্টাম ব্যায়ামে কোয়ান্টাম মেডিটেশনের মাধ্যমে মনের বিশাল শক্তিকে সংযুক্ত করা হয়েছে মনছবি অবলোকনের মধ্য দিয়ে। প্রতিটি আসনের সাথে সে আসনের উপকারিতা সম্পর্কে ভিজুয়ালাইজ বা মনছবি তৈরির মাধ্যমে মনোশক্তিকে সুস্থতা ও নিরাময়ের ক্ষেত্রে চমৎকারভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

যোগ মেডিটেশনের বহুমুখী মনোদৈহিক উপকারিতা বিবেচনা করে ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৬৯ তম সাধারণ অধিবেশনে বিশ্বের ১৭৫টি দেশের সম্মতিক্রমে **২১ জুন-কে বিশ্ব যোগ দিবস** হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে কোয়ান্টাম যোগব্যায়াম এখন পরিণত হয়েছে আধুনিক মানুষের উপযোগী মনোদৈহিক ব্যায়ামে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান সময়ে যোগব্যায়ামের চর্চা প্রতিটি মানুষের জন্যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও অন্যান্য ব্যায়ামের মধ্যে পার্থক্য

কোয়ান্টাম ব্যায়াম মূলত মনোদৈহিক ব্যায়াম। শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক প্রাণবন্ততা–দুটোই অর্জিত হয় এর মাধ্যমে। কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও প্রচলিত সাধারণ ব্যায়ামের পার্থক্য আলোচনা করলেই বিষয়টি আমাদের কাছে আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কোয়ান্টাম ব্যায়াম

১. কোয়ান্টাম ব্যায়াম করার ফলে দেহ ও মন উভয়ই সুস্থ থাকে। মানসিক প্রশান্তি লাভ করা যায়।

২. কোয়ান্টাম ব্যায়ামে শরীরের কোনো ক্ষয় হয় না; তাই ক্ষয়পূরণের জন্যে কোনো বিশেষ খাবারের প্রয়োজন হয় না।

৩. আমাদের শরীরে দুধরনের গ্রন্থি আছে। ১. বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (Exocrine Gland) ও ২. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Endocrine Gland)। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলো থেকে একপ্রকার রস নিঃসৃত হয় যার নাম হরমোন। কোয়ান্টাম ব্যায়াম এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডগুলো সুস্থ রেখে শরীরে হরমোন প্রবাহ স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে।

অন্যান্য ব্যায়াম

১. প্রচলিত সাধারণ ব্যায়ামে শুধু শরীরের বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরই ব্যায়াম হয়। মানসিক প্রশান্তি অর্জিত হয় না।

২. সাধারণ ব্যায়ামে শারীরিক ক্ষয়সাধন হয়। ফলে তা পূরণের জন্যে বাড়তি খাবারের প্রয়োজন হয়।

৩. প্রচলিত সাধারণ ব্যায়ামে শরীরের বাহ্যিক ব্যায়ামই হয়। যেমন, অতিরিক্ত মোটা থাকলে তা কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু হরমোন প্রবাহের ওপর এর কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে না।

৪. কোয়ান্টাম ব্যায়াম মেরুদণ্ডে লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি টান পড়তে সাহায্য করে।	৪. সাধারণ ব্যায়ামে এটা সম্ভব না।
৫. কোয়ান্টাম ব্যায়াম দ্বারাস্নায়ু ও পেশি সুস্থ রাখা সম্ভব।	৫. সাধারণ ব্যায়ামে শুধু পেশিগুলোরই ব্যায়াম করা সম্ভব। স্নায়ুর ব্যায়াম হয় না।
৬. কোয়ান্টাম ব্যায়ামের ফলে দেহ-মন উভয়ই সুস্থ থাকে বলে যৌবনকে দীর্ঘদিন ধরে রাখা সম্ভব হয়। দেহকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসে বলে ত্বকে ভাঁজ পড়ে না।	৬. কিন্তু অন্যান্য ব্যায়াম খুব তাড়াতাড়ি শারীরিক স্থূলতা কমিয়ে নিয়ে আসে বলে ত্বকে ভাঁজ পড়ে বার্ধক্যের ছাপ তাড়াতাড়ি পড়ে।
৭. সর্বোপরি কোয়ান্টাম ব্যায়ামে দেহের গড়ন সুগঠিত ও সুললিত হয়। চেহারায় কান্তি ও লাবণ্য বাড়ে।	৭. সাধারণ ব্যায়ামে দেহ স্লিম হয় কিন্তু চেহারায় লাবণ্য থাকে না। দেখতে কাঠখোট্টা লাগে। তাই আজকাল পাশ্চাত্যে যোগ ব্যায়ামের চর্চা এত দ্রুত বাড়ছে।

তাই শরীর সুস্থ, সুন্দর ও লাবণ্যময় করে গড়ে তোলার জন্যে কোয়ান্টাম ব্যায়ামের কোনো বিকল্প নেই।

শুরু করার আগে জেনে নিন

কোয়ান্টাম ব্যায়ামের নিয়মাবলি

১. কোয়ান্টাম ব্যায়াম করার সময় আরামদায়ক ঢিলেঢালা পোশাক পরুন।

২. একেবারে খালি পেটে অথবা একেবারে ভরপেটে ব্যায়াম করা উচিত নয়। হালকা কিছু খেয়ে ব্যায়াম করা যায়। যেমন : ভেজানো কাঁচা ছোলা (২/৩ টেবিল চামচ) অথবা ২/৩ টুকরো কাঁচা পেঁপে।

৩. খুব শক্ত বা নরম জায়গায় ব্যায়াম করা উচিত নয়। কার্পেট বা কাঁথাকম্বল বিছিয়ে তার ওপর চাদর দিয়ে ব্যায়াম করা উচিত।

৪. পূর্ণ আহারের তিন থেকে চার ঘণ্টা পরে ব্যায়াম করা উচিত।

৫. আলো-বাতাসপূর্ণ খোলা জায়গায় ব্যায়াম করা ভালো।

৬. শীতের সময় ঘরের দরজা-জানালা খুলে বাতাস প্রবেশ করিয়ে নিয়ে ব্যায়াম করুন। এতে প্রচুর অক্সিজেন ঘরে প্রবেশ করবে।

৭. কোয়ান্টাম ব্যায়াম করার সময় কথা বলবেন না, কোনোরকম গানবাজনা শুনবেন না; বরং যে আসন করছেন তার উপকারিতার বিষয়গুলো মনছবি করুন অর্থাৎ কল্পনা করুন ও বিশ্বাসের সাথে অনুভব করুন।

৮. মেয়েদের মাসিক চলাকালে ব্যায়াম করা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ। মাসিক ভালো হওয়ার একদিন পর ব্যায়াম শুরু করুন।

৯. ব্যায়াম শেষে ১০ মিনিট শিথিলায়ন বা শবাসন করে শরীর ঠান্ডা করে নিয়ে গোসল করুন। কারণ ব্যায়াম করার ফলে শরীরে তাপমাত্রা কিছুটা বেড়ে যায়। তাই হঠাৎ করে যাতে গরম/ ঠান্ডা না লাগে সেজন্যে শিথিলায়ন করে পরে গোসল করুন।

১০. প্রতিদিন সম্ভব হলে একঘণ্টা হাঁটুন।

১১. ব্যায়াম করার সময় টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন হলে টয়লেট সেরে ব্যায়াম করুন। পেশাব-পায়খানা চেপে রেখে ব্যায়াম করা উচিত নয়।

১২. ব্যায়ামের আগে পাঁচ মিনিট হলেও শবাসনে শিথিলায়ন করে মনকে স্থির করে নিয়ে ব্যায়াম শুরু করুন।

১৩. প্রতিদিন ১০/১২টি আসন করতে পারেন।

১৪. প্রাণায়াম বা মুদ্রা খালি পেটে করাই ভালো।

১৫. কোয়ান্টাম ব্যায়াম করার সময় শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখুন। শুধু প্রাণায়াম ও মুদ্রায় নিয়ম অনুসারে দম নেবেন ও ছাড়বেন।

১৬. কোনো আসন একবারেই সঠিক ভঙ্গিমায় জোর করে করার চেষ্টা করবেন না। সহজভাবে শরীরকে ব্যায়ামের ভঙ্গিমায় যতটুকু নিতে পারেন ততটুকুই করুন। আস্তে আস্তে শরীর নমনীয় হলে ভঙ্গিমা সঠিক হবে। তা না হলে হঠাৎ করে শরীরের কোনো জায়গায় টান পড়তে পারে কিংবা মেরুদণ্ডে, ঘাড়ে, কোমরে টান লেগে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। তাই ধীরে ধীরে শরীরকে সঠিক ভঙ্গিমায় আনার চেষ্টা করুন।

১৭. কোয়ান্টাম ব্যায়াম যে-কোনো সময়ই করা যায়, তবে সকাল বা সন্ধ্যায় করাই ভালো।

১৮. সন্তানসম্ভবা হলে সহজ আসন, প্রাণায়াম করা গেলেও মুদ্রা করা থেকে পুরোপুরি বিরত থাকতে হবে।

১৯. সন্তান প্রসবের পর মায়েদের যে রক্তক্ষরণ হয়, সেটা সম্পূর্ণ বন্ধ হলে আবার আস্তে আস্তে ব্যায়াম শুরু করা যেতে পারে।

২০. গর্ভাবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শেই ব্যায়াম করা উচিত।

২১. হাই ব্লাডপ্রেশার, স্লিপড ডিস্ক, সারভাইক্যাল বা লাম্বার স্পন্ডিলাইটিস, হার্টের অসুখ, করোনারি থ্রম্বসিস, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, চোখের অসুখ, যেমন রেটিনাল হেমোরেজ ইত্যাদি রোগে যারা ভুগছেন তারা সামনের দিকে ঝোঁকা (forward bending) ব্যায়াম এবং শীর্ষাসন একেবারেই করবেন না।

২২. পেপটিক আলসারের (গ্যাসট্রিক ও ডিয়োডেনাল) রোগীরা পেটের ওপর চাপ লাগে এমন ব্যায়াম করবেন না। যেমন পশ্চিমোত্তানাসন, জানুশিরাসন ইত্যাদি।

২৩. যক্ষ্মা, পুরিসি, জন্ডিস, কিডনির অসুখ হলে পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ব্যায়াম, আসন বা মুদ্রা করা উচিত নয়।

২৪. অপারেশনের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেয়ার তিন মাস পরেই ব্যায়াম করা যায়। প্রথমে হালকা ব্যায়াম ও আস্তে আস্তে সব ব্যায়ামই করা যাবে, যদি শারীরিক অন্য কোনো সমস্যা না থাকে।

২৫. গলব্লাডার, এপেন্ডিকসসহ অন্যান্য অঙ্গের অপারেশন হলে ছয় মাস পরেই ব্যায়াম করা যায়, যদি ডাক্তারের নিষেধ না থাকে।

২৬. হার্টের অপারেশন হলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে ব্যায়াম করা উচিত।

২৭. সামনের দিকে ঝোঁকা কয়েকটি ব্যায়ামের পর অবশ্যই পেছনের দিকে ঝোঁকা একটি ব্যায়াম করা উচিত।

২৮. কথায় বলে, 'মন ভালো তো সব ভালো'। তাই সবসময় মনকে শান্ত ও প্রফুল রাখুন। দুশ্চিন্তামুক্ত প্রশান্ত মনের জন্যে ব্যায়াম এবং তার সাথে মেডিটেশন করুন। ব্যায়াম এবং ধ্যান–দুটো মিলেই সুস্থ ও আনন্দময় জীবন।

২৯. বয়স ৩৫ থেকে ৪০ হলে অবশ্যই রক্তের লিপিড প্রোফাইল করে নিন। ৪০ বছর বয়সের পর বছরে দুবার রক্তের লিপিড প্রোফাইল করুন।

৩০. বয়স ৩৫ থেকে ৪০ হলে একবার ব্রেস্ট-এর মেমোগ্রাফি করে নিন। ব্রেস্ট-এ কোনো চাকা, ব্যথা অনুভব করলে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিন। অবহেলা না করে দ্রুত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। বর্তমানে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও ব্রেস্ট ক্যান্সার দ্রুত হারে বাড়ছে।

৩১. বয়স ৩৫ থেকে ৪০ হলে বোন মিনারেল ডেনসিটি (BMD) টেস্ট করে নিন। হাড়ের ভেতর ক্যালসিয়ামের ঘনত্ব জেনে নিন এবং সেই অনুসারে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি ডায়েটারি ফুড হিসেবে নিয়মিত খান।

৩২. যাদের পরিবারে ডায়াবেটিস রয়েছে, তারা অল্পবয়স থেকেই রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা পরীক্ষা করে জেনে নিন আপনার ডায়াবেটিস হয়েছে কিনা। যেমন এইচ.বি.এ.ওয়ান.সি (HbA1c) এবং ফাস্টিং ব্লাড গ্লুকোজ (Fasting blood glucose) পরীক্ষার মাধ্যমে। বর্তমানে ডায়াবেটিস মহামারি আকার ধারণ করছে। মনে করা হচ্ছে, বাংলাদেশে প্রতি ১০ জনে একজন এ রোগে আক্রান্ত। তাই এ বিষয়ে বইতে যে ব্যায়াম দেয়া আছে, নিয়মিত করুন ও খাদ্যাভ্যাসে সচেতন হোন।

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। সাদা ভাত, সাদা চিনি পরিহার করুন। নিজের যত্ন নিজে করুন।

৩৩. সাধারণত মেনোপজের পর (মাসিক স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেলে) মায়েদের কতগুলো শারীরিক সমস্যা হয়ে থাকে। যেমন শরীর থেকে গরম ভাপের মতো বের হওয়া, মাথার তালু জ্বালা, বুক ধড়ফড় করা, পা ব্যথা, কান দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দ বের হওয়া ইত্যাদি উপসর্গ। এ-ক্ষেত্রে হরমোন পরীক্ষা করে জেনে নিতে হয়। যেমন এফ.এস.এইচ (FSH), টি.এস.এইচ (TSH) হরমোন পরীক্ষার মাধ্যমে।

৩৪. মেনোপজ-পরবর্তী আরেকটি সমস্যা হলো অস্টিও আর্থ্রাইটিস। এর ফলে হাতের আঙুলের গিঁটসহ অন্যান্য সব গিঁট ফুলে যাওয়া ও ব্যথা অনুভব করা। এ থেকে মুক্তির জন্যে নিয়মিত ব্যায়াম ও মেডিটেশন করুন, উপশম পাবেন।

৩৫. যদি আপনার কোনো মানসিক সমস্যা থাকে কিংবা এলোমেলো ভাবনা-চিন্তা, অস্বাভাবিক আচরণ করেন, বহুদিন মনোকষ্টে ভোগার পর এমন হয়, তাহলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। কাউন্সেলিং সেবা নিন। ওষুধপত্র ডাক্তারের পরামর্শে খেতে পারেন। জ্বীন-ভূতে ধরেছে কিংবা কেউ তাবিজ-কবচ করেছে, এটা অনেক মানুষের ভুল ধারণা। এসব ভেবে হুজুর বাড়ি, পানিপড়া ইত্যাদির পেছনে ছুটে টাকা-পয়সা নষ্ট না করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।

৩৬. সার্বিক মনোদৈহিক সুস্থতার জন্যে সব ধরনের আসক্তি থেকে মুক্ত থাকুন। বর্তমান সময়ের ভার্চুয়াল ভাইরাসে আপনি আক্রান্ত হলে কাউন্সেলিং সেবা নিন। পরিবারের সাথে একাত্ম থাকুন। কেননা পরিবার আপনার ভালবাসার ও প্রশান্তির শেকড়।

আসন পদ্ধতি
কার্যকারিতা ও উপকারিতা

কোয়ান্টাম ব্যায়ামের আসনগুলোকে আমরা মূলত দুভাগে ভাগ করতে পারি।

এক. ধ্যানাসন। দুই. স্বাস্থ্যাসন।

ধ্যানাসনগুলো আমাদের প্রাচীন সাধকরা ধ্যান-মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে সিদ্ধি বা কামেলিয়াত হাসিলের জন্যে ব্যবহার করতেন। আর স্বাস্থ্যাসনগুলো মূলত শরীরকে পরিপূর্ণভাবে সুস্থ রেখে দীর্ঘ সাধনা চালিয়ে যাওয়ার উপযোগিতা অর্জনের জন্যে চর্চা করা হয়েছে। যোগ সাধনায় ৪০০০-এর বেশি আসনের চর্চা করেছেন সাধকরা। এর মধ্যে বহু আসন শুধু দক্ষ গুরুর তত্ত্বাবধানেই অনুশীলন করা সম্ভব। আর স্বাভাবিক সুস্থতার জন্যে এতগুলো আসন অনুশীলনের প্রয়োজনও নেই।

তাই আমরা এ বইটিতে আধুনিক মানুষের সুস্থ দেহ ও সুন্দর প্রাণোচ্ছল মনের অধিকারী হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় আসনগুলোকেই সন্নিবেশিত করেছি।

ধ্যানাসন ও স্বাস্থ্যাসনের মধ্যে মূলগত পার্থক্য হচ্ছে–ধ্যানাসন সাধারণভাবে যে-কোনো শারীরিক ব্যাধি নিয়েই করা যায়। যেমন : বজ্রাসন, পদ্মাসন, সুখাসন, গোমুখাসন, শবাসন। কিন্তু স্বাস্থ্যাসনে বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধিনিষেধ রয়েছে। তাই নিজের রোগ সম্পর্কে জেনে নিয়ে সেই প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্যাসনগুলো অনুশীলন করা উচিত।

আসন ১

সহজ শিথিলায়ন বা শবাসন

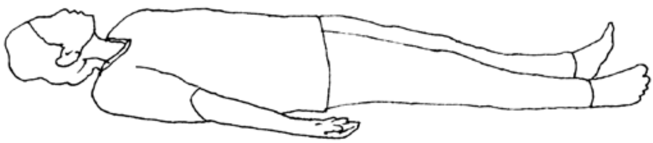

সহজ শিথিলায়ন বা শবাসন ব্যায়ামের পূর্বে এবং ব্যায়ামের পরে পাঁচ থেকে ১০ মিনিট করতে পারেন। শব অর্থ লাশ। অর্থাৎ মৃত বা লাশের মতো পড়ে থেকে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে শরীর পুরোপুরি শিথিল বা নরম করে দেয়া অর্থাৎ হাত-পা পুরোপুরি ছেড়ে দিলে যেমন লাগে সেভাবে আপনি চিৎ হয়ে শুয়ে পা দুটো লম্বা করে ছড়িয়ে দিন। তবে দুপায়ের মাঝে এক হাত পরিমাণ ফাঁক রাখলে ভালো। হাত দুটো শরীরের দুপাশে ও হাতের তালু ওপরের দিকে রাখুন। এরপর চোখ বন্ধ করে গভীরভাবে তিন/ চার বার লম্বা দম নিয়ে ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। তারপর স্বাভাবিকভাবে দম নিতে নিতে ভাবুন, আপনার শরীর পুরোপুরি শিথিল অর্থাৎ নিস্তেজ হয়ে আসছে, বেশ আরাম লাগছে।

এবার কল্পনা করুন, আপনি একটি সুন্দর মনোরম ফুলের বাগানে সবুজ নরম ঘাসের ওপর শুয়ে আছেন। গ্রীষ্মকাল হলে ভাবুন, দখিনা বাতাস আপনার শরীরকে জুড়িয়ে দিচ্ছে আর শীতকাল হলে ভাবুন, ঈষদুষ্ণ বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। বেশ আরাম আরাম লাগছে। মন থেকে সকল দুশ্চিন্তা দূর করে দিন। কল্পনার রাজ্যে কিছুক্ষণ বিচরণ করুন। শবাসন করাকালে বিশ্বাসের সাথে ভাবুন, আপনার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ। আপনার খুব আরাম লাগছে। এভাবে ভাবতে ভাবতে ঘুম এসে গেলেও ক্ষতি নেই।

সহজ শিথিলায়ন বা শবাসন উপুড় হয়ে শুয়েও করতে পারেন।

তবে ব্যায়াম চলাকালে উপুড় হয়ে ব্যায়াম করার সময় যদি একটু বিশ্রাম নিতে চান তখন উপুড় হয়ে এক মিনিট শবাসন করতে পারেন। সাধারণভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে শবাসন বা সহজ শিথিলায়ন করবেন।

উপকারিতা

১. ব্যায়ামের পর সহজ শিথিলায়নে দেহ-মন উভয়ই বিশ্রাম পায়। সহজ শিথিলায়নের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যে, আমরা যখন দাঁড়িয়ে বা বসে থাকি তখন শরীরের ওপরের অংশে রক্ত চলাচল চালু রাখতে হৃৎপিণ্ডকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। কিন্তু সহজ শিথিলায়নের সময় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব শরীরের সমস্ত অংশের ওপর সমান থাকে বলে রক্ত চলাচল সহজ হয় এবং শরীরের সকল অংশে হৃৎপিণ্ড বেশি পরিশ্রম না করেই রক্ত সরবরাহ করার সুযোগ পায়। ক্লান্তি দূর হয়ে সহজেই সতেজ অনুভূতি চলে আসে।

২. যারা শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম বেশি করেন, তাদের জন্যে সহজ শিথিলায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করে ক্লান্তিবোধ করলে ১০ মিনিট সহজ শিথিলায়ন করে নিলে পুনরায় পড়াশোনায় মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে। গর্ভবতী মায়েদের জন্যে সহজ শিথিলায়ন খুবই উপকারী। তাতে শরীর-মন দুটোই ভালো থাকে।

আসন
২

উজ্জীবন

ব্যায়াম শুরু করলে প্রথমেই শরীরটাকে উজ্জীবিত বা 'ওয়ার্ম-আপ' (warm-up) করে নেয়া ভালো। দেহকে একটু উজ্জীবিত করে নিলে দেহ নমনীয় হবে এবং পরবর্তী আসনগুলো করা সহজ হবে। ১৫ ধাপে বিভক্ত এই অনুশীলনীর মাধ্যমে আপনার পেশি ও হাড়ের জয়েন্টের জড়তা কেটে যাবে এবং আপনার শরীর ব্যায়াম ও আসনের জন্যে প্রস্তুত অবস্থায় চলে আসবে। যে-কোনো ব্যায়ামের আগেই একটু ওয়ার্ম-আপ প্রয়োজন। এই ১৫ ধাপের অনুশীলন শরীরকে চমৎকারভাবে ওয়ার্ম-আপ করে বলেই একে 'উজ্জীবন' বলা হয়। এই অনুশীলনকালে দম স্বাভাবিক থাকবে।

উজ্জীবন : ছবি– ১

উজ্জীবনের ১৫ ধাপ

পদ্ধতি : দুপায়ের মাঝখানে চার আঙুল ফাঁক রেখে দুহাত শরীরের দুপাশে রেখে বুক টান করে সোজা হয়ে দাঁড়ান।

১. বুক টান করে সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় দুহাত সোজা ওপরে তুলুন। খেয়াল রাখুন আপনার শরীরের ওজন যেন দুপায়ের ওপর সমানভাবে পড়ে। কোনো দিকে কাত হবেন না বা কোনো পায়ে ভর বেশি দেবেন না।

২. ধীরে ধীরে হাত ও মাথা পেছন দিকে নিতে থাকুন। কোমর থেকে মেরুদণ্ড পেছন দিকে বেঁকে যাবে। হাঁটু ভাঙবে না। পা সোজা থাকবে। ঘাড় থাকবে শিথিল। যতদূর সম্ভব শরীর পেছন দিকে বাঁকিয়ে দিন।

উজ্জীবন : ছবি– ২

৩. পুরো সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ুন। কপাল যতদূর সম্ভব হাঁটুর কাছাকাছি নিয়ে আসুন। হাতের আঙুল মেঝে স্পর্শ করবে।

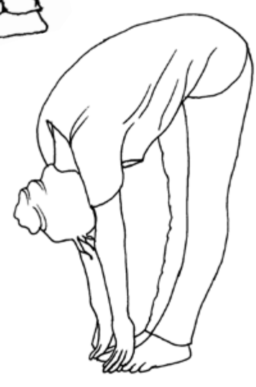

উজ্জীবন : ছবি– ৩

৪. হাঁটু ভেঙে কোমর ও মাথা মাটির সমান্তরালে নিয়ে আসুন। হাতের আঙুল ও করতল এবার সুন্দরভাবে মেঝে স্পর্শ করবে। হাতের ওপর কিছুটা ওজন থাকবে।

উজ্জীবন : ছবি– ৪

৫. দুহাতের ওপর ভর দিয়ে প্রথমে ডান পা পেছন দিকে নিন।

উজ্জীবন : ছবি– ৫

৬. বাম পা-ও পেছন দিকে নিন। পুরো শরীরের ওজন হাত ও পায়ের আঙুলের ওপর পড়বে। মাথা ও কোমর মেঝের সমান্তরাল থাকবে।

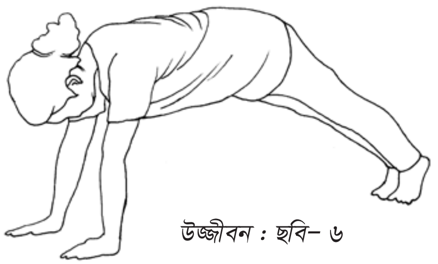

উজ্জীবন : ছবি– ৬

৭. পা ও ঊরু মাটির সাথে লেগে থাকবে। কোমর থেকে মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে হাতে ভর দিয়ে মাথা যতদূর সম্ভব পেছন দিকে নিয়ে যান।

উজ্জীবন : ছবি– ৭

৮. সমস্ত শরীর মেঝেতে লাগিয়ে দিন। পা হাঁটু পেট বুক কপাল–সব মেঝেতে লেগে যাবে, হাত দুটো থাকবে মাথার দুপাশে।

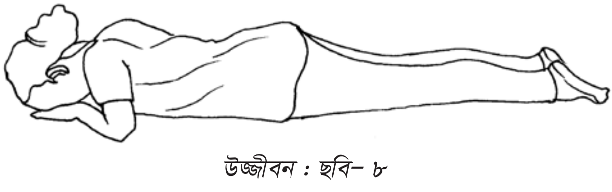

উজ্জীবন : ছবি– ৮

৯. হাতের ওপর ভর দিয়ে আবার মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে দিন। হাঁটু জোড়া লেগে থাকবে। (৭নং অবস্থানের মতো)

উজ্জীবন : ছবি– ৯

১০. আগের মতো দুহাত ও দুপায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে কোমর ও মাথা মাটির সমান্তরাল রাখুন। (৬নং অবস্থানের মতো)

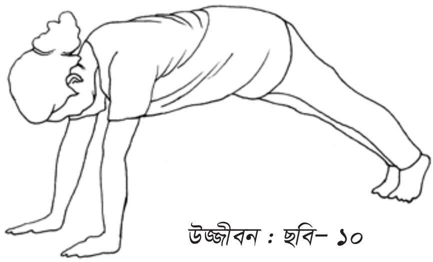

উজ্জীবন : ছবি– ১০

১১. প্রথমে ডান পা হাতের সামনে আনুন। বাম পায়ের পাতা পেছনে মাটিতে লেগে থাকবে।

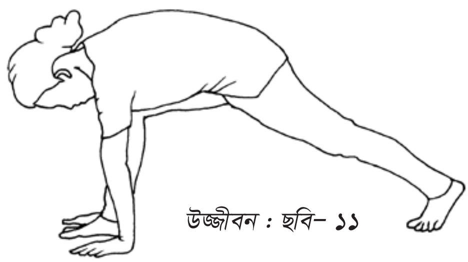

উজ্জীবন : ছবি– ১১

১২. হাঁটু ভাঙা অবস্থায় দুহাতের পাশে দুই পা রাখুন। কোমর ও মাথা মেঝের সমান্তরাল থাকবে। (৪নং অবস্থানের মতো)

উজ্জীবন : ছবি– ১২

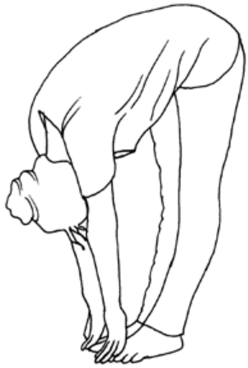

১৩. দুপায়ের ওপর ওজন রেখে হাঁটু সোজা করুন। কপাল হাঁটুর কাছাকাছি থাকবে। হাতের আঙুল মাটি স্পর্শ করবে। (৩নং অবস্থানের মতো)

উজ্জীবন : ছবি– **১৩**

উজ্জীবন : ছবি– **১৪**

১৪. হাঁটুর কাছ থেকে মাথা উঠিয়ে মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে একেবারে পেছন দিকে মাথা হেলিয়ে দিন। হাত দুটো মাথার পেছনে থাকবে। (২নং অবস্থানের মতো)

১৫. এবার বুক টান করে হাত সোজা ওপরের দিকে আনুন। (১নং অবস্থানের মতো)

এবার দুহাত শরীরের দুপাশে রাখুন। আরাম করে দাঁড়ান। এভাবে পাঁচ থেকে ১০ বার করতে পারেন।

উজ্জীবন : ছবি– **১৫**

আসন ৩

জাজেন বা বজ্রাসন

পদ্ধতি : প্রথমে দুই হাঁটু ভেঙে বসুন। দুপায়ের পাতা পেছন দিকে চিৎ হয়ে মাটির সাথে লেগে থাকবে। মেরুদণ্ড সোজা রেখে নিতম্ব দুপায়ের গোড়ালির ওপর রেখে বসুন, যেন দুই হাঁটু জোড়া লেগে থাকে। এবার দুহাত টানটান করে হাতের পাতা এবং আঙুলগুলো সোজা রেখে হাঁটুর ওপর উপুড় করে রাখুন (ছবির মতো করে)। এভাবে যতক্ষণ পারেন শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে বসে থাকুন। প্রথম দিকে পায়ে টান অনুভব করতে পারেন। বেশি চাপ বা ব্যথা অনুভব করলে পা সোজা করে একটু বিরতি দিন। তারপর আবার পা ভাঁজ করে আসনে বসুন। যখন সহজে করতে পারবেন তখন ইচ্ছে করলে ১০ থেকে ৩০ মিনিট আপনি জাজেন বা বজ্রাসনে বসে থাকতে পারেন।

বজ্রাসন : ছবি– ১

উপকারিতা

১. হাঁটুতে ইউরিক এসিড জমে হাঁটু ও ছোট ছোট অস্থি সন্ধিস্থলে বাতজনিত কোনো ব্যথা থাকলে নিয়মিত জাজেন বা বজ্রাসনে তা দূর হয়ে পা-কে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

২. তিন বেলা খাবারের পর পরই জাজেন বা বজ্রাসনে বসলে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়।

৩. বজ্রাসনে বসে প্রতিদিন ১০০ বার চুল ব্রাশ করলে সহজে চুল পাকে না এবং চুল পড়াও কমে যায়।

৪. দেহের নিচের অংশ সুগঠিত করতে জাজেন বা বজ্রাসন খুবই সহায়ক।

৫. এছাড়া রাতে খাবারের পর বজ্রাসনের অভ্যাস করলে হজমশক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে সুনিদ্রা আসতে সাহায্য করে।

বি.দ্র. : *মনে রাখতে হবে, কোনো আসনই জোর করে একবারে সঠিক ভঙ্গিমায় করার চেষ্টা করা ঠিক নয়। ধীরে ধীরে সঠিক ভঙ্গিমায় নিয়ে আসতে হবে।*

আসন ৪

হস্তপদাসন

পদ্ধতি : প্রথমে মেরুদণ্ড সোজা রেখে দুপায়ের মধ্যে চার/ পাঁচ আঙুল পরিমাণ ফাঁক করে দাঁড়ান। এবার হাত দুটো মাথার ওপরে সোজা করে তুলুন। দুই কানের সাথে দুহাত লাগিয়ে রাখুন। হাতের তালু সামনের দিকে থাকবে। (ছবির মতো)

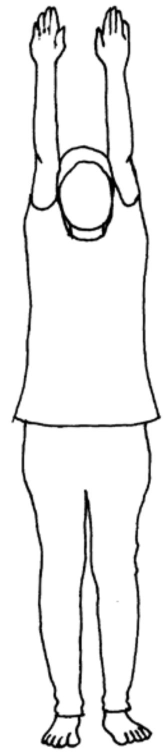

হস্তপদাসন : ছবি– ১

এবার ধীরে ধীরে শরীরের ওপরের অংশ সামনের দিকে নামাতে থাকুন। মাথা নুইয়ে মুখ হাঁটুর কাছে নিয়ে এসে কপাল হাঁটুর সাথে লাগিয়ে রাখুন। এবার দুহাত দিয়ে দুপায়ের গোড়ালির একটু ওপরে ধরুন। খেয়াল রাখুন যাতে হাঁটু ভেঙে না যায়। হাঁটু সোজা করে রাখতে হবে এবং পেট ও বুক উরুর সাথে লেগে থাকবে। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে ১০ থেকে ২০ সেকেন্ড এভাবে থাকুন। তারপর ধীরে ধীরে শরীরকে আগের অবস্থায় নিয়ে আসুন। এভাবে তিন থেকে পাঁচ বার করতে পারেন।

মনে রাখতে হবে, প্রথম দিকে শরীর সঠিক ভঙ্গিমায় না-ও আসতে পারে। তবে জোর করে শরীরকে সঠিক ভঙ্গিমায় নিতে যাবেন না। এতে উপকারের চেয়ে ক্ষতি হতে পারে। তাই ধীরে ধীরে সঠিক ভঙ্গিমায় আসুন। ক্লান্তি বোধ করলে প্রত্যেক ব্যায়ামের পরই সহজ শিথিলায়নে বিশ্রাম নিতে পারেন।

উপকারিতা

১. যারা লম্বা হতে চান তারা এ আসন করে উচ্চতা বাড়াতে পারেন। ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে-মেয়েরা এ ব্যায়াম করে উচ্চতার ব্যাপারে বেশি উপকৃত হবেন।

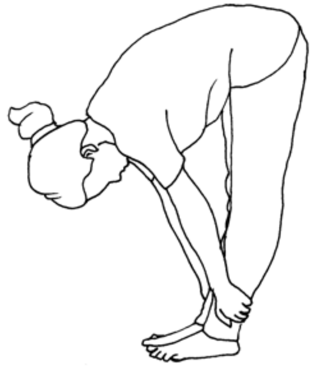

হস্তপদাসন : ছবি– ২

২. হস্তপদাসনে মেরুদণ্ড সহজ ও নমনীয় থাকে। দেহের অসমতা দূর হয়।

৩. নিয়মিত অভ্যাসে পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ রোগ হতে পারে না।

৪. পেটে চর্বি জমতে পারে না। অপ্রয়োজনীয় চর্বি কমিয়ে দেহকে সুন্দর করে তোলে।

৫. নিয়মিত হস্তপদাসন অভ্যাসে পেটের অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ–যথা পাকস্থলী, যকৃৎ, পীহা ও ক্ষুদ্রান্ত্রে চাপ পড়ায় তাদের ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে সাহায্য করে।

হস্তপদাসন : ছবি– ৩

৬. যারা নিু রক্তচাপে ভুগছেন তারা এ আসনটি করলে উপকার পাবেন।

বি.দ্র. : *যাদের উচ্চ রক্তচাপ, পীহা ও যকৃৎ স্বাভাবিকের চেয়েও বড়, যাদের হৃদরোগ, স্লিপড ডিস্ক, সারভাইক্যাল বা লাম্বার স্পন্ডিলাইটিস ও চোখের কঠিন অসুখ রয়েছে তারা এ আসনটি করবেন না।*

আসন
৫

ত্রিকোণাসন

পদ্ধতি : প্রথমে শরীর সোজা রেখে দাঁড়ান। এবার দুই পা আড়াই থেকে তিন ফুট পরিমাণ ফাঁক করুন। এরপর হাত দুটো শরীরের দুপাশে কাঁধ বরাবর উঁচু করুন। হাতের তালু নিম্নমুখী করে রাখুন। (১নং ছবির মতো)

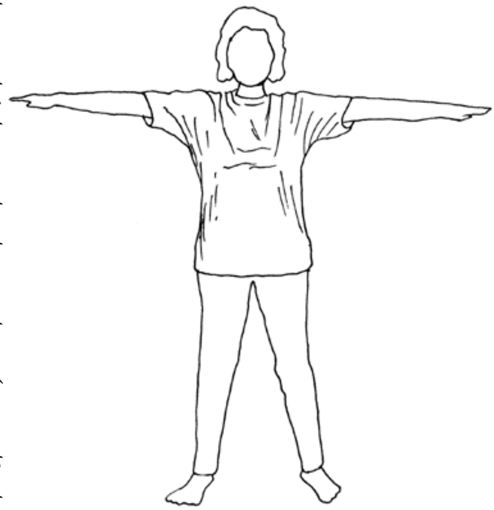

ত্রিকোণাসন : ছবি– ১

এবার পা থেকে কোমর পর্যন্ত শরীর সোজা রেখে সামনে/পেছনে না ঝুঁকে আস্তে আস্তে ডান দিকে বাঁকা করুন। খেয়াল রাখুন যেন হাঁটু না ভাঙে। এবার আস্তে আস্তে ডান দিকে বাঁকিয়ে ডান পায়ের পাতা স্পর্শ করতে চেষ্টা করুন। সহজভাবে যতটুকু হাত যায় ততটুকুই রাখুন। কিছুদিন অভ্যাস করলে আসনটি সঠিক ভঙ্গিমায় করতে পারবেন। এভাবে প্রথমে ডানদিকে, পরে বামদিকে করুন। একবার ডানে আর একবার বামে মিলে হয় এক প্রস্থ। এভাবে তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ করতে পারেন।

প্রত্যেক পাশে অবস্থানে সময় নিন ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড। দম স্বাভাবিক রাখুন। যেদিকে বাঁকাবেন সেদিকের হাত নিচে ও অপর হাত মাথার ওপরে তুলে রাখুন। দৃষ্টি থাকবে ওপরের হাতের আঙুলে। (২নং ছবির মতো)

উপকারিতা

১. এ আসনটি কোমরের চর্বি কমিয়ে কোমরকে সরু ও সুন্দর করে তোলে।

২. মেরুদণ্ডে আড়াআড়ি টান পড়ায় মেরুদণ্ড নমনীয় ও কমনীয় থাকে। মেরুদণ্ডে রক্ত চলাচল বাড়ায়, পুষ্টি যোগাতে সাহায্য করে।

৩. পিঠের মাংসপেশিকে মজবুত রাখে। ফলে পিঠে ব্যথাবেদনা হতে পারে না।

৪. সায়াটিকা রোগ প্রতিরোধ করে।

৫. হাত পা বুক ও পিঠের গঠন সুন্দর করে।

৬. কিডনিতে রক্ত চলাচল বাড়ে। ফলে কিডনির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৭. এছাড়াও এড্রিনাল গ্ল্যান্ডকে সুস্থ ও সক্রিয় রাখতে এ আসনটি নিয়মিত করা দরকার। কারণ, এড্রিনাল গ্ল্যান্ড কোনো কারণে অসুস্থ হলে রক্তচাপ কমে যেতে পারে, পরিপাক ক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটতে পারে। ক্ষুধা কমে যেতে পারে, অলসতা আসতে পারে। তাই আসনটি প্রতিদিনই করা দরকার।

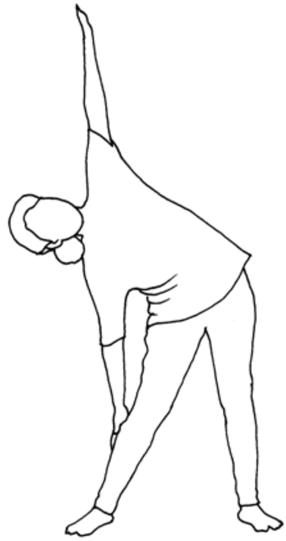

ত্রিকোণাসন : ছবি– ২(ক)

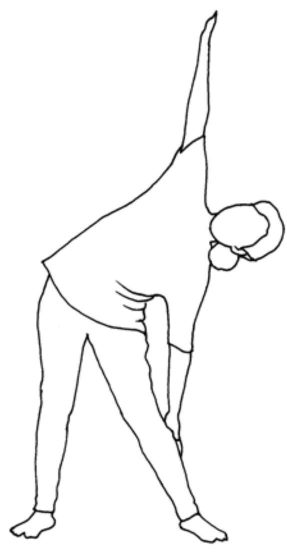

ত্রিকোণাসন : ছবি– ২(খ)

আসন
৬

অর্ধচন্দ্রাসন

পদ্ধতি : প্রথমে দুই পা ও মেরুদণ্ড সোজা করে দুপায়ের পাতা কাছাকাছি রেখে দাঁড়ান। এবার দুহাত মাথার ওপরে তুলুন। হাত দুটো যেন কানের সাথে লেগে থাকে। দুহাতের তালু একত্রে চেপে রাখুন (১নং ছবির মতো)। এবার কোমর থেকে শরীরের ওপরের অংশ ধীরে ধীরে ডান দিকে বাঁকান (২নং ছবির মতো)। একই ভাবে ১নং ছবির মতো অবস্থানে ফিরে এসে কোমর থেকে শরীরের ওপরের অংশ ধীরে ধীরে বাম দিকে বাঁকান (৩নং ছবির মতো)। দম স্বাভাবিক রাখুন। খেয়াল রাখুন যেন শরীর সামনে কিংবা পেছনে ঝুঁকে না যায়।

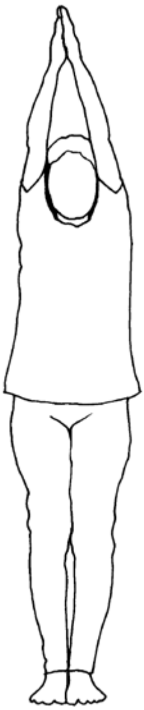

অর্ধচন্দ্রাসন : ছবি– ১

অর্ধচন্দ্রাসন : ছবি– ২

আয়নার সামনে এটি করলে আপনি সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন। এভাবে একবার ডানে ও একবার বামে–প্রত্যেক পাশে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড করে অবস্থান করুন। তবে

অর্ধচন্দ্রাসন :
ছবি– ৩

সহজভাবে যতটুকু পারেন করুন। জোর করে করবেন না। একবার ডানে ও একবার বামে মিলে এক প্রস্থ হয়। এভাবে তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ করুন।

উপকারিতা

১. কিডনিতে রক্ত চলাচল বাড়িয়ে কিডনি সুস্থ রাখে। ফলে কিডনির কোনো রোগ হতে পারে না।

২. এড্রিনাল গ্ল্যান্ডকে সুস্থ রাখে।

৩. মেরুদণ্ড নমনীয় ও কমনীয় রাখে।

৪. কোমরে সরাসরি চাপ পড়ায় অতিরিক্ত চর্বি কোমরে জমতে পারে না।

আসন
৭

জানুশিরাসন

পদ্ধতি : প্রথমে পা সামনে সোজা করে মেরুদণ্ড সোজা রেখে মাটিতে বসুন। পা দুটো যেন সামনের দিকে ছড়িয়ে থাকে। এবার প্রথমে ডান পায়ের হাঁটু ভেঙে ডান পায়ের পাতা বাম উরুর শেষ প্রান্তে এনে লাগিয়ে রাখুন। দেখতে যেন সমকোণের মতো লাগে (১নং ছবির মতো)। অর্থাৎ বাম পা সোজা রেখে ডান পা ভেঙে এনে রাখতে হবে নব্বই ডিগ্রি এঙ্গেলে।

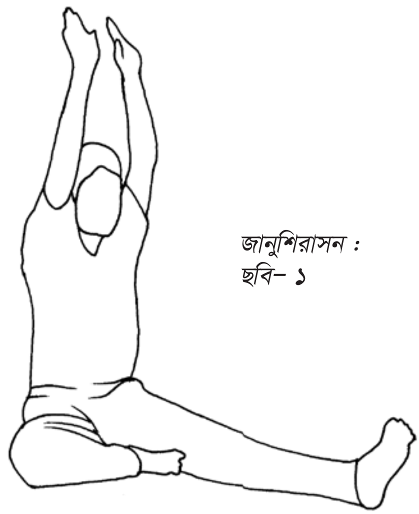

জানুশিরাসন : ছবি– ১

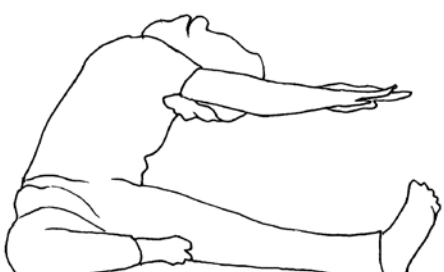

জানুশিরাসন : ছবি– ২

এরপর দম স্বাভাবিক রেখে মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বাম হাঁটুর ওপর কপাল ঠেকাতে চেষ্টা করুন (৪নং ছবির মতো)। হাত দুটো দিয়ে বাম পায়ের বুড়ো আঙুল ধরুন। হাঁটু যেন না ভাঙে। যতদিন না সঠিক ভঙ্গিমায় আনতে পারছেন ততদিন যতটুকু পারবেন ততটুকু ঝুঁকবেন (২ ও ৩নং

ছবির মতো)। জোর করে কপাল হাঁটুতে ঠেকাতে যাবেন না। এভাবে প্রথমে ডানে ও পরে একইভাবে বাম পায়ে করুন। প্রত্যেক বারই সঠিক ভঙ্গিমায় গিয়ে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। ডানে-বামে মিলে এক প্রস্থ। এভাবে তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ করুন।

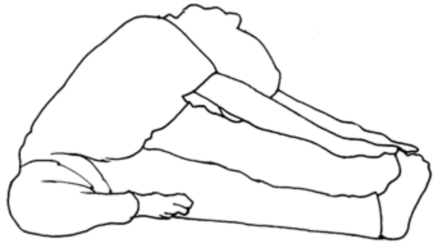

জানুশিরাসন : ছবি– ৩

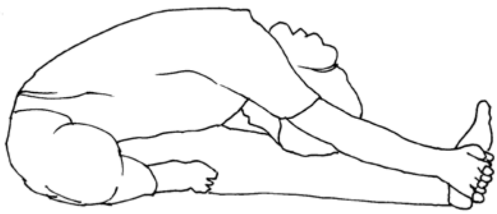

জানুশিরাসন : ছবি– ৪

এ আসনে কপাল ও হাঁটু একত্রে মিশে থাকে বলে একে জানুশিরাসন বলে। জানু অর্থ হাঁটু, শির অর্থ মাথা।

উপকারিতা

১. জানুশিরাসন অভ্যাসে অগ্ন্যাশয়ে চাপ পড়ায় অগ্ন্যাশয় সুস্থ ও সবল থাকে। এতে বহুমূত্র রোগ হতে পারে না। আর যারা এ রোগে ভুগছেন তারা এ আসনটি করলে বহুমূত্র রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন।

২. পেটে চর্বি জমতে পারে না।

***বি.দ্র. :** সামনে ঝোঁকা নিষেধ–এমন রোগ থাকলে এ আসন করবেন না।*

আসন ৮

শশাঙ্গাসন

পদ্ধতি : প্রথমে জাজেন বা বজ্রাসনের মতো করে বসুন। এবার এ অবস্থা থেকে হাঁটুতে ভর করে শরীরের ওপরের অংশ তুলুন। মাথা সোজা করুন। এবার আস্তে আস্তে মাথা সামনের দিকে ঝাঁকিয়ে কপাল হাঁটুর সাথে লাগাতে চেষ্টা করুন। এবার হাত দুটো দিয়ে দুপায়ের গোড়ালি ধরুন। দম স্বাভাবিক থাকবে। থুতনি গলার শেষ প্রান্তে থাকবে। দুপায়ের গোড়ালি লেগে থাকবে। মাথার তালু মাটিতে থাকবে (ছবির মতো)।

শশাঙ্গাসন : ছবি– ১

তবে জোর করে সঠিক ভঙ্গিমায় প্রথমেই যেতে চেষ্টা করবেন না। চর্চা করলে ধীরে ধীরে সঠিক ভঙ্গিমায় যেতে পারবেন। শেষ অবস্থানে গিয়ে ১০ থেকে ২০ সেকেন্ড থাকুন। ইচ্ছে করলে সহজ শিথিলায়ন বা শবাসন করে বিশ্রাম নিয়েও করতে পারেন। যাদের নিম্ন রক্তচাপ আছে, এ আসন করলে তাদের প্রথমদিকে মাথা ঘোরাতে পারে; ভয়ের কিছু নেই। সাইনুসাইটিস থাকলে প্রথম দিকে কপাল, নাকের দুপাশ এবং মাথা ব্যথা করতে পারে। পরে ঠিক হয়ে যায়। এ আসনটি তিন থেকে পাঁচ বার করতে পারেন।

উপকারিতা

১. এ আসন নিয়মিত অভ্যাস করলেস্নায়ুর মটর নিউরোন সুস্থ-সাবলীল থাকে। ফলে যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হয়।

২. মেরুদণ্ড নমনীয়-কমনীয় হয়। মেরুদণ্ডের সংযোগস্থলগুলোর স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকে বলে লোয়ার মটর নিউরোন বেশি কর্মক্ষম হয়।

৩. টনসিলে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায় বলে টনসিলের সমস্যা থাকলে তা দূর হয়ে যায়। ঘন ঘন ঠান্ডা লাগা দূর হয়। এ আসন নিয়মিত করলে টনসিলের রোগ সম্পূর্ণরূপে সেরে যায়। তবে ক্রনিক হলে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া উচিত।

৪. পিটুইটারি গ্ল্যান্ডে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি করে তাকে সুস্থ-সতেজ রাখে। ফলে বিভিন্ন মেয়েলি রোগে উপকার পাওয়া যায়।

৫. থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের হরমোন প্রবাহ ঠিক রাখে।

৬. শশাঙ্গাসনের নিয়মিত অভ্যাস লম্বা হতে সাহায্য করে।

৭. এছাড়াও অগ্ন্যাশয়, যকৃৎ ও পীহার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

৮. যারা ক্ষুধামান্দ্যয় ভোগেন তাদের এ আসন করলে ক্ষুধা বাড়ে।

আসন ৯

ভদ্রাসন

ভদ্রাসন : ছবি– ১

পদ্ধতি : প্রথমে দুই পা সামনের দিকে ছড়িয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে বসুন। এবার (ছবির মতো) দুপায়ের পাতা ও গোড়ালি একত্র করে যোনিমণ্ডলে স্থাপন করুন। এবার দুহাত দুহাঁটুর ওপরে রেখে চেপে ধরুন। মেরুদণ্ড সোজা রাখুন। প্রয়োজনে দেয়ালের সাথে কিংবা খাটের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে সোজা রাখতে পারেন। দম স্বাভাবিক রেখে ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড এ ভঙ্গিমায় অবস্থান করুন। এভাবে তিন থেকে পাঁচ বার করতে পারেন। ইচ্ছে করলে একসাথে এক থেকে তিন মিনিট করতে পারেন। তারপর পা সোজা করে একটু বিশ্রাম নিয়ে অন্য আসন করুন।

উপকারিতা

১. মাসিক বা ঋতু সংক্রান্ত যত রোগ রয়েছে, প্রতিটির জন্যেই এ আসন অত্যন্ত উপকারী। অর্থাৎ আমাদের শরীরে যে জননগ্রন্থি আছে, তাকে সুস্থ রাখার জন্যে এ আসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। (মাসিক সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

আসন
১০

স্থিরায়ন বা গোমুখাসন

পদ্ধতি : প্রথমে মেরুদণ্ড সোজা করে দুই পা সামনের দিকে ছড়িয়ে বসুন। এবার বাম পায়ের হাঁটু ভেঙে ডান পায়ের নিচ দিয়ে নিয়ে এসে ডান নিতম্বের কাছে নিয়ে রাখুন। বাম পায়ের গোড়ালি ডান নিতম্বের সাথে লেগে থাকবে। তবে যদি না লাগাতে পারেন জোর করে লাগাতে যাবেন না। আস্তে আস্তে অভ্যাস হলে লেগে যাবে।

গোমুখাসন : ছবি– ১

এবার ডান পা হাঁটু ভেঙে বাম উরুর ওপর দিয়ে এনে এমনভাবে রাখুন, যাতে বাম নিতম্বের সাথে ডান পায়ের গোড়ালি স্পর্শ করে। পায়ের পাতার পিঠ মাটিতে বিছানো থাকবে (১নং ছবি দেখুন)। এবার ডান হাত ডান কাঁধের ওপর নিয়ে এসে যতদূর পারেন পিঠের ওপর রাখুন। হাতের পাতা উপুড় অবস্থায় পিঠের ওপর থাকবে। এবার বাম হাত কোমরের কাছ থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে পিঠের ওপর রাখা ডান হাতটি ধরতে চেষ্টা করুন (২নং ছবির মতো)। ডান হাত দিয়ে বাম হাত আটকে ধরুন। এ আসনে যেদিকের পা ওপরে থাকবে সেদিকের হাত

গোমুখাসন : ছবি– ২

কাঁধের ওপরে থাকবে, হাত কানের সাথে লেগে থাকবে। অর্থাৎ বাম পা ওপরে থাকলে বাম হাত কাঁধের ওপর থাকবে। ডান পা ওপরে থাকলে ডান হাত কাঁধের ওপর থাকবে। মেরুদণ্ড ও শরীর সবসময় সোজা থাকবে। সামনে বা পেছনে, ডানে বা বামে যেন বেঁকে না যায়। দম স্বাভাবিক রেখে ডান পা ওপরে রাখা অবস্থায় ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড অবস্থান করুন। আবার বাম পা ওপরে রাখা অবস্থায় ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড অবস্থান করুন। এভাবে ডানে-বামে মিলে এক প্রস্থ হবে।

এভাবে তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ করতে পারেন। পরে অভ্যাস হলে একবারেই একপাশে এক থেকে তিন মিনিট করতে পারেন। আর যদি ২০ সেকেন্ডও হাত ধরে রাখতে না পারেন অসুবিধে নেই। যতটুকু সহজভাবে পারেন করুন। তাতেও ফল হবে। নিয়মিত চর্চা করলে সঠিক ভঙ্গিমায় আসনটি অনেকক্ষণ করতে পারবেন। এক হাঁটুর ওপর অন্য হাঁটু এমনভাবে থাকে–দেখতে গরুর মুখের মতো দেখায়, তাই এ আসনের নাম গোমুখাসন।

উপকারিতা

১. এ আসনে মানসিক ওস্নায়বিক উত্তেজনা দূর হয়।

২. নিয়মিত এ আসনটি অভ্যাস করলে হাঁটুতে বাতব্যথা ও বাতজনিত রোগ হতে পারে না।

৩. হাত ও কাঁধের সন্ধিস্থলের জন্যে বিশেষ উপকারী।

৪. এ আসন নিয়মিত অনুশীলন করলে কোনো স্ত্রীরোগ হতে পারে না এবং যৌন সংযম বজায় রাখা সহজ হয়।

৫. যাদের ফ্রোজেন শোলডার (frozen shoulder) রোগ রয়েছে অর্থাৎ হাত ওপরে তুলতে পারেন না তাদের জন্যে এ আসন বিশেষ উপকারী।

৬. নিয়মিত এ আসন করলে অর্শ, বাত, সায়াটিকা, মূত্রদাহ হতে পারে না।

৭. যারা অনেকক্ষণ কাজ করতে করতে কাঁধের কাছে ব্যথা অনুভব করেন, চিনচিন ব্যথা করে–মনে হয় একটি শলাকা বা সুঁই ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে–তারা নিয়মিত এ আসন করলে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

৮. রাতে যাদের ভালো ঘুম হয় না তারা রাতে খাবারের পরে বজ্রাসন করে ঘুমানোর আগে এ আসন নিয়মিত করলে অনিদ্রা দূর হয়।

আসন
১১

উষ্ট্রাসন

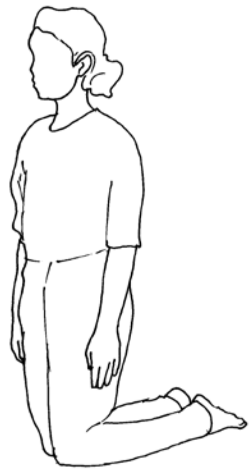
উষ্ট্রাসন : ছবি– ১

পদ্ধতি : প্রথমে দুই হাঁটুর ওপর ভর করে (১নং ছবির মতো) দাঁড়ান। দুই হাঁটুসহ দুই পা লেগে থাকবে। মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত মাটির সঙ্গে লেগে থাকবে। এবার দম স্বাভাবিক রেখে দুহাত দিয়ে দুপায়ের গোড়ালি ধরুন। বুক ও পেট যতটা সম্ভব সামনের দিকে এবং ঘাড় ও মাথা পেছন দিকে বাঁকিয়ে ধনুকের মতো করুন। এ অবস্থায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। তারপর আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসুন। এভাবে তিন থেকে পাঁচ বার করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন–যদি প্রথম অবস্থায় পা জোড়া লাগিয়ে না করতে পারেন তাহলে দুই হাঁটু, পা ফাঁকা করে করলে সহজে করতে পারবেন। দুহাত একত্রে গোড়ালির ওপর না রাখতে পারলে একহাত দিয়ে ধরুন, অন্য হাত দিয়ে খাটের পাশে করলে খাট ধরুন কিংবা দেয়াল ধরে করুন। এভাবে হাত পাল্টে একবার ডান হাত দিয়ে ডান পা আবার বাম হাত দিয়ে বাম পা ধরতে চেষ্টা করুন। এভাবে

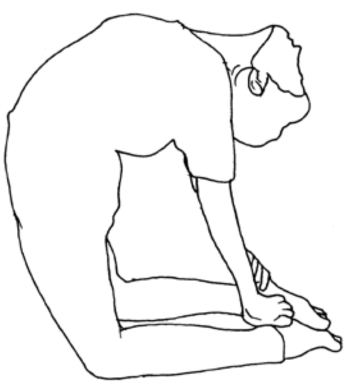
উষ্ট্রাসন : ছবি– ২

কিছুদিন অভ্যাস করলে সঠিক ভঙ্গিমায় আসনটি করতে পারবেন। এ আসনটিতে শরীরের মধ্যভাগ উটের মতো উঁচু হয়ে থাকে বলে একে উষ্ট্রাসন বলা হয়।

উপকারিতা

১. যারা কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে ভুগছেন তারা প্রতিদিন ভোরে একগ্লাস পানি খেয়ে উষ্ট্রাসন নিয়মিত অভ্যাস করলে বিশেষ উপকার পাবেন।

২. উষ্ট্রাসন নিয়মিত অভ্যাস করলে পেটে চর্বি জমতে পারে না। চর্বি থাকলে কমিয়ে কোমর ও পেট সুন্দর-সুশ্রী করে।

৩. শরীরে গরম-ঠান্ডা লাগার সহ্যশক্তি বাড়ায়।

৪. হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড ও টনসিল সুস্থ এবং সক্রিয় রাখে। এড্রিনাল গ্রন্থিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত চলাচল করিয়ে তাদের সুস্থ ও কর্মক্ষম করতে সাহায্য করে।

বি.দ্র. : *যারা হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের রোগে ভুগছেন তারা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এ আসন করবেন না।*

আসন
১২

উত্থিতপদাসন

উত্থিতপদাসন : ছবি– ১

পদ্ধতি : প্রথমে চিৎ হয়ে দুই পা সোজা করে জোড়া লাগিয়ে শুয়ে পড়ুন। দুহাত শরীরের দুপাশে মাটিতে রাখুন। হাতের তালু মাটিতে লেগে থাকবে। এবার দম স্বাভাবিক রেখে পা দুটো জোড় অবস্থায় ধীরে ধীরে মাটি থেকে ওপরে তুলুন এবং আস্তে আস্তে এমন এক জায়গায় ধরে রাখুন (ছবির মতো করে), যেখানে পেটে বেশি চাপ অনুভব করেন। এবার এ অবস্থায় ১০ থেকে ৩০ সেকেন্ড অবস্থান করুন। এভাবে তিন থেকে সাত বার পর্যন্ত করতে পারেন। প্রয়োজনে শবাসনে বিশ্রাম নিয়ে করতে পারেন। প্রথম দিকে এ আসনটি করার পর পেটের চামড়ায় প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করতে পারেন; এতে ভয়ের কিছু নেই। নিয়মিত অনুশীলন করলে ব্যথা চলে যাবে।

উপকারিতা

১. যাদের পেটে চর্বি বেশি তারা একটু বেশি বার করলে পেটের চর্বি কমিয়ে আনতে পারবেন। পেটের শেপ সুন্দর হবে।

২. এ আসন নিয়মিত করলে কোনোদিন হার্নিয়া হতে পারে না।

৩. মেয়েদের ডিম্বাশয়ে (ovary) প্রচুর রক্ত চলাচল হয় বলে স্ত্রীরোগ হতে পারে না। আর হলেও কিছুদিন করলে ভালো হয়ে যায়।

৪. যাদের জরায়ু নেমে যায় তারা বিশেষ উপকার পাবেন।

৫. হজমশক্তি বৃদ্ধি করে। পেটের পেশি ওস্নায়ুতন্ত্র, লিভার, পীহা প্রভৃতি সতেজ ও সক্রিয় থাকে।

আসন
১৩

ভুজঙ্গাসন

ভুজঙ্গাসন : ছবি– ১

পদ্ধতি : প্রথমে উপুড় হয়ে দুই পা জোড় করে সোজা রেখে মাটিতে শুয়ে পড়ুন। মাথাটা বামে অথবা ডানে–যেদিকে ইচ্ছে কাত করে রাখুন। হাত দুটো শরীরের দুপাশে ও হাতের পাতা মাটিতে লেগে থাকবে।

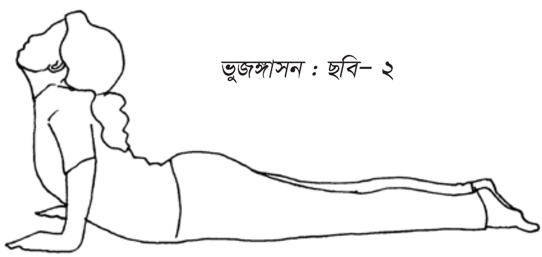

ভুজঙ্গাসন : ছবি– ২

এবার (১নং ছবির মতো) হাত দুটো টেনে নিয়ে এসে দুবাহু বরাবর উপুড় করে রাখুন। হাতের ওপর ভর করে মাথা ওপরে তুলুন। বুক মাটি থেকে ওপরে উঠবে। কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত পা জোড় অবস্থায় সোজা থাকবে। নাভি মেঝেতে লেগে থাকবে। দম থাকবে স্বাভাবিক। (২নং ছবির মতো) এভাবে পূর্ণ ভঙ্গিমায় এসে ১০/১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। তিন থেকে পাঁচ বার করতে পারেন। প্রয়োজনে শবাসনে ১০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিয়ে করতে পারেন।

এবার (৩নং ছবির মতো) হাতের ওপর ভর করে বুক-পেট-মাথা পেছন দিকে এলিয়ে দিয়ে পা দুটো হাঁটু ভেঙে মাথার তালুর সাথে লাগিয়ে দিন। নাভি ওপরে থাকবে। এ অবস্থানে ১০/১৫ সেকেন্ড থাকতে পারেন। এভাবে তিন থেকে পাঁচ বার করতে পারেন। ৩নং ছবির আসনটির নাম পূর্ণ ভুজঙ্গাসন।

ভুজঙ্গ অর্থ সাপ। সাপের ফনার মতো দেখতে লাগে বলে আসনটির নাম ভুজঙ্গাসন।

প্রথমদিকে পা জোড় অবস্থায় আসনটি না করতে পারলে পা দুটো সুবিধা মতো ফাঁক করে অভ্যাস করতে পারেন। ধীরে ধীরে শরীর নমনীয় হলে সঠিক ভঙ্গিমায় আসনটি করতে পারবেন। জোর করে একবারে করতে যাবেন না।

উপকারিতা

১. এ আসনটি নিয়মিত করলে ব্যাকপেইন, স্পন্ডিলাইটিস, স্লিপড ডিস্কজাতীয় রোগ হতে পারে না।

২. সব ধরনের স্ত্রীরোগের মহৌষধ হিসেবে কাজ করে। তাই প্রতিদিন এ আসনটি অভ্যাস করা উচিত।

৩. যে-সব ছেলেমেয়ের বয়স অনুযায়ী বুকের গড়ন সরু বা অপরিণত তাদের এ আসনটি করা উচিত। নিয়মিত অভ্যাসে বুক সুগঠিত হয়।

৪. আসনটিতে ঘাড় গলা মুখ বুক পিঠ কোমর ও মেরুদণ্ডের ওপরে চাপ পড়ায় ঐ অঞ্চলের স্নায়ুতন্ত্র ও পেশি সতেজ ও সক্রিয় থাকে। পিঠের মাংসপেশিকে মজবুত ও বেশি কর্মক্ষম করে।

৫. মেরুদণ্ডের হাড় নমনীয় থাকে।

৬. টনসিলাইটিস থেকে মুক্তির জন্যে এবং যারা ঘন ঘন ঠান্ডায় ভোগেন তাদের জন্যে উপকারী।

৭. এ আসনটি হাই ব্লাডপ্রেশার রোগীদের জন্যে খুবই উপকারী। মানসিক উদ্বেগ ও উত্তেজনার ফলে আমাদের শরীরের রক্তে এড্রিনালিন বেড়ে গিয়ে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। এ আসন নিয়মিত চর্চা এড্রিনাল গ্রন্থিকে ত্রুটিমুক্ত ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

৮. অর্ধ ভুজঙ্গাসনেও পূর্ণ ভুজঙ্গাসনের মতো ফল পাওয়া যায়।

৯. এ আসন নিয়মিত করলে হজমশক্তি বাড়ে। যকৃৎ ও পীহা সুস্থ থাকে।

আসন ১৪

অর্ধশলভাসন

অর্ধশলভাসন : ছবি– ১

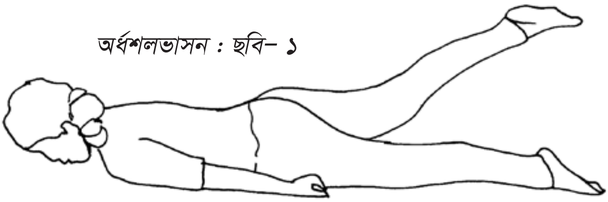

পদ্ধতি : প্রথমে উপুড় হয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ুন। হাত দুটো শরীরের সাথে দুপাশে লাগিয়ে রাখুন। এবার মেঝেতে হাতের তালু লাগিয়ে হাত মুষ্টিবদ্ধ করুন। থুতনি মেঝেতে লেগে থাকবে।

এবার দম স্বাভাবিক রেখে প্রথমে ডান পা সোজা রেখে হাঁটু না ভেঙে ওপরের দিকে তুলুন। বাম পা মাটিতে লেগে থাকবে। খেয়াল রাখুন পা যেন ডানে/ বামে বেঁকে না যায়। সোজা ওপরে তুলতে হবে। এ ভঙ্গিমায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। একই পদ্ধতিতে এরপর বাম পা তুলে ডান পা মাটিতে রেখে করুন। একবার ডান পা ও একবার বাম পা মিলে এক প্রস্থ হয়। এভাবে তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ করতে পারেন। এভাবে আলাদা আলাদাভাবে দুই পা তুলে অভ্যাস হলে পরে একইসাথে (২নং ছবির মতো) দুই পা একত্রে জোড়া লাগিয়ে হাঁটু না ভেঙে ও মাথা না তুলে করতে পারবেন। একে বলে পূর্ণশলভাসন।

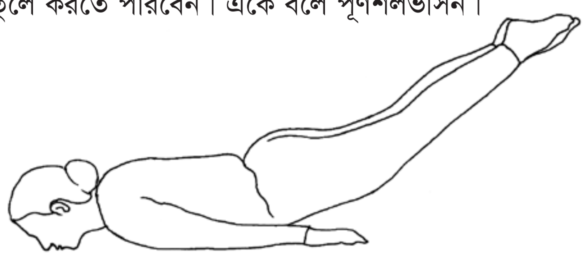

পূর্ণশলভাসন : ছবি– ১

উপকারিতা

১. এ আসন নিয়মিত চর্চা করলে কোমর ব্যথা, কটিবাত, মাসিকের সময় নিচের পেট ব্যথা ইত্যাদি হতে পারে না। এছাড়া শরীরের নিম্নাংশের খুব ভালো ব্যায়াম হয়।

২. কোমর ও নিচের পেটে চর্বি জমতে পারে না।

৩. স্লিপড ডিস্ক, লাম্বার স্পন্ডিলাইটিস বা জরায়ু উল্টে যাওয়ার কারণে কোমরে যে ব্যথা হয়, এর নিরাময়ে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

৪. নিতম্ব ও পিঠের মাংসপেশি মজবুত ও সুদৃঢ় করে মেরুদণ্ডকে ধরে রাখতে সাহায্য করে। যার ফলে স্লিপড ডিস্ক হতে পারে না।

৫. স্লিপড ডিস্ক থেকে যে সায়াটিকা ব্যথার সৃষ্টি হয়, এ আসন নিয়মিত চর্চা করলে তার উপশম হয়।

আসন
১৫

সর্বাঙ্গাসন

পদ্ধতি : প্রথমে চিৎ হয়ে দুই পা সোজা রেখে শুয়ে পড়ুন। হাত দুটো শরীরের দুপাশে রাখুন। এবার হাতের কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে জোড় পা সোজা অবস্থায় ওপরে তুলুন। দুহাত দিয়ে কোমরের কাছে ধরে রাখুন যেমন কোনো গাছকে ঠেস দিয়ে রাখা হয় তেমনি করে। থুতনি গলার কাছে লেগে থাকবে। মাথা, ঘাড়, কাঁধ মাটিতে লেগে থাকবে (ঠিক ছবির মতো)। দম স্বাভাবিক রেখে এ ভঙ্গিমায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। বিশ্রাম নিয়ে তিন থেকে চার বার করতে পারেন। ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে গেলে এক সাথে এক থেকে তিন মিনিটও এ ভঙ্গিমায় অবস্থান করতে পারেন। এ আসনটিতে শরীরের সর্ব অঙ্গের ব্যায়াম হয় বলে একে সর্বাঙ্গাসন বলা হয়। ইচ্ছে করলে প্রথম দিকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে করতে পারেন। অথবা কাউকে দিয়ে ধরে রেখেও করতে পারেন।

উপকারিতা

১. এ আসনটি যৌবনকে দীর্ঘ দিন ধরে রাখতে সাহায্য করে।

২. শরীরের থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড ও টনসিল প্রভৃতিতে প্রচুর রক্ত চলাচল হয়ে সতেজ ও সুস্থ রাখে। এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড থেকে যে হরমোন নিঃসৃত হয় তা সঠিকভাবে নিঃসৃত হওয়ার সুযোগ পায়।

৩. কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণকালে পিটুইটারি গ্রন্থির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পিটুইটারি গ্রন্থির সক্রিয়তায় নারীর দেহে যৌবনাগমন ঘটে ও দেহকে সুন্দর করে গড়ে তোলে।

৪. কোষ্ঠকাঠিন্য, রেট্রোভারটেড ইউটেরাস, অর্শ প্রভৃতি রোগে যারা ভুগছেন তাদের জন্যে এ আসন অত্যন্ত উপকারী।

৫. এ আসন নিয়মিত চর্চায় স্থানচ্যুত জরায়ু যথাস্থানে ফিরে আসে।

বি.দ্র. : *যারা হার্টের রোগে ভুগছেন এবং যে-সব ছেলেমেয়ের বয়স* ***১২*** *বছরের কম তাদের এ আসনটি করা উচিত নয়। সর্বাঙ্গাসনের পর মৎস্যাসন অবশ্যই করবেন।*

আসন
১৬

মৎস্যাসন

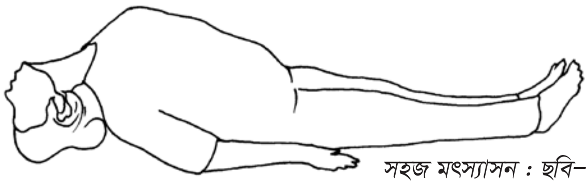

সহজ মৎস্যাসন : ছবি– ১

পদ্ধতি : প্রথমে চিৎ হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ুন। দুই পা জোড়া লেগে থাকবে। হাত দুটো শরীরের দুপাশে থাকবে। হাতের তালু মাটিতে লেগে থাকবে। এবার নিতম্ব পর্যন্ত মাটিতে রেখে হাত দুপাশে রাখুন। বুক উঁচু করে মাথার তালু মাটিতে ঠেকান (১নং ছবির মতো)। দম স্বাভাবিক থাকবে। এ ভঙ্গিমায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। এভাবে তিন বার করুন। অভ্যস্ত হলে একবারে এক থেকে দুই মিনিট অবস্থান করতে পারেন।

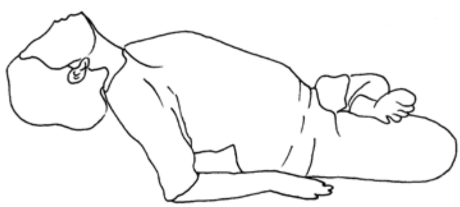

মৎস্যাসন : ছবি– ২

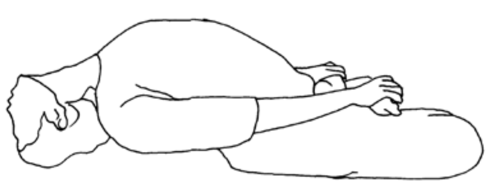

মৎস্যাসন : ছবি– ৩

এবার প্রথমে সোজা হয়ে পদ্মাসনে বসুন। পা দুটো পদ্মাসনে রেখে দুহাতের কনুই মাটিতে ভর করে (২নং ছবির মতো) শুয়ে পড়তে চেষ্টা করুন। এবার বুক ও পেট মাটি থেকে ওপরের দিকে তুলুন। মাথার তালু

মাটির সঙ্গে ঠেকে থাকবে। এখন দুপায়ের বুড়ো আঙুল দুহাত দিয়ে ধরুন। দম স্বাভাবিক থাকবে (৩ নং ছবির মতো)।

এ ভঙ্গিমায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড থাকুন। প্রয়োজনে বিশ্রাম নিয়ে তিন বার করুন। অভ্যস্ত হয়ে গেলে একবারে এক থেকে দুই মিনিটও করতে পারেন। সর্বাঙ্গাসনের পর এ আসনটি করা উচিত।

উপকারিতা

১. এ আসনে পিটুইটারি থাইরয়েড প্যারাথাইরয়েড থাইমাস প্রভৃতি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতে প্রচুর রক্ত চলাচল হওয়ায় এদেরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

২. হাঁপানি সর্দি কাশি ব্রঙ্কাইটিস টনসিলের সমস্যা থাকলে নিয়মিত আসনটি করলে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

৩. ঘাড়, কাঁধ, মেরুদণ্ডের দুপাশের পেশি ওস্নায়ুর খুব ভালো ব্যায়াম হয়।

৪. বুকের গঠন সুঠাম ও সুন্দর হয়।

আসন
১৭

তুলাসন বা উৎকট আসন

পদ্ধতি : প্রথমে মেরুদণ্ড সোজা রেখে দুই পা একফুট পরিমাণে কিংবা তার চেয়ে কিছুটা কম ফাঁক রেখে দাঁড়ান। হাত দুটো সামনের দিকে (ছবির মতো) ছড়িয়ে দিয়ে চেয়ারে বসার ভঙ্গিমায় বসুন। হাতের তালু নিচের দিকে মাটি থেকে সমান্তরাল অবস্থায় থাকবে। দম স্বাভাবিক থাকবে। এ ভঙ্গিমায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। এভাবে তিন থেকে পাঁচ বার করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, প্রথমদিকে যেটুকু সময় পারেন ততটুকুই করবেন। অভ্যস্ত হলে পরে নির্ধারিত সময় নিয়ে করতে পারবেন।

তুলাসন বা উৎকট আসন : ছবি– ১

উপকারিতা

১. এ আসনটি পায়ের শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। যাদের হাঁটতে বা সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করতে পায়ে কষ্ট হয় বা পায়ে শক্তি পান না তাদের জন্যে আসনটি খুবই উপকারী।

২. এ আসন করার ফলে কোমর ও মেরুদণ্ডে বেশ চাপ পড়ায় কোমরে কোনো ব্যথা হতে পারে না।

৩. ঊরুর ওপর চাপ পড়ায় যাদের ঊরু মোটা তারাও বিশেষ উপকার পাবেন। বাড়তি চর্বি কমিয়ে ঊরুর গঠন সুন্দর করতে সহায়ক হবে।

আসন ১৮

বৃক্ষাসন

পদ্ধতি : প্রথমে মেরুদণ্ড সোজা রেখে দুই পা সোজা করে মাটিতে দাঁড়ান। এবার (১নং ছবির মতো) প্রথমে ডান পা তুলে বাম পায়ের ঊরুর

বৃক্ষাসন : ছবি– ১

বৃক্ষাসন : ছবি– ২

একেবারে শেষ প্রান্তে নিয়ে রাখুন। ডান পায়ের পাতা বাম ঊরুর সাথে লেগে থাকবে। এবার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে হাত দুটো কাঁধের দুপাশে রাখুন। এবার এ অবস্থা থেকে আস্তে আস্তে হাত মাথার ওপরে নিয়ে দুহাতের তালু (২নং ছবির মতো) একত্রে জোড় করে রাখুন। এ অবস্থায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। আবার বাম পা তুলে একইভাবে ডান পায়ের ঊরুর সাথে লাগিয়ে মাথার ওপর দুহাত জোড় করে রাখুন। এ ভঙ্গিমায় গিয়ে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড

অবস্থান করুন। দম স্বাভাবিক থাকবে। এভাবে ডানে ও বামে মিলে এক প্রস্থ হয়। এ আসন তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ করতে পারেন।

উপকারিতা

১. এ আসনটিও পায়ের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি নিয়মিত করলে পায়ে ব্যথাবেদনা হতে পারে না। হাত-পা কামড়ায় না। এছাড়া পায়ের প্রধান ধমনীতে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায় বলে পায়ের পেশি ও স্নায়ুগুলো পুষ্ট ও সতেজ হয়।

২. কোমরের পেশিকে মজবুত রাখে।

৩. পায়ের গঠন সুন্দর হয়।

আসন
১৯

মুণ্ডকাসন

পদ্ধতি : প্রথমে বজ্রাসনে বসুন। এবার (১নং ছবির মতো) হাঁটু দুটো যত দূর সম্ভব ছড়িয়ে দিন। এবার ডান হাত ডান হাঁটুর ওপর ও বাম হাত বাম হাঁটুর ওপর রাখুন। মেরুদণ্ড সোজা রেখে এভাবে বসে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। এরপর বজ্রাসনে ফিরে আসুন। পায়ে বিশ্রাম দিয়ে তিন থেকে পাঁচ বার করতে পারেন। অথবা একবার একসাথে দুই থেকে তিন মিনিটও এ ভঙ্গিমায় অবস্থান করতে পারেন। দম স্বাভাবিক থাকবে।

মুণ্ডকাসন : ছবি– ১

উপকারিতা

১. সায়াটিকার ব্যথায় যারা কষ্ট পাচ্ছেন তাদের জন্যে বিশেষ উপকারী।

২. হাঁটুতে বাতব্যথা হতে পারে না।

আসন
২০

অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন

অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন : ছবি– ১
(সামনে থেকে)

অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন : ছবি– ২
(পেছন থেকে)

পদ্ধতি : প্রথমে মেরুদণ্ড সোজা রেখে মাটিতে দুই পা ছড়িয়ে বসুন। এবার বাম পায়ের হাঁটু ভেঙে ডান পায়ের নিচ দিয়ে নিয়ে এসে ডান উরুর সাথে লাগিয়ে মাটিতে রাখুন। পায়ের পাতা মাটি থেকে ওপরের দিকে থাকবে। এবার ডান পা তুলে বাম পায়ের উরুর ওপর দিয়ে নিয়ে এসে হাঁটুর কাছে খাড়া অবস্থায় রাখুন। পায়ের পাতা মাটিতে লেগে থাকবে। পায়ের আঙুল সামনের দিকে ছড়ানো থাকবে (১নং ছবির মতো)। এবার বাম হাত ডান হাঁটুর ওপর দিয়ে নিয়ে এসে বাম হাঁটু ধরুন এবং ডান হাতটি কোমরের কাছ থেকে পেছন দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে বাম পাশের কোমরের কাছে হাতের পিঠ দিয়ে স্পর্শ করুন। হাতের পাতা ওপরে থাকবে। মাথা যথাসম্ভব ডান দিকে ঘুরিয়ে পেছনে দেখার চেষ্টা করুন (২নং ছবির মতো)। দম স্বাভাবিক থাকবে। এ অবস্থায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন।

এভাবে একবার ডান পা ওপরে ডান হাত পেছনে রেখে আর একবার বাম পা ওপরে বাম হাত পেছনে রেখে চেষ্টা করুন। ডানে ও বামে মিলে এক প্রস্থ হবে। এভাবে তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ করতে পারেন। একই নিয়মে প্রথমে ডান পায়ে পরে বাম পায়ে অবশ্যই করতে হবে। যখন অভ্যস্ত হয়ে যাবেন তখন এক এক পায়ে এক পাশে সঠিক ভঙ্গিমায় একমিনিট করে অবস্থান করতে পারেন। দুই পায়ে দুই মিনিট।

তবে প্রথম অবস্থায় হাত-পা জোর করে সঠিক ভঙ্গিমায় আনতে যাবেন না। যতটুকু সহজভাবে পারবেন করুন। নিয়মিত চর্চায় শরীর নমনীয় হলে সঠিক ভঙ্গিমায় পারবেন। সঠিক ভঙ্গিমায় না হলেও ফল পাবেন।

বি.দ্র.: *যেদিকের পা ওপরে থাকবে সেদিকের হাত পেছনে থাকবে।*

উপকারিতা

১. এ আসনে মেরুদণ্ডের মধ্যভাগের কশেরুকাগুলোর ওপর বিশেষ চাপ পড়ে বলে বিশেষ উপকার হয়। মেরুদণ্ডের মধ্যভাগকে নমনীয়, মধ্যভাগের স্নায়ুকে কর্মতৎপর করে তোলার জন্যে মৎস্যেন্দ্রাসন অবশ্যই করা প্রয়োজন।

২. অল্প বয়স থেকে এ আসনটি অভ্যাস করলে মেরুদণ্ডের হাড়ের সমস্যা হতে পারে না।

৩. যকৃৎ পীহা পাকস্থলী ক্ষুদ্রান্ত্র কিডনি ওভারি ও এড্রিনাল গ্ল্যান্ড প্রভৃতিতে রক্ত চলাচল বাড়িয়ে এদের সুস্থ ও সুপরিচালিত করে।

৪. যাদের কাঁধ উঁচুনিচু তাদের আসনটি অবশ্যই করা উচিত।

৪. একমাত্র এ আসনের ফলে মেরুদণ্ডে মোচড় পড়ে। যারা খেলাধুলা বা ব্যায়াম করেন না তাদের জন্যে এ আসনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আসন ২১

ধনুরাসন

পদ্ধতি : প্রথমে উপুড় হয়ে শরীর সোজা রেখে হাত দুটো শরীরের দুপাশে রেখে শুয়ে পড়ুন। এবার (১নং ছবির মতো) মাটি থেকে উরু ওপরে তুলে হাঁটু ভেঙে খাড়া করুন। পেট মাটিতে লেগে থাকবে। বুক ও গলা ওপরে তুলে দুহাত দিয়ে দুপায়ের গোড়ালি ধরুন। হাত দুটো টানটান সোজা থাকবে। দম স্বাভাবিক থাকবে। হাঁটু যথাসম্ভব মাটি থেকে ওপরে তুলতে চেষ্টা করুন। দুই হাঁটু জোড়া লেগে থাকবে। দৃষ্টি ওপরে থাকবে। ছবির মতো ভঙ্গিমায় এসে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। তবে প্রথমে হাঁটু জোড়া অবস্থায় না পারলে দুপা ফাঁক করে (২নং ছবির মতো) করতে পারেন। পরে অভ্যস্ত হলে (১নং ছবির মতো) সঠিকভাবে করুন। শরীর ধনুকের মতো দেখায় বলে এর নাম ধনুরাসন।

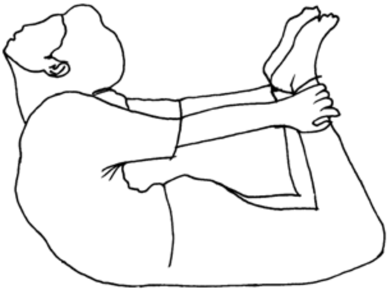

ধনুরাসন : ছবি– ১

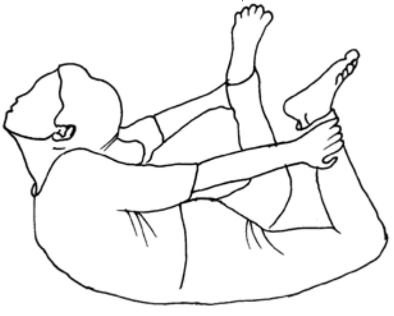

ধনুরাসন : ছবি– ২

উপকারিতা

১. কিডনি, থাইরয়েড ও এড্রিনাল গ্রন্থিকে সুস্থ স্বাভাবিক রাখে।

২. কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়।

৩. পিঠের মাংসপেশিগুলোতে বেশ চাপ পড়ায় মেরুদণ্ডেরস্নায়ুগুলোতে প্রচুর রক্ত চলাচল হয়ে সুস্থ-সতেজ রাখে।

৪. যাদের কোমরে বেশি চর্বি আছে এবং যাদের বুকের খাঁচা অনুন্নত তারা নিয়মিত এ আসন করলে অবশ্যই উপকৃত হবেন।

বি.দ্র. : *যারা গলগণ্ড রোগে বা লাম্বার স্পন্ডিলাইটিসজনিত অসুস্থতায় ভুগছেন তারা এ আসনটি করবেন না। কারণ, এ আসনটি করার সময় শরীরের কটিদেশীয় কশেরুকায় অত্যধিক চাপ পড়ে বলে কোমরের ব্যথা বেড়ে যেতে পারে।*

আসন ২২

পশ্চিমোত্তানাসন

পদ্ধতি : প্রথমে দুই পা সামনে ছড়িয়ে মেরুদণ্ড সোজা রেখে বসুন। এবার আস্তে আস্তে মাথা নিচু করে (১নং ছবির মতো) হাঁটু সোজা রেখে মাথা যতদূর সম্ভব সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে পা ধরতে চেষ্টা করুন। আস্তে আস্তে দুহাত দিয়ে দুপায়ের বুড়ো আঙুল ধরুন। কনুই মাটিতে লেগে থাকবে। দম স্বাভাবিক থাকবে। এভাবে প্রথম দিকে কিছুদিন করার পর শরীর নমনীয় হলে (২নং ছবির মতো) সঠিক ভঙ্গিমায় করতে পারবেন।

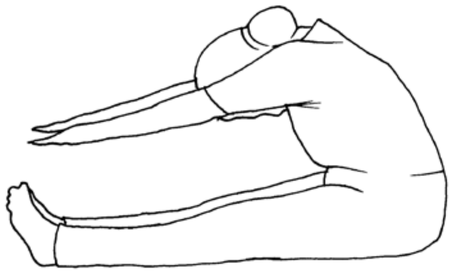

পশ্চিমোত্তানাসন : ছবি– ১
(সহজ ভঙ্গিমা)

সঠিক ভঙ্গিমা হলো–দুই পা মাটির সাথে লেগে থাকবে। কপাল হাঁটুর সাথে ও দুহাতের কনুই মাটিতে ঠেকে থাকবে। দুহাতের আঙুল দিয়ে দুপায়ের বুড়ো আঙুল ধরা যাবে (২নং ছবির মতো)। দম স্বাভাবিক থাকবে। যাদের পেটে চর্বি বেশি তারা সঠিক ভঙ্গিমায় সাত থেকে ১০ বার করতে পারেন, তা না হলে তিন থেকে পাঁচ বার করুন।

পশ্চিমোত্তানাসন : ছবি– ২
(সঠিক ভঙ্গিমা)

উপকারিতা

১. এ আসন পেটের চর্বি কমিয়ে দেহের গঠন সুন্দর করে।

২. ঊরুর তলদেশে বিভিন্ন পেশিতে বেশ চাপ পড়ায় তা সতেজ থাকে।

৩. যাদের বদহজম ও পেটের পীড়া আছে তারা বিশেষ উপকৃত হবেন।

৪. আমাশয় রোগের উপশম হয়। পেটে গ্যাস হতে পারে না।

৫. মেরুদণ্ড ও পেটের জন্যে বিশেষ উপকারী ব্যায়াম।

৬. অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের লম্বা হতে সাহায্য করে।

৭. এছাড়া অগ্ন্যাশয়, মূত্রাশয় প্রভৃতি সুস্থ রাখে।

বি.দ্র. : *যাদের হার্নিয়া বা এপেন্ডিসাইটিস আছে তারা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এ আসন করবেন না। আর যাদের পীহা, যকৃৎ অত্যধিক বড় বা রুগ্ণ তাদের এ আসনটি না করাই ভালো।*

আসন
২৩

সিংহাসন বা স্বরায়ন

পদ্ধতি : প্রথমে বজ্রাসনে বসুন। এবার সামনের হাঁটু ঠিক সোজা রেখে পেছন দিক থেকে দুই পা ঊরুর দুদিকে ছড়িয়ে দিন। আপনার নিতম্ব মাটিতে রাখুন (২নং ছবির মতো)। দুই হাঁটুর ওপর দুহাত রাখুন। মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। এবার নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে মাথাটা নিচু করে থুতনি গলার কাছে ঠেকান এবং সাথে সাথে জিহ্বা যতটা সম্ভব বড় করে সামনের দিকে বের করুন। এবার গলা দিয়ে আ-আ-আ-আ-আ শব্দ করতে করতে মুখ দিয়ে দম ছাড়ুন (১নং ছবির মতো)। এভাবে নাক দিয়ে দম নিয়ে জিহ্বা বড় করে মুখ দিয়ে আ-আ-আ শব্দে দম ছাড়ুন। এ আসনটি পাঁচ থেকে ছয় বার করুন। স্বরায়নে সময় বাধা নেই, যতটুকু সময় দরকার করুন।

সিংহাসন বা স্বরায়ন : ছবি– ১
(সামনে থেকে)

সিংহাসন বা স্বরায়ন : ছবি– ২
(পেছন থেকে)

উপকারিতা

১. এ আসনে গলার স্বর সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়।

২. টনসিলের জন্যে বিশেষ উপকারী।

৩. কানের পর্দা ভারী হওয়ার জন্যে যারা কানে কম শোনেন তারা বিশেষ উপকার পাবেন।

৪. তোতলামি দূর করতে সাহায্য করে।

আসন
২৪

অর্ধকূর্মাসন

অর্ধকূর্মাসন : ছবি– ১

পদ্ধতি : প্রথমে বজ্রাসনে বসুন। এবার আস্তে আস্তে কোমর থেকে নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে মাথা মাটির কাছে নিয়ে আসুন। কপাল মাটিতে রাখুন। নিতম্ব পায়ের গোড়ালির ওপরে থাকবে। হাত দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দিন। হাতের তালু দুটো একত্রে জোড়া লাগিয়ে রাখুন। ঠোঁট ও থুতনি মাটিতে লাগবে না। হাত কানের সাথে লেগে থাকবে। দম স্বাভাবিক রেখে এ ভঙ্গিমায় ১০ থেকে ২০ সেকেন্ড অবস্থান করুন (ছবির মতো)। আসনটি পুরোপুরি আয়ত্তে এলে এ ভঙ্গিমায় একবারে এক মিনিটও অবস্থান করতে পারেন। তখন একবার করলেই হবে।

উপকারিতা

১. এ আসনে শক্তি বৃদ্ধি হয়। পায়ের গোড়ালি ও হাঁটুতে বাত হতে পারে না। আর থাকলেও উপকার পাওয়া যায়।

২. পেট ও নিতম্বের অতিরিক্ত চর্বি কমিয়ে স্বাভাবিক করে তোলে।

৩. এ আসনটিতে লিভারে প্রচুর রক্ত চলাচল করে লিভারকে সুস্থ রাখে।

আসন
২৫

পবনমুক্তাসন

পবনমুক্তাসন : ছবি– ১

পদ্ধতি : প্রথমে সোজা হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার দম স্বাভাবিক রেখে প্রথমে ডান পা তুলে হাঁটু ভাঁজ করে বুকের কাছে এনে দুহাত দিয়ে চেপে ধরুন। উরু পেটের সাথে লেগে থাকবে (১নং ছবির মতো)। যদি পেটে চাপ না পড়ে অর্থাৎ উরু সঠিকভাবে লাগতে না চায় তাহলে একটা তোয়ালে ভাঁজ করে পেটের ওপর রেখে দিন। তাহলে সহজে চাপ লাগবে। কয়েকদিন অনুশীলন করার পর এমনিতেই হাঁটু বুকের কাছে লাগবে।

এভাবে (ছবির মতো) প্রথমে ডান পা বুকের সাথে লাগিয়ে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। তারপর বাম পা ভাঁজ করে বুকের সাথে লাগান। তারপর দুই পা সোজা করে মাটিতে রেখে আবার একত্রে দুই পা ভাঁজ করে বুকের কাছে নিয়ে এসে চেপে ধরুন (২নং ছবির মতো)।

পবনমুক্তাসন : ছবি– ২

এভাবে প্রথমে ডান পা, পরে বাম পা, তারপর দুই পা একত্রে–এরকম তিন ধাপ মিলে এক প্রস্থ হবে। এভাবে তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ করতে পারেন।

বি.দ্র. : *এ আসনটি করার সময় অবশ্যই প্রথমে ডান পা তুলে করবেন। কারণ, যদি প্রথমে বাম পা তুলে করেন তাহলে পেটের মধ্য কোলনে যে বায়ু জমে আছে, তা বের না হয়ে অবরোহী কোলন থেকে আরোহী কোলনে প্রবেশ করবে। ফলে বায়ুর বহির্গমন হবে না। তাই প্রথমেই ডান পা তুলে করতে হবে।*

উপকারিতা

১. এ আসন করলে পেটের মধ্যে বায়ু জমতে পারে না কিংবা কোনো কারণে বায়ু হলে তা নির্গমন হয়।

২. হাঁপানির জন্যে উপকারী।

৩. নিয়মিত পবনমুক্তাসন করলে পাকস্থলী ক্ষুদ্রান্ত্র যকৃৎ পীহা বেশি কর্মক্ষম হয়, হজমশক্তি বাড়ে।

আসন
২৬

হলাসন

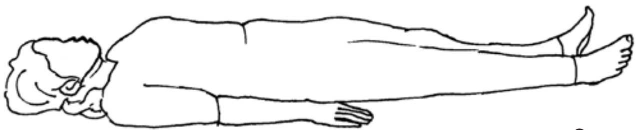

হলাসন : ছবি– ১

পদ্ধতি : প্রথমে সোজা হয়ে শুয়ে পড়ুন। হাত দুটো শরীরের দুপাশে তালু উপুড় করে রাখুন (১নং ছবির মতো)। এবার (২নং ছবির মতো) দুই পা জোড় করে ওপরে তুলুন। এরপর (৩নং ছবির মতো) দুই পা জোড় রেখে মাটি থেকে শরীরটা তুলে পা দুটো মাথার পেছনে রাখুন। এভাবে কিছুদিন চেষ্টা করার পর (৪নং ছবির মতো) পা দুটো জোড় অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে মাথার পেছনে নিয়ে দুপায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝে স্পর্শ করুন। এ ভঙ্গিমায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। দম স্বাভাবিক থাকবে। আবার (১নং ছবির মতো) স্বাভাবিক অবস্থায় এসে ১০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় করুন। এভাবে তিন থেকে পাঁচ বার করতে পারেন। আসনটি পুরোপুরি আয়ত্তে এলে একবারে এক মিনিট পর্যন্ত করা যায়।

উপকারিতা

১. এ আসনে পেটের মেদ কমে। কোমরে ও নিতম্বে মেদ জমতে পারে না।

২. আমাদের গলার কাছে থাইরয়েড গ্রন্থি রয়েছে। মোটা বা

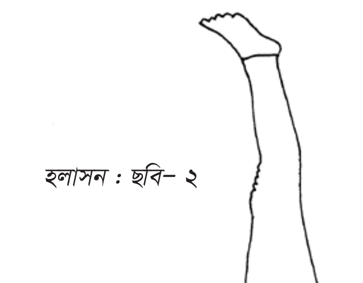

হলাসন : ছবি– ২

চিকন হওয়া কিছুটা নির্ভর করে এই গ্ল্যান্ড-এর স্বাস্থ্যের ওপর অর্থাৎ থাইরয়েড গ্রন্থির অসুস্থতার জন্যে কম হরমোন নিঃসরণ হলে শরীর অতিরিক্ত মোটা হয়ে যায় আর বেশি হরমোন নিঃসরণ হলে স্নায়ুর উত্তেজনা বৃদ্ধি, গলগণ্ড, অত্যধিক শুকনা, চক্ষুদ্বয়ের অত্যধিক স্ফীতি, হৃৎপিণ্ডের গতি (হার্ট বিট) বৃদ্ধি পায়। যার ফলে শরীরের ওজন কমতে থাকে। তাই এ আসন করলে থাইরয়েডে পর্যাপ্ত রক্ত চলাচল হয়ে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডকে সুস্থ রাখে। থাইরয়েড হরমোন প্রবাহ স্বাভাবিক রাখে।

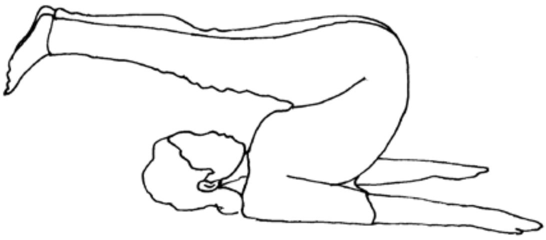

হলাসন : ছবি– ৩

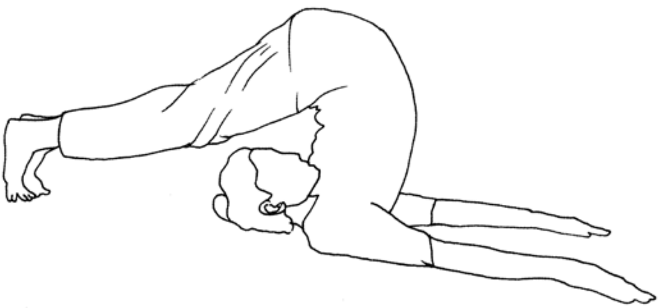

৩. টনসিলের সমস্যা দূর হয়।

৪. এ আসনের ফলে পরিপাকতন্ত্রের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ায় তাদের ক্রিয়াকলাপকে গতিশীল করে।

৫. কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময়ে সাহায্য করে।

৬. মেরুদণ্ডে স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে।

৭. এ আসনটি নিয়মিত করলে ডায়াবেটিস, বাত, সায়াটিকা, স্ত্রীরোগ হতে পারে না। আর এসব রোগ থাকলেও তা নিরাময় হয়।

আসন
২৭

শীর্ষাসন

পদ্ধতি : প্রথমে বজ্রাসনে বসুন। এবার সামনের দিকে ঝুঁকে দুহাতের আঙুলগুলো একে অপরের মধ্যে ঢুকিয়ে জোড়াবদ্ধ করে নিয়ে কনুই থেকে মাটিতে রাখুন। মাথার তালু মাটিতে স্পর্শ করে রাখুন (১নং ছবির মতো)। এবার এ ভঙ্গিমায় ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড অবস্থান করুন। এভাবে একবার করার পর ১০ সেকেন্ড করে বিশ্রাম নিয়ে দুই থেকে তিন বার করুন। যারা পূর্ণ শীর্ষাসন করতে পারবেন না তারাও এভাবে শীর্ষাসনের কিছুটা ফল পাবেন। দম স্বাভাবিক থাকবে।

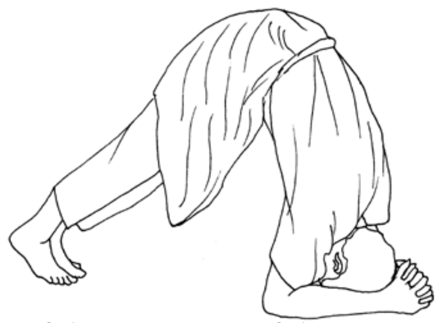

শীর্ষাসন : ছবি– ১ (সহজ শীর্ষাসন)

এবার পূর্ণ শীর্ষাসন করতে হলে দুহাতের কনুই মাটিতে রাখুন। দুই কনুইয়ের মধ্যে এক ফুট পরিমাণ ফাঁক থাকবে। দুহাতের আঙুল একে অপরের মধ্যে খাপবদ্ধ থাকবে। এবার শক্তভাবে খাপবদ্ধ রেখে দুই কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে দেয়ালে সাপোর্ট রেখে (৪নং ছবির ভঙ্গিমায়) ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড

শীর্ষাসন– দ্বিতীয় ধাপ : ছবি– ২

অবস্থান করুন। দম স্বাভাবিক থাকবে। এভাবে একবার করে বিশ্রাম নিয়ে দুই থেকে তিন বার করতে পারেন। যদি তা-ও সম্ভব না হয় তাহলে একজনের সাহায্য নিয়ে দুই পা মাটি থেকে জোড় করে ওপরে তুলে ধরে রাখতে পারেন। আসনটিতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে একসাথে এক থেকে তিন মিনিট করা যায়। তখন কোনো সাপোর্টের প্রয়োজন হবে না। এরপর শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

***বি.দ্র.** : যাদের উচ্চ রক্তচাপ বা হৃদরোগ অথবা চোখের কোনো কঠিন অসুখ আছে তারা শীর্ষাসন করবেন না।*

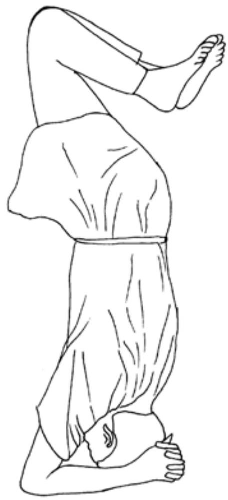

শীর্ষাসন– তৃতীয় ধাপ : ছবি– ৩

উপকারিতা

১. শীর্ষাসনের সময় প্রচুর রক্ত মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত হয়। মস্তিষ্ক হচ্ছে আমাদের মহা শক্তিশালী জৈব কম্পিউটার। এখানে রয়েছে বিশেষ গ্রন্থি হাইপোথ্যালামাস, যা হরমোন নিঃসরণ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক।

২. দৃষ্টি স্মৃতি শ্রবণ স্পর্শ অনুভূতির কেন্দ্রস্থল হলো মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কে অবস্থিত এস্নায়ু কেন্দ্রগুলোকে নিয়মিত শীর্ষাসনের মাধ্যমে সুস্থ রাখা যায়।

৩. নিয়মিত শীর্ষাসন করলে মাথাব্যথা থেকে উপশম পাওয়া যায়।

৪. মুখমণ্ডলে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায় বলে চোখ কান নাক দাঁতে সহজে কোনো রোগ হতে পারে না।

৫. পিটুইটারি গ্রন্থিতে রক্ত চলাচল প্রচুর পরিমাণে হয় বলে এ গ্রন্থির কর্মক্ষমতা

পূর্ণ শীর্ষাসন : ছবি– ৪

বৃদ্ধি পায়। ফলে দেহের সমস্ত গ্রন্থি ও স্নায়ু সুস্থ ও সক্রিয় থাকে।

৬. টনসিলের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৭. মেয়েদের জরায়ু সরে গেলে নিয়মিত এ আসনটি করলে তা ঠিক জায়গায় ফিরে আসে।

৮. এছাড়া লিউকোরিয়া, অর্শ, একশিরা, হাঁপানি, মাথাধরা, আলস্য ইত্যাদি দূর হয়।

আসন
২৮

পদ্মাসন

পদ্ধতি : প্রথমে দুই পা সামনের দিকে ছড়িয়ে বসুন। এবার হাত দিয়ে ডান পা হাঁটুর কাছ থেকে ভাঁজ করে বাম পায়ের ঊরুর ওপর রাখুন। তারপর বাম পায়ের হাঁটু ভাঁজ করে একই নিয়মে ডান ঊরুর ওপর রাখুন এবং দুই পায়ের গোড়ালি দুটো যেন নিচের পেট স্পর্শ করে (২নং ছবির মতো)। হাত দুটো দুই হাঁটুর ওপর রাখুন। হাতের তালু ওপরের দিকে থাকবে এবং হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনী (ছবির মতো) ধরে রাখুন। মেরুদণ্ড সোজা রাখুন। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখুন। (২নং ছবির মতো) সঠিক অবস্থায় বসে ধীরে ধীরে নাক দিয়ে দম নিন (বুক ফুলিয়ে)। এরপর দম পাঁচ/ সাত সেকেন্ড ধরে ছাড়ুন।

সহজ পদ্মাসন : ছবি– ১

পদ্মাসন : ছবি– ২

ছাড়ার সময় আপনার পেট ভেতরের দিকে বসে যাবে। অর্থাৎ দম নিন বুকে, ছাড়ুন সম্পূর্ণরূপে এবং দম নেয়ার চেয়ে ছাড়ার সময় একটু বেশি নিন। এভাবে এক থেকে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত পদ্মাসনে বসে প্রাণায়াম করতে পারেন। প্রয়োজনে পা অদলবদল করে নিতে পারেন। যত দিন সহজে করতে অভ্যস্ত না হন ততদিন প্রথমে সহজ পদ্মাসনে অর্থাৎ এক পায়ে করে অভ্যাস করুন (১নং ছবির মতো)। মনে রাখবেন–অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো আসন জোর করে করবেন না। নিয়মিত করলে ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে এবং সঠিকভাবে করতে পারবেন।

উপকারিতা

১. মনোসংযোগ বৃদ্ধি পায়, মন স্থির হয়।

২. পায়ের ব্যথা, হাঁটুতে বাত-ব্যথা হতে পারে না। পায়ের গ্রন্থিগুলোকে সুস্থ-সবল রাখে।

৩. পদ্মাসনে বসে প্রাণায়াম করলে ফুসফুস ভালো থাকে। ছোটবেলা থেকেই অভ্যাস করলে হাঁপানি হতে পারে না।

৪. মুখের ত্বক সুন্দর থাকে।

৫. এ আসন করার সময় মেরুদণ্ড সোজা থাকে। যাদের মেরুদণ্ড একটু বাঁকা, ক্রমাগত এ আসনটির অভ্যাস তাদের জন্যে খুবই উপকারী। এছাড়া মেরুদণ্ড থেকে যে-সবস্নায়ু শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছে, সেগুলোকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে সাহায্য করে।

আসন ২৯

দৃষ্টিদান

দৃষ্টিদান : ছবি– ১ (দৃষ্টি নিচের দিকে)

দৃষ্টিদান : ছবি– ২ (দৃষ্টি উপরের দিকে)

পদ্ধতি : প্রথমে পদ্মাসন বা সুখাসনে বসুন। অর্থাৎ যেভাবে আরাম অনুভব করেন সেভাবেই বসুন। তবে যে আসনই হোক না কেন–মেরুদণ্ড সোজা টানটান রেখে বসবেন। এবার সামনে মাটিতে একটি বিন্দু অথবা চিহ্ন স্থাপন করুন এবং তার দিকে তাকিয়ে থাকুন এক সেকেন্ড (১নং ছবির মতো)। এরপর ওপরের দিকে (আপনার ঘরের ছাদের দিকে সোজা দৃষ্টি বরাবর) একটি পয়েন্ট আগে থেকেই ঠিক করে নিয়ে সেদিকে তাকান এবং এক সেকেন্ড অবস্থান করুন (২নং ছবির মতো)। এরপর ওপরের ছাদের ডান দিকে একটি পয়েন্ট ভেবে নিয়ে চোখের মনি ঘুরিয়ে ডানে তাকান। এক সেকেন্ড অবস্থান করুন (৩নং ছবির মতো)। আবার নিচের পয়েন্টে তাকান (১নং ছবির মতো)। এভাবে প্রথমে ডান দিকে ও পরে বাম দিকের পয়েন্ট

ঠিক করে একইভাবে করুন। অর্থাৎ নিচে-ওপরে-ডানে-নিচে–এভাবে সাত থেকে ১০ বার চোখের মনি ঘোরান। আবার নিচে-ওপরে- বামে-নিচে–এভাবে চোখের মনি ঘোরান সাত থেকে ১০ বার (৪নং ছবির মতো)। প্রত্যেকবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এক সেকেন্ড অবস্থান করুন।

মেরুদণ্ড সোজা রেখে ঠিকভাবে বসবেন। মাথা নড়বে না। শুধু চোখের মনি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে করবেন।

দৃষ্টিদান : ছবি– ৩ (উপরে ডানে দৃষ্টি)

উপকারিতা

১. এ আসনটিতে চোখের বিশেষ উপকার হয়। দৃষ্টিশক্তি বাড়ে। চোখের এলার্জি থাকলে তার উপশম হয়। চোখের নার্ভগুলোতে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পেয়ে চোখকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। অল্পবয়স থেকেই এ আসন অভ্যাস করলে দৃষ্টিশক্তি ঠিক থাকে, চশমা পরতে হয় না।

দৃষ্টিদান : ছবি– ৪ (উপরে বামে দৃষ্টি)

বি.দ্র. : □ *চোখের কঠিন অসুখে ভুগলে এ ব্যায়াম করা যাবে না। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেন।*

□ *চোখের রেটিনায় কোনো অপারেশন কিংবা সমস্যা থাকলে এই ব্যায়াম করা যাবে না এবং সামনে মাথা ঝোঁকানো (নিচু করা) যাবে না।*

□ *কোনো ধরনের প্রাণায়াম করা যাবে না।*

আসন
৩০

সুপ্ত ভদ্রাসন

সুপ্ত ভদ্রাসন : ছবি– ১

পদ্ধতি : প্রথমে সোজা হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার দুই পা হাঁটু থেকে ভাঁজ করে দুহাতের সাহায্যে দুপায়ের পাতা একত্র করে জোড়া লাগান। জোড় দুপায়ের বুড়ো আঙুল দুটো বুকের মাঝখানে নিয়ে এসে চেপে ধরুন। আপনার হাত যেন আলগা হয়ে না যায় (ছবির মতো)। এভাবে এ ভঙ্গিমায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। দম স্বাভাবিক থাকবে। এভাবে তিন থেকে পাঁচ বার করতে পারেন। প্রথমবার করার পর পা ছেড়ে দিয়ে সোজা করে রাখুন। আবার দ্বিতীয়বার করুন; এভাবে তিন থেকে পাঁচ বার।

উপকারিতা

১. যারা অর্শ রোগে ভুগছেন তারা এ আসনে অশ্বিনীমুদ্রা করলে খুবই উপকৃত হবেন।

২. এ আসনে লিভেটর এনাই পেশিতে অতিরিক্ত চাপ পড়ার ফলে পেশিকে মজবুত ও শক্তিশালী করে পেলভিক এলাকার অঙ্গগুলোকে নিজ নিজ স্থানে ধরে রাখতে সাহায্য করে। যার ফলে জরায়ু, মলদ্বার বা মূত্রাশয়ের স্থানচ্যুতি হতে পারে না।

৩. স্ত্রীরোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ধৌতি
১

সহজ অগ্নিসার ধৌতি

সহজ অগ্নিসার ধৌতি : ছবি– ১

পদ্ধতি : প্রথমে মেরুদণ্ড সোজা রেখে সুখাসনে বসুন (ছবির মতো)। এবার দম স্বাভাবিক রেখে দুহাতের বুড়ো আঙুল যেখানে শরীরের দুপাশের পাঁজরের হাড় শেষ হয়ে গেছে সেখানে রাখুন। হাতের বাকি আঙুল একত্র রেখে দুহাত দিয়ে পেট চেপে ধরে নাভির এক আঙুল পরিমাণ নিচে চেপে ধরুন। ঝট করে ছেড়ে দিন। বুড়ো আঙুল যেখানে রেখেছেন সেখান থেকে সরাবেন না। শুধু দুহাতের বাকি আঙুলগুলো একত্র রেখে চেপে ধরুন। ঝট করে ছাড়ুন। এভাবে ৩০ থেকে ৪০ বার চেপে ধরুন। চাপ দেয়ার সাথে সাথে ছাড়ুন। চাপ দিয়ে ধরে রাখবেন না।

উপকারিতা

১. যারা বহুদিন ধরে আমাশয়ে ভুগছেন তাদের জন্যে বিশেষ উপকারী ব্যায়াম।

বি.দ্র. : *আমাশয় হলে খাওয়া-দাওয়ার প্রতি খেয়াল রাখুন। অতিরিক্ত তেল-ঝাল-মসলা পরিহার করুন। বাইরের খোলা খাবার খাবেন না; খাওয়ার আগে অবশ্যই সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিন।*

বমন ধৌতি

পদ্ধতি : ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই খালি পেটে এক থেকে দুই লিটার পরিমাণ পানি পান করুন। তারপর মুখ হা করে ডান হাতের মধ্যমা আঙুল দিয়ে আল-জিহ্বার কাছে নাড়া দিলেই বমির উদ্রেক হবে। যে পানি পান করেছেন তা বেরিয়ে আসবে। এভাবে পানি পান করে গলায় আঙুল দিয়ে ইচ্ছাকৃত বমির মাধ্যমে ধৌত করাকে বমন ধৌতি বলে। এতে পাকস্থলীর ভেতর বাড়তি এসিড-পিত্ত বেরিয়ে আসে। স্বাভাবিক বমি হওয়ার ফলে মানুষ যেমন দুর্বল হয়ে যায়, এতে তা হয় না। বমন ধৌতি মাসে দুই/একবার করাই ভালো–এর বেশি নয়। ধৌতি করার পর এক গ্লাস পানি পান করে পাঁচ মিনিট সহজ শিথিলায়ন বা শবাসন করবেন। তারপর নাশতা খাবেন। শীতের সময় কুসুম গরম পানি পান করে বমন ধৌতি করতে পারেন।

উপকারিতা

১. যাদের পিত্তদোষ বা এসিডিটির দোষ রয়েছে তারা বিশেষ উপকৃত হবেন।

২. পাকস্থলীতে কোনো দূষিত পদার্থ জমতে পারে না।

৩. যাদের ঢেকুর ওঠে বা মুখ তিতা বা টক লাগে তাদের জন্যে এ প্রক্রিয়াটি বিশেষ উপকারী।

বিপরীত করণীতে অশ্বিনীমুদ্রা

পদ্ধতি : প্রথমে মাটিতে দুই পা সোজা রেখে মেরুদণ্ড সোজা করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। দুহাত শরীরের দুপাশে রাখুন। এবার দুই হাঁটু ভাঁজ করে পেটের কাছে নিয়ে এসে দুই পা সোজা রেখে ধীরে ধীরে ওপরে তুলুন। দুহাতের তালু দিয়ে নিতম্ব ধরে ঠেস দিয়ে রাখুন (ছবির মতো)। থুতনি গলার সাথে লেগে থাকবে। দম স্বাভাবিক থাকবে। এভাবে না পারলে দেয়ালে পা রেখে দুহাত দিয়ে (ছবির মতো) নিতম্ব ঠেস দিয়েও করতে পারেন, তাতেও ফল হবে। পরে অভ্যস্ত হলে এমনিতেই পারবেন। দেহকে এ ভঙ্গিমায় রেখে বার বার মলদ্বার সংকুচিত ও প্রসারিত করুন। এভাবে একবার সংকুচিত ও একবার প্রসারিত করাকে এক মাত্রা বলে। এভাবে ১০ থেকে ২৫ মাত্রা করতে পারেন। এসময় দম স্বাভাবিক থাকবে।

বিপরীত করণীতে অশ্বিনীমুদ্রা : ছবি– ১

উপকারিতা

১. যারা বহুদিন ধরে অর্শরোগে ভুগছেন তারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। মলদ্বারের ভেতরের শিরায় রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্শরোগ হতে পারে না এবং হলেও নিরাময় লাভ করবেন।

২. অশ্বিনীমুদ্রা নিয়মিত অভ্যাস করলে পায়খানার রাস্তায় কোনো প্রকার রোগ হতে পারে না।

৩. অশ্বিনীমুদ্রা করার ফলে মল-নালীর তন্তুর স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকে। যার ফলে ভবিষ্যতে মলদ্বার ঝুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

৪. মেয়েদের বাধক বেদনা সারাতে বা প্রলাপসড ইউটেরাস-এর জন্যে বিশেষ উপকারী।

৫. মুদ্রাটিতে থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, স্যালিভারি প্রভৃতি গ্রন্থির খুব ভালো কাজ হয়। দেহে সহজে কোনো রোগ হতে পারে না।

৬. কোষ্ঠকাঠিন্য, বদ হজম, এসিডিটি প্রভৃতি রোগ দূর করে পেট ও তলপেটের পেশি দৃঢ় করে; পেটের অপ্রয়োজনীয় চর্বি কমিয়ে দেহকে সুস্থ করে।

গোমুখাসনে অশ্বিনীমুদ্রা

পদ্ধতি : গোমুখাসনে বসে একবার মলদ্বার সংকুচিত ও একবার প্রসারিত করুন। এভাবে একপ্রস্থ হবে। এভাবে ১০ থেকে ২০ প্রস্থ করতে পারেন।

উপকারিতা

এ মুদ্রাটিতেও বিপরীত করণীতে অশ্বিনীমুদ্রার মতো ফল পাওয়া যাবে।

গোমুখাসন

বজ্রাসনে অশ্বিনীমুদ্রা

পদ্ধতি : প্রথমে বজ্রাসনে বসুন, তারপর একবার মলদ্বার সংকুচিত করুন ও একবার প্রসারিত করুন। এভাবে একপ্রস্থ হবে। ১০ থেকে ২০ প্রস্থ করতে পারেন।

বজ্রাসন

উপকারিতা

এটিতেও একই ফল পাবেন।

সুপ্ত ভদ্রাসনে অশ্বিনীমুদ্রা

পদ্ধতি : প্রথমে সুপ্ত ভদ্রাসন করুন। তারপর শরীরটাকে সে ভঙ্গিমায় রেখে মলদ্বার একবার সংকুচিত ও একবার প্রসারিত করুন। এভাবে ১০ থেকে ২০ প্রস্থ করতে পারেন।

উপকারিতা

সুপ্ত ভদ্রাসন

১. এতে সুপ্ত ভদ্রাসনের সব উপকারিতা পাওয়া যায়।

২. মলদ্বারের বিশেষ ব্যায়াম হয়।

৩. জরায়ুর স্থানচ্যুতি হলে তার বিশেষ উপকার হবে, জরায়ু সঠিক স্থানে নিয়ে আসতে সাহায্য করে।

প্রাণায়াম

প্রাণশক্তি বৃদ্ধি পায় ও দেহকে জরা-ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখে বলে একে প্রাণায়াম বলে।

একনাসা প্রাণায়াম বা নাসায়ন

পদ্ধতি : মেরুদণ্ড সোজা রেখে প্রথমে এক পা ওপরে তুলে আর এক পা ভাঁজ করে নিচে রেখে (ছবির মতো করে) বসুন। এবার (ছবির মতো করে) ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে নাকের ডান পাশের ছিদ্র চেপে ধরুন। এমনভাবে ধরুন যেন বাতাস বেরিয়ে যেতে না পারে। এবার বাম পাশের ছিদ্র দিয়ে দম নিয়ে অনামিকা দিয়ে বাম পাশের ছিদ্রটিও বন্ধ করে দিন। তারপর

নাসায়ন : ছবি– ১

হাত ও আঙুলের ভঙ্গি

নাসায়ন : ছবি– ৩

পদ্মাসনে নাসায়ন : ছবি– ২

বাম ছিদ্র বন্ধ রেখেই ডান ছিদ্র থেকে বুড়ো আঙুল তুলে ডান ছিদ্র দিয়ে দম ছাড়ুন। বাম ছিদ্র বন্ধ রাখা অবস্থায়ই নাকের ডান ছিদ্র দিয়ে পুনরায় দম নিন। দম নেয়া হলে বুড়ো আঙুল দিয়ে ডান ছিদ্র বন্ধ করে পুনরায় বাম ছিদ্র দিয়ে দম ছাড়ুন। এভাবে একবার বাম নাক বন্ধ রেখে ডান নাক দিয়ে ছাড়া আবার ডান নাক বন্ধ রেখে বাম নাক দিয়ে ছাড়া–এই মিলে একপ্রস্থ হবে। এভাবে ছয় থেকে ১০ প্রস্থ করতে পারেন। নাসায়ন আপনি পদ্মাসনে বসেও করতে পারেন।

উপকারিতা

১. এ প্রাণায়ামে ফুসফুসের খুব ভালো কাজ হয়। মাইগ্রেন নিরাময়ে ভালো ফল পাওয়া যায়। প্রাণায়ামের ফলে ফুসফুসে প্রচুর অক্সিজেন প্রবেশ করে। ফলে কোনো রোগ সহজে ফুসফুস আক্রমণ করতে পারে না।

পদ্মাসনে প্রাণায়াম

পদ্ধতি : প্রথমে মেরুদণ্ড সোজা রেখে মাটিতে দুই পা ছড়িয়ে বসুন। এবার বাম পা হাঁটু থেকে ভেঙে ডান ঊরুর ওপর এবং ডান পা একইভাবে বাম ঊরুর ওপর রাখুন। হাত দুটো কোয়ান্টা ভঙ্গি করে চিৎ অবস্থায় দুই হাঁটুর ওপর রাখুন এবং তর্জনী ও বুড়ো আঙুল একত্রে (ছবির মতো করে) ধরে রাখুন। দৃষ্টি স্বাভাবিক সোজা বরাবর রাখুন। এবার নাকের দুই ছিদ্র দিয়ে ধীরে ধীরে দম নিতে থাকুন। বুক ফুলিয়ে দম নিন। কয়েক সেকেন্ড দম বন্ধ রেখে পুনরায় দুই নাকের ছিদ্র দিয়েই ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। চোখের দৃষ্টি রাখুন নাকের অগ্রভাগে ও মনোযোগ রাখুন দমের প্রবেশপথে অর্থাৎ নাকের ছিদ্রতে। এভাবে এক থেকে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত করতে পারেন।

পদ্মাসন

কখনো পা ব্যথা হয়ে উঠলে পা পরিবর্তন করে বসতে পারেন।

উপকারিতা

১. হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
২. হাঁপানি রোগ হতে পারে না। থাকলে ভালো উপকার পাওয়া যায়।
৩. মেরুদণ্ড সোজা ও সবল রাখে।
৪. চিন্তা শক্তি, স্মৃতি শক্তি, ইচ্ছা শক্তি ও মনের একাগ্রতা বাড়ে।
৫. পায়ের পেশি ও স্নায়ু ভালো, সতেজ ও সক্রিয় থাকে, পায়ে বাত হতে পারে না।

***বি.দ্র.:** অবশ্যই আগে পদ্মাসন অভ্যাস করুন। তারপর প্রাণায়াম করুন।*

ভ্রমণ প্রাণায়াম

পদ্ধতি : মেরুদণ্ড সোজা রেখে সমান তালে পা ফেলে হাঁটতে শুরু করুন। এবার ছয় কদমে হাঁটতে হাঁটতে দম নিন এবং আট কদমে দম ছাড়ুন। অর্থাৎ ধীরে ধীরে দম নিতে নিতে মনে মনে গণনা করে ছয় কদম এগিয়ে যান। আর ধীরে ধীরে দম ছাড়তে ছাড়তে মনে মনে গণনা করে আট কদম হাঁটুন। ফলে দম নেয়ার চেয়ে ছাড়ার সময় একটু বেশি লাগবে। পাঁচ/ সাত মিনিট এভাবে প্রতি বার হাঁটুন। ধীরে ধীরে কদমের সংখ্যা বাড়াতে থাকুন। আট কদমে নিন। ১০ কদমে ছাড়ুন। ১০ কদমে নিন। ১২ কদমে ছাড়ুন। ১২ কদমে নিন। ১৬ কদমে ছাড়ুন।

উপকারিতা

১. এ প্রাণায়ামটি সবার জন্যে উপযোগী। বিশেষ করে বয়স্কদের জন্যে বিশেষ উপযোগী।
২. যারা অসুখ-বিসুখের জন্যে কোনো ধরনের ব্যায়াম করতে পারেন না তারা এ প্রাণায়ামটি অভ্যাস করলে শরীর রোগমুক্ত রাখতে পারবেন।

***বি.দ্র. :** প্রাণায়ামটি করার সময় যদি বুকে চিনচিন ব্যথা অনুভব করেন তাহলে বুঝতে হবে ফুসফুসের ক্ষমতা অনুযায়ী মাত্রা বেশি হয়ে যাচ্ছে। যেদিন এরকম অনুভব করবেন সেদিন বন্ধ রাখুন। পরে মাত্রা কমিয়ে দুই/ তিন মিনিট করুন এবং ধীরে ধীরে সময় বাড়িয়ে পাঁচ/ সাত মিনিট করুন।*

সহজ ব্যায়াম

পা ঘূর্ণন বা লেগ সার্কেলিং

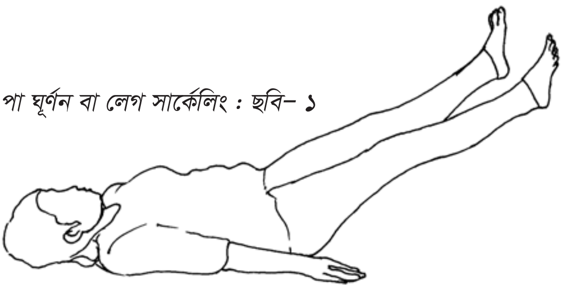

পা ঘূর্ণন বা লেগ সার্কেলিং : ছবি– ১

পদ্ধতি : প্রথমে মেঝেতে শুয়ে পড়ুন। মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। হাত দুটো শরীরের দুপাশে রাখুন। হাতের তালু মেঝেতে লেগে থাকবে। এবার (১নং ছবির মতো) ডান পা ঘড়ির কাঁটার মতো বৃত্তাকারে ডানদিকে ঘোরান। আবার (২নং ছবির মতো) বাম পা বামদিকে বৃত্তাকারে ঘোরান। প্রতি পায়ে পাঁচ থেকে সাত বার করে ঘোরান।

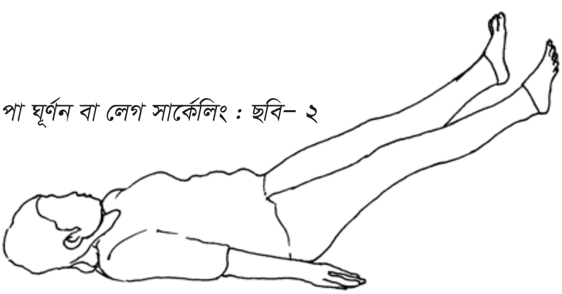

পা ঘূর্ণন বা লেগ সার্কেলিং : ছবি– ২

এবার (৩নং ছবির মতো) দুই পা একত্র করে বৃত্তাকারে ডান দিকে ঘোরান। এভাবে পাঁচ/ সাত বার ঘোরান। আবার বৃত্তাকারে বাম দিকে পাঁচ/ সাত বার ঘোরান (৪নং ছবির মতো)। দম স্বাভাবিক থাকবে। ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে গেলে ১০ থেকে ২০ বার করেও করতে পারেন।

পা ঘূর্ণন বা লেগ সার্কেলিং : ছবি– ৩

পা ঘূর্ণন বা লেগ সার্কেলিং : ছবি– ৪

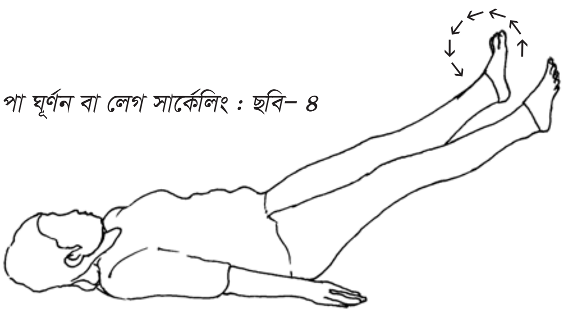

উপকারিতা

১. নিয়মিত করলে কোমরে ও পেটে চর্বি জমতে পারে না। যদিও থাকে তাহলে কিছু দিনের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসে।

২. কোমরের ব্যথা দূর হয়। নিতম্বের মাংসপেশিকে মজবুত ও সুদৃঢ় করে।

৩. হার্নিয়া, রেট্রোভারটেড ইউটেরাস প্রভৃতি রোগের হাত থেকে রক্ষা করে।

হাঁটুর ব্যথায় করণীয় ব্যায়াম

পদ্ধতি : সোজা হয়ে বিছানা কিংবা কার্পেটের ওপর শুয়ে কিংবা বসে পড়ুন। দুই পা সোজা করে টান টান রাখুন। এবার দুপায়ের পাতা এবং আঙুলগুলো শক্ত করে শরীরের দিকে বাঁকান। অর্থাৎ উল্টো দিকে বাঁকান এবং মনে মনে এক থেকে ১০ গুণুন। এবার পা ছেড়ে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসুন। এভাবে ১০ বার করুন। ছেলে মেয়ে উভয়ের জন্যে প্রযোজ্য।

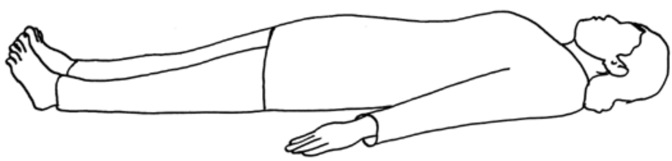

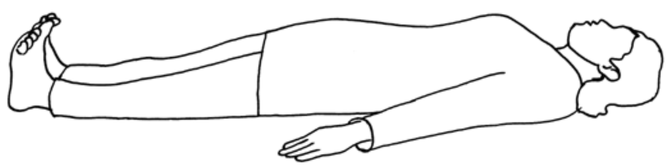

উপকারিতা

১. হাঁটুর জয়েন্টগুলো দৃঢ় করে। ৪০ বছর বয়সের পরে দিনে তিন বেলা এভাবে করুন। হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ হাঁটুর বাটি সরে যায়–এমন যাদের মাঝে মাঝে মনে হয় তাদের জন্যে বিশেষ উপকারী।

হাঁটুর ব্যথার রোগীদের জন্যে পরামর্শ

১. একটানা বেশিক্ষণ হাঁটবেন না বা দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

২. ব্যথাযুক্ত হাঁটুকে বিশ্রাম দিন এবং ছোটখাটো আঘাত থেকে হাঁটুকে মুক্ত রাখুন।

ছবি- ২

৩. হাঁটু গেড়ে বসবেন না। বাথরুমে হাই কমোড বা চেয়ার কমোড ব্যবহার করুন।

৪. পায়ের জুতা জুৎসই করে নিন। হাইহিল জুতা পরবেন না।

৫. চলাফেরার সময় হাতে লাঠি বা ওয়াকার ব্যবহার করুন।

৬. বয়স্ক হলে চলাফেরায় সাহায্য নিন। ঘরের মেঝে মসৃণ হলে ম্যাট বিছিয়ে নিন।

৭. শরীরের অতিরিক্ত ওজন কমান। ভারী জিনিস বহন করবেন না।

৮. প্রয়োজনে অর্থোপেডিক্স ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

সারভাইক্যাল স্পন্ডিলাইটিস-এ করণীয় ব্যায়াম

পদ্ধতি ১

সোজা হয়ে দাঁড়ান বা বসুন। মাথা সোজা রেখে ডান হাতের তালু কপালের মাঝখানে রাখুন। এবার বাম হাতের তালু তার ওপর রেখে জোরে চাপ দিন। মনে মনে ১০ পর্যন্ত গণনা করুন। এভাবে তিন বার করবেন।

পদ্ধতি ২

সোজা হয়ে দাঁড়ান বা বসুন। দুহাত মুষ্টিবদ্ধ করে ঘাড় নয়, মাথার পেছনে রাখুন। মাথা না বাঁকিয়ে হাতের ওপর জোরে চাপ দিন। ১০ পর্যন্ত গণনা করুন। এভাবে তিন বার করুন।

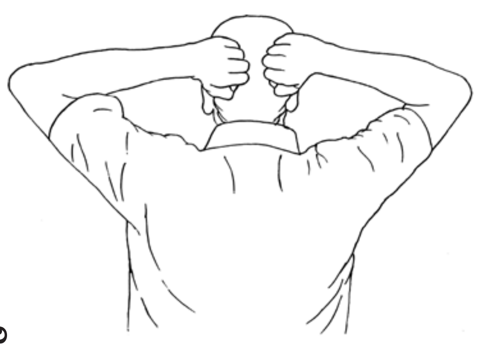

পদ্ধতি ৩

সোজা হয়ে দাঁড়ান অথবা বসুন। ডান হাত ডান গালের ওপর (ছবি অনুযায়ী) রাখুন। মাথা সোজা রেখে জোরে চাপ দিন। ১০ পর্যন্ত

গণনা করুন। এভাবে তিন বার করুন। বাম দিকে একইভাবে করুন। ডান হাত (ছবি নং ১), বাম হাত (ছবি নং ২)।

ডান হাত (ছবি নং ১) *বাম হাত (ছবি নং ২)*

পদ্ধতি ৪

ছবি অনুযায়ী ডান হাত কপালের ডান পাশে এবং বাম হাত মাথার পেছনে বাম দিকে রাখুন। মাথা সোজা রেখে জোরে চাপ দিয়ে ডান কাঁধের ওপর দেখতে চেষ্টা করুন। ১০ পর্যন্ত গণনা করুন। এভাবে তিন বার করুন। এবার ছবি অনুযায়ী বাম হাত কপালের বাম পাশে এবং ডান হাত মাথার

ডান হাত (ছবি নং ১) *বাম হাত (ছবি নং ২)*

পেছনে ডান দিকে রেখে জোরে চাপ দিয়ে বাম কাঁধের ওপর দেখতে চেষ্টা করুন। ১০ পর্যন্ত গণনা করুন। এ ব্যায়াম পাঁচ থেকে ১০ মিনিট করে প্রতিদিন এক বা দুই বেলা করুন।

ঘাড়ে ব্যথার রোগীদের জন্যে বিশেষ পরামর্শ

১. শক্ত বিছানায় লম্বা হয়ে ঘাড়ের নিচে শিশুদের কোল বালিশ বা তোয়ালে গোল করে দিয়ে চিৎ হয়ে আধা ঘণ্টা করে সকাল ও বিকেলে শোবেন এবং ঘুমানোর সময় নরম বালিশ ব্যবহার করবেন।

২. ব্যথার সময়, কাজের সময় এবং ভ্রমণের সময় অবশ্যই কলার ব্যবহার করবেন।

৩. ভ্রমণের সময় এবং বসা অবস্থায় ঘুমাবেন না। শুয়ে শুয়ে বা কাত হয়ে পড়াশোনা করবেন না।

৪. কেউ পেছন থেকে ডাকলে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাবেন না, নিজে ঘুরে যাবেন।

৫. মাথায় ভারী জিনিস বহন করবেন না এবং ঘাড়ে ঠান্ডা লাগাবেন না।

৬. সেলুনে ঘাড় মালিশ করাবেন না বা মটকাবেন না।

সব ধরনের ব্যথার ক্ষেত্রে যোগ উপদেশমতো নিয়মিত ব্যায়াম করবেন এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের নির্দেশনা অনুযায়ী ফিজিওথেরাপি নিতে পারেন।

কোমরে ব্যথার রোগীদের জন্যে পরামর্শ

১. ফোম বা বেশি নরম বিছানায় এবং বাঁকা ও কুঁজো হয়ে শোবেন না।
২. বেশি ব্যথা থাকা অবস্থায় ব্যায়াম করবেন না, উপুড় হয়ে ঘুমাবেন না।
৩. কোমর বাঁকা বা নরম করে কোনো কাজ করবেন না এবং ভারী কিছু তুলবেন না।
৪. কোনো জিনিস তোলার সময় কোমর শক্ত রেখে সোজাভাবে সাবধানে তুলবেন।
৫. ব্যথা থাকা অবস্থায় চেয়ারে বসে খাবেন এবং নামাজ পড়বেন।
৬. বাথরুমে হাই কমোড বা চেয়ার কমোড ব্যবহার করুন।
৭. শোয়া থেকে ওঠার সময় একদিকে কাত হয়ে হাতে ভর দিয়ে উঠবেন।
৮. সোজা হয়ে চেয়ারে বসে বা দাঁড়িয়ে গোসল করবেন এবং দৈনন্দিন কাজ করবেন।
৯. বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে বা বসে থাকবেন না। বেশিদূর হাঁটতে হলে থেমে থেমে হাঁটবেন।
১০. অপ্রয়োজনে ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তায় যানবাহনে ভ্রমণ করবেন না।
১১. কুয়া থেকে পানি তুলবেন না বা টিউবওয়েল চেপে পানি তুলবেন না।
১২. কোমরে মালিশ করবেন না এবং হাইহিল জুতা পরবেন না।
১৩. শরীরের অতিরিক্ত ওজন কমাতে হবে। যে-কোনো কাজের সময় সতর্ক থাকতে হবে।
১৪. ব্যথার স্থানে গরম পানিতে তোয়ালে বা গামছা ভিজিয়ে সেঁক দেবেন।
১৫. সিঁড়িতে ওঠানামার সময় ধীরে ধীরে রেলিং ধরে সোজা হয়ে উঠবেন এবং নামবেন।
১৬. কাজের সময় বা ভ্রমণের সময় করসেট বেল্ট ব্যবহার করবেন। ব্যায়াম করার সময় এবং ঘুমানোর সময় বেল্ট খুলে রাখুন। গাড়ি ড্রাইভ করার সময় সিটবেল্ট ব্যবহার করুন।
১৭. প্রয়োজনে অর্থোপেডিক ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

গর্ভবতী মহিলাদের জন্যে কিছু ব্যায়াম

গর্ভবতী মায়েরা সামান্য কিছু ব্যায়ামের দ্বারাই নিজের শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখতে পারেন। সন্তান প্রসবের ব্যাপারে সাধারণত সব মেয়েরই একটা ভয় কাজ করে। তাই গর্ভাবস্থায় ব্যায়ামের মাধ্যমে পেটের মাংসপেশিকে মজবুত রেখে শিশুর বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে পারবেন। এছাড়া পেলভিস মাংসপেশির স্থিতিস্থাপকতা ঠিক রেখে নিরাপদে প্রসব করতে পারবেন।

সবসময় একটা কথা মনে রাখবেন, গর্ভাবস্থায় সঠিকভাবে দম নেয়া উচিত। তাতে শরীরের দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যেতে সাহায্য করে এবং ব্যায়ামের ফলে শরীরে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায় বলে শরীর সুস্থ ও সবল রাখে।

প্রতিদিন ১০/১৫ মিনিটের মতো ব্যায়ামই যথেষ্ট, এর বেশি করার প্রয়োজন নেই। বেশি ব্যায়াম গর্ভবতী মায়েদের জন্যে খুবই ক্ষতিকর।

গর্ভবতী মহিলাদের প্রতিদিন সকালে ব্যায়াম করা ভালো।

গর্ভবতী মহিলারা ব্যায়াম শেষে অবশ্যই ১০ মিনিট শবাসনে বিশ্রাম নিন এবং মনে মনে এ অবস্থা কল্পনা করুন–পরম করুণাময় আপনাকে একটি সুস্থ সুন্দর মেধাবী শিশু প্রসব করার ক্ষমতা দিয়েছেন। আপনি বেশ ভালো বোধ করছেন।

ব্যায়াম শেষে বিশ্রাম নেয়ার পরে কুসুম গরম পানি দিয়ে গোসল অথবা তোয়ালে ভিজিয়ে সমস্ত শরীর মুছে ফেলুন।

গর্ভবতী মহিলারাও খোলামেলা আলো-বাতাসপূর্ণ ঘরে ব্যায়াম করুন। শীতের সময় ঘরে ব্যায়াম করার পূর্বে বাতাস চলাচল করিয়ে নিয়ে ব্যায়াম করুন।

শেষ কথা হলো, গর্ভধারিণীর অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ব্যায়াম করা উচিত। সবসময় ডাক্তারের পরামর্শে চলা

উচিত। ১৫ দিন অন্তর ডাক্তারের পরামর্শ নিন। ডাক্তারের পরামর্শে গর্ভধারণের নয় মাস পর্যন্ত ব্যায়াম করতে পারেন। তবে অবশ্যই মনে রাখবেন, চিকিৎসক যদি আপনাকে ব্যায়াম করতে নিষেধ করেন কিংবা নির্দিষ্ট ব্যায়ামগুলোর মধ্যে যে-কোনোটি বিশেষভাবে বারণ করেন তাহলে করবেন না। কেননা একজন চিকিৎসকই এসময় আপনার সম্পর্কে এবং অভ্যন্তরীণ শিশুর পজিশন সম্পর্কে ভালো বুঝবেন। নিজে নিজে ব্যায়াম করতে গিয়ে হিতে বিপরীত করবেন না।

গর্ভবতী মায়েদের গর্ভাবস্থায় নানান জটিলতা দেখা যায়। যেমন কারো কারো বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়। গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব একটু একটু করে হয়ে থাকে। আরো নানান অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। গর্ভবতী মায়েদেরকে ডাক্তাররা অনেক সময় সম্পূর্ণরূপে বেড রেস্ট নিতে বলেন। কাজেই যদি আপনার কখনো এরকম অবস্থা হয় আর আপনি ব্যায়াম করেন তাহলে আপনার মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। তাই গর্ভবতী মায়েরা সবসময় ডাক্তারের পরামর্শেই ব্যায়াম করবেন।

এ অধ্যায়ে গর্ভবতী মায়েদের জন্যে কিছু ব্যায়াম করার পদ্ধতি আলোচনা করা হলো, যা একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে করতে পারেন।

বি.দ্র. : *গর্ভাবস্থায় কোনো মতেই তাড়াহুড়ো করে ব্যায়াম করা উচিত নয়। প্রতিটি ব্যায়াম করার পর ২০/৩০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিয়ে তবে অন্য একটি ব্যায়াম করতে হবে। ব্যায়ামের সময় আরামদায়ক পোশাক পরা উচিত।*

১ নম্বর ব্যায়াম

প্রথমে মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে দুই হাঁটু ভাঁজ করে পায়ের পাতা দুটো মাটিতে রাখুন। হাত দুটো শরীরের দুপাশে রাখুন। এবার ধীরে ধীরে গভীরভাবে নাক দিয়ে দম নিতে নিতে হাত দুটো

ছবি– ১

তুলে এনে (২নং ছবির মতো) মাথার পেছনে রাখুন। হাতের পিঠ মাটিতে, তালু ওপরের দিকে থাকবে। এরপর ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে দম ছাড়তে ছাড়তে হাত দুটো পূর্বের অবস্থায় শরীরের দুপাশে এনে রাখুন। হাতের তালু মাটিতে থাকবে। এভাবে দুই বার করুন।

ছবি– ২

দিনে কমপক্ষে ২০ বার বলুন–
‘শোকর আলহামদুলিল্লাহ!
আমি বেশ ভালো আছি।’

২ নম্বর ব্যায়াম

প্রথমে শরীরের দুপাশে হাত লাগিয়ে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ান–‘নীল ডাউন’-এর মতো করে (১নং ছবির মতো)। এবার গভীরভাবে দম নিতে নিতে ধীরে ধীরে হাত দুটো (২নং ছবির মতো) কাঁধের দুপাশে রাখুন। তারপর ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে দম ছাড়তে ছাড়তে হাত দুটো আগের অবস্থায় নিয়ে আসুন। এভাবে দুই বার করুন।

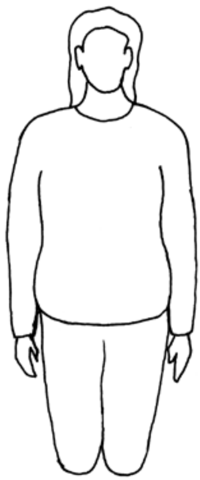

ছবি– ১

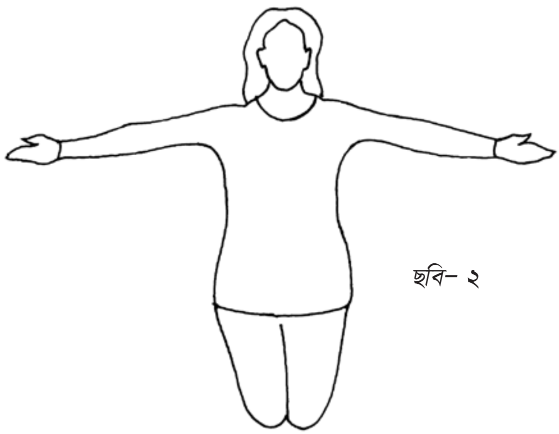

ছবি– ২

সবসময় মনে রাখুন–
রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন।

৩ নম্বর ব্যায়াম

প্রথমে দুই পা জোড় করে মাটিতে বসুন এবং হাত দুটো শরীরের দুপাশে রাখুন; হাতের আঙুলগুলো বাইরের দিকে ফেরানো থাকবে। (১নং ছবির মতো) এবার দম নিতে নিতে (২নং ছবির মতো) যতদূর সম্ভব কষ্ট না করে আরাম করে পা দুটো ফাঁক করুন। এর পর দম ছাড়তে ছাড়তে পূর্বের অবস্থায় (১নং ছবির মতো) ফিরে আসুন।

ছবি– ২

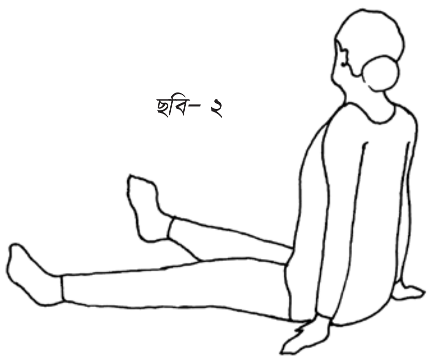

পৃথিবী সাহসী মানুষের জন্যে।
তাই সবসময় মনে মনে বলুন–
'আমি সাহসী। আমি নির্ভীক।'

৪ নম্বর ব্যায়াম

প্রথমে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। পা দুটো ভাঁজ করে এবং হাত দুটো শরীরের দুপাশে রাখুন (১নং ছবির মতো)। এবার দম নিতে নিতে হাত ও কনুই এবং পায়ের ওপর ভর দিয়ে কোমর আস্তে আস্তে (২নং ছবির মতো) ওপরে তুলুন। এরপর দম ছাড়তে ছাড়তে ১নং ছবির অবস্থায় ফিরে আসুন।

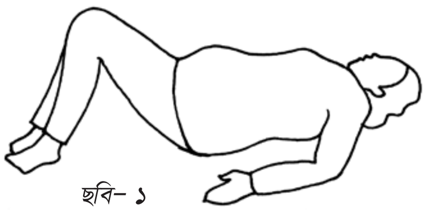

ছবি– ১

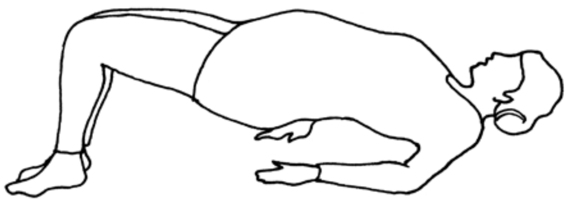

ছবি– ২

মানুষ যা ভাবতে পারে, যা বিশ্বাস করতে পারে, তা অর্জন করতে পারে।

৫ নম্বর ব্যায়াম

প্রথমে (১নং ছবির মতো) হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ান। এরপর (২নং ছবির মতো) কোমরে হাত দুটো রেখে দম নিতে নিতে শরীরের ওপরের অংশ ডানদিকে ঘোরান এবং দম ছাড়তে ছাড়তে পূর্বের অবস্থায় অর্থাৎ এক নম্বর পজিশনে নিয়ে আসুন। পুনরায় এভাবে কোমরে হাত রেখে শরীর এবার বাঁ দিকে ঘোরান এবং পূর্বের অবস্থায় (১নং ছবির মতো) ফিরিয়ে নিয়ে আসুন। ইচ্ছে করলে এ ব্যায়ামটি সোজা হয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত রেখেও করতে পারেন। তবে নিয়ম একই হবে। এভাবে দুই বার করতে পারেন।

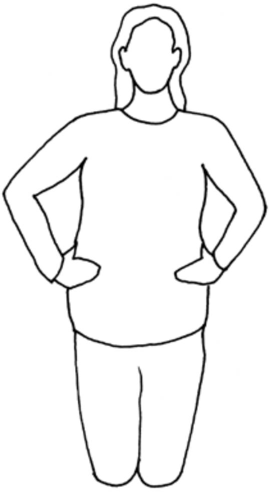

ছবি– ১

ছবি– ২

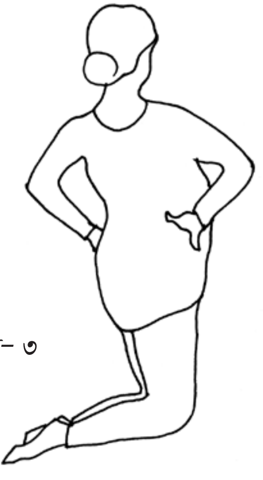

ছবি– ৩

৬ নম্বর ব্যায়াম

প্রথমে পা দুটো সামান্য ফাঁক রেখে সোজা হয়ে মাটিতে দাঁড়ান (১নং ছবির মতো)। এবার দম নিতে নিতে কোমর থেকে শরীরের ওপরের অংশ সামান্য সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন (২নং ছবির মতো)। এবার দম ছাড়তে ছাড়তে আগের অবস্থায় ফিরে আসুন। এভাবে দুই বার করতে পারেন।

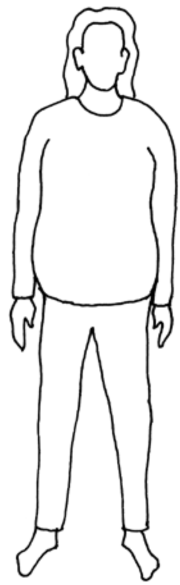

ছবি– ১

ছবি– ২

*প্রকৃতির সাথে একাত্ম হোন।
প্রকৃতি মন, দেহ ও আত্মার মাঝে
সবসময় ভারসাম্য এনে দেয়।*

৭ নম্বর ব্যায়াম

প্রথমে পা সামান্য ফাঁক রেখে কোমরে হাত রেখে মাটিতে সোজা হয়ে দাঁড়ান (১নং ছবির মতো)। এবার দম নিতে নিতে কোমর থেকে শরীরের ওপরের অংশ ডানদিকে একটু বাঁকিয়ে দিন (২নং ছবির মতো)। এবার দম ছাড়তে ছাড়তে পূর্বের অবস্থায় (১নং ছবির মতো) ফিরে আসুন। একইভাবে দম নিতে নিতে শরীরের ওপরের অংশ বামদিকে একটু বাঁকিয়ে দিন (৩নং ছবির মতো) এবং দম ছাড়তে ছাড়তে পূর্বের অবস্থায় (১নং ছবির মতো) ফিরে আসুন। এভাবে দুই বার করতে পারেন।

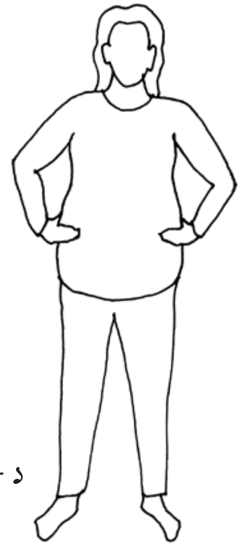
ছবি– ১

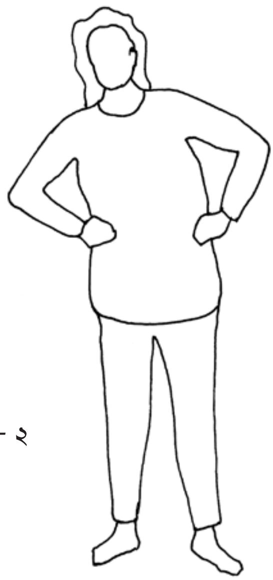
ছবি– ২

ছবি– ৩

৮ নম্বর ব্যায়াম

প্রথমে চেয়ারের পেছনে ডান হাত রেখে মাটিতে সোজা হয়ে দাঁড়ান। এবার দম নিতে নিতে ধীরে ধীরে (১নং ছবির মতো) বাঁ পা ওপরে তুলুন। মাটি থেকে এক ফুট পরিমাণ ওপরে। দম ছাড়তে ছাড়তে ধীরে ধীরে বাঁ পা নামান। এরপর ডান পা মাটি থেকে এক ফুট ওপরে তুলুন। দম ছাড়তে ছাড়তে ডান পা নামান (২নং ছবির মতো)।

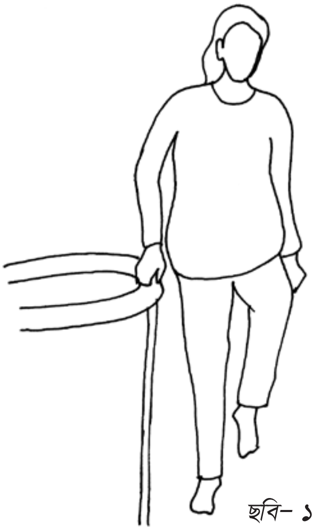

ছবি– ১

ছবি– ২

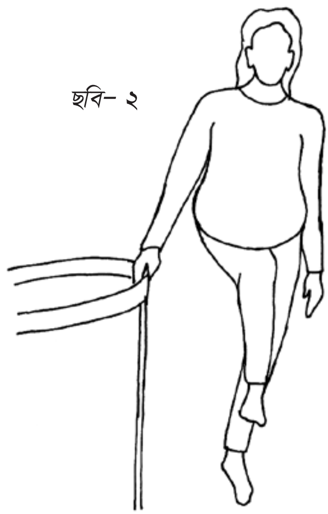

বিশেষভাবে খেয়াল রাখুন যেন চেয়ারের ওপর বেশি ভার না পড়ে।

বি.দ্র. : *গর্ভবতী মহিলারা এই আটটি ব্যায়াম একদিনেই করবেন না। প্রতিদিন তিন/ চারটি করে ব্যায়াম করতে পারেন। যদি একদিনেই করতে চান তাহলে কোনো ব্যায়ামই একবারের বেশি করবেন না।*

সবসময় সুন্দর, সুস্থ ও মেধাদীপ্ত নবজাতকের মনছবি দেখুন।

প্রসবপরবর্তী ব্যায়াম

অনেক মহিলা ভেবে থাকেন বাচ্চা প্রসবের পর ব্যায়াম করা যায় না। এটা ঠিক নয়। গর্ভাবস্থায় যেমন ব্যায়াম করা দরকার তেমনি প্রসবের পরেও প্রত্যেক মহিলার ব্যায়াম করা প্রয়োজন, যদি প্রসবের পর প্রসূতি মায়ের কোনো শারীরিক অসুবিধা না থাকে। শারীরিক অসুবিধা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ব্যায়াম করবেন।

বি.দ্র.* : *প্রসবপরবর্তী রক্তস্রাব সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ব্যায়াম করুন।

- ☐ সকালবেলা নাশতার ঘণ্টাখানেক পরে ব্যায়াম করতে হবে।
- ☐ প্রতিটি ব্যায়াম খুব ধীরেসুস্থে করুন; তাড়াহুড়ো করবেন না।
- ☐ প্রতিদিন ১০ মিনিটের বেশি ব্যায়াম করবেন না।
- ☐ প্রসবের পর ব্যায়াম করলে পেটের মাংসপেশি মজবুত রেখে জরায়ুকে সঠিক স্থানে ধরে রাখে এবং জরায়ু ও ডিম্বাশয়ের রক্ত চলাচল বৃদ্ধি করিয়ে তাদের সুস্থ ও সবল রাখে।
- ☐ ব্যায়াম করার পর সবশেষে অবশ্যই ১০ মিনিট শবাসনে বিশ্রাম নিন এবং কল্পনা করুন আপনার ফিগার খুব সুন্দর হচ্ছে, স্বাস্থ্য ভালো হচ্ছে।

এবার ব্যায়ামের পদ্ধতিগুলো জেনে নিন।

১ নম্বর ব্যায়াম

প্রথমে চিৎ হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ুন। হাত দুটো শরীরের দুপাশে রাখুন। হাতের তালু যেন মাটিতে লেগে থাকে (১নং ছবির মতো)। এবার নাক দিয়ে দম নিতে

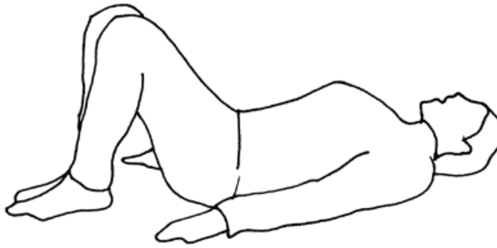

ছবি– ১

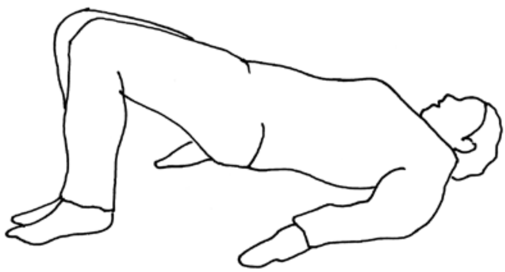

ছবি– ২

নিতে হাত ও পায়ের ওপর ভর দিয়ে কোমর আস্তে আস্তে (২নং ছবির মতো) ওপরে তুলুন। এরপর দম ছাড়তে ছাড়তে আগের অবস্থায় (১নং ছবির মতো) ফিরে আসুন। এভাবে দুই বার করতে পারেন।

প্রশান্ত মনই হচ্ছে শক্তির আসল ফল্গুধারা।

২ নম্বর ব্যায়াম

ছবি– ১

প্রথমে মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে হাত দুটো শরীরের দুপাশে রাখুন। হাতের তালু মাটিতে লেগে থাকবে (১ নং ছবির মতো)। এবার নাক দিয়ে দম নিতে নিতে পা দুটো হাঁটু থেকে ভাঁজ করে পায়ের গোড়ালি দুটোকে যতদূর সম্ভব (২নং ছবির মতো) নিতম্বের কাছে নিয়ে আসুন এবং দম ছাড়তে ছাড়তে আগের অবস্থায় (১নং ছবির মতো) পা দুটো সোজা করে রাখুন। এভাবে দুই বার করুন।

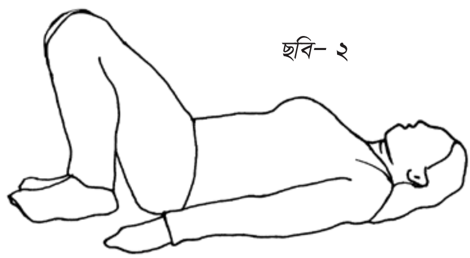

ছবি– ২

*দেহ ও মনে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারি–
এ বিশ্বাসই পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্যে
প্রথম প্রয়োজন।*

৩ নম্বর ব্যায়াম

ছবি– ১

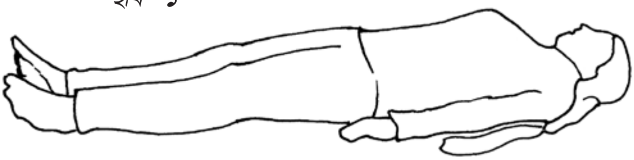

চিৎ হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ুন। হাত দুটো শরীরের দুপাশে রাখুন। হাতের তালু মাটিতে লেগে থাকবে (১নং ছবির মতো)। এবার নাক দিয়ে দম নিন। এরপর দম ছাড়তে ছাড়তে কনুই দুটোর ওপর ভর দিয়ে শরীরের ওপরের অংশ কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত ওপরে তুলুন (২নং ছবির মতো)। এবার দম নিতে নিতে শুয়ে পড়ুন আগের মতো। এভাবে দুই বার করুন।

ছবি– ২

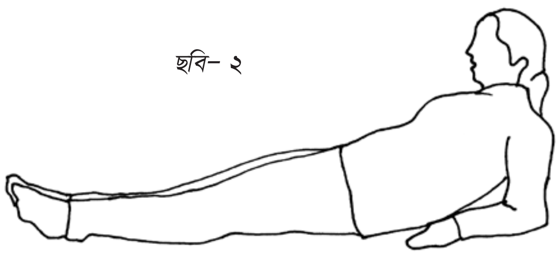

সবসময় হাসিমুখে কথা বলুন। এতে আপনি শুধু নিজেই আনন্দিত হবেন না, অন্যরাও খুশি হবে।

৪ নম্বর ব্যায়াম

ছবি– ১

চিৎ হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ুন। হাত দুটো শরীরের দুপাশে রাখুন। হাতের তালু মাটিতে লেগে থাকবে। এবার নাক দিয়ে দম নিতে নিতে পা দুটো হাঁটু থেকে ভাঁজ করে জোড় অবস্থায় (২নং ছবির মতো) বুকের কাছে নিয়ে আসুন এবং দম ছাড়তে ছাড়তে পা দুটো সোজা করে নিন। এভাবে দুই বার করতে পারেন।

ছবি– ২

ক্ষোভ হচ্ছে এমন এক বিষ,
যা আপনি নিজে পান করছেন
আর ভাবছেন মারা যাবে
আপনার প্রতিপক্ষ।

৫ নম্বর ব্যায়াম

ছবি– ১

প্রথমে হাত দুটো ভাঁজ করে তার ওপর মাথা রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন (১নং ছবির মতো)। এবার নাক দিয়ে দম নিতে নিতে পা দুটো হাঁটু থেকে ভাঁজ করে (২নং ছবির মতো) ওপরের দিকে উঠিয়ে রাখুন। এবার দম ছাড়তে ছাড়তে পা দুটো সোজা করুন। (১নং ছবির অবস্থায় নিয়ে আসুন) এভাবে দুবার করুন।

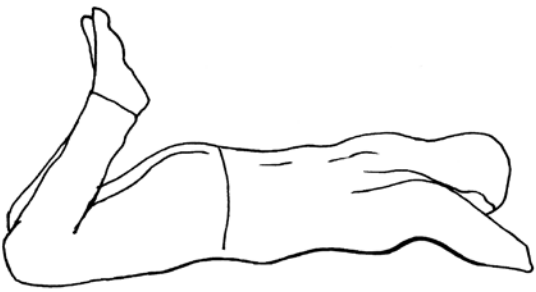

ছবি– ২

দিনে বা রাতে, প্রকাশ্যে বা গোপনে,
সচ্ছল বা অসচ্ছল অবস্থায় নিয়মিত দান
স্রষ্টার রহমত আনে।

৬ নম্বর ব্যায়াম

ছবি– ১

শরীরের দুপাশে হাত রেখে মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। হাতের তালু মাটিতে লেগে থাকবে। এবার প্রথমে পা দুটো হাঁটু থেকে ভাঁজ করে পেটের ওপর নিয়ে আসুন (১নং ছবির মতো)। এর পর (২নং ছবির মতো) একটার পর একটা পা বাই-সাইকেল চালানোর মতো ওঠান ও নামান। এভাবে দুই বার করতে পারেন।

ছবি– ২

এভাবে তিন মাস এ ব্যায়ামগুলো করার পর আস্তে আস্তে কোয়ান্টাম যোগের সব ব্যায়ামই করতে পারবেন। অবশ্য শারীরিক কোনো বিশেষ অসুখ থাকলে ব্যায়ামে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বি.দ্র. : *ব্যায়াম করার পূর্বে অবশ্যই ব্যায়ামের নিয়মাবলি পড়ে নেবেন।*

যে-সব মহিলা অপারেশনের মাধ্যমে বাচ্চা প্রসব করেছেন, তারা শারীরিক বিশেষ কোনো অসুখ কিংবা অসুবিধা না থাকলে প্রথমদিকে হাঁটাচলা এবং তিন মাস পর সব ব্যায়ামই করতে পারবেন।

ব্যায়াম করার পূর্বে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন।

যে রোগ নিরাময়ে যে ব্যায়াম অনুশীলন করবেন

ব্যাকপেইন

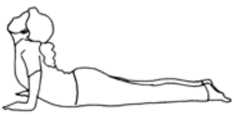

ভুজঙ্গাসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

অর্ধচন্দ্রাসন
(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

ত্রিকোণাসন
(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন
(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

গোমুখাসন
(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

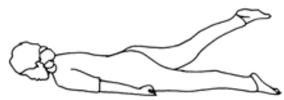

অর্ধশলভাসন
(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

টনসিল, ঠান্ডা/ সর্দি/ কাশি

মৎস্যাসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

স্বরায়ন
(পাঁচ থেকে ছয় বার)

সর্বাঙ্গাসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

শশাঙ্গাসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

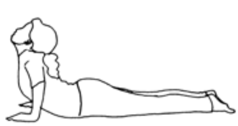

ভুজঙ্গাসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

হলাসন
(তিন বার)

ডায়াবেটিস

জানুশিরাসন
(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

হলাসন
(তিন বার)

অর্ধশলভাসন
(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

অনিদ্রা

বজ্রাসন
(পাঁচ থেকে ১০ মিনিট)

গোমুখাসন
(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

কোষ্ঠকাঠিন্য

হলাসন
(তিন বার)

উষ্ট্রাসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

সর্বাঙ্গাসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

ধনুরাসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

হস্তপদাসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

বিপরীত করণীতে অশ্বিনীমুদ্রা
(১০ থেকে ২০ প্রস্থ)

উচ্চ রক্তচাপ

গোমুখাসন
(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

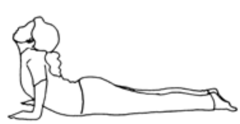

ভুজঙ্গাসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

নিম্ন রক্তচাপ

হস্তপদাসন

(তিন থেকে পাঁচ বার)

পাইলস্/ অর্শরোগ

গোমুখাসন ও গোমুখাসনে অশ্বিনীমুদ্রা

(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

শীর্ষাসন

(দুই থেকে তিন বার)

সর্বাঙ্গাসন

(তিন থেকে পাঁচ বার)

বজ্রাসন ও বজ্রাসনে অশ্বিনীমুদ্রা

(পাঁচ থেকে ১০ মিনিট)

বিপরীত করণীতে অশ্বিনীমুদ্রা

(১০ থেকে ২০ প্রস্থ)

সুপ্ত ভদ্রাসনে অশ্বিনীমুদ্রা

(১০ থেকে ২০ প্রস্থ)

হাঁপানি

মৎস্যাসন

(তিন থেকে পাঁচ বার)

পবনমুক্তাসন

(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

শীর্ষাসন

(দুই থেকে তিন বার)

পদ্মাসন ও পদ্মাসনে প্রাণায়াম

(এক থেকে পাঁচ মিনিট)

আমাশয়/ পেটের পীড়া

পশ্চিমোত্তানাসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

মাইগ্রেন/ মাথাব্যথা দূর

শীর্ষাসন
(দুই থেকে তিন বার)

নাসায়ন বা একনাসা প্রাণায়াম
(এক থেকে পাঁচ মিনিট)

আর্থ্রাইটিস

বজ্রাসন
(পাঁচ থেকে ১০ মিনিট)

গোমুখাসন
(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

পদ্মাসন
(এক থেকে পাঁচ মিনিট)

উৎকট আসন
(তিন থেকে পাঁচ বার)

হৃদরোগীরা যে ব্যায়াম করলে উপকৃত হবেন

গোমুখাসন
(তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ)

বজ্রাসন
(পাঁচ থেকে ১০ মিনিট)

শবাসন
(পাঁচ থেকে ১০ মিনিট)

সতর্ক থাকুন!

- পীহা, ও যকৃত স্বাভাবিকের তুলনায় যাদের বড়, যাদের উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, স্লিপড ডিস্ক, সারভাইক্যাল বা লাম্বার স্পন্ডিলাইটিস, চোখের কঠিন অসুখ আছে তারা ***হস্তপদাসন*** করবেন না।
- সামনে ঝোঁকা নিষেধ থাকলে ***জানুশিরাসন*** করা যাবে না।
- যারা হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের রোগে ভুগছেন তারা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ***উষ্ট্রাসন*** করবেন না।
- ১২ বছরের কম বয়সী যারা এবং হৃদরোগীরা ***সর্বাঙ্গাসন*** করা থেকে বিরত থাকবেন।
- গলগণ্ড রোগ এবং লাম্বার স্পন্ডিলাইটিস-এ যারা ভুগছেন তারা ***ধনুরাসন*** করা থেকে বিরত থাকবেন। এ আসনে কটিদেশীয় কশেরুকায় অত্যধিক চাপ পড়ে বলে কোমরের ব্যথা বেড়ে যেতে পারে।
- যাদের হার্নিয়া বা এপেন্ডিসাইটিসের সমস্যা আছে ও যাদের পীহা, যকৃৎ অত্যধিক বড় বা রুগ্‌ণ তারা ***পশ্চিমোত্তানাসন*** করা থেকে বিরত থাকুন।
- যাদের উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ আছে তারা ***শীর্ষাসন*** করা থেকে বিরত থাকবেন।
- যাদের চোখের কঠিন অসুখ আছে তারা ***শীর্ষাসন*** ও ***দৃষ্টিদান*** করা থেকে বিরত থাকবেন।
- ***পবনমুক্তাসন*** করার সময় অবশ্যই প্রথমে ডান পা তুলে করবেন। কারণ, যদি প্রথমে বাম পা তুলে করেন তাহলে পেটের মধ্য কোলনে যে বায়ু জমে আছে তা বের না হয়ে অবরোহী কোলন থেকে আরোহী কোলনে প্রবেশ করবে। ফলে বায়ুর বহির্গমন হবে না। তাই প্রথমেই ডান পা তুলে করতে হবে।

উপকৃত হবেন

- ☐ আলস্য দূর ॥ শীর্ষাসন, ত্রিকোণাসন
- ☐ লম্বা হওয়ার জন্যে ॥ শশাঙ্গাসন, হস্তপদাসন, পশ্চিমোত্তানাসন
- ☐ পেটের চর্বি কমার জন্যে ॥ জানুশিরাসন, উষ্ট্রাসন, উত্থিতপদাসন, অর্ধশলভাসন, পশ্চিমোত্তানাসন
- ☐ মাসিকের ব্যথা নিরাময় ॥ শশাঙ্গাসন, ভদ্রাসন, ভুজঙ্গাসন, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, বিপরীত করণীতে অশ্বিনীমুদ্রা
- ☐ পায়ের শক্তি বাড়ানো ॥ উৎকট আসন, বৃক্ষাসন
- ☐ গলার স্বর সুন্দর করা, তোতলামি দূর করা ॥ স্বরায়ন
- ☐ কানের পর্দা ভারী থাকলে ও শ্রবণশক্তি বাড়ানোর জন্যে ॥ স্বরায়ন
- ☐ দৃষ্টিশক্তি বাড়ানো ॥ শীর্ষাসন, চোখে পানির ঝাপটা, দৃষ্টিদান
- ☐ হজম শক্তি বৃদ্ধি ॥ বজ্রাসন, ভুজঙ্গাসন, পশ্চিমোত্তানাসন, উত্থিতপদাসন, পবনমুক্তাসন, বিপরীত করণীতে অশ্বিনীমুদ্রা
- ☐ সারাক্ষণ প্রাণপ্রাচুর্যে থাকা ও কর্মক্ষম থাকা ॥ প্রাণায়াম, ভ্রমণ প্রাণায়াম
- ☐ হরমোনের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে দেহের গঠন সুন্দর করে ॥ শীর্ষাসন, শশাঙ্গাসন, ভুজঙ্গাসন, উষ্ট্রাসন, মৎস্যাসন
- ☐ ওজন নিয়ন্ত্রণ ॥ উত্থিতপদাসন, হলাসন, উষ্ট্রাসন, ধনুরাসন
- ☐ মেয়েলি সমস্যা ॥ হলাসন, শশাঙ্গাসন, ভদ্রাসন, গোমুখাসন, উত্থিতপদাসন, সুপ্ত ভদ্রাসনে অশ্বিনীমুদ্রা, ভুজঙ্গাসন

প্রতিদিন ৩০ মিনিট ব্যয় করুন
সুস্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য ধরে রাখুন

প্রতিদিন ১৭ মিনিট ব্যায়াম ও ১৩ মিনিট শিথিলায়ন করুন। সব মিলিয়ে প্রতিদিন ৩০ মিনিটের প্রোগ্রাম।

সকালে : ভোর ৫টা থেকে দুপুর ১২টার মধ্যে

বিকেলে : বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে

সন্ধ্যার পর : সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে

শনি থেকে বৃহস্পতি–সপ্তাহে ছয় দিন এর যে-কোনো একটি প্রোগ্রাম অনুসরণ করতে পারেন। প্রথমে উজ্জীবন করে একটু ওয়ার্ম-আপ করে নিন। তারপর আসন শুরু করুন।

ক্রমিক	আসনের নাম	বার বা প্রস্থ	ভঙ্গিমায় অবস্থান	মোট সময়
১.	হস্তপদাসন	তিন বার	১০ সে. করে	৩০ সে.
২.	অর্ধচন্দ্রাসন	তিন প্রস্থ	১০ সে. করে	৬০ সে.
৩.	জানুশিরাসন	তিন প্রস্থ	১০ সে. করে	৬০ সে.
৪.	শশাঙ্গাসন	তিন বার	১০ সে. করে	৩০ সে.
৫.	ভদ্রাসন	তিন বার	২০ সে. করে	৬০ সে.
৬.	গোমুখাসন	তিন প্রস্থ	২০ সে. করে	৬০ সে.
৭.	উষ্ট্রাসন	তিন বার	১০ সে. করে	৩০ সে.
৮.	উত্থিতপদাসন	পাঁচ বার	১০ সে. করে	৫০ সে.
৯.	ভুজঙ্গাসন	পাঁচ বার	১০ সে. করে	৫০ সে.
১০.	অর্ধশলভাসন	তিন প্রস্থ	১০ সে. করে	৬০ সে.
১১.	সর্বাঙ্গাসন	একবার		৬০ সে.
১২.	মৎস্যাসন	একবার		৬০ সে.
১৩.	পবনমুক্তাসন (তিন রাউন্ড। ডানে-বামে মিলে এক রাউন্ড)			৯০ সে.
১৪.	দৃষ্টিদান ডানে-বামে মিলে			৬০ সে.
১৫.	অশ্বিনীমুদ্রা অথবা যে-কোনো একটি মুদ্রা			৩০ সে.
১৬.	নাসায়ন অথবা যে-কোনো একটি প্রাণায়াম			তিন মি.
১৭.	শীর্ষাসন			এক মি.

মোট : ১৭ মিনিট ১০ সেকেন্ড ব্যায়াম। ১৩ মিনিট (ব্যায়ামের আগে তিন মিনিট এবং শেষে ১০ মিনিট) সহজ শিথিলায়ন বা শবাসন।

***বি.দ্র.** : প্রতিদিন এই ৩০ মিনিট ব্যায়াম অনুশীলনের মধ্যে যদি কারো শারীরিক বিশেষ অসুবিধার কারণে কোনো ব্যায়াম নিষেধ থাকে, তাহলে সেটি বাদ দিয়ে করবেন।*

ব্যায়ামের নিয়মাবলি ভালোভাবে পড়ে দেখুন–শারীরিক যে-সব সমস্যার কথা লেখা হয়েছে সে-সব অসুবিধা আপনার আছে কিনা। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শে শরীর চেক-আপ করিয়ে শারীরিক অসুবিধা জেনে নিয়ে নিয়মাবলি মেনে ব্যায়াম করুন।

মাসে একদিন বা ১৫ দিনে একদিন সকাল বেলা বাসি পেটে বমন ধৌতি করে নিয়ে ১০ মিনিট শবাসন করুন। অন্য ব্যায়াম সেদিন না করলেও চলবে। এরপর নাশতা করে আধা ঘণ্টা শিথিলায়ন করুন।

বজ্রাসন দুই/ তিন বেলা খাবার পর করুন। এতে হজম শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

কোয়ান্টাম ব্যায়ামের মাত্র ৩০ মিনিট প্রোগ্রামে একজন মানুষের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্ব অঙ্গের ব্যায়াম হয় এবং অভ্যন্তরীণ শিরা-ধমনী,স্নায়ু গ্রন্থি–সব সুস্থ রাখা যায়। কোন ব্যায়ামে শরীরের কোন অংশের উপকার হয় তা বর্ণনা করা হলো :

১. **মাথা ও কপাল**
শীর্ষাসন, শশাঙ্গাসন, হলাসন, বিপরীত করণী মুদ্রা, প্রাণায়াম

২. **গলা**
সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, শশাঙ্গাসন, হলাসন, বিপরীত করণী মুদ্রা

৩. **কাঁধ**
গোমুখাসন, উষ্ট্রাসন, অর্ধচন্দ্রাসন, ভুজঙ্গাসন, সর্বাঙ্গাসন

৪. **বুক**
ভুজঙ্গাসন, ধনুরাসন, উষ্ট্রাসন, প্রাণায়াম

৫. **পেট**
হস্তপদাসন, জানুশিরাসন, উত্থিতপদাসন, পবনমুক্তাসন, অর্ধকূর্মাসন পশ্চিমোত্তানাসন

৬. মেরুদণ্ড

ভুজঙ্গাসন, শলভাসন, অর্ধশলভাসন, ধনুরাসন, উষ্ট্রাসন, অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন, অর্ধচন্দ্রাসন

৭. ঊরু এবং তার সংযোগস্থল

জানুশিরাসন, পশ্চিমোত্তানাসন, মুণ্ডকাসন

৮. নিতম্ব

বজ্রাসন, উষ্ট্রাসন, ধনুরাসন, অর্ধচন্দ্রাসন

৯. কোমর

অর্ধচন্দ্রাসন, ত্রিকোণাসন, উষ্ট্রাসন, লেগ সার্কেলিং

১০. হাত

ত্রিকোণাসন, শীর্ষাসন (হাতের ওপর ভর করে)

১১. পা

বজ্রাসন, উৎকট আসন, বৃক্ষাসন, ভদ্রাসন

১২. হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস

প্রাণায়াম

১৩. জননেন্দ্রিয়

ভদ্রাসন, উষ্ট্রাসন, শশাঙ্গাসন

১৪. চোখ

দৃষ্টিদান

১৫. কণ্ঠ

স্বরায়ন

দেহকাঠামো

মেরুদণ্ড

আমরা আজকাল প্রায়ই ব্যাকপেইন (Backpain)-এর কথা শুনে থাকি। অনেকেই বলে থাকেন ব্যাকপেইনে ভুগছি কিংবা কোমরের কাছে ভীষণ ব্যথা, উঠতে-বসতে পারি না। ঘাড়ের কাছে ব্যথা ইত্যাদি। এ ধরনের ব্যথার পেছনে কী কারণ রয়েছে, তা আমাদের জানা উচিত। সবকিছুই জানা সম্ভব না হলেও সম্যক জ্ঞান না থাকলে আমরা ব্যায়ামের গুরুত্ব কতখানি তা হয়তো অনুধাবন করতে পারব না। মেরুদণ্ড সম্পর্কে সামান্য কিছু বর্ণনা করা গেল।

আমাদের দেহের পেছন দিকে করোটির (Skull) নিচ থেকে যে দেহকাণ্ডটি বস্তি-প্রদেশ পর্যন্ত নেমে গেছে তাকে মেরুদণ্ড বলে।

৩৩টি ছোট ছিদ্রযুক্ত অস্থি দ্বারা এই মেরুদণ্ড গঠিত। একখণ্ড অস্থিকে কশেরুকা (Vertebrae) বলে। প্রতিটি কশেরুকা দেখতে একরকম না হলেও এদের আকৃতিগত অনেক মিল রয়েছে। প্রতিটি কশেরুকার মধ্যে একটি করে ছিদ্র আছে। এ ছিদ্রকে নিউরাল গহ্বর (Neural Cavity) বলে। এই নিউরাল ক্যাভিটির ঠিক সামনে একটি অস্থিময় নল আছে। এ নলটিকে বলা হয় সেন্ট্রাম (Centram)। ঠিক তার অপরদিকে নিউরাল ক্যাভিটির চারদিকে কতগুলো ছোট ছোট উদ্ভূত অংশ আছে আর এ অংশেই কশেরুকাগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই যুক্ত অঞ্চলের কশেরুকার সঙ্গে আবার বুকের পাঁজরের অস্থিগুলো যুক্ত থাকে। এই সংযোগস্থলেও অনুরূপ উদ্ভূত অংশ আছে। এখানে সেন্ট্রাম থাকে সামনের দিকে এবং উদ্ভূত অংশগুলো থাকে পেছন দিকে। প্রতি দুটো কশেরুকার মাঝখানে তরুণাস্থির (Cartilage) একটি পুরু আস্তরণ আছে, যা Intervertebral disc নামে পরিচিত। এই

তরুণাস্থির সুস্থতার ওপর নির্ভর করে মেরুদণ্ডের স্থিতিস্থাপকতা।

দুটো কশেরুকার মাঝে এই তরুণাস্থি বা Intervertebral disc থাকায় শরীর যে-কোনো দিকে বাঁকানো সম্ভব হয়। আবার কশেরুকাগুলো এমনভাবে একের পর এক সাজানো রয়েছে যে, ওদের নিউরাল ক্যাভিটিগুলো মিলে একটি ফাঁপা নলের সৃষ্টি হয়েছে। এই নলের ভেতর দিয়েস্নায়ুকাণ্ডটি (Spinal cord) প্রবাহিত হয়েছে।

মেরুদণ্ডের বিভিন্ন অংশের কাজ অনুযায়ী তাকে পাঁচটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন :

১. গ্রীবাদেশীয় অংশ
(Cervical vertebrae)

২. বক্ষদেশীয় অংশ
(Thoracic vertebrae)

৩. কটিদেশীয় অংশ
(Lumbar vertebrae)

৪. ত্রিকাস্থি
(Sacral vertebrae)

৫. অনুত্রিকাস্থি
(Coccygeal vertebrae)

খুলি ও মেরুদণ্ড

গ্রীবাদেশীয় অংশ

এ অংশ প্রথম সাতটি কশেরুকা নিয়ে গঠিত।

বক্ষদেশীয় অংশ

গ্রীবাদেশীয় অংশের পরের ১২টি কশেরুকা নিয়ে এ অংশটি গঠিত। প্রতিটি কশেরুকার সঙ্গে বুকের পাঁজরের এক জোড়া করে অস্থি যুক্ত আছে।

কটিদেশীয় অংশ

বক্ষদেশীয় অংশের পরবর্তী পাঁচটি কশেরুকা নিয়ে এ অংশ গঠিত।

ত্রিকাস্থি

কটিদেশীয় অংশের পর পাঁচটি কশেরুকা নিয়ে এ অংশ গঠিত। পরিণত বয়সে এই পাঁচটি অস্থি একসঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

অনুত্রিকাস্থি

মেরুদণ্ডের ৩৩টি অস্থির অবশিষ্ট চারটি কশেরুকা নিয়ে এ অংশ গঠিত।

এই মেরুদণ্ডের হাড়ে কোনো না কোনোভাবে কিংবা কোনো দুর্ঘটনায় হাড় ভেঙে গেলে অথবা ডিস্ক সরে গেলে অথবা হঠাৎ করে ভারী জিনিস তুলতে গিয়ে ডিস্ক সরে গেলে মেরুদণ্ডে নানান সমস্যা হয়ে থাকে। এ সমস্যাগুলোর বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন–স্লিপড ডিস্ক, স্পন্ডিলাইটিস, ব্যাক পেইন, সায়াটিকা ইত্যাদি।

এন্ডোক্রাইন সিস্টেম

কোয়ান্টাম ব্যায়াম করতে হলে আপনার Endocrine System বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা থাকা দরকার। তাহলে ব্যায়ামে আপনার একাগ্রতা বাড়বে এবং এর উপকারিতা অনুধাবন করতে পারবেন।

মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি :

১. পিটুইটারি গ্রন্থি
২. থাইরয়েড গ্রন্থি
৩. প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি
৪. থাইমাস গ্রন্থি
৫. সুপ্রারেনাল গ্রন্থি
৬. অগ্ন্যাশয়
৭. ওভারি
৮. টেস্টিস

মানবদেহের এন্ডোক্রাইন সিস্টেম

আমাদের দেহে দুধরনের গ্রন্থি রয়েছে।

প্রথমত, বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বা এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড।

দ্বিতীয়ত, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বা এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড।

তাছাড়া দেহে এমনও গ্রন্থি আছে, যার এক অংশ নালীযুক্ত এবং অপর অংশ নালীবিহীন। যেমন : অগ্ন্যাশয়, লালা-স্রাবী গ্রন্থি, অশ্রু-স্রাবী গ্রন্থি, ঘর্ম গ্রন্থি। এগুলো হচ্ছে বহিঃস্রাবী নালীযুক্ত গ্রন্থি।

লালা গ্রন্থি থেকে লালা নিঃসরণ হয়। আমাদের মুখে খাদ্যের সাথে মিশে খাদ্যবস্তু পাকস্থলীতে পৌঁছাতে এবং হজমে সাহায্য করে। তেমনি ঘর্ম গ্রন্থির মাধ্যমে আমাদের দেহ থেকে ঘাম বেরিয়ে যায়।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলো থেকে নিঃসৃত রসকে হরমোন বলা হয়। হরমোন শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ Hormao থেকে। যদিও রক্তে এদের পরিমাণ খুব কম তবুও দেহের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এর প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন সরাসরি রক্তে মিশে যায় এবং দেহের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। হরমোন রক্তের সঙ্গে মিশে দেহের গঠন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে সরাসরি অংশ নেয়। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন অত্যন্ত সক্রিয় পদার্থ, রক্তে এর পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য হলেও জীবদেহের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ওপর এর প্রভাব এত বেশি যে, দেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি, আকৃতি, প্রকৃতি, যৌনাঙ্গের গঠন, কার্যকলাপ ইত্যাদি সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এই এন্ডোক্রাইন গ্রন্থিগুলো।

এই এন্ডোক্রাইন গ্রন্থিগুলোর মধ্যে যেগুলো নারীদেহের ওপর বিশেষভাবে কাজ করে সেগুলো নিয়ে আমরা এখন সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। এ থেকে আমরা বুঝতে পারব, কোয়ান্টাম ব্যায়াম ছাড়া এমন কোনো ব্যায়াম নেই যা দেহের এই অভ্যন্তরীণ গ্রন্থিগুলোকে সুস্থ ও সবল রাখতে সাহায্য করে। প্রথমেই আসা যাক পিটুইটারি গ্রন্থির কথায়।

পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland)

আমাদের দেহে পিটুইটারি গ্রন্থির ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দেহের অন্যান্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে বলে পিটুইটারিকে মাস্টার গ্ল্যান্ড বলা হয়। আমাদের মস্তিষ্কের নিচের দিকে একটি ক্ষুদ্র অস্থি গহ্বরে এ গ্রন্থিটি রয়েছে। এই পিটুইটারি গ্রন্থির আবার রয়েছে তিনটি অংশ–

ক. পুরোভাগ খ. মধ্যভাগ গ. পশ্চাৎভাগ

পিটুইটারির পুরোভাগ থেকেই যৌনগ্রন্থিতে উত্তেজক হরমোন নিঃসরণ হয়। নারীদেহের যৌনগ্রন্থিগুলোর কাজকে এটি নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন :

প্রোলান 'এ' (Folicle Stimulating Hormone)

এর কাজ হলো ডিম্বাশয় থেকে ইসট্রোজেন হরমোন নিঃসরণকে নিয়ন্ত্রণ

করা। নারীদেহে ইসট্রোজেন কমবেশি হওয়ার জন্যে নারীত্বের প্রকাশও কমবেশি হয় এবং ডিম্বাশয় পরিপুষ্ট হতে পারে না।

প্রোলান ‘বি’ (Lutinsing Hormone)

এটি মেয়েদের করপাস লিউটিয়াম (Corpus Luteum) গঠন, প্রজেসটেরোন হরমোন নিঃসরণ এবং একই সঙ্গে এর কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে জরায়ুতে ভ্রূণ সৃষ্টি হয় এবং ভ্রূণের বৃদ্ধির কাজ ঠিকমতো হয়। কিন্তু কোনো কারণবশত প্রোলান ‘বি’-এর কাজ ব্যাহত হলে সন্তান সৃষ্টির পথে বাধা আসে অর্থাৎ গর্ভপাত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

প্রোলাকটিন (Prolactin)

এর কাজ হলো মেয়েরা গর্ভবতী হলে তার স্তনকে ঠিক রেখে স্তনে দুধ তৈরি করা।

পিটুইট্রিন (Pituitrin or oxytocin)

পিটুইটারির পশ্চাদভাগের হরমোনের নাম হলো পিটুইট্রিন। এর প্রধান কাজ গর্ভবতী মায়ের জরায়ুর পেশিকে সংকুচিত করে প্রসবে বিশেষভাবে সাহায্য করা। তবে প্রত্যক্ষভাবে এটি যৌনগ্রন্থির ওপর কাজ করে না।

থাইরয়েড (Thyroid)

থাইরয়েড গ্রন্থি আমাদের দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। থাইরয়েড থেকে নিঃসৃত হরমোনকে থাইরক্সিন (Thyroxin) বলে। আর এই থাইরক্সিন যদি কোনো কারণে কম হয় তাহলে মেয়েদের যৌনগ্রন্থিগুলোর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তার কার্যকলাপে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। থাইরক্সিন দেহের বিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে।

থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোনের অভাব হলে কিংবা ঘাটতি দেখা দিলে দেহে নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেমন : শিশু লম্বায় বাড়ে না, মোটা হয়, ক্রমে বামন হয়ে যায়। শিশুদের হাড়ের বৃদ্ধি হয় না। শিশুর বয়স বাড়লেও প্রায়ই বুদ্ধিহীনের মতো আচরণ করে। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে চালচলন, হাবভাব, কথা বলার ক্ষমতা, চিন্তাশক্তি—সব ঝিমিয়ে আসে। টিস্যু মোটা ও শক্ত হয়ে দেহে স্ফীতিরোগ দেখা দেয় যা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় মিক্সিডিমা নামে পরিচিত। চুল পড়ে। দেহের তাপমাত্রা কমে যেতে পারে।

আমাদের দেহে আয়োডিনের প্রয়োজন অত্যন্ত কম, কিন্তু এর অভাব ঘটলে গলগণ্ড বা ঘ্যাগ রোগ হয়। তাই থাইরয়েড গ্রন্থিকে সুস্থ রেখে হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে কোয়ান্টাম ব্যায়ামের কোনো বিকল্প নেই।

সুপ্রারেনাল বা এড্রিনাল গ্রন্থি

এড্রিনাল গ্রন্থির দুটো অংশ রয়েছে। একটি ওপরের অংশ, অন্যটি ভেতরের অংশ। এটির ওপরের অংশের হরমোনের নাম কর্টিকো-স্টেরয়েড। মেয়েদের শরীরে যৌন হরমোনের ওপর এরা কাজ করে। এরা যৌনগ্রন্থির সবরকম কাজকেই সাহায্য করে। যদি কোনো কারণে এড্রিনাল গ্রন্থির নিঃসরণ কম হয়, তাহলে নারীর যৌন ক্ষমতা অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি যৌন দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। তাই আমাদের উচিত এই অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোকে সুস্থ রাখার জন্যে নিয়মিত কোয়ান্টাম ব্যায়াম করা।

স্ত্রী প্রজননতন্ত্র

স্ত্রী প্রজননতন্ত্র

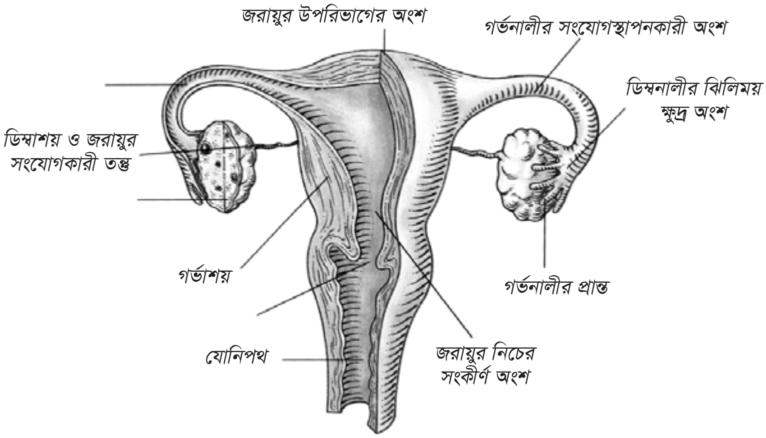

নারীদেহে প্রজননতন্ত্রের মধ্যে রয়েছে :

১. ডিম্বাশয় ২. গর্ভনালী ৩. জরায়ু

ডিম্বাশয় (Ovary)

মেয়েদের নিচের পেটে অর্থাৎ তলপেটে জরায়ুর দুপাশে এবং জরায়ু থেকে খানিকটা দূরে থাকে দুটো ডিম্বাশয়। আর এই ডিম্বাশয় থেকে গুরুত্বপূর্ণ দুটো হরমোন নিঃসরণ হয়। একটি হলো ইসট্রোজেন; আর একটি হলো প্রজেসটেরোন। ডিম্বাশয় থেকে ডিম্ব নিঃসরণ হয়। ইসট্রোজেন এবং প্রজেসটেরোন-এর প্রভাবেই মাসে মাসে অর্থাৎ ২৮ দিন অন্তর নিয়মিতভাবে এবং চক্রাকারে যে পরিবর্তন ঘটে তারই ফলে হয় মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাব।

গর্ভনালী (Fallopian tubes)

জরায়ুর দুদিক থেকে যে দুটো মাংসপেশির নালী ডিম্বাশয় পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে পরস্পরকে সংযুক্ত করেছে তাদের নাম গর্ভনালী। প্রত্যেকটি নালী আনুমানিক সাড়ে চার ইঞ্চি লম্বা। যৌবনের শুরুতে পিটুইটারি গ্রন্থির নিয়ন্ত্রণে মাসে একবার করে একটি পরিণত ডিম্বকোষ ওভারি থেকে বেরিয়ে এসে

ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে প্রবেশ করে ২৪ ঘণ্টা অবস্থান করে। যদি এই ডিম্বকোষটি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্পার্ম বা শুক্রাণুর দ্বারা নিষিক্ত না হয়, তবে তা নষ্ট হয়ে যায় এবং দুসপ্তাহ পর মাসিক শুরু হয়। যদি শুক্রাণু ডিম্বাণুটিকে নিষিক্ত করে, তবে এই নিষিক্ত ডিম্বাণু এক থেকে দুই দিনের মধ্যে জরায়ুতে প্রবেশ করে জরায়ুর পেছনে দেয়ালে প্রবেশ করে এবং বৃদ্ধি পেতে থাকে।

জরায়ু (Uterus)

জরায়ুর অবস্থান মেয়েদের তলপেটের মাঝামাঝি মূত্রাধার ও মল-নালীর মাঝখানে। এটি মেয়েদের সন্তান ধারণের থলি। সাধারণত জরায়ু তিন ইঞ্চি লম্বা হয়। তবে গর্ভবতী মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা সন্তান বৃদ্ধির সাথে সাথে আকারে বড় হতে থাকে। সন্তান প্রসবের পর এটা আস্তে আস্তে আগের অবস্থায় ফিরে আসে। জরায়ুর মূলকে বলা হয় সারভিক্স (Cervix)। এর ভেতরের গায়ে যে শ্লেষ্মাঝিলি (Mucous membrane) থাকে তাকে বলা হয় এন্ডোমেট্রিয়াম (Endometrium)।

উপসংহারে বলা যায়, সকল অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিকে সুস্থ রাখার জন্যে কোয়ান্টাম ব্যায়াম করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

প্রতিটি গ্ল্যান্ডের জন্যে সুনির্দিষ্ট আসনের তালিকা নিচে দেয়া হলো :

পিটুইটারির জন্যে : শশাঙ্গাসন, শীর্ষাসন, হস্তপদাসন

থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েডের জন্যে : সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, হলাসন, শশাঙ্গাসন

থাইমাসের জন্যে : শশাঙ্গাসন, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, জানুশিরাসন

সুপ্রারেনাল বা এড্রিনাল-এর জন্যে : ভুজঙ্গাসন, ধনুরাসন, অর্ধচন্দ্রাসন

জননগ্রন্থির জন্যে : ভদ্রাসন, ভুজঙ্গাসন, শশাঙ্গাসন, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন

মাসিক ঋতুচক্র

মাসিক ঋতুচক্র (Menstruation) মেয়েদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথমেই আমাদের জানা উচিত সাধারণত মেয়েরা কোন বয়সে ঋতুমতী বা সাবালিকা হয়ে থাকে।

সাধারণত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মেয়েরা একটু আগেই ঋতুমতী হয়ে থাকে। ১১ বছর থেকে শুরু করে ১৪ বছরের মধ্যেই বেশিরভাগ মেয়ের ঋতুচক্র শুরু হয়ে থাকে। আর ৪০ থেকে শুরু করে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত ঋতু চলতে পারে। তবে ৪০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যেই সাধারণত ঋতু বন্ধ বা মেনোপজ (Menopause) হয়ে থাকে। এ সময়টিও মেয়েদের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শীতপ্রধান দেশের মেয়েরা সাধারণত ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সে প্রথম ঋতুমতী হয়ে থাকে।

যদি কোনো কারণে দেখা যায় যে, ১৫ বছর বয়সের পরও কোনো মেয়ে ঋতুমতী হচ্ছে না, তাহলে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া উচিত।

আবার সন্তান ধারণের সময় মেয়েদের মাসিক বন্ধ থাকে–এটা স্বাভাবিক নিয়ম। যদি সন্তান ধারণকালে মাসিক শুরু হয়, তৎক্ষণাৎ একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত।

মাসিক সাধারণত ২৮ দিন অন্তর অন্তর হয়। কারো কারো ৩০/৩৫/৪০ দিন অন্তর হয়। সাধারণত চার/ পাঁচ দিন স্থায়ী থেকে বন্ধ হয়। কারো কারো ক্ষেত্রে তিন দিন হয়ে বন্ধ হয় আবার কারো ক্ষেত্রে সাত দিন হয়ে বন্ধ হয়। চার/ পাঁচ দিন স্থায়ী ঋতুই স্বাভাবিক বলে ধরা হয়।

ঋতুচক্র শুরুর কারণ

কৈশোর থেকে যখন কোনো মেয়ে নারীত্বে পদার্পণ করে তখন কিছু শারীরিক-মানসিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আর এর পেছনে রয়েছে পিটুইটারি গ্রন্থি। এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন অন্যান্য গ্রন্থিগুলোকে সক্রিয় ও নিয়ন্ত্রণ করে। তাই কৈশোরের শেষে পিটুইটারির পরিচালনায় থাইরয়েড, ওভারি গ্রন্থিগুলোর কার্যকলাপ শুরু হয়। ওভারির অপরিণত ডিম্বকোষগুলো এ

সময় পরিণত হয়ে ওঠে এবং তারা ইসট্রোজেন নামে এক প্রকার হরমোন নিঃসৃত করে। এ হরমোনের প্রভাবে মেয়েদের মধ্যে নারীসুলভ লাবণ্য লক্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং মেয়েদের যৌন অঙ্গাদি ঠিকভাবে গঠিত হয়।

যৌবনের শুরুতে পিটুইটারির নিয়ন্ত্রণে মাসে একবার করে একটি পরিণত ডিম্বকোষ ওভারি থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং গর্ভনালীতে প্রবেশ করে। এটি ঘটে ঋতুচক্রের ১০/১৫ দিনের মধ্যে।

ডিম্বকোষটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ওভারিতে সৃষ্টি হয় একটি হলুদ রঙের তরল পদার্থ। এ থেকেই 'প্রজেসটেরোন' নামে এক প্রকার হরমোন নিঃসৃত হয়ে জরায়ুর বৃদ্ধি ও নিয়মিত মাসিকের সূত্রপাত ঘটায়।

জরায়ুর ভেতরের গায়ে শেষ্মা ঝিলির আবরণে 'ইসট্রোজেন' ও 'প্রজেসটেরোনের' সম্মিলিত ক্রিয়া শুরু হয়। সেই ঝিলির বিবর্তনের ফল ঋতুস্রাব। ইসট্রোজেন ও প্রজেসটেরোনের প্রভাবেই ২৮ দিন অন্তর চক্রাকারে পরিবর্তনের ফলে হয় নিয়মিত মাসিক ঋতুস্রাব।

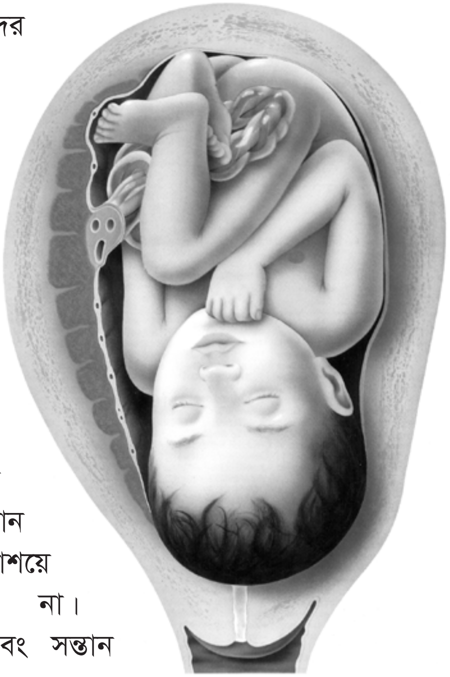

তবে সন্তানসম্ভবা মেয়েদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটে। যৌন মিলনের পর পুরুষের শুক্রাণু ডিম্বকোষটির সঙ্গে মিলিত হলে ডিম্বকোষের সে অবস্থাকে বলা হয় 'নিষিক্ত ডিম্বাণু' (fertilized ovum)। সাধারণত শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটে ফেলোপিয়ান টিউবের মধ্যে এবং সেখান থেকে নিষিক্ত ডিম্বাণুটি চলে যায় জরায়ুতে এবং ২৮০ দিন থাকার পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এসময়ের মধ্যে ডিম্বাশয়ে আর ডিম্ব প্রস্তুত হয় না। ফলে ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে এবং সন্তান বৃদ্ধির কাজ চলতে থাকে।

মাসিকপূর্ব লক্ষণ

মাসিক বা ঋতুচক্র শুরু হওয়ার পূর্বে দুধরনের সমস্যা (Pre-Menstrual Symptoms) দেখা যেতে পারে। এগুলো হচ্ছে :

ক. শারীরিক লক্ষণ
খ. মানসিক লক্ষণ

শারীরিক লক্ষণ

১. মাসিক শুরু হওয়ার দুই/ একদিন পূর্বে অথবা মাসিক চলাকালীন মাথাব্যথা
২. পিঠে ব্যথা
৩. পেটে ব্যথা
৪. মাথা ঝিমঝিম ভাব
৫. সাইনুসাইটিস
৬. একনি বা মুখে ব্রণ
৭. স্তন ভারী লাগা বা স্তনে ব্যথা
৮. পায়ের গোড়ালির গাঁটে ব্যথা
৯. হাঁটু, উরু ইত্যাদির ব্যথা
১০. খাবারে অরুচি
১১. কোমরে ব্যথা

মানসিক লক্ষণ

১. হঠাৎ আচরণ পরিবর্তন
২. টেনশন
৩. অস্বস্তিবোধ
৪. বিষণ্নতা বা কান্নাকান্না ভাব
৫. মনোযোগের অভাব
৬. আলস্য ভাব
৭. অল্পে রেগে যাওয়া
৮. চুপচাপ বসে থাকা

ঋতু সংক্রান্ত সমস্যা

ক. বাধক বেদনা (Dysmenorrhoea)

এটা মাসিক শুরু হওয়ার দুই/ একদিন পূর্বে হতে পারে অথবা মাসিক চলাকালীন নিচের পেটে প্রচণ্ড ব্যথা অথবা হালকা হালকা ব্যথা অনুভব হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মাসিক শুরু হয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় দিন উপযুক্ত পরিমাণে স্রাবের পর ব্যথার উপশম হতে দেখা যায়। কারো কারো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা দিতে পারে। যেমন : জরায়ু বাঁকা, জরায়ুতে টিউমার, ক্যান্সার ইত্যাদি কারণেও ব্যথা হতে পারে। এক্ষেত্রে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণের পর ব্যায়াম করা উচিত। বাধক বেদনার কারণ :

১. গৃহবন্দি জীবনযাপন
২. অতৃপ্ত কামনাবাসনা
৩. অসংযমী জীবনযাপন
৪. সুষম খাদ্যের অভাব
৫. কোষ্ঠকাঠিন্য
৬. অজীর্ণ
৭. মানসিক অস্থিরতা
৮. যৌনাঙ্গের গঠনের গোলমাল

বাধক বেদনা থেকে নিরাময়ের ব্যায়াম

১. শশাঙ্গাসন	২. ভদ্রাসন	৩. ভুজঙ্গাসন
৪. সর্বাঙ্গাসন	৫. মৎস্যাসন	৬. বিপরীত করণীতে অশ্বিনীমুদ্রা

খ. অনিয়মিত মাসিক ঋতু

মেয়েদের স্রাব বা মাসিক সাধারণত ২৮ দিন অন্তর হয়ে থাকে এবং চার/ পাঁচ দিন স্থায়ী থেকে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। কারো কারো ক্ষেত্রে এর অনিয়ম দেখা যায়। যেমন কারো সাত দিন থাকে। কারো তিন দিন থাকে। আবার কারো ৩০/৩৫/৪০ দিন পার হয়েও অনিয়মিতভাবে ঋতুস্রাব হয়ে

থাকে। আবার কারো কারো ১৫ দিন পর পর হতে দেখা যায়। আবার কারো ১৫/২০ দিন বন্ধ থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব হতে পারে। রক্তের রং কালচে চাক চাক হয়ে থাকে। তখন তলপেটে ব্যথা এবং খাবারে অরুচি সৃষ্টি হয়।

অনিয়মিত ঋতুচক্র নিরাময়ে ব্যায়াম

১. হস্তপদাসন ২. শশাঙ্গাসন ৩. ভদ্রাসন ৪. ভুজঙ্গাসন
৫. পশ্চিমোত্তানাসন ৬. সর্বাঙ্গাসন ৭. মৎস্যাসন

এর সাথে প্রোটিনযুক্ত খাবার, প্রচুর পানি পান, শাকসবজি, টাটকা ফলমূল বেশি খেতে হবে। আয়রন ট্যাবলেট/ ক্যাপসুল খাওয়া যেতে পারে। যদি যৌন রোগ থাকে, যেমন : সিফিলিস, গনোরিয়া বা কোনো জীবাণুঘটিত রোগ, তাহলে ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধও খেতে হবে।

গ. বিলম্বিত মাসিক

মাসিক একবার শুরু হলে তা ২৮ দিন অন্তর হওয়াই স্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্যসম্মত। অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা দিতে পারে। যেমন : ৩০/৩৫/৪০ দিন পরও হতে দেখা যায়। একে বলে বিলম্বিত মাসিক।

বিলম্বিত মাসিকের কারণ :

১. হরমোন সমস্যা ২. রক্তশূন্যতা ৩. পুষ্টির অভাব

মূলত হরমোন সমস্যাই এর প্রধান কারণ হিসেবে দেখা যায়।

লক্ষণ : দেরিতে মাসিক দেখা দিলে স্রাবের পরিমাণ বেশি হতে পারে। হঠাৎ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। স্তনে, তলপেটে ব্যথা, ঊরু ভারীবোধ হওয়া, ক্লান্তি অনুভব, শরীর মোটা হয়ে যাওয়া অথবা রোগা হয়ে যাওয়া; এর সাথে আরো উপসর্গ, যেমন : অরুচি, মাথাধরা, শরীর ম্যাজম্যাজ করা ইত্যাদি শারীরিক সমস্যা হতে পারে।

বিলম্বিত ঋতুচক্র নিরাময়ের ব্যায়াম

১. শশাঙ্গাসন ২. ভদ্রাসন ৩. ভুজঙ্গাসন
৪. হলাসন ৫. সর্বাঙ্গাসন ৬. মৎস্যাসন

ঘ. অধিক স্রাব (Menorrhagia)

অধিক স্রাব জরায়ু সংক্রান্ত একটি প্রধান রোগ। এটি নানান কারণে হতে পারে। যেমন :

১. হরমোন সমস্যা
২. জরায়ু বা যোনির ভেতর থেকে রক্তস্রাব হয়
৩. জরায়ুর স্থানচ্যুতি
৪. জরায়ু বা যোনিপথে টিউমার
৫. বার বার গর্ভপাত
৬. জরায়ুতে ক্যান্সার

এছাড়া অনেকের জরায়ু ও ডিম্বাশয়ে প্রদাহ হয়, এমনকি পুঁজও জন্মে। এর জন্যে ব্যথার সৃষ্টি হয়। এসব ক্ষেত্রে তলপেটে রক্ত চলাচল যাতে ভালোভাবে হয় তার জন্যে তলপেটে চাপ পড়ে এমন সব ব্যায়াম নিয়মিত করা দরকার। যদি অন্য কোনো রোগ ছাড়া শুধু হরমোনগত কারণে এ রোগ হয়ে থাকে তাহলে ব্যায়ামের মাধ্যমেই এ রোগ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। হরমোন সংক্রান্ত সমস্যায় ওষুধ খেলে তেমন কোনো ফল পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে কোয়ান্টাম ব্যায়ামই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এটা পরীক্ষিত ও প্রমাণিত।

তাই একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শে আপনার শারীরিক সমস্যা জেনে নেয়ার পর ব্যায়াম করতে পারেন। প্রয়োজনে ওষুধও খেতে পারেন।

অধিক স্রাব নিরাময়ের ব্যায়াম

১. শশাঙ্গাসন ২. ভদ্রাসন ৩. অর্ধকূর্মাসন ৪. পবনমুক্তাসন
৫. ভুজঙ্গাসন ৬. সর্বাঙ্গাসন ৭. মৎস্যাসন

এছাড়া ভিটামিন সমৃদ্ধ কাঁচা ফলমূল, সবজি প্রচুর পরিমাণে খেতে হবে। প্রতিদিন ছোট এক বাটি সালাদ ও চার/ পাঁচটি লেবু খাবারের সাথে খেতে হবে। লেবুতে ভিটামিন সি রয়েছে—এক্ষেত্রে যা অত্যন্ত উপকারী।

ব্যায়াম প্রশিক্ষণ ও গবেষণায় ২২ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, শুধু তিন জন রোগী পেয়েছি যাদের জীবনের প্রথম মাসিক শুরু হয়ে কোনো দিনই তা আর বন্ধ হয় নি। রোগিণীকে সবসময় হরমোন পিল অর্থাৎ বার্থ কন্ট্রোল পিল খেয়ে মাসিক বন্ধ রাখতে হতো। ওষুধ ছেড়ে দিলে সাথে সাথেই শুরু হতো। প্রথম জনের বয়স তখন ১৯/২০ বছর। এক পর্যায়ে

হরমোন ওষুধ খেতে খেতে তার নানান সমস্যা দেখা দিল। দেশে-বিদেশে প্রচুর ডাক্তার দেখিয়েও কোনো ফল পায় নি বলে শেষ পর্যন্ত এলো যোগ ব্যায়াম করতে। আমি তার কথা শুনে বুঝেছিলাম হরমোন সমস্যা। আমি তাকে মাত্র ছয়টি ব্যায়াম এবং প্রতিদিন এক বাটি সালাদ এবং ছয়টি লেবু খেতে দিয়েছিলাম। আলাহর অসীম করুণায় সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়েছিল মাত্র ছয় মাস নিয়মিত দুবেলা ব্যায়াম করে ও খাবার খেয়ে। তার যেহেতু সবসময়ই পিরিয়ড হতো তাই প্রথম দিকে পিল খেয়ে মাসিক বন্ধ রেখে ব্যায়াম করতে হয়েছিল, কেননা মাসিকের সময় ব্যায়াম করা নিষেধ। পরবর্তীতে পিল না খেয়েই সে ব্যায়াম করতে পেরেছিল। তবে তিন মাস পর পিল ছেড়ে দেয়ায় দেখা গেল, মাসিক ১৩ দিন বন্ধ থেকে আবার শুরু হয়েছে। তারপর আবার পিল খেয়ে পিরিয়ড বন্ধ রেখে পুনরায় ব্যায়াম শুরু করল। পাঁচ মাস পার হওয়ার পর দেখা গেল, আর মাসিক হচ্ছে না। যেখানে ওষুধ ছেড়ে দিলেই সাথে সাথে তার মাসিক শুরু হতো সেখানে ব্যায়ামের পর অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ছয় মাস পর থেকে ২৮ দিনের ঋতুচক্র ঠিকমতো শুরু হয়েছে। মেয়েটি ছিল অবিবাহিতা এবং তাকে বলেছিলাম, সারাজীবন যেন ঐ ছয়টি ব্যায়াম করে–অন্ততপক্ষে যত দিন মেনোপজ না হয়। ব্যায়ামগুলো ছিল :

১. শশাঙ্গাসন : পাঁচ বার ১০ সেকেন্ড করে
২. ভদ্রাসন : পাঁচ বার ২০ সেকেন্ড করে
৩. ভুজঙ্গাসন : পাঁচ বার ১০ সেকেন্ড করে
৪. সর্বাঙ্গাসন : তিন বার ১০ সেকেন্ড করে
৫. মৎস্যাসন : একবার এক মিনিট
৬. শীর্ষাসন : দুই থেকে তিন মিনিট

প্রতিদিন দুই বেলা একবাটি করে সালাদ ও ছয়টি কাগজিলেবু খাবারের সাথে খেতে বলেছিলাম।

ঙ. কম মাসিক হওয়া বা অল্পরজঃ (Oligomenorrhoea)

যাদের মাসিক বা ঋতু শুরু হওয়ার পর সঠিক পরিমাণে না হয়ে অল্প পরিমাণে স্রাব হয়, তাকে অল্পরজঃ বলে। এসময়ে নিচের পেটে ব্যথা থাকতে পারে। আবার কারো কারো ক্ষেত্রে ব্যথা না-ও হতে পারে। আবার একদিন

মাসিক হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। কারো কারো ক্ষেত্রে ঠিক সময়ে মাসিক শুরু হয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে আসে এবং বেশ কয়েকদিন, যেমন আট/ দশ দিনও হতে পারে। নানা কারণে এ রোগ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে। রোগী দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে যেতে পারে। ক্লান্তিবোধ, মাথা ঝিমঝিম করা, মেজাজ খিটখিটে হওয়া, সব কিছুতে অসহ্য লাগা, একা একা থাকতে ভালো লাগা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বি.দ্র. *: গর্ভাবস্থায় যদি কারো এরকম ফোঁটা ফোঁটা রক্ত যাওয়া দেখা দেয়, তাহলে অবশ্যই স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে ব্যায়াম করা উচিত। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিষেধ করলে অবশ্যই ব্যায়াম করবেন না।*

কম মাসিক বা অল্পরজঃ হওয়ার কারণ

১. প্রধান কারণ হরমোনের অভাব অথবা হরমোন নিঃসরণের ক্ষেত্রে অনিয়ম
২. জরায়ু বা ডিম্বাশয়ে কোনো কারণে প্রদাহ
৩. যৌনরোগ, যেমন : সিফিলিস, গনোরিয়া জাতীয় রোগে আক্রান্ত হওয়া
৪. ডিম্বাশয়ের জন্মগত ত্রুটি
৫. দেহে রক্তশূন্যতা অথবা অত্যধিক চর্বি হলে জরায়ু ও ডিম্বাশয়ের পাশে চর্বি জমে। এর ফলেও মাসিক কম হয়।
৬. অপুষ্টি ইত্যাদি কারণে মাসিক কম হতে দেখা যায়।

কম মাসিক হওয়া থেকে নিরাময় ও সঠিকভাবে হওয়ার ব্যায়াম

১. শশাঙ্গাসন ২. ভদ্রাসন ৩. ভুজঙ্গাসন ৪. সর্বাঙ্গাসন
৫. মৎস্যাসন ৬. উষ্ট্রাসন ৭. লেগ সার্কেলিং

এছাড়াও যারা অত্যধিক মোটা তারা সঠিক নিয়মে ডায়েট করে শর্করা জাতীয় খাবার কম খেয়ে নিয়মিত ব্যায়াম করে শরীরের ওজন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারেন।

যারা রক্তশূন্যতায় ভুগছেন তারা প্রোটিন জাতীয় খাবার, টাটকা তরকারি, ফলমূল, মুরগির স্যুপ, আয়রন সমৃদ্ধ খাবার এবং ডাক্তারের পরামর্শে আয়রন ক্যাপসুল খেতে পারেন। তবে এ রোগ থেকে চিরতরে মুক্ত হতে চাইলে নিয়মিত কোয়ান্টাম ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

চ. শ্বেতপ্রদর (Leucorrhoea)

মেয়েদের জরায়ু ও যোনিনালীর ঝিলির নিচে ফোসকার মতো ছোট ছোট গ্রন্থি আছে। এসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসে যোনিনালী ভেজানো থাকে। যার ফলে বাইরের জীবাণু সহজে আক্রমণ করতে পারে না। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তখনই, যখন কোনো কারণে ঐ গ্রন্থি থেকে রস বেশি পরিমাণে নিঃসৃত হয়। এই বেশি পরিমাণ রস নিঃসৃত হওয়াকেই শ্বেতপ্রদর বলে।

শ্বেতপ্রদরের কারণ

১. বাইরের ময়লা রোগ-জীবাণু ঢুকে এ রোগ সৃষ্টি হতে পারে।
২. নোংরা প্যাড কিংবা নোংরা কাপড় ব্যবহার করলে।
৩. রক্তস্রাব বন্ধ হলে বা মাসিক কমে গেলে জরায়ুর ক্রিয়া কমে যায়। তখন সাদাস্রাব বেশি হয়।

***বি.দ্র.** : সাদাস্রাব বেশি হলে দুর্বল লাগা, মাথা ঝিমঝিম করা, চোখে ঝাপসা লাগা, খাবারে অরুচি ইত্যাদি হয়ে থাকে। এর থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে হলে ব্যায়াম করা প্রত্যেক মেয়েরই কর্তব্য।*

শ্বেতপ্রদর নিরাময়ের ব্যায়াম

১. ভদ্রাসন	২. ভুজঙ্গাসন	৩. ধনুরাসন	৪. শশাঙ্গাসন
৫. পবনমুক্তাসন	৬. শলভাসন	৭. পশ্চিমোত্তানাসন	৮. জানুশিরাসন

ছ. স্রাব বন্ধ (Menopause)

মেয়েদের সাধারণত স্বাভাবিক নিয়মেই ৪০ থেকে শুরু করে ৫০ বছর বয়সের মধ্যে মাসিক বন্ধ হয়ে যায়। এটা কোনো রোগ নয়। প্রাকৃতিক নিয়মেই যেমন নির্দিষ্ট বয়সে মেয়েরা সাবালিকা হয়ে থাকে তেমনি প্রাকৃতিক নিয়মেই নির্দিষ্ট বয়সে ঋতু বন্ধ হয়ে যায়। দুটো সময়ই মেয়েদের জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে এসময় কিছু উপসর্গ হয়ে থাকে। মাথার তালু জ্বালা অনুভব হয়। অনিয়মিত ঋতুস্রাব হয়। কারো কারো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও দেখা যায়, যেমন : ৫০ বছর পরেও ঠিকমতো মাসিক হয়ে যাচ্ছে আবার কারো কারো ক্ষেত্রে ৪০ বছর না হতেই মেনোপজের লক্ষণ দেখা দেয়। আর এর ফল হিসেবে দেখা দেয় নানা উপসর্গ : কানে সোঁ সোঁ শব্দ, হাত-পা ঝিমঝিম,

কোমরে-পিঠে ব্যথা, হজমে অসুবিধা, কোষ্ঠকাঠিন্য, কখনো কখনো স্রাব খুব বেশি হতে পারে। এমন হলে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। কখনো পাঁচ/ছয় মাস পরেও স্রাব হতে পারে। চেহারায় রুক্ষভাব আসতে পারে। যে-সব মহিলা মেনোপজকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে চান না তাদের ক্ষেত্রে মানসিক জটিলতা দেখা দেয়। যেমন : স্বামীর সঙ্গে সহবাস হয়তো পূর্বের মতো হবে না–এই হীনম্মন্যতায় ভোগা, বুড়ি হয়ে গেছি, আমার প্রয়োজন বোধ হয় স্বামীর কাছে নেই ইত্যাদি ভাবা, ক্লান্তি-অবসাদ অনুভব করা, নিজেকে অসহায় ভাবা, অল্পে রেগে যাওয়া ইত্যাদি নানা মানসিক অবস্থার শিকার হতে পারেন।

স্রাব বন্ধের (Menopause) কারণ

মেয়েদের জীবনে কমবেশি সবার ক্ষেত্রেই ৪০ বছর পার হলেই স্ত্রী হরমোন (ইসট্রোজেন) নিঃসরণ কম হতে থাকে। কয়েক বছর পর একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। আবার পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ঐ সময় গোনাডোট্রাপিন নামক এক প্রকার হরমোন নিঃসরণ বাড়তে থাকে; তার ফলে ঋতু বন্ধ হয়ে যায়।

প্রকৃতির এই স্বাভাবিক নিয়ম সব মেয়েরেই মেনে নেয়া উচিত। এতে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই।

দেহের সঠিক মাপ

দেহের সঠিক মাপ বা Perfect body measurement নিয়ে পাশ্চাত্যে বাড়াবাড়ির শেষ নেই। দেহের মাপ ও অনুপাতের চেয়ে সুস্থ, কমনীয় ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দেহই হচ্ছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবুও এ ব্যাপারে পাশ্চাত্যে প্রচলিত মাপ ও চার্ট নিচে দেয়া হলো :

১. **বুক (Bust)**

১০ থেকে ১২ ইঞ্চি বেশি হবে কোমর থেকে। অর্থাৎ কোমর যা হবে তার থেকে বুক ১০/১২ ইঞ্চি বেশি হবে।

২. **কোমর (Waist)**

বুক এবং নিতম্বের চেয়ে ১০/১২ ইঞ্চি ছোট হবে। অর্থাৎ নিতম্ব এবং বুকের মাপ যত হবে তার থেকে ১০/১২ ইঞ্চি কম হবে কোমরের মাপ।

৩. **নিতম্ব (Hip)**

নিতম্বের উঁচু অংশের থেকে ফিতা দিয়ে মাপলে সেটা সাধারণত বুকের মাপ অথবা তার থেকে দুই/ তিন ইঞ্চি বেশি হতে পারে।

৪. **ঊরু (Thigh)**

ঊরুর চওড়া অংশ ২১ ইঞ্চি থেকে ১৮ ইঞ্চির মধ্যে হওয়া উচিত।

৫. **হাঁটু (Knee)**

ঊরু থেকে ছয় ইঞ্চি কম থাকতে হবে। অর্থাৎ ঊরু যা হবে তার থেকে ছয় ইঞ্চি ছোট হবে হাঁটুর মাপ।

৬. **কাফ মাস্‌ল (Calf)**

হাঁটুর পরে পায়ের যে অংশে একটু মোটা মাস্‌ল রয়েছে তাকে কাফ মাস্‌ল বলে। এটা ঊরুর মাপের থেকে সাত ইঞ্চি ছোট হবে।

৭. **এংকেল (Ankle)**

কাফ মাস্‌লের চেয়ে সাড়ে চার বা পাঁচ ইঞ্চি ছোট হবে এংকেলের মাপ।

যিনি যত মোটা কিংবা পাতলা হোন না কেন, আনুপাতিক মাপ থাকলে দেখতে সুন্দর লাগবে। সাধারণত উচ্চতা অনুসারেও ওজন মাপ হয়ে থাকে।

উচ্চতা অনুসারে দেহের ওজন সারণি ॥ মহিলা

ফুট	মিটার	হালকা	মাঝারি	চওড়া
		কেজি		
৪′৮″	১.৪২	৪২.৩	৪৫	৪৯.৫
৪′৯″	১.৪৪	৪৩.৩	৪৫.৯	৫০.৯
৪′১০″	১.৪৭	৪৪.৫	৪৭.৭	৫২.২
৪′১১″	১.৫০	৪৫.৯	৪৮.৬	৫৩.৬
৫′	১.৫২	৪৬.৮	৪৯.৫	৫৫.০
৫′১″	১.৫৬	৪৮.৬	৫০.৯	৫৬.৪
৫′২″	১.৫৮	৫০.০	৫২.৭	৫৭.৭
৫′৩″	১.৬১	৫০.৯	৫৫.০	৫৯.৫
৫′৪″	১.৬৩	৫২.৭	৫৬.৮	৬১.৩
৫′৫″	১.৬৬	৫৪.৬	৫৮.৬	৬৫.০
৫′৬″	১.৬৮	৫৬.৪	৬০.৫	৬৬.৩
৫′৭″	১.৭১	৫৮.৬	৬২.৩	৬৮.৫
৫′৮″	১.৭৩	৬০.৫	৬৪.১	৭০.৮
৫′৯″	১.৭৬	৬১.৭	৬৫.৯	৭২.৬
৫′১০″	১.৭৮	৬৩.১	৬৭.৭	৭৩.৬
৫′১১″	১.৮১	৬৪.১	৬৮.৭	৭৪.৬

উচ্চতা অনুসারে দেহের ওজন সারণি ॥ পুরুষ

ফুট	মিটার	হালকা	মাঝারি	চওড়া
		কেজি		
৫′১″	১.৫৬	৫১.৮	৫৫.০	৫৯.১
৫′২″	১.৫৮	৫৩.৬	৫৬.৮	৬০.৯
৫′৩″	১.৬১	৫৫.০	৫৭.৭	৬২.৩
৫′৪″	১.৬৩	৫৫.৯	৫৯.৫	৬৩.৬
৫′৫″	১.৬৬	৫৭.৩	৬০.৯	৬৭.৭
৫′৬″	১.৬৮	৫৯.১	৬২.৩	৬৯.৫
৫′৭″	১.৭১	৬০.৯	৬৫.০	৭১.৮
৫′৮″	১.৭৩	৬২.৭	৬৬.৮	৭৩.২
৫′৯″	১.৭৬	৬৪.৮	৬৮.৬	৭৫.৯
৫′১০″	১.৭৮	৬৬.৮	৭০	৭৬.৯
৫′১১″	১.৮১	৬৭.৮	৭২	৭৭.৯
৬′	১.৮৪	–	৭৩	৭৮.৭
৬′১″	১.৮৬	–	৭৪.৫	৮০.৪
৬′২″	১.৮৯	–	৭৬.৬	৮২.৩
৬′৩″	১.৯১	–	৮০.৯	৮৬.৪

আহার

সুষম খাবারই প্রতিটি মানুষের খাওয়া উচিত। অতিরিক্ত তেল, চর্বি, মসলা বেশি মাত্রায় প্রোটিন ইত্যাদি খাবার মানুষের শরীরের জন্যে ক্ষতিকর। সুষম খাবার বলতে বোঝায়–যে খাবারে থাকবে শর্করা প্রোটিন,স্নেহপদার্থ ভিটামিন মিনারেল বা খনিজ পদার্থ ইত্যাদি।

১. মানুষের জন্যে খাবার পরম করুণাময়ের নেয়ামত। তাই খাবার শুরুতে তাঁর নাম নিয়ে খাওয়া শুরু করুন। তাড়াহুড়ো করে, অন্যমনস্কভাবে খাওয়া ঠিক নয়। খাবার সময় ভাবুন–যে খাবার খাচ্ছেন তা আপনার শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগান দেবে। সঠিকভাবে সব হজম হবে। বিরক্তি নিয়ে কোনো খাবার খাবেন না। খাবার সময় মনে মনে বলুন, যা খাব মজা করে খাব, যা খাব সব হজম হবে।

২. খাওয়ার জন্যে বাঁচা নয়, বাঁচার জন্যে খাবার গ্রহণ করুন। খাওয়ার জন্যে বাঁচতে চাইলে খাবার মৃত্যু ডেকে আনবে, আর বাঁচার জন্যে খেলে খাবার আপনাকে প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত করবে।

৩. প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়ার অভ্যাস করুন।

৪. রাতে খাবার খেয়ে সাথে সাথে শুয়ে পড়বেন না, কমপক্ষে ১০ মিনিট বজ্রাসনে বসুন। একটু হাঁটুন।

৫. খাদ্যবস্তু ভালো করে চিবিয়ে খাবেন। এতে হজম ভালো হবে।

৬. কখনো খাবার অপচয় করবেন না। যতটুকু খেতে পারবেন ততটুকুই পেটে নিন।

৭. খাবারের মধ্যে পানি পান করা উচিত নয়। খাওয়ার আধ ঘণ্টা পর পানি পান করুন।

৮. নবীজী (স)-এর নির্দেশ অনুসারে পাকস্থলীর একভাগ খাবার, একভাগ পানি আর একভাগ ফাঁকা রাখুন।

৯. খিদে অনুভব না করলে খাবার খাবেন না। একটু খিদে রেখেই খাবার শেষ করবেন।

১০. সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে কুলি করুন। তারপর খালি পেটে এক গ্লাস (প্রয়োজনে চার গ্লাস হতে পারে) পানি পানের অভ্যাস করুন। এতে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হবে, সহজে পেটের কোনো পীড়া হবে না।

১১. অতিরিক্ত পরিশ্রম করে এসেই খাবার খাবেন না। মুখ-হাত ধুয়ে পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে তারপর খান।

১২. খালি পেটে কফি বা চা পান করবেন না। এটি স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর।

১৩. দৈনন্দিন খাবার তালিকায় মাছ ও গোশতের পরিমাণ সীমিত রাখুন। করলা বাঁধাকপি ডাঁটা লালশাক পুঁইশাক সজনেসহ মৌসুমি ও আঁশজাতীয় সবজি পর্যাপ্ত পরিমাণে খান। আধা সেদ্ধ শাকসবজি সহজে হজম হয়।

১৪. সামুদ্রিক মাছ খাওয়ার অভ্যাস করুন।

১৫. মসুর মুগ মাশ বুট মটর অড়হরসহ যে-কোনো ডাল প্রতিদিনের খাবারে পরিমিত রাখুন। রাতে মসুর ডাল না খাওয়া ভালো।

১৬. ঘন ডালের চেয়ে পাতলা ডালে উপকার বেশি।

১৭. **পুষ্টিগুণ বজায় রাখতে মাড়সহ ভাত রান্না করুন। শাকসবজি ভালোভাবে ধুয়ে তারপর কাটুন।**

১৮. নিয়মিত মাশরুম খান। প্রোটিন, খনিজ উপাদান ও ভিটামিন বি-১ সমৃদ্ধ এ সবজি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, হৃদরোগ ও ম্যালেরিয়ার ঝুঁকি কমায়।

১৯. **প্রতিদিন ৫/১০ গ্রাম স্পিরুলিনা খান। প্রচুর প্রোটিন, বিটা কেরোটিন ও লৌহ সমৃদ্ধ এ খাবার দেহকোষকে প্রাণবন্ত করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।**

২০. নিয়মিত সব ধরনের বাদাম খাওয়ার অভ্যাস করুন।

২১. দেশীয় মৌসুমি ফল পর্যাপ্ত খান। মৌসুমি ফল সে মৌসুমের রোগব্যাধির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

২২. বর্ষাকালে বা যখনই বাজারে আনারস ওঠে তখন থেকেই নিয়মিত খাওয়া শুরু করুন। ফ্লু থেকে মুক্ত থাকবেন।

২৩. ঠান্ডা-সর্দি থেকে রেহাই পেতে শীতকাল আসার আগেই প্রতিদিন জাম্বুরা খাওয়ার অভ্যাস করুন।

২৪. শীতকালে নিয়মিত পালংশাক টমেটো ব্রোকোলি ও গাজর খান। গরমের দিনে সকালে ও দুপুরে শসা বা ক্ষীরা খান। শসা-ক্ষীরা রাতে খাবেন না।

২৫. প্রতিদিন খাবারে সালাদ খান। সালাদে লেটুস ক্যাপসিকাম টমেটো শসা গাজর ধনেপাতা পুদিনাপাতা ও লাল বাঁধাকপি ব্যবহার করুন।

২৬. রাতে চর্বিদার-গুরুপাক খাবার (গরু-খাসি-পাঁঠার মাংস, বিরিয়ানি/ কাচ্চি) গ্রহণ এবং খেয়েই শুয়ে পড়া দুঃস্বপ্ন বা হার্ট অ্যাটাকের কারণ হতে পারে।

২৭. খাবারে অতিরিক্ত মশলা, টেস্টিং সল্ট, ঝাল ও ভাজাপোড়া বর্জন করুন। রেস্তোরাঁ ও বাইরের খাবার যত কম খাবেন তত ভালো।

২৮. যাদের ওজন বেশি তারা তেলেভাজা খাবার এবং আইসক্রিম চকলেট কেক বিস্কুট পরিহার করুন।

২৯. যারা মোটা তারা বিকেলের নাশতার পর্ব পরিহার করুন।

৩০. ভাতের বিকল্প হিসেবে মাঝেমধ্যে আলু খান। বিশেষত শিশুকে খাওয়ান। এতে দেহের পুষ্টি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ার সাথে সাথে রং উজ্জ্বল হবে, উচ্চতাও বাড়বে।

৩১. দুধ-চায়ের পরিবর্তে শুধু লিকার চা বা সবুজ চা পান করুন।

৩২. সাদা চিনির পরিবর্তে ব্রাউন সুগার বা গুড় খাওয়ার অভ্যাস করুন।

৩৩. যারা দিনে চার/ পাঁচ বার চা পান করেন তারা শুধু দুবার চায়ে মিষ্টি নিন; বাকি সব বার মিষ্টি ছাড়া চা পান করুন।

৩৪. দেহের রেচন প্রক্রিয়াকে স্বাভাবিক রাখতে প্রতিদিন কমপক্ষে ছয় গ্লাস বা দেড় লিটার পানি পান করুন। প্রচুর শাক ও আঁশযুক্ত সবজি খান।

৩৫. প্রত্যেকবার খাওয়ার পর দাঁত ভালো করে পরিষ্কার করুন। তাহলে দাঁতে ক্যারিজ হবে না।

৩৬. গরম কোনো খাবার বা পানীয় খেয়েই সাথে সাথে ঠান্ডা খাবার বা পানীয় খাওয়া উচিত নয়, এতে দাঁতের ক্ষতি হয়।

৩৭. সকালে ভরপেট নাশতা করুন, দুপুরে তৃপ্তির সাথে খান আর সন্ধ্যার পর পরই রাতের হালকা খাবার গ্রহণ করুন।

৩৮. সপ্তাহে অথবা ১৫ দিনে একদিন রোজা বা উপবাস করতে পারেন।*

৩৯. সেহরিতে সামান্য সবজি-ভাত কিংবা খেজুর-কলা খান। প্রোটিন জাতীয় খাবার পানির তৃষ্ণা বাড়ায় বলে তা পরিহার করুন। ভাজাপোড়া বাদ দিয়ে শুধু খেজুর-পানি দিয়ে ইফতার করুন। মাগরিবের নামাজের পর রাতের খাবার (মাছ-মাংস-ডালসহ অন্যান্য সুষম খাবার) খেয়ে নিন। এ খাদ্যাভ্যাস পুরো রমজানে আপনাকে সারাদিন ঝরঝরে রাখবে, পানির তৃষ্ণা কম হবে।

৪০. শিশুকে ফর্মুলা ফুড, ইনস্ট্যান্ট নুডলস একেবারেই খাওয়াবেন না। নিয়মিত বিশেষ কোনো ব্র্যান্ডের চিপস-চকলেট-আইসক্রিম খেতে নিরুৎসাহিত করুন। ছোটবেলা থেকে তাকে চা পানে অভ্যস্ত করে তুলবেন না।

৪১. ফাস্ট ফুড, জাংক ফুড, প্রক্রিয়াজাত ও প্যাকেটজাত কৃত্রিম খাবারে রয়েছে কালার, ফ্লেভার, টেস্টার এবং এডিক্টিভ উপাদান। নিয়মিত এসব খাবার গ্রহণ শরীরের মেদ বৃদ্ধি ছাড়াও ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। হাড়, দাঁত ও চোখের জটিলতা, এমনকি কিডনি ও মূত্রাশয়ের ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ হতে পারে।

৪২. ধূমপান, মাদকদ্রব্য, পান-বিড়ি-সিগারেট ও সব ধরনের কোমল পানীয় ও এনার্জি ড্রিংকস থেকে নিজেকে পুরোপুরি মুক্ত রাখুন।

** সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন কঠোরভাবে খাবার নিয়ন্ত্রণের চেয়ে একদিন স্বাভাবিক খাওয়াদাওয়া এবং তার পরদিন কিছুই না খাওয়া–এরকম অভ্যাস অনেক ভালো ফল দিতে পারে। আর এর কারণ হচ্ছে 'সবিরাম উপবাস' দেহে প্রোটিনের উৎপাদন বাড়িয়ে ব্রেনসেলের ক্ষয় রোধ করে এবং নার্ভসেলের উৎপাদন বাড়ায়। যার ফলে স্ট্রোক, আলঝেইমার, হান্টিংটন বা পার্কিনসন্সের মতো ব্রেনের বয়সজনিত রোগগুলো হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। তবে একটি সুস্থ ব্রেনই রোজা বা উপবাসের একমাত্র উপকার নয়। এর ফলে কোষের গ্লুকোজ পরিপাকের ক্ষমতা বাড়ার কারণে ডায়াবেটিসও প্রতিরোধ হয়। এমনকি হৃৎপিণ্ডের সুস্থতাও তাতে বেড়ে যায়।*

গবেষণায় আরো দেখা গেছে, রোজা বা উপবাস ব্যায়ামের চেয়েও কার্যকরভাবে হার্টবিট ও ব্লাডপ্রেশার কমাতে পারে। অনাহারের ফলে যে সাময়িক শক্তি সংকট, তা ব্রেনসেলগুলোকে প্রোটিন উৎপাদনে উৎসাহ দেয়, যা উদ্বেগজনক পরিস্থিতি মোকাবেলার সামর্থ্য যোগায়। আর পুরো দেহেই ইনসুলিন ছড়িয়ে পড়ে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায়।

৪৩. সফট ড্রিংকস আপনার শরীরের জন্যে অত্যন্ত হার্ড। সফট ড্রিংকস বা কোমল পানীয়ের প্রতিটি চুমুক আর্সেনিকের মতোই ধীরে ধীরে শরীরের অন্তর্গত শক্তি ক্ষয় করে। শরীরের মেদ বৃদ্ধি ও আসক্তি সৃষ্টি ছাড়াও এ পানীয় হাড়ক্ষয়, অকালবার্ধক্য, বদহজম, শ্বাসকষ্ট, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি করে এবং কিডনির বিনাশ ঘটায়।

৪৪. এনার্জি ড্রিংকসের উচ্চমাত্রার ক্যাফেইন আপনার নার্ভাসনেস, বদমেজাজ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, পেশির খিঁচুনি, অনিদ্রা, মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্ট ছাড়াও সন্তান ধারণে জটিলতা, এমনকি অক্ষমতার কারণ হতে পারে।

৪৫. কোমল পানীয় ও এনার্জি ড্রিংকস নিজে পান ও অন্যকে পরিবেশন করা থেকে বিরত থাকুন।

৪৬. প্রার্থনা খাবারের তৃপ্তি বাড়ায়। তাই খাওয়ার আগে প্রার্থনা করুন। আর খাওয়া শেষে বলুন, শোকর আলহামদুলিলাহ/ থ্যাংকস গড/ হরি ওম বা প্রভু ধন্যবাদ, বেশ তৃপ্তির সাথে খেয়েছি।

খাবারের প্রার্থনা

হে করুণাময়!

তোমারই নেয়ামত এখন আমাদের সামনে।

এত ভালো খাবার এখন অনেকের সামনেই নেই।

এই সুস্বাদু খাবারের জন্যে

তুমি আমাদের শুকরিয়া গ্রহণ করো।

সবাইকে সুস্বাদু খাবার, সুস্বাস্থ্য, সম্মান ও প্রাচুর্য দান করো।

সত্যের আলোয় আলোকিত করো। আমিন!

পরিমিত খাদ্য তালিকা

পৃথিবীতে সব মানুষেরই বেঁচে থাকার জন্যে প্রথমেই প্রয়োজন অক্সিজেন; তারপরই সুষম খাদ্যের। খাদ্য দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয় পূরণ এবং দেহে তাপ সৃষ্টি করে দেহযন্ত্রকে সক্রিয় রাখে। তাই আমাদের প্রতিদিন খাবারের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখা প্রয়োজন–খাবারে যেন প্রোটিন শর্করা স্নেহ আয়রন ক্যালসিয়াম আয়োডিন ও খনিজ লবণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় মাত্রায় থাকে। পরিমিত খাদ্য তালিকায় এসব উপাদানসমৃদ্ধ খাবার থাকা প্রয়োজন। আর এ প্রয়োজন মেটাতে পরিমিত খাবারের একটি তালিকা নিচে দেয়া হলো।

খাবারের সাথে সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। যেমন ধরুন, সকালের নাশতা দুপুরে, দুপুরের খাবার বিকেলে আর বিকেলের খাবার রাতে খেলে তা দেহের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। মনে রাখতে হবে, দেহ তার নিজস্ব গতি এবং ছন্দে চলে আর তার জন্যে সঠিক সময়ে তাকে খাবার ও বিশ্রাম দিতে হবে।

সকালের নাশতা

সকাল ৭টা থেকে সকাল ৯টার মধ্যে হওয়া ভালো।

দুপুরের খাবার

দুপুর ১টা থেকে দুপুর ২:৩০ মিনিটের মধ্যে হওয়া ভালো।

বিকেলের নাশতা

বিকেল ৪:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে হওয়া ভালো।

রাতের খাবার

রাত ৮টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে হওয়া ভালো।

সকালের নাশতা

শনিবার

☐ ডিম ১টি ☐ আটার রুটি ৩/৪/৫/৬টি ☐ সবজি ১ কাপ ☐ মধু ১ চা চামচ ☐ যে-কোনো ফ্রেশ জুস ১ গ্লাস অথবা পছন্দমতো যে-কোনো ১টি ফল নাশতার সাথে খান, যেমন : আপেল ১টি/ আমলকি ২টি/ কলা ১টি/ কমলা বা মোসাম্বি ১টি/ আমড়া ১টি/ আনারস জুস ১ গ্লাস।

রবিবার

☐ বিভিন্ন ধরনের ডাল এবং সবজি মিলিয়ে খিচুড়ি ☐ পছন্দমতো ১টি ফল ☐ ১ চা চামচ মধু।

সোমবার

☐ পাউরুটি ৩/৪/৫ পিস। বয়স ও ওজন ভেদে কমবেশি হতে পারে।
☐ মাখন ১ চা চামচ ☐ মধু ১ চা চামচ খান।

মঙ্গলবার

☐ আটার রুটি ৩/৪/৫/৬ পিস। বয়স ও ওজন ভেদে কমবেশি হতে পারে।
☐ বিভিন্ন ধরনের তরকারি মিলিয়ে রান্না করা সবজি ১ কাপ পরিমাণ
☐ মধু ১ চা চামচ ☐ ফল যে-কোনো ১টি অথবা ফ্রেশ জুস ১ গ্লাস।

বুধবার

☐ আটার রুটি ৩/৪/৫/৬ পিস। ☐ ডিম ১টি ☐ সবজি ১ কাপ ☐ মধু ১ চা চামচ ☐ যে-কোনো ফ্রেস জুস/ পছন্দমতো ১টি ফল।

বৃহস্পতিবার

☐ খিচুড়ি ☐ ১ চা চামচ মধু ☐ যে-কোনো ফল : কলা ১টি/ কমলা/ আপেল/ আমলকি ২টি/ আমড়া অর্থাৎ মৌসুমি ফল বাজারে যা পাওয়া যায়।

শুক্রবার

☐ আটার রুটি ২/৩/৪/৫ পিস। বয়স ও ওজন ভেদে কমবেশি ☐ ডিম ১টি ☐ সবজি ১ কাপ ☐ মধু ১ চা চামচ ☐ যে-কোনো মৌসুমি ফল।

***বি.দ্র.:** শিশুদের প্রতিদিন ১টি ডিম, এক গ্লাস দুধ ও ১টি কলা দিতে পারেন।*

দুপুরের খাবার

শনিবার

□ ভাত/ রুটি ওজন ও বয়স ভেদে কমবেশি □ ছোট মাছ (যে-কোনো ধরনের) □ শাক (যে-কোনো ধরনের) □ করলা □ মসুর ডাল মাঝামাঝি ঘন □ সালাদ : ধনেপাতা/ পুদিনাপাতা/ পার্সলি/ সেলারি/ শসা/ ক্ষীরা/ গাজর/ বিট/ টমেটো/ বাঁধাকপির ভেতরের কচি অংশ/ লেটুস/ রেড ক্যাবেজ/ লেবুর রস/ বিট লবণ/ খাবার লবণ ইত্যাদি মিলিয়ে সালাদ তৈরি করে নিন। (একজনের জন্যে ১ কাপ পরিমাণ) □ যে-কোনো ফল ১টি (তবে প্রতিদিন একই ফল খাবেন না। বিভিন্ন ধরনের ফল খাবেন। স্বাদে বৈচিত্র্য আসবে)

রবিবার

□ ভাত/ রুটি ওজন ও বয়স ভেদে কমবেশি □ করলা □ মুগ ডাল মাঝামাঝি ঘন □ বড় মাছ (যে-কোনো ধরনের) ১ পিস (মাঝারি আকারের)। □ যে-কোনো ফল ১টি অথবা ফ্রেশ জুস ১ গ্লাস। □ সালাদ জনপ্রতি ১ কাপ।

সোমবার

□ ভাত/ রুটি ওজন ও বয়স ভেদে কমবেশি □ করলা অথবা যে-কোনো তেঁতো শাক □ ছোলার ডাল □ মাংস যে-কোনো ধরনের □ মৌসুমি ফল যে-কোনো ধরনের □ সালাদ ১ কাপ।

মঙ্গলবার

□ ভাত/ রুটি ওজন ও বয়স ভেদে কমবেশি □ যে-কোনো ধরনের ভর্তা/ ভাজি □ সব ধরনের (মুগ মসুর ছোলা অড়হর) মেশানো ডাল ঘন করে রান্না □ সালাদ ১ কাপ □ পছন্দমতো যে-কোনো মৌসুমি ফল।

বুধবার

□ ভাত/ রুটি ওজন ও বয়স ভেদে কমবেশি □ যে-কোনো ধরনের শাক (বিভিন্ন শাক খাবেন, সবসময় একই রকম শাক খাবেন না)। □ মসুর ডাল □ যে-কোনো ধরনের মাংস □ সালাদ ১ কাপ □ যে-কোনো মৌসুমি ফল।

বৃহস্পতিবার

□ ভাত/ রুটি ওজন ও বয়স ভেদে কমবেশি □ সব ধরনের তরকারি মিশিয়ে ভাজি □ ছোলার ডাল □ যে-কোনো ধরনের মাছ □ সালাদ ১ কাপ □ যে-কোনো মৌসুমি ফল।

শুক্রবার

□ ভাত/ রুটি ওজন ও বয়স ভেদে কমবেশি □ ছোট মাছ (যে-কোনো ধরনের) □ মসুর ডাল □ সালাদ ১ কাপ □ যে-কোনো মৌসুমি ফল।

সপ্তাহে একদিন মাছ-মাংস পরিহার করুন।

বিকেলের নাশতা

যাদের ওজন বেশি তারা বিকেলের নাশতা পরিহার করুন। যাদের ওজন কম তারা খেতে পারেন। তবে অতিরিক্ত তেলেভাজা খাবার খাবেন না। বাচ্চারা ১ গ্লাস দুধ ও তার সাথে ঘরে তৈরি যে-কোনো খাবার এবং বড়রা ১ কাপ লিকার চা ও তার সাথে সামান্য কিছু স্ন্যাক্স খেতে পারেন।

রাতের খাবার

শনিবার

□ আটার রুটি ১টি/ পাউরুটি ২ পিস (যাদের ওজন কম তারা এর চেয়ে বেশি নিতে পারেন, কিন্তু যাদের ওজন বেশি তারা এ নিয়মে নেবেন)
□ দুধ ১ গ্লাস (যাদের ওজন বেশি তারা ফ্যাট ছাড়া দুধ খাবেন)।
□ মৌসুমি ফল : আম/ পাকা পেঁপে ৪ পিস/ আপেল ১টি/ মোসাম্বি ১টি।

রবিবার

□ পাউরুটি ১ পিস (যাদের ওজন কম তারা রুটি পরিমাণে বেশি খেতে পারেন) □ দুধ ১ গ্লাস □ যে-কোনো ফল : আপেল ১টি/ পেঁপে ৩ পিস।

সোমবার

☐ আটার রুটি ১টি/ পাউরুটি ২ পিস ☐ মুড়ি ১ কাপ ☐ দুধ ১ গ্লাস
☐ মৌসুমি ফল যে-কোনো ১টি।

মঙ্গলবার

☐ ভাত ২ কাপ/ আটার রুটি ১টি ☐ সবজি ১ কাপ ☐ দুধ ১ গ্লাস
☐ মৌসুমি ফল যে-কোনো ১টি।

বুধবার

☐ আটার রুটি ২টি ☐ যে-কোনো ভাজি ১ কাপ ☐ দুধ ১ গ্লাস
☐ মৌসুমি ফল যে-কোনো ১টি।

বৃহস্পতিবার

☐ পাউরুটি ২/৩ পিস ☐ আটার রুটি ১ পিস ☐ দুধ ১ গ্লাস
☐ মৌসুমি ফল যে-কোনো ১টি।

শুক্রবার

☐ ভাত আধা কাপ/ পাউরুটি ২/৩ পিস/ আটার রুটি ১ পিস ☐ দুধ ১ গ্লাস
☐ মৌসুমি ফল যে-কোনো ১টি।

বি.দ্র. *: বয়স ও ওজন ভেদে খাবার কমবেশি হতে পারে। এ খাদ্য তালিকা মূলত মেয়েদের জন্যে।*

স্পিরুলিনা খাওয়ার অভ্যাস করুন। এতে প্রচুর পুষ্টি রয়েছে।

ছোট মাছ বলতে শুধু কাঁচকি মাছই ভাববেন না। টাকি বাতাসি কাজরি পাবদা টেংরা পুঁটি ফলি মলা ঢেলা কৈ মাগুর শিং ইত্যাদিকেও ছোট মাছের আওতায় ধরা হয়েছে।

বড় মাছ বলতে রুই কাতল মৃগেল কোরাল আড় ইত্যাদি বড় ধরনের মাছকে বোঝানো হয়েছে।

মাংসের প্রোটিনের চেয়ে মাছের প্রোটিন স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী। মাংসে স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে।

লবণ খেলে আয়োডিনযুক্ত লবণ খাবেন।

অত্যধিক ভুনা, ভাজা, তেল-ঝাল-মশলা খাবেন না।

প্রতিদিন তিন পদের বেশি খাবার খাবেন না।

রোগগ্রস্ত হলে ডাক্তারের বিধিনিষেধ মেনে খাবার খাবেন।

সৌন্দর্যচর্চার ইতিহাস

যুগে যুগে মানুষ নিজেকে অন্যের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে কিংবা কখনো আত্মতৃপ্তি লাভে নিজেকে সাজিয়েছে বিভিন্ন ভাবে। আদি থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সময়ের সাথে তারা নিজেদেরকে সাজিয়েছে নানান কৌশলে রঙে বর্ণে আবরণে এবং আভরণে।

প্রসাধনের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখব–আজ থেকে ২০ হাজার বছর আগের ক্রো-ম্যানোরাই এই প্রসাধন রীতির সর্বজনস্বীকৃত প্রবর্তক। তখন মানুষ ছিল অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তারা বুঝত না, জানত না–আকাশে বজ্রপাত কেন হয়, দাবানল কেন জ্বলে। ঝড়বৃষ্টি কেন হয়, বন্যা কেন তাদের ঘরবাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যায়–এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর মৃত্যুকে তারা ভীষণ ভয় করত। মহান প্রভু কী, আলাহর মহিমা কী–কিছুই তারা বুঝত না। ভয়ই ছিল তাদের নিয়ন্ত্রক। আর এই ভয়কে জয় করার জন্যে তারা নানান রঙে-বর্ণে-অলঙ্কারে নিজেকে সাজিয়ে কল্পিত দেবতাকে সন্তুষ্ট করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ভয় থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করত।

মেয়েরা তখন থাকত মন্ত্র সুরক্ষিত গুহায়। আর পুরুষরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বেরোত শিকারে। গায়ে, মুখমণ্ডলে রং-এর জাদু মেখে। কালের প্রবাহে সভ্যতা এসে পৌঁছল ইতিহাসের দরজায়। ততদিনে মানুষ চাষ করতে শিখেছে। জাপানের নব্য প্রস্তর যুগে (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০০-২০০০) বা নীল নদের উপত্যকায় গড়ে উঠেছে চাষীদের ছোট ছোট বসতি। মিশরে শুরু হয়েছে প্রি-ডাইন্যাস্টি সভ্যতা।

মানুষের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিধিও ততদিনে বেড়েছে। ভয় কমেছে দুর্যোগের। তারা নিজেদের ক্ষমতা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। ক্রমশ ভয় বিভক্ত হলো দেখা এবং না দেখায়। এখন নীল নদে কবে পাবন আসবে, ঘন মেঘ কবে আকাশ ছেয়ে ফেলবে, মানুষ এখন তার গাণিতিক নির্ভুলতায় এর ভবিষ্যদ্বাণী

করতে শিখেছে। সুতরাং এসবে তার ভয় নেই। তবু ভয় আছে মৃত্যুকে। একদিন অজ্ঞাত বিপদকে জাদু বলে দূরে রাখতে সে যে প্রসাধনের সূত্রপাত করেছিল, এখন তা-ই পরিব্যাপ্ত হয়েছে চেনা শত্রুদের বিরুদ্ধেও। হিংস্র পশু এবং তার চেয়ে হিংস্র ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের বিরুদ্ধে ভয় পেয়ে নয়–ভয় দেখাতে বা আত্মগোপন করতে তারা মুখ ও সারা শরীর চিত্রিত করা আরম্ভ করল।

সময়ের বিবর্তনে ধীরে ধীরে এসব ছোট ছোট গোষ্ঠীতে গড়ে উঠল পুরোহিত সম্প্রদায়। সাধারণ মানুষ ভাবত এরা চির রহস্যময় মৃত্যুর রাজ্যের খবর এনে দেবে। বিপদে-আপদেও জনসাধারণকে পথ দেখাবে, উদ্ধার করবে। এরাই তখন হয়ে উঠল প্রসাধনের সর্বময় কর্তা। এভাবে প্রসাধন হলো ধর্মের অঙ্গ। প্রসাধনের জটিলতাও বাড়ল। প্রাচীন মিশরীয়রা শরীরে উল্কি আঁকত। তারা রেড়ির বীজ থেকে তেল বের করে গায়ে মাখত সূর্যের আলো থেকে চামড়া বাঁচাতে। এছাড়া তারা মুখ ও চোখের পাতা রাঙাতে শুরু করল বুনো রেড়ির তেলে সবুজ ম্যালাকাইট (তামার আকর) গুলে।

মিশরের বেনী হাসান নামক স্থানে রয়েছে খুমোটোপের সমাধি। পুরাতাত্ত্বিকেরা এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন এসব প্রসাধনের নিদর্শন। আর সমাধি গাত্রে আঁকা রয়েছে এমন সব ছবি, যা দেখে বোঝা যায় তখনকার দিনে দূর-দূরান্তে প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবসা চলত। মিশরে তখন চোখে কাজল দেয়ার প্রথা চালু হয়। কাজল সীসার একরকম যৌগ, যার ইংরেজি নাম গ্যালেনা। এই কাজল হলো সুরমার পূর্বসূরী, যা তৈরি অ্যানটিমনি ধাতু থেকে।

পরবর্তীকালে অর্থাৎ ফেরাউনদের আমলে মিশরে চোখের পাতায় বা ভ্রু আঁকতে এর ব্যবহার অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ফারাও আখেন-আটেনের রানি নেফারতিতি সুরমা দেয়া হরিণ চোখের জাদু দিয়ে বিচ্ছিন্ন উত্তর এবং দক্ষিণ নীল উপত্যকাকে সঙ্ঘবদ্ধ করেছিলেন এক সাম্রাজ্যের অধীনে। এর ফলে মিশরে কী পরিমাণ সমৃদ্ধি এসেছিল তা বোঝা যায় নেফারতিতির জামাতা বিখ্যাত ফারাও টুটেন খামেনের সমাধি দেখে। এরও বহু পরে সর্বজনজ্ঞাত মিশর সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার কাজল চোখের দৃষ্টি কী করে পৃথিবীর ইতিহাসটাই পাল্টে দিয়েছিল তা অনেকেরই অজানা নয়।

তৎকালীন মিশরে প্রসাধনী রং বলতে ছিল কালো এবং সবুজ রং। রামেসিস ও টলেমিদের সময় মেয়েদের ঠোঁটে এবং কপালে গেরি মাটি বা কারমাইন-এর লাল রং প্রসাধন চালু হয়। তখন সবুজ রং তৈরি হতো

ম্যালাকাইট-এর পরিবর্তে সবুজ কপার হাইড্রো সিলিকেট দিয়ে। পিঁপড়ার ডিম বেটে তারা চোখে পেইন্ট করত। কিন্তু এর ব্যবহার ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে।

শরীর রং করার এ ইতিহাস থেকে বোঝা যায়, একসময় হয়তো প্রথাটির ধর্মীয় তাৎপর্য ছিল গভীর। আবার সূর্যালোক থেকে শরীরের ত্বক রক্ষা এবং শারীরিক সৌন্দর্যবৃদ্ধির কথাও বাদ দেয়া যায় না। হয়তো শেষ পর্যন্ত প্রসাধনে রং ব্যবহারের কারণ হিসেবে মানুষের সৌন্দর্যের অনুভূতিই প্রাধান্য লাভ করেছিল।

এই সূত্রে শরীর রং করার আরেক বিকল্প প্রথাও উলেখযোগ্য–যার নাম উল্কি। অন্য বহু প্রসাধনের মতো উল্কি (শরীরকে রং দিয়ে চিত্রিত করা) প্রসাধনেরও উৎপত্তি প্রাচীন মিশরে–খ্রিষ্টপূর্ব চার থেকে দুই হাজার বছরের মধ্যে। এরপর প্রথাটি ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর সর্বত্র। আড়াই হাজার বছর আগে ক্রিট হয়ে গ্রিস, পারস্য, আরব এবং আরো প্রায় পাঁচ শত বছর পরে চীনে। চীন থেকে আইনুরা প্রথাটি জাপানে চালু করে। ক্রমশ জাপানি শিল্পীদের হাতে এটা কারুকলায় উন্নীত হয়। সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে সুমাত্রা, বোর্নিও, ফিলিপাইনসহ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহে।

নিউজিল্যান্ডের মাওরিদের মধ্যে উল্কির ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখা যায়। এর উৎপত্তি পলিনেশিয়ায়। পরে অবশ্য প্রথাটি মাওরিদের সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে ওঠে। সেখানে উল্কির স্থানীয় নাম অ্যামোকো। ওরা বাদাম পুড়িয়ে সেই ছাই দিয়ে উল্কি করত। ওরা এত উল্কিপ্রিয় যে, প্রক্রিয়াটি যন্ত্রণাদায়ক হলেও তারা উল্কি আঁকতে যন্ত্রণা সহ্য করত। সৌন্দর্যবোধ ছাড়াও উল্কির ব্যবহার একেক দেশে একেক তাৎপর্য বহন করে। মালয়ের অধিবাসীরা কলেরার প্রতিষেধক হিসেবে শরীরে সাদা, কালো ও লাল রঙের উল্কি আঁকত। আবার আফ্রিকার কোনো কোনো আদিবাসী নারী নিজেদের বিধবা বোঝাতে ব্যবহার করে উল্কি। অ্যামেরিয়রা বিশ্বাস করত উল্কি দিয়ে শুধু এই জীবনে নয়, মৃত্যুর পরেও তাদেরকে ঠিক চিনে নিতে পারবে তাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবরা।

রং দিয়ে উল্কি করে শরীরকে নানান রঙে সাজানোর উত্তাল তরঙ্গ মিশরের ফারাওদের যুগেও দেখা গিয়েছিল। ওল্ড টেস্টামেন্টে 'পেইন্টেড লেডি' জিজাবেলের কথা পড়ে মনে হয় বডি পেইন্টিং-এর প্রথাটি মিশর থেকে মধ্য প্রাচ্যে এসেছে।

কালের বিবর্তনে আজকের সভ্য জগতেও নারীর সৌন্দর্য প্রসাধনের পাশে উল্কির প্রচলন শুরু হয়েছে। তবে সেটি প্রাচীন প্রক্রিয়ায় শারীরিক নির্যাতন

সহ্য করে নয়। অত্যন্ত সহজ উপায়ে আধুনিক নারীরাও উল্কি এঁকে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে থাকেন। আজকাল বিউটি পার্লারে গিয়ে মেয়েরা হাতে, গলায়, পায়ে ও গালে ফুল ফোঁটা এঁকে থাকেন। এগুলো অতীতের উল্কিরই বিকল্প পদ্ধতি। গ্রিসে মেয়েরা শরীরে রং-এর প্রলেপ ব্যবহার করত। ভূমধ্যসাগরীয় একরকম লতাগুল্ম থেকে অ্যালকানেট নামে লাল রং বের করে তারা গালে লাগাত। আর মুখে এবং গায়ে সাদা রং-ও ব্যবহার করত।

এ থেকেই হয়তো-বা আধুনিক প্রসাধনে এসেছে গালে রুজ এবং ব্লাশার লাগানোর প্রচলন। আধুনিক প্রসাধনে এগুলো তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন রং-এ। গায়ের রং অনুসারে আজকের নারীরা তা ব্যবহার করছে সৌন্দর্যকে আরো ফুটিয়ে তুলতে। কে না চায় গাল দুটো দেখাক আপেলের মতো। তাই তো আপেল রং-এর গাল বানাতে ব্যবহৃত হচ্ছে রুজ, ফেস পাউডার, ব্লাশারের মতো প্রসাধনী। বিশ্বের নানাদেশে বহু নামি দামি কোম্পানি প্রসাধন সামগ্রী বানাতে ব্যস্ত। প্রসাধন বিজ্ঞানীরা রীতিমতো গবেষণা চালাচ্ছেন এর মান নিয়ে। সারা বিশ্বে প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবসা এক বিরাট লাভজনক ব্যবসা। তাই নিত্য নতুন আঙ্গিকে প্রসাধনের প্রসার ঘটছে সারা বিশ্বে। পালা দিয়ে চলছে একেক কোম্পানি।

রূপচর্চার ইতিহাস বলতে গেলে চার জন রমণীর নাম অবশ্যই আগে আসে। তারা হলেন–

ক. মিশরের ক্লিওপেট্রা

খ. বাইজানটিয়ার থিওডোরা

গ. ফ্রান্সের মাদাম পঁপিদু এবং

ঘ. ভারতের সম্রাজ্ঞী নূরজাহান

কথিত আছে, ক্লিওপেট্রার অপরূপ সৌন্দর্য এবং বুদ্ধিমত্তা ছাড়াও তিনি ছিলেন বহুগুণের অধিকারিণী। ধাত্রীবিদ্যা ও ভেষজবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তিনি। ক্লিওপেট্রা প্রসাধন শিল্পকে পুরোহিতদের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে একে চিকিৎসাবিদ্যার সাথে সংযোজন করেন। পরাক্রমশালী ফারাওদের সময় থেকেই প্রসাধনের ওপর পুরোহিতদের আধিপত্য কমতে শুরু করেছিল। ক্লিওপেট্রার মতো সুন্দরী লাবণ্যময়ী প্রসাধন বিশেষজ্ঞরা যখন ভেষজবিদ্যার চর্চা শুরু করলেন তখন পুরোহিতদের জাদুমন্ত্র সম্পূর্ণ খসে পড়ল। তাছাড়া আজকাল মুখের চামড়া পেলব রাখতে মেয়েরা যে 'ফেস মাস্ক' নামক প্রসাধন ব্যবহার করে–রানী ক্লিওপেট্রাই তার প্রবর্তক। মধু, ডিমের সাদা অংশ এবং

‘গাধার খুর’ নামে এক প্রকার গাছের পাতার রস মিশিয়ে তিনিই এই প্রাকৃতিক অভিনব ফেস প্যাকটি তৈরি করতেন। প্রাচীন মিশরীয় প্রসাধনে আইবিস, বিড়াল, কুমিরের রক্ত, কাঁকড়া, বিছার লেজ, ইঁদুরের নখ, গাধার খুর ইত্যাদি যতসব উদ্ভট উপাদানের নাম পাওয়া যায়, পরবর্তীতে আবিষ্কৃত হয় যে, এগুলো হলো এক রকম উদ্ভিজ্জ্য উপাদানের আটপৌরে নাম।

খ্রিষ্টের সমসাময়িক রোমে প্রসাধন বিস্তারের বর্ণনা দিয়ে গেছেন দার্শনিক পিনি এবং কবি ওভিড, যাকে আজও ‘প্রসাধনের কবি’ নামে অভিহিত করা হয়। পিনির বই ‘ন্যাচারাল হিস্ট্রি’ থেকে জানতে পারা যায়, তখনকার দিনে মেয়েরা ঠোঁটে ‘লিপস্টিক’, চোখে ‘আইশ্যাডো’ ছাড়াও গালে ব্যবহার করত ভিনেগারে ভেজানো ‘পুপেসেরিয়াম’ নামে একরকম শেকড়, যা থেকে পাওয়া যেত রুজ কিংবা সিঁদুর। গায়ের রং ধবধবে সাদা করতে ব্যবহার করা হতো চক পাউডার। ওভিডও Ars Amatoria (art of love) নামে একটা বই লিখেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন, 'Cura dabit faciem; facies neglecta perbit'—অর্থাৎ উপযুক্ত যত্ন নিলে (রূপ পরিচর্যা করলে) সবাই সুন্দর; অবহেলা করলেই কুৎসিত। ওভিডের অধিকাংশ আলোচনা কেশচর্চা নিয়ে। পিনির আলোচনা পারফিউম নিয়ে।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাইজেনটাইন সভ্যতার প্রাক্কালে কনস্ট্যানটিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) শহরটির পত্তনের পর অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে যায়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে সেখানে রাজত্ব করতেন খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী রাজা জাসটিনিয়ন, যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন দ্বিতীয় এক রোম সাম্রাজ্যের। সে স্বপ্ন তার সফল হয় নি। আর তারই রানি থিওডোরা আমাদের দিয়েছিলেন বিজ্ঞানভিত্তিক প্রসাধনের ধারণা। অসামান্য রূপের অধিকারিণী ছিলেন কনস্ট্যানটিনোপল শহরের হিপোড্রোমের ভালুক পালকের মেয়ে। জন্ম তার সাধারণ পরিবারে হলেও নারীত্বে তিনি ছিলেন মহিয়সী আর প্রসাধনে ছিলেন অসাধারণ জ্ঞানবতী। নানারকম গাছগাছড়া নিয়ে তিনি নতুন নতুন প্রসাধন সামগ্রী তৈরি করতেন তার নিজের গবেষণাগারে। এ ব্যাপারে রাজচিকিৎসক ইতওস ছিলেন তার সুযোগ্য সহকারী। এছাড়া তিনি ছিলেন প্রসাধন শিল্পের পৃষ্ঠপোষক।

একাদশ শতাব্দীতে কনস্ট্যানটিনোপলের সিংহাসনে আমরা আরেক সম্রাজ্ঞীর অধিষ্ঠান দেখতে পাই। জোই (Zoe) নামে। তিনি যৌবনকে ধরে রেখেছিলেন। তাকে বলা হতো অনন্তযৌবনা। তিনি ৫০ বছর বয়সে বাইজানটাইন সিংহাসনে তার খুলতাত অষ্টম কনস্ট্যানটিনোপলের

স্থলাভিষিক্ত হন। এই অনন্তযৌবনা নারী নিজের আবিষ্কৃত প্রসাধনপ্রণালী দিয়ে বার্ধক্যকে দূরে রেখেছিলেন। ৭২ বছর বয়সে যখন তিনি মারা যান তখনো তার মুখ দেখাত ষোড়শী তন্বীর মতো।

উপমহাদেশে রূপচর্চার ইতিহাসও একইভাবে প্রাচীন। মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্যগুলোয় আবরণ, আভরণ ও প্রসাধনে তৎকালীন বঙ্গ ললনাদের সৌন্দর্য কীভাবে বিকশিত হয়ে উঠত তার নিখুঁত বর্ণনা আমরা পাই। যেমন :

হস্তে লীলা কমলম্ অলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্র প্রসব রজসা পাণ্ডুতাম্ আননশ্রীং।
চূড়াপাশে নবকুরু বকং চারু কনে শিরিষং
সীমন্তে চ তুদুপগমজং যত্র নীণং বধুনাম্।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উপমহাদেশে যুক্ত হয় আরবীয় প্রসাধনচর্চা। সপ্তম থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান–সব কিছুতেই এগিয়ে চলার জোয়ার বইছিল। সে-সময় একদিকে আমরা যেমন আবু ইবনে সিনার মতো হেকিমের নাম শুনতে পাই, তেমনি ইসহাক-ইবন মুরাদ বা হাজি-জৈন-আল আত্তার প্রভৃতি প্রসাধনবিশেষজ্ঞরাও সে-সময় জন্মেছিলেন। মোঘলরা প্রসাধনচর্চায় এনেছিল নতুন উদ্যম। জাতি হিসেবে মোঘলরা ছিল জাঁকজমকপ্রিয় এবং প্রসাধনবিলাসী।

মোঘল সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ছিল অনেক গুণ। তিনি সাহিত্যচর্চা করতেন, কবিতা লিখতেন, চিত্রশিল্পেও তার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। নূরজাহান সুরুচিসম্পন্ন সাজগোজ অর্থাৎ প্রসাধন ব্যবহার করতেন। তিনি বিভিন্ন প্রসাধনসামগ্রীও তৈরি করতে পারতেন। বিশেষ করে সুগন্ধিদ্রব্য (Perfume) প্রস্তুত করতেন। বিভিন্ন ফুল থেকে নির্যাস নিয়ে তাদের সংমিশ্রণে নতুন নতুন সুগন্ধি তৈরি করা ছিল তার শখ।

চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর যে প্রামাণ্য গ্রন্থ ম্যানডেভিল তিনি রচনা করে গেছেন তার ২৪ পরিচ্ছেদেই রয়েছে প্রসাধন সংক্রান্ত আলোচনা। সেখানে সাবানের উলেখ আছে। বইটির ১০টি অধ্যায়ে জরাকে ঠেকিয়ে রাখার উপায় লিপিবদ্ধ আছে। হেনরীর ছাত্র গাই-দ্য-শৌলক (১৩০০-১৩৬৮ খ্রিষ্টাব্দ) প্রসাধনবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি করেছিলেন। সে দেশে কসমেটিক সার্জারি চালু করার কৃতিত্বও তার।

মধ্যযুগে ইংল্যান্ডে প্রসাধনের ব্যাপারটা অতীত ঐতিহ্য অনুযায়ী

সম্পূর্ণরূপে চার্চের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। রানি প্রথম এলিজাবেথের সময় এর বাঁধন ছেঁড়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়। যদিও রানি চার্চকে সন্তুষ্ট করতে ফরমান জারি করেছিলেন যে, কোনো রমণী যদি কৃত্রিম কেশ, স্পেনীয় হেয়ার প্যাড, মেক-আপ, ফলস হিপ, হাইহিল জুতো ব্যবহার করে সম্রাজ্ঞীর কোনো প্রজাকে প্রলুব্ধ করে বিবাহ করে তবে তাকে ডাইনীর উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে; অথচ রানি এবং তার বোন মেরী ছিলেন অত্যন্ত প্রসাধনপ্রিয়। সুগন্ধির প্রতি রানির এতই দুর্বলতা ছিল যে, পার্শ্বচরেরা সবসময় গায়ে গন্ধ মেখে ঘুরে বেড়াত। শোনা যায়, এলিজাবেথ এতই প্রসাধন ব্যবহার করেছিলেন যে, পরবর্তীতে তার ত্বকের অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল–শেষ জীবনে তিনি লজ্জায় কারো সামনে খুব একটা বেরোতেন না।

প্রসাধনের ব্যাপারে ইউরোপে নব জাগরণ এনেছিল ফ্রান্স। ফ্রান্সকে সমগ্র ইউরোপের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরা হতো। তাই আজও ফরাসি পারফিউম সারা পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান দখল করে রেখেছে।

সৌন্দর্যচর্চা ॥ মৌলিক সত্য

যুগে যুগে মানুষ নিজেকে সুন্দর রাখার, সৌন্দর্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। এ জন্যে উদ্ভাবন করেছে নানা কৌশল। এজন্যে সে কখনো প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করেছে, আবার কখনো ব্যবহার করেছে কৃত্রিম উপাদান। তবে কৃত্রিম উপাদানের চেয়ে প্রাকৃতিক উপাদানই বেশি ভালো। কারণ এতে নেই কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, নেই কোনো বাড়তি খরচ। অনায়াসেই যা হাতের কাছে পাওয়া যায়, তা-ই আপনি আপনার রূপচর্চায় কাজে লাগাতে পারেন। প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম–যে-কোনো উপাদান দিয়েই রূপচর্চা করেন না কেন, আগে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে আপনার ত্বকের ধরন, চুলের ধরন ইত্যাদি তথ্য। তবে পরিপূর্ণ রূপবতী কিংবা রূপবান বলতে কেবল শারীরিক সৌন্দর্যকেই বোঝায় না, এর সাথে থাকে বিশেষ কিছু গুণ। যেমন :

১. সুস্থ দেখানো
২. বয়সের তুলনায় কম বয়সী মনে হওয়া
৩. ব্যক্তিত্ব এবং শিষ্টাচার

৪. সাজপোশাক
৫. মার্জিত ভাব
৬. মানবিক গুণাবলি
৭. শিক্ষা

এসব মিলিয়ে একজন মানুষকে সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে বিচার করা হয়।

পৃথিবীতে জন্মগতভাবেই যদি কেউ সৌন্দর্যের অধিকারিণী হয়ে থাকে, তবে সেটা তাদের জন্যে করুণাময়েরই বিশেষ দান। কিন্তু বাকি সব গুণাবলি মানুষকে অর্জন করতে হয়। আর জন্মগত সৌন্দর্যও চিরস্থায়ী নয়, তাকে বেশিদিন ধরে রাখার জন্যে প্রয়োজন পরিচর্যার। তাই আজ যে এ সচেতনতা হয়েছে তা নয়। অতীতেও এ সচেতনতা ছিল। আগের দিনের নারীরা ঘরে বসেই রূপচর্চা করত। কালের প্রবাহে এর প্রসার ঘটেছে। এখন ঘরের বাইরেও এজন্যে রয়েছে বহু প্রতিষ্ঠান, যা বিউটি পার্লার নামে পরিচিত। এখন মেয়েরা পার্লারে গিয়ে রূপচর্চা করে। আর যারা জন্মগতভাবে সৌন্দর্যের অধিকারিণী নন, তারাও হতাশ হবেন না, তারাও অনায়াসে সৌন্দর্যচর্চার মাধ্যমে নিজেকে পরিণত করে তুলতে পারেন রূপসী রমণীতে।

তবে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোনো চর্চাই আলাদিনের চেরাগের মতো আপনাকে রাতারাতি বদলে দেবে না। এজন্যে প্রয়োজন ধৈর্য। আর এটা ভাবাও ঠিক নয় যে, আপনি সারাজীবনই আপনার যৌবনকে ধরে রাখবেন, রূপকে ধরে রাখতে পারবেন। প্রকৃতির নিয়মেই ধাপে ধাপে বয়সের সাথে সাথে আপনাকে এগোতে হবে এক এক পর্যায়ের সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশে। তবে সৌন্দর্যচর্চা করলে আপনার বয়স যখন ৪০ তখন হয়তো আপনাকে দেখতে লাগবে ৩০ বছর বয়সী। এটাই বা কম কী। বয়সের তুলনায় ১০ বছর কম লাগা সহজ ব্যাপার নয়।

অনেকে গায়ের রং নিয়ে ভাবেন–ফর্সা না হলে বুঝি সুন্দরী হওয়া যায় না; এটা আসলে ভুল ধারণা। সুন্দরী মানে যদি শুধু ফর্সাকেই বোঝানো হতো, তাহলে প্রতিযোগিতায় আফ্রিকার কালো মেয়েটি বিশ্বসুন্দরী হতে পারত না। কাজেই সুন্দরী মানেই রং ফর্সা হতে হবে–এ কথাটি সত্য নয়। রং যা-ই হোক না কেন, পরিচর্যার মাধ্যমে আপনি হয়ে উঠতে পারেন অপরূপ সুন্দরী।

সর্বোপরি মনে রাখতে হবে সৌন্দর্যচর্চা মানে শুধু মুখমণ্ডলের চর্চা নয়, দেহের মাথা থেকে পা পর্যন্ত যত্ন নেয়া, পরিচর্যা করাই রূপচর্চার পূর্ণাঙ্গ রূপ।

এর সঙ্গে রয়েছে ব্যায়াম, পরিমিত ও স্বাস্থ্যসম্মত আহার, সাজপোশাক, আপনার ব্যক্তিত্ব, শিষ্টাচার, মানবিক গুণাবলি, শিক্ষা, কথা বলার ভঙ্গি, হাঁটা-চলা-বসার ভঙ্গি ইত্যাদি। এসব মিলিয়েই একজন মানুষকে সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে বিচার করা হয়।

সৌন্দর্যচর্চা ॥ গোসল

সুস্বাস্থ্য ও ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষায় গোসলের কোনো জুড়ি নেই। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে ঘাম, ময়লা ও ক্লান্তিজনিত অবসাদ দূরীকরণে মনের মতো গোসল কাজ করে টনিকের মতো। একারণেই যুগ যুগ ধরে গোসলকে শুধু আবশ্যিক কাজ হিসেবে দেখা হয় নি; বরং একে আনন্দময় ও কার্যকর করার জন্যে নানা মাত্রা সংযোজন করা হয়েছে। কথিত আছে, মিশরের রানি ক্লিওপেট্রা প্রতিদিন একশত গাধার দুধ দিয়ে গোসল করতেন। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের গোসলে লাগত সহস্র গোলাপ।

গোসল করার জন্যে বিভিন্ন দেশে তৈরি হয়েছিল হাম্মামখানা। আর মরুভূমির মানুষেরা সবসময়ই স্বপ্ন দেখত দরিয়ার হাম্মামে গোসল করার। দরিয়ার হাম্মাম মানে প্রবহমান নদী। পলী বাংলায় গ্রামের ধার দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীতে যে কেবল পুরুষেরাই গোসল করত তা নয়; কলসি কাঁখে দল বেঁধে পলীবালারাও পানিতে অবতরণের আনন্দে মেতে উঠত। নদীর পানিতে সাঁতার কেটে গোসল করার যে আনন্দ, তা থেকে শহরবাসীরা বঞ্চিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে একটু সহজ বুদ্ধি প্রয়োগ করলেই গোসল যেমন ত্বক পরিষ্কারে সহায়ক হতে পারে, তেমনি ক্লান্তি-অবসাদও দূর করতে পারে।

তাই আসুন গোসলের পূর্বে কী করলে আপনার ত্বকের সৌন্দর্য ও মনের প্রফুলতা বজায় থাকবে তা নিয়ে আলোচনা করি।

গোসল করার আগে শরীরকে অবশ্যই ঠান্ডা করতে হবে। বাইরে থেকে ঘাম নিয়ে অথবা রান্না ঘরের কাজ সারার পর পরই গোসল করতে যাবেন না। অবশ্যই ১০ মিনিট শরীরটাকে জুড়িয়ে নেবেন।

সাবান ও বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান বাদে প্রাকৃতিক উপায়েও আপনি সুন্দরভাবে পরিপূর্ণ এবং তৃপ্তিকর গোসল করতে পারেন। তবে এর আগে

আপনাকে আপনার ত্বক সম্পর্কে সচেতন হতে হবে; জানতে হবে আপনার ত্বক শুষ্ক, স্বাভাবিক, তৈলাক্ত না মিশ্র। যা-ই হোক না কেন–এর পরিচর্যায় প্রাকৃতিক ভেষজ উপাদান রয়েছে, যার কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

গোসলের জন্যে সাবানের পরিবর্তে অল্প খরচে বেসন বা আটা অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন। হাত-পায়ের দাগ, ময়লা তোলার জন্যে এক টুকরো লেবু নিতে পারেন। গা ঘষার জন্যে ব্যবহার করতে পারেন ধুনদুলের খোসা কিংবা ছোট তোয়ালেকে ব্যান্ডের মতো করে মুখে ইলাস্টিক লাগিয়ে নিজেই গ্লাভস-এর মতো বানিয়ে নিতে পারেন।

শুষ্ক ত্বক হলে বেসনের সাথে মধু মিশিয়ে মুখে মেখে নিন এবং গোসলের পাঁচ মিনিট আগে সারা শরীরে মাখন অথবা অলিভ অয়েল বা নারকেল তেল ভালো করে মেখে নিন। এবার সারা শরীরে পানি ঢেলে দিন। এবার পানি দিয়ে তৈরি বেসন বা আটার পেস্ট সারা শরীরে সাবানের মতো ঘষে নিয়ে পানি ছেড়ে গোসল করতে পারেন। মনে রাখবেন সুস্থ শরীরে কখনোই অতিরিক্ত ঠান্ডা পানি বা শরীরের তাপমাত্রার চেয়ে উষ্ণ পানি ব্যবহার করবেন না। আপনার ত্বক তৈলাক্ত হলে বেসন বা আটার সাথে শুধু পানি মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে সমস্ত শরীরে, মুখে ব্যবহার করতে পারেন।

মিশ্র ত্বক হলে শুষ্ক স্থানে মধু ও বেসনের পেস্ট এবং তৈলাক্ত স্থানে পানি ও বেসনের পেস্ট লাগিয়ে নেবেন। তারপর পর্যাপ্ত পানি দিয়ে ভালোভাবে গোসল সেরে নিন।

এবার যদি আপনি সুগন্ধিযুক্ত পানি গোসলে ব্যবহার করতে চান তবে তা প্রাকৃতিক উপায়ে বানানোর পদ্ধতি জেনে নিন।

ক. এক বালতি পানিতে কয়েকটি তাজা লেবুপাতা চটকে নিতে পারেন। ঐ পানি শরীরে ঢেলে নিলে শরীর থেকে লেবুর হালকা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসবে।

খ. এক মগ পানিতে কমলা লেবুর খোসা পাঁচ মিনিট ফুটিয়ে নিয়ে ঠান্ডা করে এক বালতি পানিতে মিশিয়ে শরীরে ঢালতে পারেন। এতে মিষ্টি সুন্দর গন্ধ পাওয়া যাবে।

গ. এক বালতি পানিতে কয়েকটি তাজা গোলাপের পাপড়ি পাঁচ/ ছয় ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে তা দিয়েও গোসল করতে পারেন। এই পানি ব্যবহার করলে শরীর থেকে গোলাপের হালকা গন্ধ আসবে। এভাবে বেলি ফুল দিয়েও পানি তৈরি করে নিতে পারেন।

ঘ. গোলাপ ফুলের পরিবর্তে অল্প গোলাপ জল পানিতে ঢেলে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন।

ঙ. যারা অতিরিক্ত ঘামেন তারা গোসল সেরে বালতির পানিতে অল্প ফিটকিরি মিশিয়ে গায়ে ঢেলে নিতে পারেন। এতে সেই দিন আপনি ঘাম ও ঘামের দুর্গন্ধ থেকে রেহাই পাবেন।

এবার ভেজা তোয়ালে বা গামছা দিয়ে শরীর ভালোভাবে মুছে ফেলুন।

গোসলের সময় আপনার যে-সব প্রয়োজনীয় জিনিস দরকার তা হলো–

১. শরীর ঘষার ব্রাশ বা ছোবড়া (ধুনদুলের ছোবড়া হাতে সেলাই করে নিতে পারেন)

২. নাইলনের তৈরি স্পঞ্জ–যা স্টেশনারি দোকানে পাওয়া যায়

৩. তোয়ালে বা গামছা

৪. সাবান বা প্রাকৃতিক উপাদান (বেসন, আটা কিংবা ময়দা)

৫. তেল (গোসলের একঘণ্টা পূর্বে ভালো করে শরীরে ম্যাসাজ করে নিন, এতে ত্বক মসৃণ থাকে)

প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কেশ পরিচর্যা

'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'–ঘন কালো চুলের এর চেয়ে সুন্দর উপমা হয়তো আর হয় না। তবে চুল শুধু কবির কল্পনাকেই প্রভাবিত করে নি; বরং চুলের সৌন্দর্যে যুগে যুগে সৌন্দর্যপিপাসুরা মোহাবিষ্ট হয়েছে। তাই চুলের পরিচর্যা চলে আসছে সুপ্রাচীন কাল থেকেই। সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার চুলও ছিল ঘন ও লম্বা। মিশরীয় সভ্যতায়ও কেশ পরিচর্যার প্রমাণ মেলে। বেণি বাঁধার রীতি মিশর থেকে গ্রিসে প্রচলিত হয়। রোমান নারীদের দুর্বলতা ছিল বব চুলের প্রতি, আর বাঙালি নারীর চুলের খোঁপা, সে-তো ভুবনবিখ্যাত। চুল আজানুলম্বিত হোক অথবা বব ছাঁট, বয়-কাট হোক অথবা পুষ্পিত খোঁপা–চুলের যথাযথ যত্ন না নিলে আপনার গর্বিত চুল ঝরে যাবে অকালেই।

চুল পরিচর্যার প্রাথমিক পদক্ষেপ হচ্ছে শ্যাম্পু। কিন্তু বাজারে প্রচলিত

অধিকাংশ রাসায়নিক শ্যাম্পু চুলের উপকারের পরিবর্তে ক্ষতিই করে বেশি। এ কারণে আজকাল সৌন্দর্যসচেতন নারীরা দেশি-বিদেশি রাসায়নিক শ্যাম্পুর পরিবর্তে প্রাকৃতিক শ্যাম্পু ব্যবহার করছেন। আমরা এবার প্রাকৃতিক উপায়ে চুল পরিষ্কার করার কয়েকটি প্রণালি সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রাকৃতিক উপায়ে চুল পরিষ্কার

শ্যাম্পু বা সাবান দিয়ে চুল পরিষ্কার করলে যাদের চুল পড়ে যায় বা এলার্জি হয় তারা প্রাকৃতিক উপায়ে চুল পরিষ্কার করতে পারেন। এতে চুলের ক্ষতিও হবে না এবং চুল পড়বেও অনেক কম। যারা ঘরের বাইরে বেশি যান তারা সপ্তাহে দুদিন অবশ্যই চুল পরিষ্কার করবেন। বাইরের ধুলোবালির জন্যে চুলের গোড়ার লোমকূপগুলো বন্ধ হয়ে যেতে চায়। এতে চুল বেশি পড়ে। যাদের চুল তৈলাক্ত তাদের চুলে ময়লা আটকায় বেশি।

মানুষের মুখের ত্বকের মতো চুলেরও বিভিন্ন ধরন আছে। যেমন :

১. তৈলাক্ত চুল

২. রুক্ষ চুল

৩. স্বাভাবিক চুল

তাই আপনার চুল যে ধরনেরই হোক না কেন, প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে পরিষ্কার করলে চুলের কোনো ক্ষতি হবে না। রাসায়নিক সামগ্রী ব্যবহার করলে তার অনেক বিধিনিষেধ মানতে হয়, কিন্তু প্রাকৃতিক সামগ্রীর তেমন কোনো বিধিনিষেধ নেই। এটি একটি বিরাট সুবিধা। এবার জেনে নিন কী কী উপায়ে প্রাকৃতিক শ্যাম্পু বানিয়ে আপনি মাথা পরিষ্কার করতে পারেন।

প্রথম পদ্ধতি

উপকরণ : দুই চামচ মেথি, চারটি শুকনো আমলকি (বিচি বাদ দিয়ে), মেহেদি পাতা বাটা এক টেবিল চামচ, খুসবু করার জন্যে এক টুকরো সোন্দা ও এক টুকরো লেবু।

প্রস্তুত প্রণালি : মেথি, আমলকি ও সোন্দা একত্রে ধুয়ে এক কাপ পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। মনে রাখবেন, যেদিন মাথা ধোবেন তার একদিন আগেই এগুলো ভেজাতে হবে। মেথি, আমলকি ও সোন্দা ভিজে ফুলে নরম হবে। এবার শিলপাটায় মেথি পিষে নেবেন। মেথি ভেজানো পানি ফেলবেন না। ঐ পানি একত্রে মিশিয়ে নেবেন। এবার একটি পাত্রে বাটা মেহেদি, মেথি,

লেবুর রস একসঙ্গে চটকে নরম পেস্টের মতো করে নিন। এই পেস্ট চুলে তেল দেয়ার মতো বিলি কেটে চামড়ায় এবং চুলে ভালো করে লাগিয়ে দুঘণ্টা রাখবেন। কমপক্ষে একঘণ্টা রাখলেও হবে। গোসলের সময় প্রথমে মাথায় পানি ঢেলে একটু নরম হলে আস্তে আস্তে ঘষে ঘষে পানি ঝেড়ে মাথা পরিষ্কার করবেন। এ পদ্ধতিতে চুল পরিষ্কার করতে একটু ঝামেলা মনে হলেও চুলের জন্যে বিশেষ উপকারী। মেথি পিচ্ছিল বলে এতে বেশি পানি দিয়ে মাথা পরিষ্কার করতে হয়।

তৈলাক্ত চুল হলে গোসলের শেষে এক টুকরো লেবুর রস মগে একটু পানির সাথে মিশিয়ে চুলে মেখে নিতে পারেন। এতে চুল যেমন নরম হবে তেমনি চকচকও করবে এবং মিষ্টি সুগন্ধ ভেসে আসবে।

রুক্ষ ও স্বাভাবিক চুলেও এ পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। চুলের পরিমাণ বুঝে একই অনুপাতে দ্রব্য বাড়িয়ে নিতে পারেন। এ পদ্ধতিতে চুল ধুলে চুলে খুশকি হয় না এবং চুলের গোড়া শক্ত হয়।

যারা প্রাকৃতিক উপায়ে চুলে রং করতে চান তারা মেহেদি পাতা বাটা বেশি করে দিলে আস্তে আস্তে কিছুদিন পর লালচে আভা আসবে। মেহেদি পাতার রস চুলের গোড়া শক্ত করে।

রিঠার সাহায্যে চুল ধোয়া

মাথার চুল পরিষ্কার করার কাজে রিঠা ফলের গুরুত্ব আজও অপরিসীম। স্যাপিনডাস প্রজাতির গাছের ফল রিঠা। রিঠা ফল দেখতে দুধরনের–বড় ও ছোট। রিঠা ফলের শাঁস সাধারণত পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যবহৃত হয়। এতে ১২ শতাংশ স্যাপেনিন নামক ফেনক (সাবান) রয়েছে বলে এটি মাথার চুলকে বেশ পরিষ্কার করে এবং ঝরঝরে রাখে।

রিঠা বীজের তেল সাবান তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। রিঠার নির্যাসের মধ্যে অল্প অল্প তেল থাকায় এটি চুলের কিউটিক্‌লের জন্যে বেশ উপকারী। আগে যখন শ্যাম্পু ছিল না তখন আমাদের মা-দাদীরা চুল ধোয়ার জন্যে রিঠা ব্যবহার করতেন। ফলে তাদের চুল ঘন, কালো আর লম্বা হতো। আজকাল যত রাসায়নিক সামগ্রী আমরা ব্যবহার করছি তত আমাদের চুল ঝরে পড়ছে।

প্রস্তুত প্রণালি : কয়েকটি রিঠা ধুয়ে নিয়ে শিলপাটায় ভেঙে ভেতরের বিচি বের করে ফেলুন। এবার চুলোয় পরিষ্কার হাড়ি বসিয়ে এক মগ পরিমাণ

পানিতে রিঠার খোসা ছাড়িয়ে ফুটিয়ে নিন। তিন/ চার মিনিট ফোটানোর পর ঠান্ডা করে হাত দিয়ে চটকে রসটাকে ভালো করে বের করে নিন। মাথাটা একটু ভিজিয়ে নেবেন; তারপর রিঠার রস দিয়ে আস্তে আস্তে মাথা ঘষতে শুরু করবেন। মাথা ঘষার পর বেশি পানি দিয়ে চুল ধুতে হবে। তা না হলে রিঠার রস চুলে থেকে যাবে এবং চুল একটু আঠা আঠা মনে হবে। বাজারে মনোহারি দোকানে রিঠা কিনতে পাবেন। এ ফলটি দেখতে ঘন বাদামি ও গোলাকার।

সর্ষের খৈল

সর্ষে যে কেবল আমাদের রান্নাবান্নায় ব্যবহৃত হয় তা নয়; রূপচর্চায়ও এর অবদান অনেক। আপনারা হয়তো বলবেন–চুল তো স্বাস্থ্যগত কারণেই ধোয়া দরকার, তার আবার রূপচর্চার সাথে সম্পর্ক কী? হ্যাঁ, আজকাল আর চুল শুধু ধুয়েই আমরা ক্ষান্ত নই। এখন এটিকে রূপচর্চার অঙ্গ হিসেবেও দেখছি।

আমরা যতই সাজগোজ করি না কেন, মাথায় তেল চিটচিটে চুল দেখলেই তাকে বলি–একেবারে গেঁয়ো। চুল ধুয়ে আমরা দেখি চুল চিকচিক করছে কিনা কিংবা সিল্কের মতো মনে হচ্ছে কিনা ইত্যাদি। তারপর রয়েছে নানা ঢং-এ চুল কাটা, বাঁধা ইত্যাদি। কারণ কেশবতী নারীর রূপই আলাদা।

এবার আসি সর্ষের কথায়। যে-কোনো বয়সের বাচ্চা হোক না কেন–খাঁটি সর্ষের তেল গায়ে মাখার রেওয়াজ আছে আমাদের দেশে। কিন্তু গ্রাম-বাংলায় সর্ষে খৈল দিয়ে চুল ধোয়ার রেওয়াজ সম্পর্কে আমরা কজনই বা জানি! হাতের কাছের সস্তা জিনিস ব্যবহার করেও আমরা চুলকে স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে পারি। এবার জেনে নিন কীভাবে সর্ষে খৈল দিয়ে চুল পরিষ্কার করবেন।

প্রস্তুত প্রণালি : প্রথমে কিছুটা সর্ষের খৈল একটি বাটিতে নিয়ে সারারাত ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন ভালো করে চটকে নিয়ে ছাঁকনি দিয়ে ভালোভাবে ছেঁকে সে পানি মাথার চুলে ভালো করে মেখে ঘণ্টা খানেক রাখুন। তারপর গোসলের সময় মাথা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করুন। বেশি করে পানি দিয়ে পরিষ্কার করে নিন। তারপর ভালোভাবে চুল শুকিয়ে নিন। দেখবেন চুল ঝরঝরে হয়ে বেশ ফুলে উঠেছে। তৈলাক্ত চুল হলে এক টুকরো লেবুর রস পানিতে মিশিয়ে চুলে ঢেলে নিতে পারেন। খৈল দিয়ে চুল ধুলে চুলে খুশকি হয় না।

মসুরের ডালের বেসন

রান্নার উপকরণ দিয়েও আপনি চুল পরিষ্কার করতে পারেন। বেসন দিয়ে যেমন শরীর পরিষ্কার করা যায়, তেমনি চুল পরিষ্কারের কাজেও এর অবদান কম নয়। আমাদের মা-দাদীরা বেসন দিয়ে চুল পরিষ্কার করতেন।

প্রস্তুত প্রণালি : চুলের পরিমাণ বুঝে মসুর ডাল নিয়ে ধুয়ে একটি পাত্রে পরিষ্কার পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর শিলপাটায় বেটে নিন। পানি মিশিয়ে পেস্টের মতো করে চুলে বিলি কেটে ঘণ্টাখানেক রেখে চুল ভালোভাবে পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলুন। ভালোভাবে চুল শুকালে আঁচড়ে ফেলুন। দেখবেন চুল ঝরঝরে হয়েছে। আপনার যদি গ্রাইন্ডিং মেশিন থাকে তবে তাতেও ডাল গুঁড়ো করে বেসন তৈরি করে নিতে পারেন। বেসনের সাথে পানি মিশিয়ে পেস্টের মতো তৈরি করে মাথায় ব্যবহার করতে পারেন।

চুল ধোয়ার পর কন্ডিশনার হিসেবে লেবু পানি চুলে ঢেলে দিতে পারেন। এতে চুলের খুশকিও দূর হয়। যে-কোনো ডালের বেসন দিয়েই চুল ধোয়া যায়, তবে মসুরের ডালের বেসনই সবচেয়ে ভালো।

পেঁয়াজের রস

এককালে বলা হতো, 'বউ ভালো লাজে, সালুন (তরকারি) ভালো পেঁয়াজে'—একথা হয়তো আমরা অনেকেই জানি। এর সাথে হয়তো আমরা অনেকেই জানি না যে, পেঁয়াজের রস চুলের এক মহৌষধ। চুলের খুশকি দূর করতে পেঁয়াজের রসের জুড়ি নেই। এমনকি পেঁয়াজের রস মাথায় ঘষলে নতুন চুলও গজায়।

প্রস্তুত প্রণালি : ছোট পেঁয়াজ কিছু পরিমাণ নিয়ে থেঁতো করে রস বের করে সম্পূর্ণ মাথায় বিলি কেটে তেল দেয়ার মতো করে ত্বকে ও চুলে রস মেখে নিন। ঘণ্টাখানেক রেখে বেশি করে পানি দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন। দেখবেন—চুল শুকালে রেশমের মতো ফুরফুরে হয়ে উঠেছে। অনেকে গন্ধের জন্যে পেঁয়াজ দিতে চান না। এক্ষেত্রে মাথা ধোয়ার শেষে পানির সাথে সুগন্ধি কিছু মিশিয়ে নিয়ে মাথায় ঢেলে নিতে পারেন। যেমন, এক মগ পানিতে দুই টুকরো শরবতি লেবুর রস মিশিয়ে মাথা ধোয়ার পর সমস্ত চুল লেবু পানি দিয়ে ধুয়ে দিলে শরবতি লেবুর খুসবু আসবে। আর যারা কৃত্রিম উপায়ে শ্যাম্পু দিয়ে ধুতে চান তারা চুলের উপযোগী শ্যাম্পু দিয়ে ধোবেন।

তেঁতুলের ক্বাথ

আপনার চুলের পরিমাণ অনুযায়ী তেঁতুল নিয়ে একটি বাটিতে পানির সাথে মিশিয়ে ঘন পেস্টের মতো বানিয়ে মাথায় বিলি কেটে ১০/১৫ মিনিট রেখে ভালো করে মাথা ধুয়ে নিলে দেখবেন চুল শুকানোর পরে কেমন ফুরফুরে, নরম ও সিল্কি হয়েছে।

যাদের অন্য কিছু স্যুট করে না তারা তেঁতুল দিয়ে চুল ধুলে উপকৃত হবেন এবং চুলও ছিঁড়বে না। চুলে কন্ডিশনার হিসেবে কিছু ব্যবহার করতে হবে না।

কেশ পরিচর্যা

খুব সাধারণ প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে চুল পরিষ্কার করার পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। চুলের প্রকার ভেদে বিভিন্ন উপাদানের প্রয়োগ সম্পর্কে আপনারা জেনেছেন। এবার কীভাবে চুলের যত্ন করতে হয় সে-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

১. চুল আঁচড়ানো

চুলকে সুন্দর, উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যে প্রত্যেকের উচিত চুল আঁচড়ানো। এতে চুলে আটকে থাকা ধুলোবালি ও মরা চুল দূর হয়। চুল আঁচড়ানো বা ব্রাশ করার ফলে মাথার ত্বকে রক্ত চলাচল বেড়ে গিয়ে চুলের পুষ্টি যোগায়।

চুল আঁচড়ানো চুলের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় হলেও অনেকে খুব বেশি চুল আঁচড়ান। এটা ঠিক নয়। এতে চুল ফেটে গিয়ে ভেঙে যেতে পারে। আবার আঁচড়ানোর জন্যে ব্যবহৃত ব্রাশ বা চিরুনি খারাপ হলে চুলের ক্ষতি হতে পারে। এজন্যে ব্রাশ বা চিরুনি কেনার সময় দেখে নেবেন এর দাঁতগুলো যেন বেশি তীক্ষ্ণ বা ধারালো না হয়। দাঁতের শেষ অংশ যেন গোলাকার বা মসৃণ হয়।

২. আঁচড়ানোর নিয়ম

প্রথমে মাথার ওপর থেকে চিরুনি বা ব্রাশ বসিয়ে টেনে চুলের নিচের অংশ–যাকে আমরা আগা বলি–সে পর্যন্ত নামাতে হবে। এভাবে ডান পাশ থেকে শুরু করে আঁচড়াতে আঁচড়াতে বাম পাশে যাবেন। আবার বাম পাশ থেকে ডান পাশে আসবেন। এভাবে ৭০ বার চুল আঁচড়ান। এবার সমস্ত চুল উঠিয়ে মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে নিয়ে গোড়া থেকে শুরু করে আগা পর্যন্ত

টেনে টেনে ব্রাশ করুন ৩০ বার। মোট ১০০ বার ব্রাশ করুন। এ পদ্ধতিতে প্রতিদিন একবার আঁচড়ান। এতে চুলের ঔজ্জ্বল্য বাড়বে এবং ময়লা জমতে পারবে না। রক্ত চলাচল বেড়ে গিয়ে চুল দীর্ঘায়ু হবে। চুল ঝরবেও কম। তাছাড়া আপনি যদি বজ্রাসনে বসে ব্রাশ করতে পারেন, তবে আপনার চুল অকালে পাকবেও না এবং ঝরবেও না। এটা অতি পরিচিত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে আপনি দুসপ্তাহের মধ্যেই ফল পাবেন। জাপানী মেয়েরা এভাবে বসেই চুল আঁচড়ায়।

৩. চিরুনি ও ব্রাশের যত্ন

চুলের যত্নের সাথে সাথে চিরুনি ও ব্রাশের যত্নও আপনাকে নিতে হবে। যেমন প্রতি দুদিন পর আপনি চিরুনি ও ব্রাশ পরিষ্কার করবেন–

ক. গরম পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে সাবান বা জেট পাউডার দিয়ে ব্রাশ পরিষ্কার করে পরে কয়েক ফোঁটা ডেটল বা স্যাভলন পানির সাথে মিশিয়ে ধুয়ে নেবেন।

খ. একটি পাত্রে পানি নিয়ে এক টেবিল চামচ খাবার সোডা মিশিয়ে সেই পানিতে প্রথমে চিরুনি বা ব্রাশ পরিষ্কার করে নিয়ে পরে সাবান পানিতে ধুয়ে নিতে পারেন।

৪. চুলকে সজীব ও সুন্দর রাখার জন্যে করণীয়

ক. একদিন কিংবা দুদিন অন্তর চুলের গোড়ায় ভালো করে তেল মালিশ করবেন। মালিশ করার সময় হাতের আঙুলের ডগার মাংসপিণ্ড দিয়ে মালিশ করবেন। তাড়াহুড়ো করে মালিশ করবেন না। আস্তে আস্তে ঘষবেন যেন মাথার তালুর ওপরই ঘষাটা লাগে, চুলের ওপরে নয়। এতে চুলের গোড়ায় রক্ত সঞ্চালন বাড়বে। চুল প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাবে। তেল শুধু চুলের গোড়ায় লাগাবেন। পরে চিরুনি বা ব্রাশ দিয়ে আঁচড়ালে সব চুলে তেল মেখে যাবে।

খ. সপ্তাহে একদিন অথবা দুদিন মাথা পরিষ্কার করবেন। এছাড়া চুল অপরিষ্কার মনে হলেই ধুয়ে নেবেন।

গ. শ্যাম্পু দিয়েই পরিষ্কার করুন কিংবা প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে চুল ধোয়ার একদিন আগে মাথায় তেল মালিশ করবেন। যে তেলই হোক, তেলটা সামান্য গরম করে নেবেন। এতে খুশকিও দূর হয় এবং চুল ধোয়ার পর বেশ নরম ভাব থাকে।

৫. মাথায় খুব খুশকি হলে

চুল ধোয়ার আগে তেল গরম করে মাথায় মালিশ করে তারপর একটা তোয়ালে গরম পানিতে ভিজিয়ে পানি নিংড়ে মাথায় ১০ মিনিট জড়িয়ে রাখবেন। তারপর খুশকি দূর করার ওষুধ বা শ্যাম্পু দিয়ে মাথা পরিষ্কার করবেন। এছাড়া প্রাকৃতিক উপায়েও আপনি খুশকি দূর করতে পারেন। যেমন : কাঁচা পেঁয়াজের রস মাথায় ভালোভাবে দিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিট রাখবেন। তারপর চুল ভালো করে পরিষ্কার করবেন। এভাবে কিছুদিন করার পর খুশকি দূর হবে। প্রতিদিন নিজস্ব চিরুনি বা ব্রাশ দিয়ে চুল আঁচড়াবেন। কখনো অন্যের ব্রাশ, চিরুনি ব্যবহার করবেন না।

৬. চায়ের লিকারের সাথে পাতি লেবুর রস

চায়ের কড়া লিকারের সাথে পাতি লেবুর কয়েক ফোঁটা রস মিশিয়ে মাথা ধোয়ার পর এই লিকার পানি দিয়ে চুল ধুয়ে নেবেন। এতে চুল পড়া কমবে এবং চুল চকচক করবে।

৭. শুকনো আমলকি

শুকনো আমলকি দুধে চার/ পাঁচ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখবেন। নরম হলে বেটে পেস্টের মতো করে মাথায় বিলি কেটে চুলের গোড়ায় ঘষে ঘষে লাগাবেন। অন্ততপক্ষে একঘণ্টা রেখে মাথা ধুয়ে ফেলবেন। আমলকির সাথে কয়েকটা মেহেদি পাতা দিতে পারলে খুব ভালো। এ পদ্ধতিতে চুল খুব ভালো থাকে।

৮. দুর্বাঘাস ও নারকেল তেল

একমুঠো দুর্বাঘাস খাঁটি নারকেল তেলের মধ্যে সারা রাত ভিজিয়ে রাখবেন। পরের দিন এ তেল রোদে ভালোভাবে গরম করে নিয়ে মাথায় বিলি কেটে লাগালে চুল ঘন হয়। এ তেল বোতলে রেখে দিতে পারেন। তবে রোজ রোদে দিতে হবে। মাথায় দেয়ার সময় রোদে গরম করে নেবেন।

৯. চুলে উকুন হলে কী করবেন

উকুন চুলের জন্যে যেমন ক্ষতিকর তেমনি অস্বস্তিকর। 'পেডিকুলসি ক্যাপিটিস' জাতের উকুন পরাশ্রয়ী জীবাণু। উকুন একজনের মাথা থেকে অন্যের মাথায় ছড়ায়। এরা মাথার ত্বকের ওপর বাস করে। এদের ধূসর বা সাদা রঙের লিক বা ডিম চুলের গোড়া থেকে একটু দূরে চুলের গায়ে গেঁথে থাকে। এর চিকিৎসা খুবই সহজ। বাজারে আজকাল উকুননাশক সাবান ও

শ্যাম্পু পাওয়া যায়। এ দিয়েও আপনি উকুন দূর করতে পারেন। এ-ছাড়া :

ক. সাড়ে পাঁচ গ্রাম ডিডিটির সঙ্গে সাড়ে তিন আউন্স ট্যালকম পাউডার মিশিয়ে একটা চূর্ণ তৈরি করে রাতে শোবার আগে চুলের ওপর বেশি করে দিয়ে একটা কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতে হবে। পরের দিন চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াতে হবে। এভাবে দু-তিন দিন ওষুধ প্রয়োগ করলে উকুন মরে যাবে।

খ. নারকেল তেলের সাথে ন্যাপথালিন গুঁড়ো করে মিশিয়ে চুলে লাগিয়ে ঘণ্টা খানেক রেখে দেবেন। তারপর মাথা ধুয়ে ফেলবেন। এভাবে কয়েক দিন লাগানোর পর উকুন মরে যাবে।

গ. প্রাকৃতিক উপায়েও উকুন দূর করা যায়। তুলসী পাতার রস উকুন নিধনে উপকারী। এর রস মাথায় বিলি কেটে দিয়ে ঘণ্টা খানেক রাখবেন। পরে মাথা ধুয়ে ফেলবেন।

ঘ. ধুতরা পাতার রস, পানের রস ও কর্পূর একসঙ্গে মিশিয়ে মাথায় লাগালে উকুন মরে যায়। এরপর মাথা ভালোভাবে ধুয়ে ফেলবেন।

১০. চুলের ডগা ফেটে গেলে

চুলের ডগা ফেটে গেলে মনে করবেন চুলের সর্বনাশ হয়েছে। কাজেই ডগা ফাটলে ডগা ছেঁটে ফেলবেন। এ-ছাড়া কোনো উপায় নেই। তা না হলে চুল আর বাড়বে না। ধৈর্য ধরে চুল ব্রাশ করবেন। নিয়মিত খাবারের মধ্যে ভিটামিন ‘সি’ জাতীয় খাবার রাখবেন। তাহলে উপকার পাবেন। নিয়মিত তেল মালিশ করবেন। সপ্তাহে দুদিন চুল ধোবেন। খাবারের মধ্যে ‘এ’ জাতীয় ভিটামিন রাখবেন। তাহলে চুল ও ত্বক উভয়ই সুন্দর হবে। গাজরে প্রচুর ভিটামিন ‘এ’ পাওয়া যায়। আমড়া আমলকি লেবু পেয়ারায় প্রচুর ‘সি’ ভিটামিন পাওয়া যায়। মৌসুমের সময় এগুলো খেলে উপকার পাবেন। সন্তান প্রসবের পরও অনেক মায়ের চুল পড়ে যায়। ক্যালসিয়াম ও আয়রনের অভাব হলে এটা হয়ে থাকে। তখন ডাক্তার দেখিয়ে পরামর্শ নিতে পারেন। মনে রাখবেন চুল নারীর সৌন্দর্যের এক অপরিহার্য অঙ্গ। একে অবহেলা করা উচিত নয়।

সব ধরনের চুলের যত্নে করণীয়

১. সবসময় চিরুনি, ব্রাশ পরিষ্কার রাখবেন।

২. অন্যের চিরুনি, ব্রাশ ব্যবহার করবেন না।

৩. খুব ঘন ঘন চুল ছাঁটবেন না। অন্তত পক্ষে একমাস বা দেড় মাস অন্তর ছাঁটবেন।
৪. চুলের আগা ফাটলে ছেঁটে ফেলবেন।
৫. চুল খুব শক্ত কিংবা টান টান করে বাঁধবেন না।
৬. চুলে রাসায়নিক দ্রব্য পারতপক্ষে ব্যবহার করবেন না।
৭. অন্তত পক্ষে সপ্তাহে দুদিন চুলে তেল মালিশ করবেন।
৮. অতিরিক্ত সূর্যের আলো চুলের জন্যে খারাপ। তাই এর হাত থেকে চুলকে রক্ষা করবেন।
৯. বাইরে থেকে এসে চুল ব্রাশ করবেন, যাতে চুলে ধুলোবালি জমতে না পারে।
১০. খাবারের সাথে ভিটামিন 'এ', ভিটামিন 'সি', ভিটামিন 'বি' কমপেক্স ও প্রোটিন রাখবেন। এতে চুলের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং চুল অকালে পাকবে না।
১১. ছোট মাছ খাবেন।
১২. সর্বোপরি জাজেন বা বজ্রাসনে বসে ছোটবেলা থেকে প্রতিদিন ১০০ বার চুল ব্রাশ করলে চুল অকালে পাকবে না। চুলে খুশকি হবে না।

ত্বকের যত্ন

আপনার যা জানা উচিত

আমরা একজন মানুষের বয়স, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বুঝতে চেষ্টা করি তার মুখের দিকে তাকিয়ে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং বয়সের ভারে মানুষের মুখে ক্লান্তিবোধ এবং বয়সের ছাপ পড়ে। বয়সের জন্যে ত্বক কুঁচকে যায় এবং মুখে বলিরেখার জন্ম নেয়। কেউ কেউ আবার ত্বকের ওপর বয়সের ছাপ পড়তে দিতে নারাজ। এটি একান্তই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। তবে এ সবকিছুর পেছনেই রয়েছে সুস্পষ্ট কিছু শারীরিক ও মানসিক কারণ।

১. পাশ্চাত্যে ট্যানিং অবসর বিনোদনের অবলম্বন হিসেবে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ট্যানিং হলো শরীরের ত্বককে এমনভাবে tuned করা, যাতে রোদ ত্বকের কোনোরকম ক্ষতি করতে না পারে।

২. তীব্র রোদে ঘোরাফেরা করলে ত্বকে কতগুলো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেমন : বিশেষজ্ঞরা বলছেন অতিরিক্ত রোদে পোড়ার কারণে ত্বকে ক্যান্সার হয়, ত্বক কুঁচকে যায় এবং পিগমেন্ট (ত্বকের বর্ণ নিয়ন্ত্রক পদার্থ) পরিবর্তিত হয়।

৩. অতিরিক্ত তাপে ত্বকের আর্দ্রতা হ্রাস পায়।

রেটিন 'A'-এর আবিষ্কারক ড. কিগম্যান বলেছেন যে, মহিলারা যদি সূর্যালোক এড়িয়ে চলেন তবে তাদের মুখের ত্বক বাহুর ত্বকের মতোই টানটান, মসৃণ ও কোমল থাকবে। লোক ভেদে, জাত ভেদে ত্বকের বর্ণও পরিবর্তিত হয়। জন্ম থেকেই যাদের ত্বকের রং ফ্যাকাসে-সোনালি এবং মাথার চুল লাল, তাদের রোদে পুড়িয়ে ত্বক কালো করে ফেললে স্বাভাবিক বাদামি রং পেতে পারেন।

রোদ পোহানো যাদের খুব প্রিয় তাদের মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই। তারা রোদের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে বাঁচার জন্যে ‘সানস্ক্রিন’ নিয়ে রোদ লাগাতে পারেন যতক্ষণ খুশি।

সবারই জানা উচিত বয়স বাড়লে মানুষের ত্বকের চর্বি গঠিত ডারমাসিসের (নিচের সাপোর্টিং অংশ) স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা কমতে থাকে।

ডারমাসিসে পানি এবং কিছু কোষ থেকে ‘কোলাজেন’ ও ‘ইলাস্টেন’ তৈরি হয়। কোলাজেন ও ইলাস্টেন ত্বককে দৃঢ় করে এবং স্থিতিস্থাপকতা ধরে রাখতে সাহায্য করে; যাকে আমরা সজীবতা, তারুণ্য ইত্যাদি বলি। বয়স বাড়লে ডারমাসিস আর আগের মতো পানি এবং চর্বি ধরে রাখতে পারে না। নতুন কোষ উৎপাদন কমে যায়, ফলে ওপরের ত্বকে পুরনো কোষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এ সময়ই মানুষের মধ্যে বয়সের ছাপ স্পষ্ট হয়। গালে গলায় ত্বকে ভাঁজ পড়ে, চামড়া কুঁচকে যায় এবং বিবর্ণ হয়ে পড়ে।

সবসময় মনে রাখবেন, অসুখ সারানোর চিকিৎসা করার চেয়ে আগে থেকে অসুখ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ভালো। ত্বকের যত্ন নেয়ার তিনটি বিষয় মনে রাখতে হবে। এক. ত্বক পরিষ্কার রাখা, দুই. ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখা, তিন. ত্বক আর্দ্র রাখা। যত্নের সঙ্গে ত্বক পরিষ্কার করলে মেক-আপ, সারাদিনের ময়লা এবং দেহনিঃসৃত ঘাম ইত্যাদি দূর হয়। ত্বকের লোমকূপ পরিষ্কার থাকে। কৃত্রিম উপায়ে ত্বক আর্দ্র রাখলে বয়সজনিত শুষ্কতা হতে পারে না এবং ত্বক সজীব থাকে।

আপনি যদি নিয়মিত রোদ এড়িয়ে চলেন, ত্বকের যত্ন নেন, ব্যায়াম করে ত্বককে কর্মক্ষম রাখেন এবং প্রচুর পানি পান করেন তাহলে আপনার ত্বক কখনো স্বাভাবিক সজীবতা ও লাবণ্য হারাবে না। আর বয়স আপনাকে কখনো ছুঁতে পারবে না।

মনে রাখবেন, সূর্য থেকে যে অতিবেগুনি রশ্মি বেরোয় তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে শরীরে অতিরিক্ত পরিমাণ মেলানিন তৈরি হয়। আর এই অতিরিক্ত মেলানিন তৈরি হওয়ার কারণে ত্বকের রং বদলে যেতে পারে। অতিবেগুনি রশ্মি থেকে ত্বক বাঁচাতে রোদে ছাতা ব্যবহার করুন। বিদেশে অবশ্য সানব্রেলা বলে ছাতা পাওয়া যায়।

তাছাড়া ত্বকের যত্নে রয়েছে খাবারের বিশেষ ভূমিকা। নিচে উলিখিত জিনিসগুলো মিলিয়ে একটা হালকা নাশতা জাতীয় খাবার তৈরি করে নিন। এ খাবার আপনার ত্বককে আরও পরিপুষ্ট করবে।

এককাপ দই, একটি কলা, আধা কাপ জাম, তিন টেবিল চামচ আটা, এক টেবিল চামচ ইস্ট, এক টেবিল চামচ হেসিথিন, এক চা চামচ দানাদার ভিটামিন সি, ডিমের আস্ত একটি কুসুম। পরিমাণমতো জেলাটিন পাউডার। গন্ধ ও স্বাদ বর্ধক হিসেবে এক চা চামচ মধু মিশিয়ে নিতে পারেন।

মুখের যত্ন

কথায় বলে, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। তাই আমাদের জানা উচিত, কীভাবে নিজেকে সুন্দর রাখা যায়। মানুষ সুন্দর হয়ে জন্মালেও যত্নবান না হলে সৌন্দর্য বেশিদিন টেকে না। আমরা অনেকেই মনে করি, গায়ের রং ফর্সা হলেই বুঝি সে সুন্দর। আসলে তা নয়। রং আপনার যা-ই হোক না কেন, যদি তাতে গ্ল্যামার বা লাবণ্য থাকে, তাকেই আজকাল সুন্দর বলে। ঘোলাটে, নির্জীব, দাগযুক্ত ত্বক যেমন নিজের কাছে খারাপ লাগবে তেমনি অন্যের কাছেও খারাপ লাগবে। আলাহ আপনাকে যেমনই বানান না কেন, একটু চেষ্টা করলেই আপনি অনেকখানি আকর্ষণীয় হতে পারেন সবার কাছে। তার জন্যে শুধু দরকার ধৈর্য ও নিয়ম মাফিক পরিচর্যা।

মেয়েদের ২৪/২৫ বছর বয়স থেকেই বিশেষভাবে ত্বকের যত্ন,

খাওয়াদাওয়া, ব্যায়াম ইত্যাদির দিকে নজর দেয়া উচিত। তাহলে ৫০ বছর বয়সেও নিজের রূপ ও সৌন্দর্য ধরে রাখা সম্ভব। সঠিক পদ্ধতি জেনে নিয়ে ধৈর্য ধরে নিজের পরিচর্যা করতে হবে।

ত্বককে সুন্দর ও সতেজ রাখার জন্যে আপনাকে জানতে হবে আপনার মুখমণ্ডলের ত্বক কী ধরনের। যেমন–

১. স্বাভাবিক ত্বক
২. তৈলাক্ত ত্বক
৩. শুকনো ত্বক
৪. মিশ্র ত্বক

আপনার ত্বক কী ধরনের তা বোঝার জন্যে আপনি রাতে ভালোভাবে মুখ ধুয়ে মুছে ঘুমোবেন। মুখে কিছু লাগাবেন না। এবার সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আয়নার সামনে দাঁড়ালেই বুঝতে পারবেন। যদি দেখেন মুখটা ভীষণ তেলতেলে হয়ে আছে, তবে বুঝবেন আপনার মুখ তৈলাক্ত। একটি টিস্যু পেপার দিয়ে মুছে দেখবেন টিস্যু পেপারটি তেলতেলে হয়ে গেছে। আর যদি দেখেন মুখমণ্ডলে হালকা তৈলাক্ত ভাব, শুধু নাক ও কপাল একটু চকচক করছে, কিন্তু চোখের কোণ খানিকটা শুকনো মনে হয়, টিস্যু পেপার দিয়ে মুখ মুছলেও খুব একটা তেল ভাব হয় না, তবে বুঝবেন আপনার ত্বক স্বাভাবিক ধরনের। আর শুকনো ত্বক দেখেই বুঝবেন। এ ত্বকে তেলতেলে ভাব দূরের কথা সতেজ ভাবও দেখা যায় না। এ ত্বকে অল্পতেই বলিরেখা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা বেশি। এ ত্বক টিস্যু পেপার দিয়ে মুছলেও তেলতেলে ভাব মনে হবে না। আর মিশ্র ত্বকে মুখের বিভিন্ন অংশের ত্বকের প্রকৃতি বিভিন্ন রকম। নাক ও কপাল দেখা গেল তেলতেলে ভাব আবার গাল হতে পারে শুকনো। এ জাতীয় ত্বক হচ্ছে মিশ্র ত্বক। এ ত্বকের যত্নে শুকনো অংশের জন্যে শুকনো ত্বকের বিশেষ পরিচর্যা ও তৈলাক্ত অংশের জন্যে তৈলাক্ত ত্বকের উপযোগী বিশেষ পরিচর্যা গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের ত্বকের পরিচর্যা করা একটু ঝামেলার। তবে ধৈর্য ধরে করলে সুফল পাবেন। এবার জেনে নিন ত্বকের প্রকারভেদ অনুসারে কীভাবে ত্বকের পরিচর্যা করতে হবে।

স্বাভাবিক ত্বক

ক. এ ধরনের ত্বকে সাধারণত সমস্যা অনেক কম। তাই অনেকে মনে করেন, এ ধরনের ত্বকের আর যত্নের দরকার কী? এমনিতেই ভালো

আছে। কিন্তু একটা বয়সের পর ত্বক নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। তাই এ জাতীয় ত্বকের প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করা উচিত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মানেই যেমন ধোয়া-মোছা তেমনি ত্বকের পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রেও ধোয়া-মোছাই প্রথম। দিনে-রাতে মিলিয়ে কম করে পাঁচ বার মুখ স্বাভাবিক পানি দিয়ে ধোবেন। এতে ধুলোবালি লোমকূপের গোড়ায় আটকে থাকতে পারবে না। ত্বক সজীব মনে হবে। সাবান অথবা বেসন ব্যবহার করে মুখমণ্ডল পরিষ্কার করতে পারেন। তবে সাবান বেশি না দেয়াই ভালো। প্রাকৃতিক উপাদান, যেমন: বুটের বেসন দিয়ে মুখমণ্ডল পরিষ্কার করতে পারেন। সাবানে যাদের এলার্জি তারা অনায়াসেই বেসন ব্যবহার করতে পারেন।

খ. রাতে শোবার আগে কুসুম গরম পানি নিয়ে বেসন দিয়ে মুখ ধুয়ে নেবেন। পরে মুখ মুছে গ্লিসারিনের সাথে সমপরিমাণ পানি মিশিয়ে মুখে মেখে নিতে পারেন। এতে মুখের ত্বক নরম থাকবে এবং খসখসে হবে না। এছাড়া আপনি কোন স্কিন টনিক বা ফ্রেশনারও লাগাতে পারেন।

গ. সপ্তাহে অন্ততপক্ষে দুই/ তিন দিন ফেসপ্যাক লাগাবেন। ফেসপ্যাক লাগানোর ১৫/২০ মিনিট পরে মুখমণ্ডল ভালোভাবে স্বাভাবিক ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন। এতে মুখের উজ্জ্বলতা বাড়বে।

ঘ. বাইরে থেকে ঘরে ফিরে অবশ্যই মুখমণ্ডল ভালোভাবে ধোবেন, যাতে মেক-আপ লেগে না থাকে। বাইরের ধুলোবালি লোমকূপের গোড়ায় যেন আটকে না থাকে। তাহলে ব্রণ হওয়ার ভয় থাকে না।

ঙ. মাঝে মাঝে মুখে গরম পানির ভাপ নিতে পারেন। এতে লোমকূপের গোড়া খুলে গিয়ে তেল-ময়লা জমতে পারবে না এবং ব্রণ হওয়ার আশঙ্কা কমে যাবে।

প্রতি রাতে অবশ্যই খুব ভালোভাবে মুখ ধুয়ে পরিষ্কার করে ঘুমোবেন। অসুবিধা হলে নিয়মিত ক্রিম লাগাতে পারেন। যে ক্রিম আপনার ত্বকে স্যুট করবে সেটাই ব্যবহার করবেন।

স্বাভাবিক ত্বকের জন্যে কয়েকটি ফেসপ্যাক

এই ফেসপ্যাক থেকে যে-কোনো একটি সপ্তাহে দুই/ তিন দিন ব্যবহার করতে পারেন।

১. কমলালেবুর খোসা বাটা + অলিভ অয়েল + কাঁচা ডিমের কুসুম। এগুলো একত্রে মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে মুখমণ্ডলে লাগিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট রেখে স্বাভাবিক ঠান্ডা পানিতে মুখ ধুয়ে ফেলবেন।
২. কয়েকটি চীনাবাদাম ভিজিয়ে বেটে নিন + কয়েক ফোঁটা খাঁটি মধু একত্রে মিশিয়ে মুখে ২০ মিনিট রেখে প্রথমে হালকা গরম পানি ও পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন।
৩. কমলালেবুর খোসা বাটা + কয়েক ফোঁটা মধু একত্রে মিলিয়ে মুখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট রেখে প্রথমে হালকা গরম পানি ও পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
৪. কাঁচা ডিমের কুসুম + এক চামচ বেসন ও দুধের সর একত্রে পেস্টের মতো করে মুখে ১৫/২০ মিনিট রেখে প্রথমে কুসুম গরম পানি, পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
৫. কাঁচা ডিমের কুসুম + এক চামচ অলিভ অয়েল একত্রে মিশিয়ে মুখে ১৫ মিনিট রেখে স্বাভাবিক ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
৬. কাঁচা ডিমের কুসুম + অলিভ অয়েল ও মধু একত্রে মিশিয়ে মুখে মেখে ১৫/২০ মিনিট রেখে ঠান্ডা পানিতে মুখ ধুয়ে ফেলুন।
৭. ছোলার ডালের বেসন + মধু একত্রে মিশিয়ে মুখে ১৫/২০ মিনিট রেখে প্রথমে হালকা গরম পানি, পরে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে ফেলুন। এ পদ্ধতি মুখের রং উজ্জ্বল করে এবং ত্বক নরম রাখে।
৮. মসুরের ডাল বাটা বা ডালের বেসন + কাঁচা দুধ + কয়েক ফোঁটা লেবুর রস + কয়েক ফোঁটা মধু একত্রে পেস্টের মতো করে মুখে লাগিয়ে ২০ মিনিট রাখুন। তারপর ঠান্ডা পানিতে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

তৈলাক্ত ত্বক

তৈলাক্ত ত্বক দেখলেই সহজে বোঝা যায়। তৈলাক্ত ত্বককে ভালো ত্বক বলা হলেও এর সমস্যা সবচেয়ে বেশি। তবে এ ত্বক বেশি বয়স পর্যন্তও সজীব থাকে এবং বলিরেখা সহজে পড়ে না। গরমকালে এ ত্বক থেকে বেশি পরিমাণে তেল বের হয়। তাই অন্যান্য ত্বকের তুলনায় এ ত্বকের যত্ন বেশি নিতে হয় এবং পরিষ্কার রাখতে হয়। দিনে-রাতে মিলিয়ে ৮/১০ বার মুখ ধুয়ে এ ত্বক পরিষ্কার করলে ভালো। তা না হলে ব্রণ, ব্ল্যাক হেডস, একনি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে মুখে দাগ সৃষ্টি হয়ে বিশ্রী হয়ে যায়।

ক. এ জাতীয় ত্বক সাবান বা বেসন দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার রাখা উচিত।

খ. সবসময় হালকা গরম পানি দিয়ে ধোবেন এবং পরে নরম তোয়ালে বা গামছা দিয়ে মুখ ভালোভাবে মুছে নেবেন।

গ. মেক-আপ করার আগে কোনো অ্যাস্ট্রিনজেন্ট লোশন তুলোয় করে নিয়ে মুখে লাগাবেন। এর ফলে মুখ থেকে বেশি তেল বেরিয়ে মেক-আপ নষ্ট হবে না।

ঘ. মুখে ব্রণ হলে হাত দিয়ে খোঁটাখুঁটি করবেন না।

ঙ. বেশি তেল ঘি ভাজাপোড়া মশলা খাবেন না। ডাক্তারের পরামর্শে ভিটামিন-এ, ভিটামিন-ডি, ভিটামিন-সি মাঝে মধ্যে খেতে পারেন।

চ. প্রতিদিন দুই/ তিন লিটার পানি পান করবেন।

ছ. রাতে ঘুমানোর আগে হালকা গরম পানি, মসুর ডালের বেসন দিয়ে মুখ ভালোভাবে ধুয়ে শোবেন। শীতের দিনে গ্লিসারিন সমপরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে নিয়ে মুখে মেখে নিতে পারেন। গরমকালে কিছু দেয়ার দরকার হবে না।

জ. ক্রিমজাতীয় জিনিস তৈলাক্ত মুখে না দেয়াই ভালো। এতে ব্রণ হওয়ার আশঙ্কা খুব বেশি।

ঝ. বাইরে থেকে ঘরে ফিরে অবশ্যই মুখমণ্ডল খুব ভালো করে ধুয়ে নেবেন। তা না হলে বাইরের ধুলোবালি লোমকূপের গোড়ায় আটকে ব্রণ উঠতে পারে। প্রথমে হালকা গরম পানি দিয়ে, পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ ধোবেন।

ট. সবসময় নিজের তোয়ালে ও চিরুনি পরিষ্কার রাখবেন।

ঠ. সপ্তাহে দুদিন মুখে ফুটন্ত পানির ভাপ নিতে পারেন। ভাপ নেয়ার আগে মুখে কোনো নারিশিং ক্রিম ভালো করে মালিশ করে নেবেন। এতে ব্ল্যাক হেডগুলো (কালো মুখওয়ালা ব্রণ) নরম হয়ে উঠবে। তখন একটা স্টেরিলাইজড তুলো জড়ানো সরু কাঠি দিয়ে ব্ল্যাক হেডগুলোর চারপাশে চাপ দিলে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে। তবে সাবধানে করতে হবে। নতুবা খোঁচা লেগে দাগ হতে পারে। একদিনে না বেরোলে জোর করে বের করতে যাবেন না। পরের দিন আবার চেষ্টা করবেন।

ড. যদি ভাপ নিতে না চান তবে গরম পানিতে সামান্য বোরিক পাউডার

মিশিয়ে তুলো ভিজিয়ে সেঁক দিতে পারেন। তাতেও উপকার পাবেন। এতে ব্রণের মধ্যকার জিনিস বেরিয়ে যায়। তবে ব্রণে যেন কোনো আঘাত না লাগে সেদিকে খেয়াল করতে হবে। একদিনে না বেরোলে দু-তিন দিনে বের করবেন। একদিনে চেপে বের করতে গেলে ক্ষতি হতে পারে।

তৈলাক্ত ত্বকের কয়েকটি ফেসপ্যাক

১. মসুরের ডালের বেসন + খাঁটি সর্ষের তেল একত্রে মিশিয়ে পাতলা পেস্টের মতো করে মুখে লাগিয়ে তিন/ চার ঘণ্টা রেখে হালকা গরম পানি দিয়ে ঘষে ঘষে ধুয়ে ফেলুন। ঘষার সময় দেখবেন সাবানের ফেনার মতো হচ্ছে। এতে মুখের দাগ উঠে যায়, রং ফর্সা হয়। এই প্যাকে পানি লাগাবেন না। বেসনের সাথে তেল মেশান।

২. মসুরের ডাল বাটা + দুধের সর একত্রে ১৫/২০ মিনিট মুখে রেখে প্রথমে হালকা গরম পানি দিয়ে, পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৩. ডিমের সাদা অংশ + কয়েক ফোঁটা লেবুর রস একত্র করে ১৫ মিনিট রেখে স্বাভাবিক ঠান্ডা পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন।

৪. মসুরের ডালের বেসন + মধু একত্র করে ১৫/২০ মিনিট মুখে রেখে প্রথমে হালকা গরম পানি এবং পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৫. অলিভ অয়েল + কাঁচা ডিমের কুসুম + মসুরের ডাল বাটা একত্রে মুখে মেখে ১৫/২০ মিনিট রেখে ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

শুকনো ত্বক

শুকনো ত্বকের খুব বেশি যত্নের প্রয়োজন হয়। তা না হলে বয়স হলেই বলিরেখা পড়তে চায় এবং কুঁচকে যেতে চায়।

ক. শুকনো ত্বকে সবসময় তৈলাক্ত জিনিস ব্যবহার করা প্রয়োজন। বেশি সাবান ব্যবহার করা উচিত নয়। বেসন ব্যবহার করা উচিত। ছোলার ডালের বেসন এ ত্বকের জন্যে উপকারী। সাবান ব্যবহার করলে গ্লিসারিন সাবান ব্যবহার করা যেতে পারে।

খ. মুখ ধোয়ার পর সবসময় কোনো স্কিন টনিক বা ফ্রেশনার লাগাবেন। এতে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়বে।

গ. মেক-আপের আগে ভালোভাবে ময়েশ্চারাইজার লাগাবেন। এতে

মুখের ত্বক নরম ও ভেজা থাকবে।

ঘ. শুকনো ত্বকে কখনও অ্যাস্ট্রিনজেন্ট লোশন লাগাবেন না। এতে ত্বক আরও রুক্ষ হবে।

ঙ. গোসলের আগে প্রতিদিন, তা না পারলে সপ্তাহে দুদিন অলিভ অয়েল কিংবা সর্ষের তেল ১৫/২০ মিনিট ধরে ঘষে ঘষে লাগাবেন। আধঘণ্টা পরে ছোলার ডালের বেসন ও দুধের সর বা কাঁচা দুধ মেশানো পেস্টের মতো করে গায়ে ও মুখে মেখে গোসল করবেন।

চ. রাতে ঘুমানোর আগে এক চা চামচ কাঁচা দুধ নিয়ে তুলোয় ভিজিয়ে মুখে মেখে ১০ মিনিট রেখে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে ফেলবেন।

ছ. শসার রস ১০ মিনিট মুখে মেখে ধুয়ে ফেলবেন। এতে রং ফর্সা হয় ও উজ্জ্বলতা বাড়ে।

জ. বাইরে থেকে এসে মুখ ভালোভাবে ধুয়ে ফেলবেন।

ঝ. রাতে মুখ ধুয়ে সমপরিমাণ পানির সাথে গ্লিসারিন মিশিয়ে মুখে মাখতে পারেন। মুখ নরম থাকবে। খসখসে ভাব হবে না।

ঞ. প্রচুর পানি খাবেন। ভিটামিন-সি, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-ডিযুক্ত খাবার খাবেন। প্রতিদিন দুধ খাবেন।

ট. রাতে হালকা গরম পানি ব্যবহার করে ছোলার বেসন দিয়ে মুখ ধুয়ে কোনো ক্রিম বা গ্লিসারিন মেখে নেবেন। স্বাভাবিক ত্বকের ফেসপ্যাকগুলো শুকনো ত্বকেও ব্যবহার করা যায়।

মিশ্র ত্বক

ত্বকের যত্নে ত্বক পরিষ্কার রাখাটা সব ত্বকের বেলায় এক। তাই মিশ্র ত্বক হলেও দিনে-রাতে কমপক্ষে পাঁচ বার ধুতে হবে। মিশ্র ত্বকের যত্নও স্বাভাবিক ত্বকের মতো। মিশ্র ত্বক দেখলেই বোঝা যায়। যেমন : সাধারণত নাকের ডগা, চিবুক তেলতেলে হয়ে থাকে। এ ত্বকের শুকনো জায়গায় শুকনো ত্বকের পরিচর্যার দরকার হয়। তাই মুখ ধোয়ার পর তৈলাক্ত অংশে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট লোশন এবং শুকনো অংশে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হয়। এ ত্বকের বেলায়ও কিছু নিয়ম মানতে হয়, যেমন–

ক. মাঝে মাঝে ভাপ নিতে হয়।

খ. সপ্তাহে তিন/ চার দিন ফেসপ্যাক লাগাতে হয়।

গ. রাতে শোবার আগে ভালোভাবে মুখ ধুয়ে ক্রিম লাগাবেন। শুকনো অংশে তৈলাক্ত ক্রিম এবং তৈলাক্ত অংশে লোশন ক্রিম লাগাবেন।

ঘ. বাইরে থেকে এসে সবসময় মুখ ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করুন।

ঙ. বেশি করে পানি পান করবেন। খাবারে ভিটামিন-সি, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-ডি রাখবেন।

মিশ্র ত্বকের জন্যে কয়েকটি ফেসপ্যাক

১. ডিমের একটু সাদা অংশ + দুই চামচ কমলালেবুর রস + এক চা চামচ মধু মিশিয়ে মুখে মেখে ১৫ মিনিট রাখুন। এরপর ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন।

২. দুধের সর + বেসন বা ওটমিল + লেবুর রস মিলিয়ে মুখে ১৫ মিনিট রেখে প্রথমে হালকা গরম, পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৩. কাঁচা হলুদ + ময়দা + দুধের সর একত্রে মেখে ১৫ মিনিট রেখে প্রথমে হালকা গরম, পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৪. শসার রস ও কয়েক ফোঁটা লেবুর রস ১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।

মুখের পরিচর্যায় সবসময় মনে রাখবেন–

১. যে প্যাকটি আপনার ত্বকের সাথে সবচেয়ে মানিয়ে যাবে সেটি ব্যবহার করবেন।

২. প্রতিদিন সাত/ আট ঘণ্টা ঘুমোনো উচিত।

৩. তেল-মশলা, ভাজাপোড়া খাবার কম খাবেন।

৪. সবজি, কাঁচা ফলমূল ও সালাদ বেশি পরিমাণে খাবেন।

৫. পানি বেশি করে পান করবেন।

৬. ভিটামিন-সি, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-ডি এবং ভিটামিন-ই যুক্ত খাবার প্রতিদিনই খাবেন। এতে ত্বক ভালো থাকবে।

৭. সপ্তাহে অন্তত দুদিন প্যাক ব্যবহার করবেন।

৮. প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে কুসুম গরম পানি, প্রাকৃতিক উপাদান অথবা আপনার পছন্দের সাবান দিয়ে মুখ ভালো করে পরিষ্কার করে মুছে নিন। পরে ময়েশ্চারাইজিং লোশন দিয়ে পাঁচ মিনিট হালকাভাবে মুখ ম্যাসাজ করুন।

কম খরচে প্রাকৃতিক উপায়ে রূপচর্চা

আজকাল প্রসাধন সামগ্রীর দাম শুনলে আঁতকে উঠতে হয়। আর দামের কথা বাদ দিলেও রাসায়নিক প্রসাধনী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু আপনি তরিতরকারি ও দৈনন্দিন খাবারে ব্যবহৃত সামগ্রী দিয়েও সহজেই নিজেকে অপরূপ করে তুলতে পারেন। এতে ব্যয়ও যেমন কম, আর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে।

১. আটা

ক. রান্না ঘরের আটা আপনার ত্বক পরিচর্যায় অনেক সহায়ক হতে পারে। যে ধরনেরই ত্বক হোক না কেন, আটা সব ত্বকের জন্যেই ভালো কাজ করে। এক টেবিল চামচ পরিষ্কার আটা নিয়ে তার সাথে গরুর কাঁচা দুধ, একটু কাঁচা হলুদ বাটা মিশিয়ে মুখে মেখে ১০/১৫ মিনিট রেখে মুখ ধুয়ে ফেলবেন।

খ. আটা পানিতে ফুটিয়ে পেস্টের মতো করে মুখমণ্ডলে লাগালে মুখের ছিট ছিট তিলে দাগ অনেক হালকা হয়ে যায়।

গ. বেসনের মতো আটা হাতে নিয়ে পানি দিয়ে পেস্ট করে মুখে লাগিয়ে সাবানের মতো মুখ পরিষ্কার করা যায়।

ঘ. দুধের সরের সাথে আটা ও কাঁচা হলুদ মিশিয়ে মুখে মেখে ১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলবেন।

২. হলুদ

হলুদের গুণের কথা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। রূপচর্চায় হলুদের ভূমিকা অনেক। অতীতে নানী-দাদীরাও হলুদ ব্যবহার করতেন। নানান রোগের জন্যে কাঁচা হলুদের রসও খেতেন। ঘরোয়া চিকিৎসাতেও হলুদের অবদান অনেক। অনেক ফেসপ্যাক কাঁচা হলুদ দিয়ে তৈরি করা হয়। অনেকের গায়ের রং ফ্যাকাসে সাদা। তারা যদি একটু কাঁচা হলুদ বেটে তার সাথে অলিভ অয়েল মিশিয়ে গায়ে, হাতে এবং পায়ে মেখে প্রতিদিন গোসল করেন, তাহলে দেখবেন ফ্যাকাসে ভাব নেই। সুন্দর সোনা বর্ণের আভা চলে

আসছে দেহে। কাঁচা হলুদের সাথে দুধের সরও মিশিয়ে নিতে পারেন।

হলুদ লোমনাশক, নিয়মিত মাখলে শরীরের লোম বাড়ে না। এতে ওয়াক্সিং-এর কাজ হয় ভালো। আগেকার দিনে মা-দাদীরা কাঁচা হলুদ বাটার সাথে নিম পাতা বেটে বড়ি বানিয়ে রোদে শুকিয়ে রাখতেন। তারপর প্রতিদিন বাসি পেটে খেতেন। এতে পেটের দোষ হতো না, লিভার ভালো থাকত। এতে মুখে লিভার স্পট পড়ে না। অনেক মেয়েলি অসুখেও ফল পাওয়া যায়। কাঁচা হলুদ আখের গুড়ের সাথে খালি পেটে খেলে রক্ত পরিশোধিত হয় বলে স্বাস্থ্যরক্ষা ও রূপচর্চায় হলুদের অবদান অতুলনীয়।

৩. ডাব ও ঝুনো নারকেল

ক. ডাবের পানিতে ১৯টি খনিজ উপাদান রয়েছে। প্রতিদিন অন্তত পক্ষে দুটো ডাব খেলে ত্বকের কমনীয়তা বাড়ে।

খ. বসন্ত হলে কচি ডাবের পানি দিয়ে মুখ ধুলে দাগ চলে যায়।

গ. মুখে ব্রণের দাগ হলে ডাবের পানি দিয়ে ধুলে দাগ চলে যায়।

ঘ. একটু তুলো ডাবের পানিতে ভিজিয়ে মুখে লাগিয়ে শুকোতে দিন। তারপর হাত দিয়ে আস্তে আস্তে মুখ ঘষে দেবেন। এতে মুখে সুন্দর উজ্জ্বল একটা ভাব চলে আসবে। মুখের ত্বক কোমল ও মসৃণ হবে।

নানী-দাদীরা সেকালে নারকেল দিয়ে চুল ধুতেন। এতে চুলের উজ্জ্বলতা যেমন বাড়ত তেমনি চুলও পড়ত না। অনেক সময় ঝুনো নারকেল নষ্ট হয়ে যায়। এই নষ্ট নারকেল না ফেলে শিলে পিষে মাথায় ঘষে দিয়ে ঘণ্টা খানেক পরে মাথা ধুলে চুল শুকোনোর পর দেখবেন চুল তেল দেয়ার মতো হয়েছে। চুলের পরিচর্যায় নারকেল বেশ উপকারী।

ঙ. একটা নারকেলের অর্ধেক নিয়ে কুরিয়ে আধা কাপ অথবা এক কাপ গরম পানির সাথে ভালো করে চটকে দুধ বের করে নিয়ে পরিষ্কার দুধের সাথে একটা কাগজিলেবুর রস মিশিয়ে মাথায় বিলি কেটে চামড়ায় ভালোভাবে ম্যাসাজ করে ২০/৩০ মিনিট রেখে হালকা গরম পানিতে চুল ধুয়ে নিন। এ পদ্ধতি সপ্তাহে একদিন করলে চুল ওঠা বন্ধ হবে। তারপরেও চুল পড়লে ভিটামিন ও আয়রন খেতে হবে। ক্যালসিয়ামের অভাবেও চুল পড়ে। সেজন্যে ডাক্তারের পরামর্শে ক্যালসিয়াম খেতে পারেন।

৪. গোলাপ জল

গোলাপ জল চেনে না এমন লোক বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিয়েবাড়ি বলুন, মিলাদ মাহফিল বলুন, রূপচর্চা বলুন–গোলাপ জলের চাহিদা আছেই। রান্নাবান্নায় গোলাপ জল তো চাই-ই চাই। গোলাপ ফুলের নির্যাস থেকেই এ পানি বানানো হয়। পানি সুগন্ধি করতে গোলাপ জলের দরকার হয়। গ্লিসারিনের সাথে সমপরিমাণ গোলাপ জল মিশিয়ে ঠোঁটে মাখলে ঠোঁট ফাটে না এবং ঠোঁটের রং-ও সুন্দর হয়। গোলাপ জল দিয়ে স্কিন-ফ্রেশনার টনিক আপনি নিজেই বানাতে পারেন। আধা কাপ গোলাপ জল, একটা লেবুর রস, ক-ফোঁটা মধু একত্রে মিশিয়ে নিলে স্কিন-ফ্রেশনার টনিক হয়ে গেল। এ টনিক দিনে দুবার তুলোয় করে মুখে লাগাতে পারেন। যাদের মুখের চামড়া খসখসে তারা রাতে মুখ ভালোভাবে ধুয়ে সমপরিমাণ গোলাপ জলের সাথে গ্লিসারিন মুখে, হাতে এবং পায়ে মেখে নিতে পারেন। ভোরে কুসুম গরম পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলবেন। এতে মুখের খসখসে ভাব থাকবে না এবং ত্বক কোমল হবে।

৫. মধু

মধুর গুণের কথা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। মধু এবং দুধকে বলা হয় বেহেশতের নেয়ামত। মধু ত্বকের জন্যে খুবই উপকারী। বহু ফেসপ্যাক মধু দিয়ে তৈরি হয়। কয়েক ফোঁটা মধু ও কাঁচা দুধ একত্রে মুখে মাখলে মুখের রং উজ্জ্বল, কোমল ও মসৃণ হয়।

মধু ও বেসন একত্রে মিশিয়ে ফেসপ্যাক বানিয়ে মুখে মেখে ১৫/২০ মিনিট রেখে হালকা গরম পানি ও পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুলে মুখের ত্বক খুব সুন্দর ও মসৃণ হয়।

কয়েক ফোঁটা মধু + কয়েক ফোঁটা লেবুর রস + এক চা চামচ গাজরের রস + এক চা চামচ ছোলার ডালের বেসন একত্রে পেস্টের মতো করে মুখে মেখে ২০/৩০ মিনিট রেখে স্বাভাবিক পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এতে মুখ মসৃণ ও কোমল হয়ে উঠবে। এ প্যাকটি শুষ্ক ও স্বাভাবিক ত্বকের জন্যে উপকারী।

মধু খেলেও নানা রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। মধু কফনাশক। প্রতিদিন এক চামচ মধু খেলে ঠান্ডা লাগতে পারে না। আয়ুর্বেদী বহু চিকিৎসায় মধু ব্যবহৃত হয়। বাসক পাতার রসের সাথে কয়েক ফোঁটা মধু নিয়মিত খেলে ঘুম ভালো হয়।

৬. খাবার সোডা

খাবার সোডা রুটি, বিস্কুট, চটপটি ইত্যাদি বহুবিধ রান্নায় ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু রূপচর্চা বা কোনো কিছু পরিষ্কার করার কাজেও যে সেটি ব্যবহার হয় তা হয়তো অনেকেই জানেন না। রূপোর গয়না একটু খাবার সোডা দিয়ে ব্রাশ করে ধুলে দেখবেন ঝকঝকে হয়ে উঠছে। অনেকের মুখের দাঁত দেখতে হলদেটে ভাব। তারা যদি একটু খাবার সোডা দাঁত মাজার ব্রাশের ওপর নিয়ে মেজে নেন, তাহলে দেখবেন দাঁতগুলো মুক্তোর মতো ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। তবে, এ পদ্ধতিটি আপনি রোজ করতে যাবেন না। এতে মাড়ির ক্ষতি হবে।

৭. আলু

শুধু রান্নাবান্না, খাবারদাবারে যে আলুর ব্যবহার হয় তা নয়। রূপচর্চায় আলুর অবদান একেবারে কম নয়। অনেকে গায়ের রং ফর্সা করার জন্যে নানান জিনিস ব্যবহার করে থাকেন। তারা হয়তো অনেকেই জানেন না, আলু ব্যবহার করেও শরীরের রং উজ্জ্বল করা যায়। গোল আলু খোসাসহ গোল গোল করে কেটে নিয়ে কিছুক্ষণ ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে রেখে তারপর পানি থেকে তুলে হাতে পায়ে মুখে গলায় ঘষে ঘষে মেখে নিয়ে কিছুক্ষণ পর ধুয়ে ফেলুন। এভাবে নিয়মিত করলে দেখবেন গায়ের রং উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

৮. ডিম

সৌন্দর্যচর্চায় ডিম এক অতুলনীয় ভূমিকা পালন করে। ডিম দিয়ে মাথা ধোয়া, ডিমের তৈরি প্যাক বিভিন্নভাবে ত্বকের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ডিমের প্যাকে মুখের লাবণ্য ফিরে আসে। ডিমের কুসুমের প্যাক শুকনো ত্বকের পক্ষে খুবই ভালো। শুকনো ত্বকের জন্যে ডিমের কয়েকটি প্যাক :

ক. ডিমের হলুদ অংশ + আধা চা চামচ অলিভ অয়েল + কয়েক ফোঁটা লেবুর রস। এ প্যাকটি মুখ ধুয়ে, পরিষ্কার মুখে লাগিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট পরে প্রথমে কুসুম গরম পানিতে মুখ ধুয়ে ও পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিলে ত্বকের জন্যে খুবই ভালো ফল হবে।

খ. ডিমের কুসুম ও তার সাথে অ্যালমন্ড অয়েল অথবা অলিভ অয়েল আধা চা চামচ মিশিয়ে মুখে মেখে ১৫ মিনিট রেখে প্রথমে কুসুম গরম পানি, পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন। সাধারণত সপ্তাহে

দুই/ তিন দিনের বেশি লাগানোর দরকার নেই। এতে আপনার ত্বক সতেজ হয়ে উঠবে।

৯. ময়দা

প্রত্যেক বাড়িতেই রান্না ঘরে ময়দা পাওয়া যায়। আর এ ময়দা রূপচর্চার কাজে ব্যবহার করে আপনি হতে পারেন রূপবতী নারী। সাবানের পরিবর্তে ময়দা পানিতে গুলিয়ে হাতে, পায়ে ও মুখে মেখে গোসল করতে পারেন। আবার ময়দা + কাঁচাহলুদ বাটা + দুধের সর মিশিয়ে হাতে, পায়ে, মুখে আস্তে আস্তে মেখে প্রথমে কুসুম গরম পানিতে, পরে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে নিলে দেখবেন গায়ের রং কিছু দিনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

১০. পেঁয়াজ

রূপচর্চায় পেঁয়াজের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বহু রোগ সারাতেও পেঁয়াজের জুড়ি নেই। কাঁচা পেঁয়াজে ভিটামিন-বি ও ভিটামিন-সি রয়েছে। কাঁচা পেঁয়াজের রস ও আদার রস সমপরিমাণে নিয়ে সামান্য গরম করে এক বা দুই চা চামচ খেলে নতুন সর্দির উপশম হয়। যদি কারো নাক থেকে অনবরত পাতলা পানির মতো শেষ্মা পড়ে তাহলে কাঁচা পেঁয়াজ ও আদা সামান্য তেলে ভেজে নিয়ে খেলে শেষ্মা ঘন হয়। মাথার খুশকিতে কাঁচা পেঁয়াজের রস ওষধি হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া কাঁচা পেঁয়াজের সাথে সামান্য কয়েকটি সর্ষে বেটে মাথায় বিলি কেটে দিলে নতুন চুল গজায়।

১১. শসা

শসার গুণের কথা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। শসা যেমন রান্নাবান্নায়, খাওয়াদাওয়ায় ব্যবহৃত হয় তেমনি ব্যবহৃত হয় রূপচর্চায়।

ক. মুখে কোনো কালো দাগ পড়লে কচি শসার রস মুখে লাগিয়ে ১৫ মিনিট রেখে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে নেবেন। এভাবে কিছুদিন নিয়মিত লাগালে দাগ উঠে যায়।

খ. শসার রসের সাথে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মুখে মেখে শুকিয়ে গেলে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে নিলে মুখের রং উজ্জ্বল ও কোমল হয়। তবে নিয়মিত কিছুদিন করতে হবে।

গ. অনেক সময় দেখা যায় চোখের নিচে অনেকেরই কালো দাগ পড়ে। শসার রস নিয়মিত মাখলে এ দাগ দূর হবে।

ঘ. মনে রাখবেন যদি কেউ ফর্সা হতে চান তবে নিয়মিত শসার রসের সাথে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে মুখে, হাতে ও গায়ে নিয়মিত মাখলে গায়ের রং ফর্সা হয় অথবা শসা পাতলা পাতলা করে কেটে মুখে ঘসে নিতে পারেন। পরে শুকোলে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে নেবেন। তৈলাক্ত ত্বকের জন্যে শসা খুবই উপকারী। তবে কাঁচা ব্রণের ওপর লেবুর রস লাগালে দাগ হয়। তার জন্যে শুধু শসার রসই ভালো।

ঙ. মুখকে রোদ থেকে বাঁচাতে, মুখের দাগ তুলতে ও ময়লা থেকে যদি রেহাই পেতে চান তবে শসার সাহায্যে একটি ফেসপ্যাক বানিয়ে ২৫/৩০ মিনিট রেখে প্রথমে গরম পানি, পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়ে আপনি নিশ্চিন্তে বাইরে বেড়িয়ে আসতে পারেন। এতে ত্বক সারাদিনের জন্যে যেমন চকচকে, মসৃণ ও কোমল থাকবে তেমনি বাইরের নানান জীবাণু থেকে ত্বক রেহাই পাবে।

এবার জেনে নিন কীভাবে প্যাকটি তৈরি করবেন। একটি কচি শসা পাতলা করে কেটে থেঁতো করে তার সাথে একটি ডিমের কাঁচা কুসুম, এক টেবিল চামচ গুঁড়ো দুধ মিশিয়ে মিক্সার মেশিন অথবা ব্লেন্ডারে মিশিয়ে নিয়ে মুখে, গলায় ও হাতে মেখে নেবেন। ব্লেন্ডার না থাকলে হাতেই ভালো করে মিশিয়ে নেবেন।

১২. গাজর

রূপচর্চায় গাজরের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। গাজরে প্রচুর ভিটামিন-এ এবং ক্যারোটিন রয়েছে। প্রতিদিন একটি করে কাঁচা গাজর খেলে আপনার শরীরে ভিটামিন-এ-এর অভাব হবে না। এতে চোখ, ত্বক–উভয়ের জন্যেই উপকার। আমাদের দেশে শীতকালে প্রচুর গাজর পাওয়া যায় এবং দামও খুব কম থাকে। তাই সস্তায় আপনি প্রচুর ভিটামিন গ্রহণ করতে পারেন। গাজর খেলে দাঁতও চকচকে হয়। গায়ের রং ফর্সা হয়। পায়খানা পরিষ্কার হয়। চুল পড়ে না। চুলের উজ্জ্বলতা বাড়ে। মনে রাখবেন, ভিটামিন-এ ত্বকের সৌন্দর্যের জন্যে খুবই দরকার আর তা আপনি গাজর থেকে অল্পতেই পেতে পারেন। অর্থাৎ গাজর খেলে আপনার ত্বক চোখ দাঁত ঠোঁট চুল–সব কটি অঙ্গেরই উপকার হচ্ছে। আবার গাজর দিয়ে সুন্দর ফেসপ্যাকও তৈরি করে নিতে পারেন। এ প্যাক মিশ্র ত্বকের পক্ষে খুবই উপকারী। কীভাবে প্যাক তৈরি করবেন জেনে নিন :

এক টেবিল চামচ অথবা আপনার পরিমাণ মতো ছোলার ডালের বেসন + গাজরের রস + অলিভ অয়েল কয়েক ফোঁটা নিয়ে পেস্টের মতো বানিয়ে মুখে মেখে ১৫/২০ মিনিট রেখে প্রথমে হালকা গরম পানিতে, পরে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে ফেলবেন। গাজর দিয়ে আপনি আরও একটি ফেসপ্যাক তৈরি করে নিতে পারেন। এ প্যাক স্বাভাবিক ও শুষ্ক–উভয় ত্বকের জন্যেই উপকারী।

একটি (মিহি কোরানো) গাজর + দুই চা চামচ গরুর দুধ + এক চা চামচ বেসন মিশিয়ে মুখে মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। কাঁচা গাজর নিয়মিত খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে।

১৩. টমেটো

শীতকালে আমাদের দেশে প্রচুর টমেটো পাওয়া যায়। এসময় দামও কম থাকে। টমেটোতে প্রচুর ভিটামিন-সি থাকে। তাই কাঁচা টমেটো খাওয়া খুবই উপকারী। টমেটোতে ভিটামিন-বিও রয়েছে। ভিটামিন-বি, ভিটামিন-সি এগুলো ত্বকের জন্যে বেশ উপকারী। টমেটো খেয়ে এবং ফেসপ্যাক তৈরি করে আপনি রূপচর্চা করতে পারেন অনায়াসে।

ফেসপ্যাক তৈরির পদ্ধতি

মাঝারি ধরনের তিনটি টমেটোর রসের সঙ্গে দুই চা চামচ গ্লিসারিন, তিন চামচ লেবুর রস, চার চামচ অলিভ অয়েল নিয়ে ভালো করে মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে মুখে, গলায় ও হাতে ভালো করে মেখে নিয়ে ১৫/২০ মিনিট রেখে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন, মুখটি কেমন সুন্দর মনে হচ্ছে।

১৪. বাঁধাকপি

বাঁধাকপিতে রয়েছে ভিটামিন-বি, ভিটামিন-এ ও ভিটামিন-সি। এছাড়া বাঁধাকপিতে ভিটামিন-কে-ও রয়েছে। ভিটামিন-কে রক্ত জমাট বাঁধতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। দেহের হাড় গঠন ও পুষ্টিতে ভিটামিন-কে বিশেষ প্রয়োজন। বাঁধাকপিতে সালফার রয়েছে প্রচুর। সালফার আমাদের চুল ও দেহের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষা করে।

বাঁধাকপির সাহায্যে আমরা মুখের ত্বককে অনায়াসে কোমল করে তুলতে পারি। প্রথমে বাঁধাকপির পরিষ্কার দু-তিনটি পাতা নিয়ে রস বের করুন। এবার এর সঙ্গে এক চামচের চার ভাগের একভাগ ইস্ট মেশান এবং এর সাথে এক চামচ মধু মিশিয়ে ঘন পেস্টের মতো তৈরি করে নিয়ে সমস্ত মুখে

মেখে ১৫ মিনিট রেখে প্রথমে হালকা গরম পানি, পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এছাড়া বাঁধাকপির সাহায্যে সুন্দর স্কিন-ফ্রেশনার টনিক বানাতে পারেন নিজ হাতেই। প্রথমে বাঁধাকপির কয়েকটি টাটকা পাতা পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়ে কুচিয়ে এক কাপ পানিতে কুচানো কপি ফুটিয়ে ভালো করে সেদ্ধ করে সেই পানি ভালোভাবে ছাঁকনিতে ছেঁকে নিন। তৈরি হয়ে গেল আপনার স্কিন-ফ্রেশনার। মুখ ভালোভাবে বেসন অথবা সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে একটু তুলো ঐ পানিতে ভিজিয়ে সারা মুখে, হাতে ও পায়ে লাগিয়ে নিন এবং শুকোতে দিন। মুখ মুছে ফেলবেন না। এতে এর গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। পানি গরম অবস্থায় দেবেন না। ঠান্ডা করে দেবেন। যেদিন বানাবেন সেদিন ব্যবহার করবেন, বাসি করবেন না।

১৫. লেটুস পাতা

বাঁধাকপির মতো লেটুস পাতায়ও রয়েছে ভিটামিন-সি। এছাড়াও আছে ম্যাঙ্গানিজ। লেটুস হজমকারক। তাই লেটুস পাতা খাওয়া খুবই ভালো। আমরা সালাদে লেটুস ব্যবহার করে থাকি। লেটুস দিয়ে আবার স্কিন-ফ্রেশনার টনিকও তৈরি করা যায়। শীতকালে ঘরে বসেই আপনি স্কিন-ফ্রেশনার টনিক বানাতে পারেন। বাঁধাকপির মতোই লেটুস কুচিয়ে পানিতে ফুটিয়ে ভালোভাবে সেদ্ধ করে ছেঁকে নিয়ে ঠান্ডা হলে তুলোয় করে মুখে, হাতে ও পায়ে মেখে নিতে পারেন।

১৬. মটর দানা

মটরেও রয়েছে নানান ভিটামিন। মটর খেতে আমরা সবাই ভালবাসি। মটর দিয়েও সুন্দর ফেসপ্যাক তৈরি করা যায়। তৈলাক্ত ত্বকের জন্যে মটরের সাহায্যে আপনি সুন্দর ফেসপ্যাক বানাতে পারেন। মটর প্রসেস করে রেখে বহুদিন ব্যবহার করতে পারবেন।

প্রস্তুত প্রণালী : এক কাপ মটর নিয়ে গরুর দুধে সারারাত ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন দুধ থেকে তুলে নিয়ে শুকিয়ে নেবেন এবং এই শুকনো মটর গ্রাইন্ডারে গুঁড়ো করে অথবা শিলপাটায় গুঁড়ো করে রেখে দিতে পারেন। যখন প্রয়োজন হবে কিছুটা নিয়ে পানি মিশিয়ে পেস্টের মতো করে মুখে লাগাতে পারবেন। ১৫ মিনিটের মতো মুখে রেখে ধুয়ে ফেলবেন। এ প্যাকটি ব্রণের জন্যে খুবই উপকারী।

১৭. পুদিনাপাতা

পুদিনাপাতার চাটনি অত্যন্ত মজাদার। আর এই পুদিনাপাতা রূপচর্চারও অনবদ্য উপকরণ। তৈলাক্ত মুখে সারা সময়ই একটা/ দুটো ব্রণ লেগে থাকে। আর তা সারাতে পুদিনাপাতার জুড়ি নেই। শীতের সময় এর ফলন হয় বেশি এবং সারাবছরও বাজারে কমবেশি পাওয়া যায়।

এবার জেনে নিন রূপচর্চায় এর ব্যবহার–

প্রথমে পুদিনা গাছ থেকে শুধু পাতা নিন। ভালোভাবে ধুয়ে মিহি করে বেটে পেস্টের মতো বানিয়ে রাতে মুখে ভালোভাবে লাগিয়ে রেখে দিন। পরের দিন ভোরে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এভাবে মাস খানেক লাগানোর পর দেখবেন আপনার মুখে আর আগের ব্রণ নেই। দাগও নেই।

মনে রাখবেন, যে-কোনো রূপচর্চাই ধৈর্য ধরে বহুদিন না করলে আপনি তার সঠিক ফল ভোগ করতে পারবেন না।

ঘরের জিনিস দিয়েই অনেক কম খরচে সৌন্দর্যচর্চা করে আপনি হয়ে উঠতে পারেন সুকোমল ত্বকের অধিকারিণী। বিউটি পার্লারে গিয়ে পয়সা ও সময় নষ্ট করে আপনাকে এসব করতে হবে না। অনায়াসে নিজেই এগুলো তৈরি করে নিতে পারেন। আর প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি বলে এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। শুধু দেখে নিন কোনটি আপনার জন্যে বেশি প্রযোজ্য।

ভ্রুর যত্ন

দেহের গঠনের মতো ভ্রুরও প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন কারো ভ্রু মোটা এবং ঘন। আবার কারো ভ্রু সরু কিংবা চিকন। কারো ভ্রু চ্যাপটা ধরনের এবং মোটা। কারো ভ্রু পাতলা, কারো ভ্রু লম্বাটে আবার কারো ভ্রু খাটো ধরনের। তবে যে ধরনেরই হোক না কেন আজকাল আর এটা কোনো সমস্যা নয়। যাদের ভ্রুতে কেশের পরিমাণ কম তারা প্রতিদিন রাতে ভালো ক্যাস্টর অয়েল অরেঞ্জ স্টিক অথবা হাতের আঙুল দিয়ে ভ্রুতে লাগাতে পারেন। এভাবে তিন মাস লাগালে দেখবেন আপনার ভ্রু ঘন কালো হয়ে উঠছে।

আর যাদের ভ্রু মোটা তারা আজকাল বিউটি পার্লারে গিয়ে নিজের পছন্দ মতো ভ্রুর আকার তৈরি করে নিতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, আপনার

মুখের সাথে যে-রকম ভ্রু দেখতে সুন্দর স্বাভাবিক মনে হবে সে-রকম সাইজ করে নেবেন। কাউকে চিকন এবং সরু ভ্রুতে বেশি মানায় দেখে আপনিও তা-ই করতে যাবেন না। মনে রাখবেন, সবাইকে সবটাতে মানায় না। এছাড়া আপনি নিজেও শন দিয়ে ভ্রু তুলে সুন্দর সাইজ করে নিতে পারেন। তবে ভালোভাবে করতে পারলেই করবেন। তা না হলে বিউটি পার্লারে গিয়ে অভিজ্ঞ বিউটিশিয়ান দিয়ে করিয়ে নেয়াই ভালো।

একটি কথা মনে রাখবেন, ভ্রুর পুরো আকার বদলে না ফেলে ছোটখাটো কিছু ত্রুটি সংশোধনের মাধ্যমেই একে আরো সুন্দর করে তোলা যায়–যাতে আপনার ভ্রু দেখে স্বাভাবিক সুন্দর মনে হয়। সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে যত স্বাভাবিকতা বজায় রাখা যায় ততই ভালো। আপনার মেক-আপ, সাজপোশাক যত সুন্দর হোক, যদি ভ্রু মানানসই না হয়, তাহলে পুরো মুখমণ্ডলের সাজটাই লাগবে বিশ্রী।

ভ্রু সাজানোর জন্যে প্রয়োজন শুধু একটি আই-ব্রো পেন্সিল। পেন্সিলের রং হোক কালো কিংবা বাদামি–কোনো অসুবিধে নেই।

প্রথমে ভ্রু ব্রাশ করে নিন। তারপর পেন্সিলের সাহায্যে হালকাভাবে পুরোটা এঁকে ফেলুন। খেয়াল রাখবেন যেন গাঢ় করে এঁকে না ফেলেন। এমনভাবে আঁকুন দেখতে যেন স্বাভাবিক মনে হয়, একটু উজ্জ্বলও লাগে। আঁকার পরে আবার ব্রাশ করে নেবেন।

চোখের যত্ন

চোখ আমাদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। চোখে দৃষ্টিশক্তি না থাকলে পৃথিবী অন্ধকার। কালো হরিণ চোখ নিয়ে কজনই বা জন্মায়। তাই বলে যারা হরিণ-নয়না নন তাদেরও হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আপনি যদি চোখ দুটোকে সত্যিই সুন্দর করে তুলতে চান তাহলে নিয়মিত চোখের ব্যায়াম করবেন। আর চোখে মেক-আপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম অনুসরণ করলে চোখের সমস্যা থেকে অনেকটাই মুক্ত থাকতে পারবেন।

চোখে মেক-আপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম

১. চোখের মেক-আপ ব্যবহারের সময় তাড়াহুড়ো করবেন না।

২. চোখের পাতার ওপর যেখানে আই-শ্যাডো ব্যবহার করা হয় সেখানে মানানসই আই-শ্যাডো ব্যবহার করুন। পোশাকের সাথে রং মিলিয়ে করতে পারলে সবচেয়ে সুন্দর লাগবে। আর যদি তা না হয় তাহলে এমন শ্যাডো ব্যবহার করুন যেন স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। হালকা ব্রোঞ্জ কিংবা হালকা গোল্ডেন ব্রোঞ্জ রঙের শেড সাধারণভাবে ভালো লাগে।

৩. দিনের বেলায় উজ্জ্বল গাঢ় রং ব্যবহার করবেন না।

৪. রাতের বেলায় উজ্জ্বল গাঢ় রং ব্যবহার করতে পারেন।

৫. আপনার চোখ যদি ছোট হয় তাহলে চোখের বাইরের দিকে পেন্সিল দিয়ে প্রায় নিচে এঁকে নিলে আপনার চোখ একটু বড় দেখাবে। চোখের পাপড়ি বড় দেখানোর জন্যে মাসকারা ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে মাসকারা ব্যবহার করারও নিয়ম রয়েছে। যেমন, মাসকারার ব্রাশটি নিচ থেকে টেনে ওপরের দিকে উল্টিয়ে লাগাবেন ওপরের পাপড়িতে। নিচের পাপড়িতে খুব যত্ন করে লাগাতে হবে, যাতে চোখের নিচের ত্বকে লেগে না যায়। মাসকারার ব্রাশ এ-ক্ষেত্রে টানবেন নিচের পাপড়ির ওপর বসিয়ে নিচের দিকে। প্রথম একবার লাগানোর পর শুকোতে দিন। তারপর দ্বিতীয়বার লাগালে এতে চোখের পাপড়ি ঘন ও বড় দেখাবে।

   যাদের চোখ বড় তাদের বেলায় তেমন সমস্যা নেই। যেভাবেই পেন্সিল দিয়ে আঁকুন, খারাপ লাগবে না। তবে তারা যদি আই-শ্যাডো লাগানোর পর পেন্সিল দিয়ে শুধু ওপর থেকে এক চোখের কোণের দিকটা একটু ঘন কালো করে নিচের অংশে সামান্য হালকা চিকন করে আঁকেন, তাহলে ভালো লাগবে। তারপর মাসকারা লাগিয়ে দিন, দেখতে অপরূপ লাগবে।

চোখের বিশেষ যত্ন নেয়ার পদ্ধতি

১. চোখের ব্যায়াম করতে হবে। মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে চোখের বিশ্রাম দিতে হবে।

২. অনেকের চোখের কোণের দিকটায় কাকের পায়ের মতো চিরিক ফাটা রেখা দেখা যায়—একে বলে বলিরেখা। এ বলিরেখা আপনি প্রাকৃতিক উপায়ে দূর করতে পারেন। কাঁচা গোল আলু থেঁতো করে

বলিরেখাগুলোর ওপর দিয়ে ১৫/২০ মিনিট চোখ বন্ধ করে রাখুন। এরপর ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। মনে রাখবেন ভ্রু কুঁচকে চোখ কুঁচকাতে থাকবেন না। তাহলে অল্প বয়সে বলিরেখা পড়তে পারে। সবসময় স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকাবেন।

৩. অনেকের চোখের তলায় কালো দাগ পড়ে থাকে। সে-ক্ষেত্রে বেশি রাত জাগবেন না। প্রচুর পরিমাণে পানি খাবেন। রোজ পাঁচ/ সাত মিনিট কচি শসার রস লাগিয়ে রাখুন। তারপর ধুয়ে ফেলুন।

৪. চোখ ক্লান্ত লাগলে চোখ বন্ধ করে কাঁচা শসার দুটো চাক দুচোখের ওপর রেখে শুয়ে থাকুন ১০ মিনিট। পা দুটো বালিশের ওপর রাখুন। কিছুক্ষণ পর দেখবেন দুচোখে ঠান্ডা-সতেজ অনুভব হচ্ছে।

৫. সূর্যের আলোতে অনেকেরই চোখ জ্বালা করে, চোখে পানি আসে, চোখ কুঁচকে তাকাতে হয়, এটা চোখের জন্যে ক্ষতিকর। চোখ কুঁচকে তাকানোর ফলে বলিরেখা পড়তে পারে। তাই দিনের বেলা সূর্যের আলো থেকে চোখকে বাঁচাতে সানগ্লাস ব্যবহার করবেন।

৬. চোখে মেক-আপ নিয়ে থাকলে তা অবশ্যই কোনো ক্রিম বা অলিভ অয়েল তুলোয় ভিজিয়ে তুলে নিয়ে ভালোভাবে চোখ ধুয়ে নেবেন।

৭. রাতে কখনোই চোখে মেক-আপ নিয়ে শোবেন না।

৮. দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখার জন্যে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাবার খাবেন।

কানের যত্ন

সৌন্দর্যচর্চায় কানের যত্ন নিতে ভুলবেন না। নিয়মিত কানের ভেতর ও বাইরের দিকটা পরিষ্কার করবেন। গোসলের সময় প্রতিদিনই কানের বাইরের দিকটা নরম তোয়ালেতে সাবান লাগিয়ে অথবা বেসন গুলিয়ে কিংবা আটা গুলিয়ে লাগিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন। গোসল শেষে কানের ভেতরের পানি অরেঞ্জ স্টিক দিয়ে সতর্কতার সাথে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুছে নিন। খেয়াল রাখুন, কানের ভাঁজের মধ্যে যেন ময়লা বাসা বেঁধে না থাকে।

বি.দ্র. : *কানের অভ্যন্তর পরিষ্কারের প্রয়োজন হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। নিজে নিজে খোঁচাখুঁচি করবেন না।*

ঠোঁটের যত্ন

ঠোঁট সবসময়ই হওয়া উচিত কোমল, মসৃণ এবং স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আর্দ্র। ঠোঁট শুকিয়ে গেলে ফেটে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ঠোঁটের চামড়ায় দাগ পড়ে। এ অবস্থায় লিপস্টিক লাগালে ভালো দেখায় না। ঠোঁটের জন্যে প্রয়োজন তাই পরিচর্যার। অতিরিক্ত গরম কিংবা ঠান্ডা আবহাওয়া ঠোঁটের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তখন ঠোঁট শুকিয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে শীতকালে ঠোঁটের প্রতি বাড়তি নজর রাখতে হবে। শীত শুরু হওয়ার আগেই ঠোঁটের যত্ন নিন। তাহলে ঠোঁটের চামড়া-ওঠা, ঠোঁট-ফাটা ইত্যাদি থেকে রেহাই পাবেন। ঠোঁটও থাকবে কোমল, মসৃণ।

যত্ন নেয়ার প্রক্রিয়া

১. প্রতিদিন কুসুম গরম পানি দিয়ে ঠোঁট পরিষ্কার করে তাতে কোনো ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম অথবা চ্যাপস্টিক লাগিয়ে রাখুন। এছাড়া রাতে ঘুমোনোর আগে গোলাপ জলে মেশানো গ্লিসারিন পানি ঠোঁটে লাগিয়ে শুতে পারেন অথবা ভালো পেট্রোলিয়াম জেলির প্রলেপ লাগিয়ে নিতে পারেন।

২. গ্লিসারিন পানি তৈরির নিয়ম : সমপরিমাণ গ্লিসারিন ও গোলাপ জল অথবা খাবার পানি মিশিয়ে নিলেই হলো। তবে একবারে বেশি পরিমাণে বানাবেন না। নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই অল্প অল্প করে বানিয়ে ব্যবহার করবেন।

ঠোঁটের ক্ষেত্রে বর্জনীয়

অনেককেই দেখা যায় জিভ দিয়ে ঠোঁট বার বার ভিজিয়ে রাখতে চান, এটি একটি বদভ্যাস। কারো সামনে এরকম করলে দৃষ্টিকটু লাগে। এছাড়া ঠোঁটের ওপর অতিরিক্ত জিভ বোলালে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন–

ক. ঠোঁট শুকিয়ে যেতে পারে

খ. ঠোঁটে জ্বালা-যন্ত্রণা সৃষ্টি হতে পারে

এছাড়া অতিরিক্ত ঠান্ডা থেকেও এক ধরনের যন্ত্রণার সৃষ্টি হতে পারে। ঠোঁটে ফুসকুড়ির মতো উঠতে পারে। তারপর এগুলো শক্ত হয়ে যায়। দেখে

মনে হবে ঠোঁটের ঐ অংশে সর পড়েছে। প্রায় ১০/১৫ দিন থাকার পর তা ঝরে যায়। এটি সাধারণত শীতের শেষ দিকে এবং বসন্তের প্রথম দিকে দেখা যায়। এ অবস্থায় সার্জিক্যাল পরিচর্যা করা যায়। এছাড়া এর প্রতিষেধক হিসেবে বাজারে বিভিন্ন ধরনের এন্টি-ভাইরাল ক্রিম পাওয়া যায়। এগুলো ডাক্তারের পরামর্শে ব্যবহার করতে পারেন।

৩০ বছর পার হওয়ার পরই ঠোঁটে কতগুলো উপসর্গ দেখা দিতে পারে :

১. ঠোঁটের চারপাশে সূক্ষ্ম রেখা বিস্তার লাভ করতে আরম্ভ করে। এছাড়া ঠোঁট ঘন ঘন সংকুচিত করলেও এরকম হতে পারে। যে-সব ছেলেমেয়ে ধূমপান করে, তাদের ক্ষেত্রে এ রেখাগুলো বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তাই সুন্দর ঠোঁটের প্রত্যাশা করলে এসব অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে।

২. সকালে ও রাতে ঠোঁটের যত্নে ঠোঁটে ক্রিম ব্যবহার করুন। রাতে গ্লিসারিন মেখে রাখতে পারেন। তবে গ্লিসারিনের সাথে সম পরিমাণ পানি মিশিয়ে নিতে হবে।

ঠোঁটের মেক-আপ

ঠোঁটের ক্ষেত্রে যে মেক-আপটি ব্যবহৃত হয়, আমরা সবাই জানি তার নাম লিপস্টিক। আর এই লিপস্টিক ব্যবহারেরও কিছু নিয়ম আছে। যেমন :

মুখমণ্ডলের সমস্ত মেক-আপ শেষে লিপস্টিক লাগান। যাদের শুষ্ক ত্বক তারা এমন লিপস্টিক ব্যবহার করুন যাতে তেলতেলে ভাব আছে। আর যাদের ত্বক তৈলাক্ত তারা বেছে নিন বেশি তেলতেলে নয় এমন লিপস্টিক। লিপস্টিক সাধারণত দু-ধরনের দেখতে পাওয়া যায়। পার্লি ও নন-পার্লি। আজকাল পার্লি পেন্সিলও পাওয়া যায়। পার্লি লিপস্টিকে বাড়তি লিপগ্লস ব্যবহার না করলেও চলে।

ঠোঁটে মেক-আপের পদ্ধতি

ঠোঁট যেমন সরু, মোটা, চ্যাপটা–বিভিন্ন ধরনের তেমনি লিপস্টিক লাগানোর কায়দাও বিভিন্ন।

১. লিপস্টিক লাগানোর সময় প্রথমে ঠোঁটে একটু পাউডার লাগিয়ে নিলে ভালো হয়। তারপর লিপ পেন্সিল দিয়ে হালকা করে আউট লাইন এঁকে নিন। তারপর ঠোঁটের মধ্যভাগ লিপ ব্রাশের সাহায্যে

লিপস্টিক লাগিয়ে ভরে দিতে পারেন অথবা সরাসরি লিপস্টিক দিয়েও ভরে নিতে পারেন। এরপর একটা টিস্যু পেপার দিয়ে চেপে অতিরিক্ত লিপস্টিক রং তুলে ফেলুন।

২. গ্রীষ্মে দিনের বেলায় কটকটে রঙের লিপস্টিক লাগানো উচিত নয়। তবে রাতে ব্যবহার করতে পারেন–পার্টি বা যে-কোনো অনুষ্ঠানে।

৩. শীতের সময় অবশ্য দিনে কিংবা রাতে–দুসময়ই গাঢ় রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করতে পারেন।

৪. সাধারণত পোশাকের রঙের সাথে ম্যাচ করে লিপস্টিক লাগালে বেশ স্মার্ট লাগে। তবে মেরুন লিপস্টিক সব পোশাকেই মানায়।

৫. বেশি সরু ঠোঁটে একটু ভারি করে লিপস্টিক লাগান। অপরপক্ষে বেশি মোটা ঠোঁটে চিকন আউটলাইন করে লিপস্টিক লাগান।

৬. চ্যাপটা ঠোঁটে বেশি ছড়িয়ে লিপস্টিক লাগাবেন না। একটু ওভাল শেপ করে লিপস্টিক লাগান, তাতে চ্যাপটা ভাব কম দেখাবে।

লিপগ্লস

এটি লিপস্টিক ব্যবহার করার পর ঠোঁটের ওপর লাগানো যেতে পারে। এতে ঠোঁট একটু ভেজা ভেজা, উজ্জ্বল, চকচকে দেখায়। লিপগ্লস সাধারণত লিপস্টিকের রঙের সাথে মিলিয়ে লাগাতে হয়। লিপগ্লস বিভিন্ন রং–এমনকি স্বচ্ছ রঙেরও হয়। স্বচ্ছ রঙের লিপগ্লস যে-কোনো রঙের লিপস্টিকের ওপর লাগাতে পারবেন।

দাঁতের যত্ন

কথায় বলে, 'দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না'। এটা শুধু কথার কথা নয়। আসলে আমরা কজনই বা সঠিকভাবে দাঁতের যত্ন নিয়ে থাকি! সুস্থ দাঁত ও মাঢ়ির জন্যে প্রয়োজন সঠিক পরিচর্যা। আপনি যতই সুন্দরী হোন না কেন দাঁত সুন্দর না হলে আপনাকে হাসলে দেখাবে বিশ্রী, মুখ থেকে গন্ধ বেরোলে অনুষ্ঠানে পাবেন লজ্জা। তাই সুস্থ-সুন্দর দাঁত ও মাঢ়ির যত্ন কীভাবে নেবেন তা জেনে নিন :

আমাদের নিজেদের অবহেলার কারণেই আমাদের দাঁত ও মাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দাঁত আমাদের মহা মূল্যবান সম্পদ। তাই এর প্রতি যত্নবান হতে হবে ছোটবেলা থেকেই। আমাদের দাঁতের ক্ষয়ের পেছনে মিষ্টিজাতীয় খাবার এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। চিনি থেকে জীবাণু উৎপন্ন হয় বহুগুণে। এ জীবাণু বিস্তার লাভ করে এবং এক ধরনের এসিড সৃষ্টি হয়। আর এ এসিড দাঁতের এনামেলে আক্রমণ চালায়। এক সময় দাঁতের এনামেলের প্রলেপ ছিদ্র করে এসিড দাঁতের ভেতরে ঢুকে পড়ে। তখন আমাদের দাঁতে ব্যথা হয়। দাঁত হয় ক্ষতিগ্রস্ত। তাই সুস্থ-সুন্দর দাঁতের জন্যে জেনে নিন কিছু নিয়ম :

১. সুস্থ দাঁতের জন্যে প্রয়োজন সঠিক পদ্ধতিতে দাঁত ব্রাশ করা।

২. প্রতিদিন অন্তত দুবার দাঁত মাজা উচিত। রাতে খাবার পর ও দুপুরে খাবার পর। সকালে নাশতার পর ভালো করে কুলকুচা করে নিন।

৩. প্রতিবার যা কিছু খান না কেন সাথে সাথে মুখে পানি নিয়ে কুলকুচা করুন, যাতে মুখের ভেতরে কোনো খাদ্যকণা থাকতে না পারে।

৪. ফ্লুরাইড দাঁতের ক্ষয় রোধ করে। দাঁতের এনামেলের সঙ্গে মিশে ফ্লুরাইড এনামেলকে শক্তিশালী করে তোলে।

৫. আপনার টুথব্রাশের টাফট হবে নাইলনের, ব্রিসল হবে মিডিয়াম। যখনই দেখবেন ব্রাশের টাফটগুলো আর সোজা অবস্থায় নেই তখন সেটা আর ব্যবহার করবেন না।

৬. প্রতি দাঁতের সবগুলো দিক ব্রাশ করবেন। ব্রাশ চালাবেন ওপর-নিচ, নিচ-ওপর–এভাবে।

৭. বছরে দুবার আপনার ডেন্টিস্টের কাছে পরামর্শ নেবেন।

৮. মাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় দাঁতের ওপর পাকের কারণে। এই পাক হলো দাঁতের ওপর পাতলা পাতের মতো ময়লা আস্তর। দাঁতে পাক দেখা দিলে অতিসত্বর পাক পরিষ্কার করে নেবেন।

৯. পাকের ভেতর জীবাণু থাকে। জীবাণু থেকে বিষ তৈরি হয় এবং সে বিষ দাঁতের পাশ দিয়ে মাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে। সে-ক্ষেত্রে মাড়ি জ্বালাপোড়া করতে পারে। লাল হয়ে যেতে পারে। এমনকি মাড়ি থেকে রক্তও পড়তে পারে।

১০. যদি আপনার দাঁত উঁচুনিচু বা অসমান হয় তাহলে ডেন্টাল সার্জনের

পরামর্শে ঠিক করিয়ে নিতে পারেন।

১১. মুখে গন্ধ হলে ভালো কোনো মাউথ ওয়াশ পানিতে মিশিয়ে অথবা গরম পানিতে লবণ মিশিয়ে মুখ ধোবেন।

১২. দাঁত যদি ঝকঝকে করতে চান, তাহলে একটু খাওয়ার সোডা ব্রাশে নিয়ে দাঁত মাজলে দাঁত ঝকঝকে সাদা হয়ে উঠবে। তবে এটি সবসময় করবেন না। এতে দাঁতের এনামেলের ক্ষতি হতে পারে।

১৩. নিয়মিত ভিটামিন-সি ও ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার খাবেন।

ঘাড় ও গলার যত্ন

মুখের যত্ন পরিচর্যা যতই করুন না কেন ঘাড় ও গলার সৌন্দর্য না থাকলে আপনার সৌন্দর্যের আকর্ষণীয় দিকটা ঢেকে যাবে অনেকখানি। কথায় বলে 'মরাল গ্রীবা' অর্থাৎ রাজহাঁসের মতো মসৃণ গলা অর্থাৎ লম্বাটে গলা সুন্দরী নারীর আকর্ষণীয় দিক। আপনার যদি মরাল গ্রীবা না-ও থাকে, তবুও একটু সতর্কভাবে পরিচর্যার মাধ্যমে সুন্দর করে তুলতে পারেন আপনার গ্রীবা।

আমাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে ত্বক শুষ্ক হয়ে ওঠে। শরীরের অন্যান্য এলাকার তুলনায় গলার ভাঁজ বা শুষ্ক ত্বক বেশি চোখে পড়ে। গলার ত্বকের দিকে তাকিয়ে বয়স সহজেই অনুমান করা যায়। তাই গলার বাড়তি যত্ন নেয়া প্রয়োজন। বয়স বাড়ার সাথে গলার মাংসপেশিগুলো ক্রমান্বয়ে ঝুলে পড়ে। তাই ঘাড় ও গলার নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত। যারা নিয়মিত ব্যায়াম করেন না তারাও অন্তুতপক্ষে নিচের নিয়মে ব্যায়ামটি করুন ও কিছু নির্দেশনা পালন করুন। দেখবেন বহু বছর পর্যন্ত আপনার ঘাড় ও গলা সুন্দর থাকবে।

ঘাড়ের ব্যায়াম ও কিছু নির্দেশনা

১. কাঁধ না নাড়িয়ে প্রথমে আপনার মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন। তারপর আস্তে আস্তে ডান দিকে কয়েক সেকেন্ড রাখুন। তারপর পেছনে, এরপর বাঁ দিকে, পুনরায় সামনে—এভাবে ছয়/ সাত বার ব্যায়ামটি করুন। এ ব্যায়াম মাটিতে বসে মেরুদণ্ড সোজা রেখে বজ্রাসনে বসে অথবা এমনি বসেও করতে পারেন। অথবা দাঁড়িয়ে

দুপায়ের মাঝে সামান্য ফাঁক রেখে কাঁধ স্থির রেখেও করতে পারেন। এভাবে বৃত্তাকারে ডানে-বামে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রতিদিন একবার করে ঘাড়ের এ ব্যায়ামটি করুন।

২. যখন দাঁড়ানো অবস্থায় থাকবেন–সবসময় মেরুদণ্ড সোজা টানটান করে দাঁড়াবেন। যদি কুঁজো হয়ে বা এঁকেবেঁকে দাঁড়ান বা আপনার চিবুক যদি ঝুলে থাকে তবে আপনাকে অনাকর্ষণীয় ও বেঁটে দেখাবে। এতে গলায় ভাঁজ বা বলিরেখা পড়ার সম্ভাবনা বেশি।

৩. সবসময় ঘাড় সোজা রেখে চলাফেরা করুন। ঘাড় নুইয়ে বসা, হাঁটাচলার অভ্যাস ত্যাগ করুন। তা না হলে অল্প বয়সেই গলায় বলিরেখা দেখা দেবে।

৪. ঘাড়, গলা পরিষ্কার করার সময় কখনো ঘষাঘষি করবেন না। বেশি ঘষাঘষিতে ত্বক কুঁচকে যেতে পারে। বরং ক্লিনজিং মিল্ক ব্যবহার করতে পারেন।

৫. রাতে শোবার আগে হালকাভাবে বডি লোশন কিংবা অলিভ অয়েল নিয়ে আস্তে আস্তে নিচ থেকে ওপরে টেনে টেনে ম্যাসাজ করুন।

হাতের যত্ন

আমাদের দেশের মেয়েরা সাধারণত মুখের যত্ন নিতেই ব্যস্ত থাকেন। হাত-পায়ের যত্নের ব্যাপারে তারা বেশ উদাসীন। কিন্তু হাত আমাদের যেমন প্রয়োজনীয় অঙ্গ তেমনি কোমল হাত ও কনকচাঁপার কলির মতো আঙুল সৌন্দর্যে যোগ করে নতুন মাত্রা। জন্মগতভাবে সুন্দর হাতের অধিকারিণীর সংখ্যা খুবই কম। তবে যত্নের মাধ্যমে যে-কেউ সুন্দর হাতের অধিকারিণী হতে পারেন। হাতের যত্নের জন্যে সামান্য কিছু নিয়ম পালন করতে হবে। তাহলে অনেক বয়স পর্যন্ত হাতের সৌন্দর্য ধরে রাখতে পারবেন।

মেয়েদের প্রধানত রান্নাবান্না ও গৃহস্থালি কাজ বেশি করতে হয়। হাতই সেখানে ব্যবহৃত হয় বেশি। তরকারি ও তেল-মশলার দাগ প্রায় সময়ই হাতে লাগে। একটু লেবুর রস কিংবা তেঁতুলপানি দিয়ে হাতটা অনায়াসে পরিষ্কার করে নিতে পারেন।

কেবল হাতের পাতা বা নখের যত্ন নিলেই হবে না, বাহুর যত্নও নিতে হবে। বাহু হতে নখ পর্যন্ত পুরোপুরি যত্ন নিলেই হবে হাতের যত্ন নেয়া।

গোসলের সময় বেসন গুলিয়ে বাহুসহ সম্পূর্ণ হাতে ঘষে গোসল করতে পারেন। অনেকের কনুইয়ে কালো ছাপ পড়ে। সে-ক্ষেত্রে প্রতিদিন এক টুকরো লেবু নিয়ে ঘষে নিলে দাগ উঠে যাবে। কুসুম গরম পানিতে হাত পরিষ্কার করা ভালো। গোসল শেষে কোনো হ্যান্ড লোশন কিংবা একটু গ্লিসারিন সমপরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে হাতে মেখে নিতে পারেন। তবে গ্লিসারিন মেখে রোদ লাগাবেন না। এতে চামড়া পুড়ে কালো হয়ে যাবে। গোসলের আগে অলিভ অয়েল হাতে ভালোভাবে মালিশ করে নিতে পারেন। এতে হাত ভালো থাকবে। অনেকের হাতে আবার অসংখ্য লোম, যা অনেকে পছন্দ করেন না। ইচ্ছে করলে আপনি ওয়াক্সিং করে অনায়াসে সে হাত লোমমুক্ত করে নিতে পারেন। অনেকের হাত দেহের তুলনায় মোটা। তারা সহজ কোয়ান্টাম ব্যায়ামের মাধ্যমে হাত সুন্দর করে তুলতে পারেন।

এবার আসা যাক হাতের আঙুল ও নখের যত্ন প্রসঙ্গে। হাতের আঙুলের নখের যত্নকে বলা হয় ম্যানিকিওর। এই ম্যানিকিওর সপ্তাহে একদিন, না পারলে ১৫ দিনে একদিন করলে ভালো হয়। এতে হাতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে, পুরানো মরা চামড়া ও ময়লা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হবে।

ম্যানিকিওর করার জন্যে কিছু জিনিস দরকার হয়। যেমন :

১. নেইল পলিশ তোলার জন্যে রিমুভার
২. এক বাটি হালকা গরম পানি ও সাবান
৩. একটি ছোট তোয়ালে
৪. নখ পরিষ্কার করার ব্রাশ
৫. কিউটিকল ছুরি
৬. হাতে ব্যবহারের ক্রিম বা অলিভ অয়েল
৭. গ্লিসারিন বা গোলাপ পানি
৮. নরম কাঠের কাঠি বা অরেঞ্জ স্টিক
৯. এমারি বোর্ড বা শিরিশ বোর্ড

পরিচর্যার পদ্ধতি

প্রথমে—নখে যদি নেইল পলিশ লাগানো থাকে তবে তা রিমুভার দিয়ে

তুলে ফেলুন। ভালো করে নিজের ইচ্ছেমতো শেপ দিয়ে নখ কাটুন। তবে ডিম্বাকৃতি শেপ সুন্দর লাগে বেশি। এরপর এমারি বোর্ড দিয়ে নখগুলো ধীরে ধীরে সুন্দরভাবে ফাইল করে নিন। একটা বাটিতে হালকা গরম সাবান পানি নিয়ে তার মধ্যে হাত দুটো ১৫/২০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। দেখবেন নখের চারপাশের ত্বক (cuticle) নরম হয়ে গেছে।

এবার ব্রাশের সাহায্যে ব্রাশ করে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিন।

কিউটিকলের মরা ত্বক কিউটিকল ছুরি দিয়ে পরিষ্কার করে নিন। তারপর তোয়ালে দিয়ে হাত ভালোভাবে শুকনো করে মুছে নিয়ে ক্রিম ম্যাসাজ করে নিন অথবা অলিভ অয়েল হালকা গরম করেও ম্যাসাজ করতে পারেন। অরেঞ্জ স্টিকের ভোঁতা দিক দিয়ে নখের গোড়ায় ক্রিম লাগিয়ে নিন। রাতে শোবার আগে গ্লিসারিনের সাথে সমপরিমাণ গোলাপ পানি মিশিয়ে হাতে মেখে নিতে পারেন। এতে হাতের ত্বক নরম থাকবে এবং হাত ফাটবে না। এছাড়া আপনি কোনো ভালো হ্যান্ড লোশন ব্যবহার করতে পারেন কিংবা অলিভ অয়েল ম্যাসাজ করে নিতে পারেন। হাতে নেইল পলিশ লাগালে ভালো দেখে লাগাবেন। প্রথমে একবার পাতলা করে দিয়ে শুকিয়ে নিয়ে, দ্বিতীয়বার লাগাবেন। এভাবে তৃতীয়বারও লাগিয়ে নিতে পারেন। এছাড়া মেহেদি দিয়েও হাত রাঙাতে পারেন।

নখের যত্নের টুকিটাকি

১. নখ পাতলা হলে বা ভেঙে গেলে মাস তিনেক প্রতিদিন জেলাটিন খেলে ঠিক হয়ে যাবে।
২. নখের পুষ্টির জন্যে এ, বি, সি ও ডি ভিটামিনযুক্ত খাবার খাবেন।
৩. সপ্তাহে দু/ তিন দিন ক্যাস্টর অয়েল লাগাবেন অথবা অলিভ অয়েল হালকা গরম করে নখে মালিশ করবেন।
৪. প্রতিদিন হাতের ব্যায়াম ও ম্যাসাজ করবেন।
৫. লাল আভাযুক্ত নীল দেখলে বুঝবেন নখের স্বাস্থ্য ভালো। নীল আভাযুক্ত দেখলে বুঝবেন নখের রক্ত প্রবাহ দুর্বল।
৬. অতিরিক্ত গরম পানি বা অতিরিক্ত ঠান্ডা পানিতে নখ ভেজাবেন না।
৭. হাত সারাক্ষণ পানিতে ভেজাবেন না। এতে হাতের ত্বক ফেটে যেতে পারে। হাত কম ভেজানোই ভালো।

৮. সপ্তাহে একদিন ম্যানিকিওর করা উচিত।

৯. প্রতিদিন রাতে হাত ধুয়ে ভালোভাবে মুছে নিয়ে কোনো ভালো ক্রিম, লোশন বা অলিভ অয়েল হালকা গরম করে ম্যাসাজ করতে পারেন। অল্প খরচে গ্লিসারিনের সাথে সমপরিমাণ পানি মিশিয়ে হাতের বাহু হতে আঙুলের ডগা পর্যন্ত মেখে নিতে পারেন।

১০. হাতের আঙুল গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত একটু হালকাভাবে মোচড় দেয়ার মতো মালিশ করবেন। এতে আঙুলের গাঁট যাদের মোটা তারা উপকার পাবেন।

১১. প্রতিদিন ১০ বার হাতের ব্যায়াম করলে হাতে রক্ত সঞ্চালন ভালো হয়ে হাত সুন্দর থাকবে। হাত মুষ্টিবদ্ধ করে মুষ্টি খুলে আঙুলগুলো যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে দেবেন। এভাবে একবার মুষ্টিবদ্ধ করবেন, একবার ছাড়বেন। এভাবে প্রতিদিন ১০ বার করুন।

১২. সবসময় পুরানো নেইল পলিশ তুলে ফেলে নতুন নেইল পলিশ লাগাবেন। গরমের দিনে হালকা মিষ্টি রঙের নেইল পলিশ ভালো লাগবে। শীতে গাঢ় রং ভালো লাগবে। রাতের অনুষ্ঠানে আপনি গাঢ় রঙের নেইল পলিশ ব্যবহার করতে পারেন।

১৩. আজকাল অল্পবয়সী মেয়েরা নখের ওপর লাগানোর জন্যে নেইল পলিশ দেয়ার পর বিভিন্ন রঙের ফুল বা ডিজাইন ব্যবহার করে বৈচিত্র্য এনে থাকে। তবে পোশাকের সাথে মিলিয়ে পার্লি অথবা নন-পার্লি নেইল পলিশ ব্যবহার করলে কোমল সৌন্দর্য ফুটে ওঠে।

পায়ের যত্ন

হাতের যত্নের মতো পায়ের যত্নও আপনাকে নিতে হবে নিয়মিত। অনেকেই মনে করেন পা তো ঢাকাই থাকে, তার আবার যত্নের প্রয়োজন কী! কিন্তু কথাটা মোটেই ঠিক নয়। কেননা সারাদিনে আপনার এ শরীরের ভার বহন করছে পা দুটোই। কাজেই ভেবে দেখুন এর অবদান কত। তাই এর যত্ন নেয়া দরকার শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো। আর শুধু পায়ের পাতা বা

নখের যত্ন নিলেই পায়ের যত্ন হবে না, ঊরু থেকে শুরু করে আঙুলের ডগা পর্যন্ত যত্ন নিলেই হবে পায়ের যত্ন নেয়া। অনেকের উরু খুব ভারী; আবার মোটা হওয়ার দরুন অনেকের ঊরুতে চর্বি জমে যায়। সে-ক্ষেত্রে নিয়মিত ব্যায়াম করে অনায়াসে সে চর্বি কমিয়ে সুন্দর করে তুলতে পারেন। প্রতিদিন ঊরু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত তেল মালিশ করা ভালো। তাতে পা সজীব থাকবে। পায়ের যত্ন হাতের যত্নের মতোই নিতে হয়। পায়ের যত্নকে পেডিকিওর বলা হয়। পেডিকিওর এর জন্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী :

১. লবণ/ গরম পানি
২. সাবান
৩. পা ধোয়ার ব্রাশ
৪. পিউমিশ স্টোন
৫. নেইল কাটার
৬. অলিভ অয়েল
৭. পায়ে মাখার লোশন
৮. গ্লিসারিন ও গোলাপ জল
৯. ট্যালকম পাউডার
১০. তোয়ালে
১১. তুলো
১২. নেইল রিমুভার

সর্বোপরি সুস্থ-সতেজ পা চাইলে পায়ের ব্যায়াম করতে হবে। তাতে পায়ের পেশি সতেজ হবে, রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পাবে।

মাঝে মাঝে পা দুটোকে বিশ্রাম দিন। যেমন, বিছানায় শুয়ে পা দুটোকে একটু উঁচু জায়গায় রেখে দিন। এভাবে ১০/১৫ মিনিট বিশ্রাম দিন।

প্রতিদিন দুই/ তিন বেলা ১০/১৫ মিনিট করে বজ্রাসনে বসুন।

কীভাবে যত্ন নেবেন

১. হালকা গরম পানিতে কিছুটা লবণ ফেলে সে পানি একটি গামলায় নিয়ে তাতে পায়ের পাতা দুটো ১০/১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। অথবা খাবার সোডা সোডিয়াম বাই-কার্বনেট হালকা গরম পানিতে মিশিয়ে

তাতেও পা ১০/১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে পারেন। এতে পায়ের ত্বক নরম হবে।

২. পিউমিশ স্টোন দিয়ে ঘষে ঘষে পায়ের মরা ত্বক উঠিয়ে ফেলুন।

৩. ব্রাশে সাবান লাগিয়ে পায়ে ভালোভাবে লাগিয়ে নখের চারপাশ, গোড়ালি, পায়ের পাতার চারপাশ ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৪. তোয়ালে দিয়ে ভালোভাবে পা শুকনো করে মুছে নিন।

৫. এবার তুলো ভিজিয়ে কোনো লোশন লাগিয়ে নিন অথবা গ্লিসারিন সমপরিমাণ গোলাপ পানি বা নরমাল পানি মিশিয়ে পায়ে মেখে নিন। এতে পা নরম থাকবে। পা ফাটবে না। শীতকালে অনেকের পা ফাটে, তাই এ পদ্ধতি শীতকালে উপকারী। গরমকালে অবশ্য পা ধোয়ার পর হালকাভাবে ট্যালকম পাউডার ছিটিয়ে নিতে পারেন।

৬. পা ধোয়ার আগেই নখ ভালোভাবে কেটে এমারি বোর্ডের সাহায্যে ঘষে নিন। পায়ের নখ গোল করে কাটা উচিত নয়। স্কয়ার শেপ করে কাটাই ভালো।

৭. পায়ে নেইল পলিশ দেয়ার সময় ফাঁকে ফাঁকে তুলো ঢুকিয়ে নিলে নেইল পলিশ দেয়া সহজ হবে। হাতে ও পায়ে একই রং ব্যবহার করা উচিত।

৮. পা সবসময় ভেজা থাকা ভালো নয়, এতে পায়ের ত্বক ফেটে যায়।

৯. পায়ের নখ সুন্দর-সজীব রাখার জন্যে অলিভ অয়েল হালকা গরম করে মালিশ করলে উপকার পাবেন।

১০. প্রতিদিন পায়ের ব্যায়াম করা উচিত।

১১. প্রতিদিন ভালোভাবে পা ধুয়ে শুকনো করে মুছে কোনো ভালো লোশন কিংবা গ্লিসারিন সমপরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে মালিশ করে নিলে পায়ের ত্বক নরম থাকে এবং পা ফাটবে না। মনে রাখবেন সুন্দর পা নারীর সৌন্দর্যকে অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়।

পায়ের বিভিন্ন সমস্যা

ক্লান্ত পা

পায়ের যে-কোনো অসুবিধায় বা অসুখে আপনার পায়ে ক্লান্তিবোধ জাগতে পারে। এ-ক্ষেত্রে আপনি পা দুটোকে কিছুটা উঁচু স্থানে ২০ থেকে ৩০ মিনিট রাখুন। প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ১০ মিনিট পা হালকা ম্যাসাজ করুন। আপনি যদি নিয়মিত বজ্রাসনে ১০/১৫ মিনিট বসেন এবং প্রতিদিন একঘণ্টা হাঁটেন তাহলে এগুলোর প্রয়োজন হবে না ।

পা ফাটা

শীতের সময় অনেকেরই পা ফাটে। এছাড়া অনেকের আবার ১২ মাসই পা ফাটা থাকে। ফাটা পা দেখতে কুৎসিত মনে হয়। যাদের শীতে পা ফাটে তারা শীত শুরু হওয়ার আগেই পায়ের যত্ন শুরু করবেন। কুসুম গরম পানিতে বেশি করে লবণ ফেলে তার মধ্যে পা ১০/১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। এরপর পা ঘষে ঘষে ফাটা জায়গা পরিষ্কার করে ভালোভাবে তোয়ালে দিয়ে মুছে শুকিয়ে নিন। এরপর কোনো লোশন কিংবা গ্লিসারিনের সাথে সমপরিমাণ গোলাপ পানি কিংবা নরমাল পানি মিশিয়ে প্রতিদিন রাতে পায়ে ম্যাসাজ করবেন।

খাবারে প্রতিদিন ভিটামিন-এ, ভিটামিন-বি, ভিটামিন-সি রাখবেন। শীতের সময় প্রচুর কাঁচা গাজর খাবেন। মনে রাখবেন, ত্বকের পেলবতার জন্যে 'ভিটামিন-এ'-এর প্রয়োজন। এছাড়া ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার খাবেন। কচু শাকে প্রচুর ক্যালসিয়াম রয়েছে। আগে থেকেই নিয়মিত পায়ের যত্ন নিলে পা ফাটবে না।

পায়ের ফোসকা

অনেক সময় নতুন জুতোর কারণে পায়ে ফোসকা পড়ে। এ ফোসকা বড় না হলে একটা সুই স্যাভলন পানিতে রেখে ফোসকা ছিদ্র করে দিলে ভেতর থেকে পানি বেরিয়ে যাবে। তারপর ঐ স্থানে অ্যান্টিসেপটিক স্যাভলন ক্রিম লাগিয়ে নিতে পারেন। যদি ফোসকা পেকে অসুবিধে সৃষ্টি করে তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়াই ভালো।

আঙুল ফোলা

বেশি শীতপ্রধান দেশে কিংবা পাহাড়ি অঞ্চলে অনেকের পায়ের আঙুল লাল হয়ে ফুলে ওঠে এবং ভীষণ চুলকাতে থাকে। এ অবস্থায় গরম পানিতে লবণ কিংবা বরিক পাউডার মিশিয়ে পা ১০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে পরে শুকনো করে পা মুছে চিকিৎসকের পরামর্শে যে-কোনো অ্যান্টিসেপটিক মলম লাগাতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, এ অবস্থায় যেন পায়ে ঠান্ডা না লাগে। উলের মোজা পরে থাকবেন।

পায়ের স্ফীতি

নানা কারণে পায়ের স্ফীতি হতে পারে। যেমন গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে কিংবা হৃদরোগেও এ লক্ষণ দেখা দিতে পারে। যারা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করেন তাদের বেলায়ও হতে পারে অথবা যারা অস্বাভাবিক রকম মোটা তাদেরও হতে পারে। এ-ক্ষেত্রে গোসলের পর পায়ে লেবুর রস ঘষে ১৫/২০ মিনিট পা দুটোকে শিথিল করে শরীর থেকে কিছুটা উঁচু স্থানে রেখে বিশ্রাম দিতে পারেন। এতে বেশি সুফল পাবেন। পায়ের ব্যায়াম নিয়মিত করলে এসব হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

কুনি নখ

নখ কাটার দোষে অনেক সময় নখের কোণা মাংসের মধ্যে ঢুকে গিয়ে পাশগুলো ফুলে ওঠে ও পেকে যায়—একে বলে কুনি নখ। এটা বেশ বেদনাদায়ক। এ-ক্ষেত্রে গরম পানিতে বোরিক পাউডার মিশিয়ে দিনে চার/পাঁচ বার সেঁক দিলে ব্যথার উপশম হবে। পরে কোনো অ্যান্টিসেপটিক মলম লাগিয়ে নিতে পারেন।

পায়ের কড়া

বার বার চাপ বা ঘষা লাগার জন্যে পায়ে কড়ার সৃষ্টি হয়। এ কড়া নখের মতো শক্ত হয়ে ব্যথা করে। তাই জুতো কেনার সময় খেয়াল করে কিনতে হবে যেন তা আরামদায়ক হয়। তা না হলে পরে চাপে চাপে কড়া পড়বে। প্রথম দিকে কর্ন ঝামা বা পিউমিশ স্টোন দিয়ে ঘষে ঘষে কড়া নিবারণ করা যায় কিংবা ধারালো ব্লেড বা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলা যায়। এখন বাজারে অনেক লোশন বেরিয়েছে যা কড়ার ওপর লাগালে নরম হয়ে পড়ে যায়। অবশ্য যে-কোনো ওষুধ লাগানোর আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।

একজিমা

একজিমা দুধরনের হতে পারে–শুষ্ক ও আর্দ্র। একজিমা যে ধরনেরই হোক না কেন, এর প্রতিকারও আছে এবং পরিচর্যাও সহজ। একজিমা চুলকায়। সঠিক সময়ে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এর প্রতিকার করুন। তা না করলে একজিমা আপনাকে ভোগাবে।

ছত্রাকজনিত রোগ

পায়ের আঙুলের ফাঁকে এ ব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। কারণ এ সব জায়গায় ঘাম হয়। যে-সব জায়গায় ঘাম হয়, ভেজা থাকে, সে-সব জায়গায় ছত্রাকজনিত জীবাণুর আক্রমণ সহজে হয়। এ-ক্ষেত্রে পা নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে ধুয়ে শুকনো করে মুছে ফেলতে হবে। পা শুষ্ক রাখলেই অনেক ক্ষেত্রে এ রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। ছত্রাকের আক্রমণ প্রবল হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

সোরিয়াসিস

সোরিয়াসিসে আক্রান্ত ত্বকের স্থান দেখতে শুষ্ক ও আঁশযুক্ত থাকে। ত্বকের ওপর হালকা গোলাপি রঙের দাগের মতো দেখায়। সূর্যের আলো সোরিয়াসিস দূর করে। যে দেশে সূর্যের আলো নেই সেখানে আল্ট্রা ভায়োলেট ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা আছে। প্রথম অবস্থায় সূর্যের আলো, লোশন বা মলমেই সেরে যায়। তবে এ অবস্থা বেশিদিন চললে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

হাত-পায়ের যত্নে ও সৌন্দর্যচর্চায় মেহেদি

'হলুদ বাটো মেন্দি বাটো বাটো ফুলের মৌ' বাঙালি নারীর সৌন্দর্যচর্চায় অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানের মতো মেহেদির ব্যবহারও সার্বজনীন। ঈদের দিনে বিশেষ সাজগোজের মধ্যে মেহেদি একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। আজকাল গ্রাম বা শহর–যেখানেই হোক, ঈদের দিনে হাত-পা মেহেদিরঞ্জিত না হলে যেন সাজটাই অপূর্ণ থেকে যায়।

সৌন্দর্যচর্চায় মেহেদির ব্যবহার আজ নতুন নয়। প্রাচীনকাল থেকেই এর

ব্যবহার চলে আসছে। পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরের মেয়েরা হাতে, পায়ে ও চুলে মেহেদি লাগাত। এমনকি মৃত্যুর পর মমির চুল ও নখ মেহেদি দিয়ে রঞ্জিত করে দিত। বাগদাদের খলিফাদের যুগে নারীর সৌন্দর্যচর্চার অন্যতম প্রধান উপকরণ ছিল মেহেদি। উপমহাদেশে মেহেদির প্রচলন হয় মোঘল আমল থেকে। মোঘল রমণীদের সৌন্দর্যচর্চায় মেহেদির ভূমিকা ছিল অনন্য। হাতে-পায়ে মেহেদির নকশী কাজ তখন থেকেই চালু হয়। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান মেহেদির নকশী কাজ খুবই পছন্দ করতেন। মোঘল হেরেম থেকে রাজপুত নারীদের মধ্যে মেহেদির প্রচলন শুরু হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে তা উপমহাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আর এখন এর ব্যবহার করে না এমন মহিলার সংখ্যা খুবই কম।

মেহেদি শুধু সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্যেই নয়, হাত-পায়ের ত্বকের জন্যেও অত্যন্ত উপকারী। মেহেদি পাতা ছাড়াও এর ফল-ফুল ও মূল বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করা হয়। এই ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন স্থানে এর পরিচিতি বিভিন্ন নামে। মেহেদি কোথাও মেদি, মেন্দি, কোথাও মৌকা, কোথাও মদয়ন্তিকা, আবার কোথাও গিরিমলিকা বা বনমলিকা নামে পরিচিত। মধ্য এশিয়ায় এটি পরিচিত 'আল-খান্না' নামে। আর আরবে পরিচিত 'হেন্না' নামে। ইংরেজি হেনা (Henna) শব্দটি এসেছে আরবি হেন্না শব্দ থেকে। মেহেদির বোটানিকেল নাম হচ্ছে Lawsonia Inermis Linni। এটি Lythreaceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

হাতে মেহেদি লাগানো কঠিন কাজ নয়। সাধারণভাবে আমাদের দেশের মেয়েরা গাছ থেকে প্রয়োজন মতো পাতা তুলে নিয়ে ডাঁটা-বোঁটা ফেলে ধুয়ে শিলপাটায় মিহি করে বেটে নেয়। বাটা যত মিহি হবে পেস্ট তত সুন্দর, লাগানো তত সহজ এবং রং তত উজ্জ্বল হবে। অনেক সময় শহরে টাটকা মেহেদি পাতা যোগাড় করতে অসুবিধা। তাই আপনি ইচ্ছে করলে টাটকা পাতা রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে চেলে শিশি ভরে কিংবা পলিথিন প্যাকে মুখ আটকে রেখে দিতে পারেন। প্রয়োজনে একটু গরম পানি দিয়ে পেস্টের মতো বানিয়ে হাতে-পায়ে নিজের ইচ্ছেমতো ডিজাইন করে নিতে পারেন। এছাড়া বাজারে আজকাল গুঁড়ো মেহেদি এবং পেস্ট মেহেদিও পাওয়া যায়। তা দিয়েও হাত রাঙাতে পারেন। তবে তাজা মেহেদির রঙের উজ্জ্বলতাই ভিন্ন।

হাতে ডিজাইন করার ক্ষেত্রে সাধারণত মেয়েরা কাঠি, শলা, টুথপিক দিয়ে তুলে তুলে ডিজাইন করে থাকে। এতেও সুন্দর নকশা আঁকা যায়। তবে সময়

বেশি লাগে। আজকাল কম সময়ে সূক্ষ্ম ডিজাইন করার জন্যে পাস্টিক কোণ ব্যবহার করা হয়। পাস্টিক কোণ বানানো এমন কঠিন কিছু নয়। আপনি নিচের ছবি দেখে অনায়াসে নিজেই এই কোণ বানাতে পারেন।

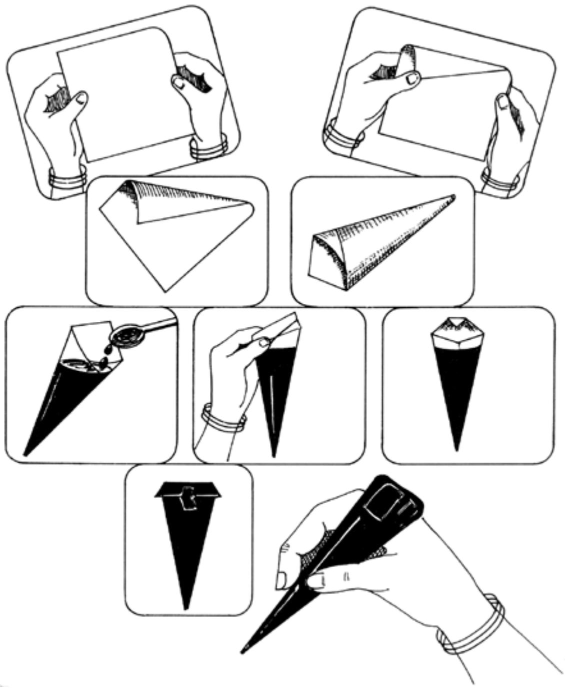

মেহেদির পেস্ট বানানোর পদ্ধতি

১. শুধু পরিষ্কার কাঁচা পাতা মিহি করে বেটে নিতে পারেন।

২. মিহি করে বাটা কাঁচা পাতার পেস্টের সাথে একটু লেবুর রস মিশিয়ে নিতে পারেন।

৩. কাঁচা পাতার পেস্টের সাথে চা বা কফির কড়া লিকার মেশাতে পারেন। এতে মেহেদির রং গাঢ় হয়।

৪. কাঁচা পাতার পেস্টের সাথে সামান্য পান খাওয়ার খয়ের মেশাতে পারেন। এতেও রং গাঢ় হবে।

৫. মেহেদি পাতার শুকনো গুঁড়ো হলে তা দিয়ে পেস্ট বানানোর জন্যে একটু গরম পানিতে মিশিয়ে একঘণ্টা রেখে দিতে হবে। তাহলেই পেস্ট ব্যবহারের উপযোগী হবে।

৬. গুঁড়ো পেস্টের সাথেও লেবুর রস, চা বা কফির লিকার বা খয়ের মেশাতে পারেন।

৭. পেস্টের ঘনত্ব ঠিক করার জন্যে প্রয়োজনমতো লেবুর রস ও একটু চিনি গোলানো পানি পেস্টের সাথে মিশিয়ে নিতে পারেন।

এভাবে পেস্ট বানিয়ে নিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো ডিজাইন করে হাতে-পায়ে লাগিয়ে নিতে পারেন। মেহেদি লাগানোর পর যদি দেখেন উঠে যেতে চায়, তাহলে লেবুর রস ও চিনি গোলা পানি ভিন্ন পাত্রে নিয়ে তুলোতে ভিজিয়ে মেহেদির প্রলেপের ওপর আস্তে আস্তে চেপে চেপে দেবেন। এতে পেস্ট ঝরে পড়বে না। দুই থেকে চার ঘণ্টা পর্যন্ত মেহেদি হাতে রাখা উচিত। পুরো মেহেদি শুকিয়ে যাওয়ার পর ভোঁতা ছুরি কিংবা চামচ দিয়ে তুলে ফেলবেন। এবার খাঁটি সর্ষের তেল মেখে হাত দুটো চুলোর আগুনের কাছে ধরে দুই/ তিন মিনিট সেঁকে নিন। খেয়াল রাখবেন, সেঁকতে গিয়ে আবার হাত পুড়িয়ে না ফেলেন। রঙের ঔজ্জ্বল্য ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্যে দুই/ তিন ঘণ্টা পানিতে হাত ভেজাবেন না।

সবশেষে মনে রাখবেন, ধৈর্যের সঙ্গে সূক্ষ্ম ডিজাইনে মেহেদি লাগিয়ে অনায়াসেই আপনি আপনার শৈল্পিক মনের পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে পারেন। হতে পারেন আকর্ষণীয়।

কীভাবে সাজবেন

সবকিছু পরিচর্যার পর এবার জানতে হবে আপনি কীভাবে সাজবেন। সাজার জন্যে কী কী প্রসাধন সামগ্রী প্রয়োজন এবং কীভাবে তা ব্যবহার করবেন। সাজগোজের জন্যে আপনার প্রয়োজনীয় প্রসাধন সামগ্রী এবং তা ব্যবহারের নিয়মাবলি :

১. ক্লিনজার

ক্লিনজিং করার জন্যে সাধারণত তিন ধরনের উপকরণ পাওয়া যায়। যেমন : মিল্ক, ক্রিম ও লোশন। গায়ে মাখা সাবান অথবা ত্বক অনুসারে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করতে পারেন।

লাগানোর নিয়ম : সাধারণত হাতের আঙুল অথবা তুলো দিয়ে লাগাবেন। সারা দেহেই ক্লিনজার ব্যবহার করা যায়।

২. ফ্রেশনার

ক্লিনজিং করার পর ফ্রেশনার ব্যবহৃত হয়। স্বাভাবিক, মিশ্র ও শুষ্ক ত্বকের জন্যে টনিক, স্কিন ফ্রেশনার বা টোনার। তৈলাক্ত ত্বকের জন্যে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট লোশন।

লাগানোর নিয়ম : তুলো দিয়ে লাগাবেন। শুধু মুখে ব্যবহার করতে হয় মেক-আপের আগে।

৩. ময়েশ্চারাইজার

ত্বকের আর্দ্রতা বা জলীয়ভাব ধরে রাখার জন্যে ব্যবহার করা হয়। দুধরনের ময়েশ্চারাইজার পাওয়া যায়–ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম ও ময়েশ্চারাইজিং লোশন। হাতের আঙুল দিয়ে লাগাতে হয়।

৪. ব্লেমিশ কভার আপস্টিক

এটি মুখের ছোট ছোট খুঁত বা দাগ ঢাকার জন্যে ব্যবহৃত হয়। মেক-আপ শুরু করার আগে এটি যেখানে যেখানে দাগ বা খুঁত রয়েছে সেখানে–বিশেষ করে চোখের আশপাশের খুঁত থাকলে তা ঢাকতে ব্যবহার করতে পারেন।

এগুলো বিভিন্ন রঙের পাওয়া যায়। যে রং আপনার ত্বকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সে রং লাগাবেন।

৫. ফাউন্ডেশন

এটিকে ময়েশ্চারাইজার লাগানোর ১০ মিনিট পর মেক-আপের বেইজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ফাউন্ডেশন মুখের নানা রকমের দাগ লুকাতে সাহায্য করে। সাময়িকভাবে মুখের ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল করে তোলে। ফাউন্ডেশন আঙুলের ডগা দিয়ে তুলে সারা মুখে-গলায় বিন্দু বিন্দু করে লাগাতে হয়। তারপর আলতো করে ঘষে ঘষে সারা মুখে-গলায় বসিয়ে দিতে হয়। এমনভাবে লাগাবেন যেন বেশি না হয়ে যায়। বেশি হলে বিশ্রী লাগবে। মনে হবে প্রলেপ মেখেছেন। হালকাপাতলা করে লাগাতে হবে, যেন মুখ দেখতে প্রাকৃতিক ফর্সা মনে হয়। ফাউন্ডেশন কেনার সময় গায়ের রঙের সাথে মিলিয়ে কিনুন। ফর্সাদের জন্যে গোল্ডেন ট্যান বা হালকা রোজ ভালো লাগবে। সবসময় ত্বকের রঙের সাথে খাপ খাইয়ে ফাউন্ডেশন লাগাবেন।

৬. কমপ্যাক্ট মেক-আপ বা প্যানকেক

কমপ্যাক্ট মেক-আপকে সম্পূর্ণ মেক-আপ বলা যায়। এটা শুধু আলাদাও লাগানো যায় আবার ফাউন্ডেশনের ওপরও ব্যবহার করা যায়। স্পঞ্জ দিয়ে লাগাতে হয়। এটি মুখমণ্ডলে ব্যবহার করা হয়। রাতের সাজে এটা ভালো। আপনার ত্বকের রঙের সাথে মিলিয়ে কিনুন।

৭. ফেস পাউডার

এটি এমনিতে লাগানো যায়। এর সাথে দেয়া প্যাড দিয়ে লাগাতে পারেন অথবা ব্রাশ দ্বারাও লাগানো যায়। আবার ফাউন্ডেশন লাগানোর পরও ব্যবহার করা যায়। এটিও মুখমণ্ডলে ব্যবহৃত হয়। ফাউন্ডেশনের পর লাগালে ফাউন্ডেশন থেকে এক শেড হালকা রঙের লাগাতে হবে।

৮. ব্লাশ-অন বা রুজ

ব্লাশ-অন বা রুজ দুধরনের। পাউডার ও লিকুইড ক্রিম আকারে। এগুলো বিভিন্ন রঙের পাওয়া যায়। এটি ব্যবহার করতে হয় পাফ, সফট ব্রাশ কিংবা তুলো দিয়ে। মেক-আপ সম্পূর্ণ হলে এটি গালে উজ্জ্বলতার জন্যে ব্যবহার করা হয়। তবে বিভিন্ন মুখমণ্ডলের আকৃতিতে বিভিন্নভাবে লাগাতে হয়। লম্বা মুখের ক্ষেত্রে গালের উঁচু হাড়ের দিক থেকে ব্রাশ টেনে কানের দিক

পর্যন্ত টেনে মিশিয়ে দিলে লম্বাটে মুখ দেখতে ছোট লাগবে। আবার গোল মুখকে লম্বাটে দেখাতে হলে কানের তলা থেকে ব্রাশ টেনে নিয়ে সমগ্র চোয়ালের পাশ ঘিরে কান পর্যন্ত টানতে হবে। তারপর একটা টিস্যু পেপার দিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে।

৯. আইশ্যাডো

চোখের পাতায় লাগাতে হয়। এতে চোখে বাড়তি সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। আইশ্যাডো নানান রঙের পাওয়া যায়। পোশাকের সাথে মিলিয়ে লাগালে বেশ স্মার্ট এবং সুন্দর লাগে। এটি ব্রাশ, ছোট স্টিলের মাথায় স্পঞ্জ প্যাড লাগানো স্টিক, তুলো ইত্যাদির যে-কোনো একটির সাহায্যে লাগাতে পারেন।

১০. আই লাইনার

এটি আইশ্যাডো লাগানোর পর লাগাতে হয়। চোখের ওপরে কিংবা ওপরে-নিচে উভয় পাতায় লাগাতে পারেন। এটি কাজলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যাদের চোখ ছোট তারা চোখের বাইরের দিক দিয়ে সতর্কভাবে সুন্দর করে লাইন টেনে চোখ বড় দেখাতে পারেন। লাইনার কালো বা ব্রাউন রঙের পাওয়া যায়।

১১. মাসকারা

চোখে লাইনার কিংবা কাজল লাগানোর পরই মাসকারা লাগাতে হয়। যাদের চোখের পাপড়ি অল্প তারা এটি ব্যবহার করলে চোখের পাপড়িগুলো ঘন এবং বড় দেখায়। আর যাদের চোখের পাপড়ি বড় তারাও লাগাতে পারেন। দেখতে আরো ভালো লাগবে। মাসকারা দুধরনেরই পাওয়া যায়– লিকুইড এবং শক্ত কেকের মতো। শক্ত মাসকারা লাগানো সহজ। মাসকারা সাধারণত কালো, ব্রাউন, নীলচে রঙের হয়ে থাকে। তবে বাঙালি মেয়েদের জন্যে কালো মাসকারা লাগানো উত্তম।

১২. আই-ব্রো পেন্সিল

ভ্রুতে লাগাতে হয়। দুরঙের পাওয়া যায়। বাদামি ও কালো। এটি ভ্রুকে ঘন, কালো ও উজ্জ্বল দেখাতে ব্যবহৃত হয়।

১৩. লিপস্টিক

ঠোঁট সুন্দর করতে লিপস্টিক ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত পোশাকের সাথে মিলিয়ে ঠোঁটে লাগালে ভালো লাগে। তবে পোশাকের এমন কিছু রং

আছে সে রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করলে সঙ মনে হবে। লিপস্টিক বিভিন্ন রঙের পাওয়া যায়। দিনের বেলা হালকা মিষ্টি রং লাগান, রাতে গাঢ় রং লাগাতে পারেন। লাগানোর আগে ঠোঁটে একটু পাউডার লাগিয়ে নিয়ে তারপর লিপ পেন্সিল বা লিপ ব্রাশ দিয়ে হালকা করে আউট লাইন এঁকে নিয়ে তারপর ভেতরের অংশ লিপস্টিক দিয়ে ভরে দিতে হয়। আজকাল অনেকেই লাইন এমনভাবে টানেন আর মধ্যে হালকা ভরাট করেন যে, মুখের দিকে তাকালে মনে হয় ঠোঁটে আলগা কিছু লাগিয়ে রেখেছেন। আবার অনেকে বাইরে লাইন টানেন এক রঙের পেন্সিল ব্যবহার করে, মধ্যে ভরাট করেন অন্য রঙের লিপস্টিক দিয়ে। এটিও দেখতে বিশ্রী লাগে। মনে হয় কৃত্রিম ঠোঁট। সবসময় মনে রাখবেন, সাজগোজ যত স্বাভাবিক হবে তত আপনাকে রুচিসম্মত মনে হবে। হাল-ফ্যাশনের সবকিছুই দেখতে ভালো লাগে না। ওগুলো ছবির জগতে, বিজ্ঞাপনে দেখতে ভালো লাগে, বাস্তবে নয়।

১৪. লিপগ্লস

লিপস্টিক লাগানোর পর এটি ব্যবহার করতে হয়। এতে ঠোঁট ভেজা ভেজা, উজ্জ্বল ও চকচকে দেখায়। লিপগ্লস বিভিন্ন রঙের পাওয়া যায়। ন্যাচারাল লিপগ্লসও পাওয়া যায়। সাধারণত লিপস্টিকের রঙের সাথে মিলিয়ে লাগাতে হয়। আর যদি রঙের সাথে না মেলাতে পারেন, তাহলে ন্যাচারাল লিপগ্লস লাগাতে পারেন। এতে ঠোঁট সুন্দর দেখায়।

১৫. গ্লিমার

মেক-আপ করার শেষ পর্যায়ে গ্লিমার ব্যবহার করতে হয়। গ্লিমার ব্যবহার করার ফলে মুখমণ্ডলে চকচকে ভাব ফুটে ওঠে। তবে খুব কম পরিমাণে লাগাতে হয়। আঙুলের ডগায় সামান্য নিয়ে কপাল, দুই গালের কিছুটা অংশে এবং চিবুকে লাগালেই হয়। তবে এটি রাতের অনুষ্ঠানে লাগানো উচিত। এছাড়া রোল গ্লিমারও পাওয়া যায়। এটি সরাসরি লাগানো যায়।

১৬. সুগন্ধি বা পারফিউম

সুগন্ধি পছন্দ করে না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কী নারী, কী পুরুষ! মিষ্টি গন্ধ সবার মনেই আবেশ সৃষ্টি করে। শুধু মানুষ কেন, বিধাতাও নিশ্চয়ই পছন্দ করেন সুবাস। তাই তো তিনি প্রকৃতিতে নানা লতাগুল্ম ও পত্রপুষ্পকে করেছেন সুবাসিত। আর মানুষ এই প্রকৃতি থেকেই তৈরি করতে শিখেছে নানা ধরনের সুগন্ধি। প্রাচীন কালে মানুষ নিজ হাতে নানান ফুল-ফল,

লতাপাতা থেকে নির্যাস বের করে তৈরি করত সুগন্ধি। তবে একে সংরক্ষণ করা ছিল কঠিন ব্যাপার। আর এখন বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরি হচ্ছে নানা সুগন্ধি। তা সংরক্ষণ করতেও কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।

ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি সুগন্ধি ব্যবহার করে থাকে। সাজগোজ সেরে একটু সুগন্ধি ব্যবহার না করলে মনে হবে যে সাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

তবে সুগন্ধি লাগালেই হলো না। সুগন্ধি লাগানোরও নিয়ম আছে। আর নিয়মগুলো জানা থাকলেই সুগন্ধি ব্যবহার একটা আর্টে পরিণত হতে পারে।

সবরকম গন্ধের প্রতিই আমাদের সহজাত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। সুন্দর গন্ধ নাকে লাগলে আবেশে চোখ দুটো আপনা থেকেই বন্ধ করে বলি–আহ্! কী চমৎকার! আর বাজে গন্ধ বা উগ্র কোনো গন্ধ পেলে নাক কুঁচকে বলি, ইশ্! কী বাজে! দূরে সরে যাই।

প্রতিটি মানুষের শরীরে স্বাভাবিক গন্ধ আছে। এমনকি সব সৃষ্টিরই নিজস্ব গন্ধ রয়েছে। এজন্যে তাকে আলাদা করে বোঝা যায়।

আমরা দেহের স্বাভাবিক গন্ধ পরিবর্তন করে চমৎকার কোনো মিষ্টি গন্ধ তৈরি করতে চাই। আর এজন্যে আমরা নানা ধরনের পারফিউম, বডি সেন্ট, সুগন্ধি পাউডার, আতর ব্যবহার করে থাকি।

আপনি যেখানে যাবেন বা বসবেন সেখানে সুগন্ধি আবেশ সৃষ্টি করতে চাইলে সঠিক উপায়ে সুগন্ধি ব্যবহার করুন।

বিভিন্ন সুগন্ধির বিজ্ঞাপন দেখলেই কেমন একটা শিহরণ জাগানো আনন্দ এসে আমাদের রোমান্টিক আচ্ছন্নতায় ভরিয়ে তোলে। কিন্তু আমরা কি দোকানে গিয়ে বলব, আমাকে আচ্ছন্নতা সৃষ্টিকারী ও কোনো উত্তেজক সুগন্ধি দিন? নিশ্চয়ই এটি কখনো বলব না।

অনেকেই বাড়ি থেকে বেরোনোর মুহূর্তে খুব তাড়াতাড়ি একটু পারফিউম চেপে লাগিয়ে নেন। কিন্তু সুগন্ধি ব্যবহারের আরো ভালো উপায় আছে।

গোসলের সময় পানিতে বিভিন্ন সুগন্ধি উপাদান ব্যবহার করা যায়। এতে শরীর থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ বেরোবে। আবার ত্বকের কোমলতাও বজায় থাকবে। এছাড়া গোসলের পরও ব্যবহার করার জন্যে কিছু সুগন্ধি আছে। তবুও সুগন্ধি সাবানের বিকল্প নেই। গোসল শেষে বাইরে না বেরোলে আপনি ত্বকে ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন। লোশন ব্যবহার করতে পারেন। যে-সব জায়গা প্রচুর ঘামে সেখানে পাউডার ব্যবহার করতে পারেন। এতে আপনার শরীর থেকে চমৎকার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়বে।

সুগন্ধিযুক্ত বডি লোশন হাতে কিংবা শরীরে মাখলে আপনার শরীর ও হাত থেকে সুন্দর মিষ্টি সুবাস ছড়াবে। আপনি হয়তো রান্নাবান্নার কাজ একটু আগে সেরেছেন। পেঁয়াজের বিশ্রী গন্ধ নাকে লাগছে। হাত ভালো করে ধুয়ে লোশন মেখে নিলে পেঁয়াজের বিশ্রী গন্ধ দূর হবে। পেঁয়াজ-রসুন খাওয়ার পর প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত আমাদের নিঃশ্বাস এবং শরীর থেকে এর গন্ধ বেরোতে পারে, যা আমরা নিজেরা টের পাই না। পাশের কেউ সহজেই বুঝতে পারে। এজন্যে পেঁয়াজ, রসুন এমনকি কিছু গ্রীষ্মকালীন ফলের গন্ধের ব্যাপারেও সাবধান থাকা উচিত।

যদি এলার্জির জন্যে সুগন্ধি লাগাতে না পারেন তাহলে হাঁটুর ভাঁজে সুগন্ধি কোনো পাউডার বা ক্রিম লাগাতে পারেন। হাত বা মুখের পাশে লাগাবেন না। এলার্জি থাকলে স্প্রে-ও ব্যবহার করবেন না। এতে অ্যালকোহল থাকে।

যে সুগন্ধিতে তেলের পরিমাণ বেশি, সে সুগন্ধি ত্বকে বেশিক্ষণ থাকে। যদি আপনার এতে অসুবিধে হয়, তাহলে আপনি আর্দ্র কোনো ক্রিম ব্যবহার করে নিয়ে সেন্ট ব্যবহার করবেন।

গরমে গন্ধ বেশি ছড়ায়, তাই গরমের সময় কোনো কড়া সুগন্ধি ব্যবহার না করাই ভালো। হালকা মিষ্টি গন্ধ ব্যবহার করলে দেখবেন কেমন একটা আমেজ লাগছে। আবার শীতের সময় উষ্ণ এবং কড়া কিছু ব্যবহার করা যায়। সুগন্ধি আবহাওয়া অনুযায়ী অবশ্যই পরিবর্তিত হওয়া উচিত।

সুগন্ধি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিচের তথ্যগুলো জানা প্রয়োজন

১. গ্রীষ্মে কড়া সুগন্ধি ব্যবহার করবেন না।

২. শীতে উষ্ণ কড়া সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারেন।

৩. কাপড়ে সুগন্ধি লাগাবেন না, এতে কাপড়ের সুতো নষ্ট হয় এবং খানিকক্ষণ পরে থাকেও না।

৪. মুক্তোর গহনায় যাতে সুগন্ধি না লাগে খেয়াল রাখবেন। এতে মুক্তোর দ্যুতি নষ্ট হয়।

৫. স্বর্ণালংকার পরে পারফিউম লাগাবেন না। পারফিউম আগে ব্যবহার করুন। পাঁচ মিনিট পরে গহনা পরতে পারেন।

৬. সুগন্ধি অন্ধকারে ঠান্ডা জায়গায় রাখবেন।

৭. সুগন্ধি বেশিদিন ঘরে জমিয়ে রাখবেন না। তাহলে ব্যবহারের যোগ্য থাকে না।

৮. সুগন্ধি বোতলের মুখে স্ফটিক জাতীয় আবরণ থাকলে ওটা কখনো গায়ে লাগাবেন না। আপনার ত্বকে ব্যাকটেরিয়া থাকলে এর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে।
৯. সুগন্ধিতে এলার্জি থাকলে ব্যবহার করা উচিত নয়।
১০. সুগন্ধি দ্রব্য বাইরে বেরোনোর আগ মুহূর্তে না লাগিয়ে ৫/১০ মিনিট আগে ব্যবহার করুন।
১১. তৈলাক্ত ত্বকে সুগন্ধি বেশিক্ষণ থাকে।
১২. যাদের ত্বক শুষ্ক তারা কোনো ক্রিম, লোশন ব্যবহার করার পর সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারেন।

সুগন্ধি ব্যবহার করলে মনে একটু তাজা ভাব আসে। তবে বিশেষ কোনো মানসিক পরিবর্তন বা আচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয় না। আর সুগন্ধির প্রতিক্রিয়া জনে জনে ভিন্ন হতে পারে। তাই একজনের কাছে যা অমৃত তা অন্যের কাছে হতে পারে বিষ। ব্যক্তিগত রুচিরই প্রাধান্য পায় সুগন্ধি ব্যবহারে।

সুগন্ধি দেহের বিশেষ স্পটে লাগান। যেমন : কনুইয়ের ভাঁজে, কব্জির ভেতর দিকে। হাঁটুর পেছনে। এছাড়া এক টুকরো তুলোয় সুগন্ধি ভিজিয়ে শরীরের ভেতরে পোশাকের মধ্যে সুবিধামতো জায়গায় রেখে দিতে পারেন। গ্রীষ্মকালে হালকা গন্ধের এবং শীতকালে কোনো ভারি ধরনের পারফিউম ব্যবহার করা উচিত। পারফিউমের মধ্যে কয়েকটি শ্রেণি রয়েছে যা শ্রেণি ভেদে শরীরের বিভিন্ন স্থানে লাগাতে হয়। যেমন :

ক. **এন্টি-পারস্‌পিরেন্ট :** এটি ঘাম প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সেজন্যে এটি শুধু বগলেই ব্যবহার হয়।

খ. **ডিওডোরেন্ট :** এই সুগন্ধিটি দেহের অবাঞ্ছিত গন্ধকে দূর করতে সাহায্য করে। তাই সারা দেহেই ব্যবহার করা যায়।

গ. **কোলন :** এই সুগন্ধিটি গোসলের পর ব্যবহার করা হয়। এটি সারা শরীরে লাগাতে পারেন। এর কাজ হলো দেহের তাপ কমিয়ে দেহ ঠান্ডা রাখা।

১৭. টিপ

সবশেষে পোশাকের সাথে মানিয়ে ইচ্ছে অনুসারে কপালে টিপ পরতে পারেন। বাজারে আজকাল হরেক রকমের টিপ পাওয়া যায়। এটি মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি করে। তবে টিপ মুখমণ্ডলের প্রকার ভেদে পরা উচিত।

তা না হলে মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যবৃদ্ধির চেয়ে সৌন্দর্যহানি ঘটাবে। আমাদের মুখাকৃতি বিভিন্ন ধরনের। গোলাকার, লম্বাটে, চ্যাপটা, চৌকো ইত্যাদি। সব মুখেই সব ধরনের টিপ মানায় না। তাই জেনে নিন কোন মুখে কোন ধরনের টিপ পরলে আপনাকে সুন্দর লাগবে।

১. গোলাকার মুখে লম্বা ধরনের টিপ পরুন। এতে মুখ একটু লম্বাটে মনে হবে।
২. লম্বাটে মুখে গোলাকৃতির টিপ পরুন। তাহলে আপনার মুখ খানিকটা গোল মনে হবে।
৩. চ্যাপটাকৃতির মুখে সাধারণত টিপ মানাতে চায় না। তবুও যদি পরেন, লম্বাটে ধরনের টিপ পরবেন।
৪. চৌকো ধরনের মুখে মোটেও টিপ মানাতে চায় না। যদিও পরেন শুধু লম্বাটে ধরনের টিপ পরবেন। লম্বাটে অনেক ধরনের হয়। তার মধ্যে যেটি মানায় সেটি পরবেন।

সাজগোজের ব্যাকরণ অনুসরণ করে আপনি নিজেকে সাজিয়ে তুলতে পারেন অপরূপা নারীতে।

ঋতু অনুযায়ী সাজ

আমরা অনেকেই কোন সময় কী সাজ হওয়া উচিত তা জানি না বা সেভাবে সাজিও না। কথায় বলে, সব সাজ সব জায়গায় মানায় না আর সব কথা সব জায়গায় বলা যায় না। তাই আমাদের জানা উচিত, কোন ঋতুতে কীরকম সাজ হওয়া ভালো। ঋতুর সাথে খাপ খাইয়ে আপনার সাজ হলে সেটা আপনার সুরুচির প্রকাশ পাবে। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। তাই প্রথমেই গ্রীষ্ম ঋতু দিয়ে শুরু করা যাক।

গ্রীষ্মের সাজ

গ্রীষ্মকালে আমরা প্রচণ্ড ঘেমে থাকি। তাই শরীর অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। গরমের দিনে এমনিতেই আপনি অস্বস্তিবোধ করেন। আর এসময় যদি রং চটচটে মেক-আপ করতে যান তাহলে নিজের কাছে তো অস্বস্তি লাগবেই,

অন্যের দৃষ্টিতেও সেটা রুচিহীনতার পরিচয় বহন করবে। কারো কাছে মনে হতে পারে রং মেখে সঙ সেজেছেন। তাই গ্রীষ্মকালে দিনের বেলায় মেক-আপ করবেন হালকা, যা দেখতে লাগে স্বাভাবিকের মতো। তবে রাতের অনুষ্ঠানে বিয়ে বাড়িতে কিছুটা ভারি সাজ করতে পারেন।

মেক-আপের শুরুতে এক টুকরো তুলোতে কয়েক ফোঁটা অ্যাস্ট্রিনজেন্ট লোশন নিয়ে মুখমণ্ডল, গলা, ঘাড়—এসব জায়গায় লাগাবেন। তবে চোখের চারপাশ বাদ দিয়ে, কারণ গরমের দিনে ঘাম বেশি হয়। এটি লাগানোর কিছু পরে মুখের মেক-আপ করতে পারেন। ফাউন্ডেশনের বদলে বেইজ হিসেবে ভ্যানিশিং ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন। তবে প্রথমে আপনাকে ময়েশ্চারাইজিং লোশন মুখমণ্ডলে—বিশেষ করে দুচোখের পাশে লাগাতে হবে। এরপর ধারাবাহিকভাবে সব জিনিস দিয়ে হালকাভাবে সেজে নিয়ে আবারো অ্যাস্ট্রিনজেন্ট লোশন খুব সতর্কভাবে মেক-আপের ওপর আলতোভাবে চেপে লাগান। জোরে ঘষা লাগাবেন না। তাহলে মেক-আপ উঠে যেতে পারে। এভাবে মেক-আপের আগে ও পরে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট লোশন ব্যবহার করলে দুই/ তিন ঘণ্টা মেক-আপ ঠিক থাকবে।

বি.দ্র. : *লিপস্টিক এবং আইশ্যাডো অবশ্যই গরমের দিনে হালকা হতে হবে। সুগন্ধি বা পারফিউম হবে হালকা মিষ্টি গন্ধের।*

বর্ষার সাজ

গ্রীষ্মের পরেই আমাদের দেশে শুরু হয় বর্ষা। কখনো কখনো ৮/১০ দিন পর্যন্ত একনাগাড়ে বৃষ্টি হয়। এসময় বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকে। আর আর্দ্রতা বেশি থাকার ফলে ময়েশ্চারাইজিং লোশন কম পরিমাণে ব্যবহার করলেও চলবে।

বর্ষা ঋতুতে গ্রীষ্মের মতো রৌদ্র-তাপ না থাকলেও ভ্যাপসা গরম বোধ হবে মাঝে মাঝে। তাই এসময় হালকা সাজ হবে রুচির পরিচয়। এসময় ফাউন্ডেশন হিসেবে কমপ্যাক্ট মেক-আপ বা প্যানকেক ব্যবহার করতে পারেন। এতে সামান্য কারণে আপনার মুখ ভিজে গেলেও মেক-আপ উঠে যাবার ভয় নেই। এসময় কাজলের পরিবর্তে আই লাইনার এবং ওয়াটার প্রুফ মাসকারা ব্যবহার করবেন। লিপস্টিক হালকা রঙের ব্যবহার করবেন। তবে দিনটি যদি মেঘে ঢেকে থাকে, অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তাহলে গাঢ় লিপস্টিক সেদিন ব্যবহার করতে পারেন।

শীতের সাজ

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষের জন্যে শীত ঋতু একটা আনন্দের সময়। এসময় বাজারে আসে শীতের হরেক রকম সবজি। তা খেতে যেমন সুস্বাদু ও রুচিকর তেমনি রূপচর্চায়ও এগুলোর ব্যবহার হয়ে ওঠে আনন্দের। শরীরে পুষ্টির জন্যেও পাওয়া যায় প্রচুর ভিটামিনযুক্ত খাবার। আর সাজের সুযোগও চমৎকার। শীতকালে শরীর বেশি ঘামে না বলে সাজগোজ স্থায়ী থাকে বেশিক্ষণ। তৈলাক্ত ত্বক যাদের, তাদের জন্যে সাজগোজ হয় মনের মতো। কারণ এসময় মুখে তেলতেলে ভাব হয় অতিসামান্য। এসময় এ ধরনের ত্বকের মানুষের সাজ হয়ে ওঠে কমনীয়। ভারি মেক-আপ যারা ভালবাসেন এখন তাদের সুসময়। প্রসাধনীর সবকিছু এসময় ব্যবহার করা যায়। প্রথমে ময়েশ্চারাইজিং লোশন মুখমণ্ডলে–বিশেষ করে দুচোখের পাশে সুন্দর করে লাগান। শীতকালে গাঢ় রঙের লিপস্টিক, লিপগ্লস ব্যবহার করতে পারেন। হাত-পায়ে ময়েশ্চারাইজিং লোশন লাগাতে ভুলবেন না। তা না হলে হাতের ত্বক খসখসে ধুলো লাগার মতো মনে হতে পারে।

বসন্তের সাজ

বসন্তকে বলা হয় ঋতুরাজ। এর স্থায়িত্ব খুব কম। বসন্ত ঋতুতে মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই জাগে আনন্দের শিহরণ। এ সময়টাই এমন যে, খুব গরম নয় আবার খুব শীতও নয়। তাই ত্বক হয়ে ওঠে সতেজ, উজ্জ্বল। এসময় সাজগোজ যেভাবেই করুন না কেন, দেখতে লাগবে সুন্দর। তবে এসময় মধ্যম ধরনের সাজগোজই মানায় বেশি। না বেশি গাঢ়, না বেশি হালকা। প্রকৃতি আর আবহাওয়ার কারণেই একটা প্রফুল্লস্নিগ্ধ ভাব আসে।

পোশাক

সাজের সাথে পোশাকের বিরাট সম্পর্ক। তাই এবার জেনে নিন ঋতু ভেদে কীরকম পোশাক পরবেন।

রূপচর্চা ও সাজগোজের পরই আসে পোশাক এবং অলংকার। তাই সময় এবং আচার-অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে এটি নির্বাচনে যদি ভুল করেন, তাহলে যতই রূপচর্চা করুন না কেন, সুন্দরী হোন না কেন, পরিপূর্ণভাবে আপনাকে

সুন্দরী বলা যাবে না। দেখতেও স্মার্ট লাগবে না। নিখুঁত প্রসাধনের সাথে সাথে সুরুচিপূর্ণ পোশাক এবং গহনার একটা সামঞ্জস্য না থাকলে আপনাকে লাবণ্যময়ী মনে হবে না। এটি একটি অন্যটির পরিপূরক। শুধু সাজলেই হবে না, আবার শুধু ভালো ভালো পোশাক পরলেই সুন্দর লাগবে না। সাজের সাথে মানানসই পোশাক যেমন দেহের সৌন্দর্য অপরূপ করে তোলে, ঠিক তার উল্টো হলে আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্যটুকুও দৃষ্টির অগোচরে চলে যেতে পারে। সেজন্যে সাজগোজের সাথে পোশাক নির্বাচন করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করবেন।

নিখুঁত প্রসাধন, সঠিক হেয়ার স্টাইল করার সাথে সাথে মানানসই রুচিসম্মত পোশাক ও অলংকার মিলিয়েই পরিপূর্ণ সাজগোজ বলা যাবে।

আধুনিক কালে বিভিন্ন ধরনের পোশাক আমাদের দেশের মেয়েরা পরলেও শাড়ি এখনও জনপ্রিয়তার দিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে। শাড়িতে শারীরিক অনেক খুঁতই ঢাকা যায়। যেমন ধরুন, একজনের খুব মোটা পা কিংবা খুব মোটা হাত–এগুলো অনায়াসেই শাড়ির অন্তরালে ঢেকে দেয়া যায়। এগুলো সালোয়ার-কামিজ কিংবা প্যান্ট-শার্ট পরে লুকিয়ে রাখার উপায় নেই। শাড়ির যেমন তুলনা নেই তেমনি আবার তাড়াহুড়ো করে কর্মব্যস্ত একজন নারী কর্মক্ষেত্রের জন্যে অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হওয়ার প্রয়োজনে সালোয়ার-কামিজেরও তুলনা হয় না। পোশাক নির্বাচনে প্রথমে আসা যাক শাড়ির কথায়। জেনে নিন কোথায় কখন কেমন শাড়ি পরা উচিত–

শাড়ি

প্রথমে বুঝতে হবে আপনার গায়ের রং, উচ্চতা, বয়স কী ধরনের আর কোথায় অর্থাৎ কী ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানে বা কর্মক্ষেত্রে আপনি যাবেন। এসব দিক খেয়াল রেখে আপনি শাড়ি নির্বাচন করবেন। শুধু শাড়ি নয়, যে-কোনো পোশাকের ক্ষেত্রেই এটি চিন্তা করতে হবে।

প্রথমেই আসা যাক রঙের কথায়। অনেকেই আছেন যাদের প্রায় সব রঙের শাড়িতেই মানিয়ে যায়। আবার অনেকে সুন্দর বা গায়ের রং ফর্সা হওয়া সত্ত্বেও সব রং তাদের মানায় না। আবার যারা সুদেহী তাদের সব শাড়িতেই মানায়। তবে চেহারার সঙ্গে মানানসই শাড়ি কেনাই বুদ্ধিমতীর কাজ। বাজারে বিভিন্ন ধরনের শাড়ি পাওয়া যায়। যেমন দামি শাড়ির মধ্যে কাতান বেনারসি বালুচরি সিল্ক জর্জেট শিফন ফুলভয়েল জামদানি টাঙ্গাইল ধনেখালি শান্তিপুরি মিরপুরি মাদ্রাজি মনিপুরি টিস্যু ইত্যাদি–আরও কত কী। মোটকথা শাড়ি বাছাই করবেন শরীরের গড়ন, বয়স এবং অনুষ্ঠান অনুসারে।

উচ্চতা, গড়ন ও রং অনুসারে কেমন শাড়ি পরা উচিত

মানুষের উচ্চতা তিন ধরনের। লম্বা, মাঝারি, খাটো। তেমনি দেহের গড়নও তিন ধরনের। যেমন পাতলা, মাঝারি ও মোটা। গায়ের রং তিন ধরনের। ফর্সা, শ্যামলা ও কালো।

উচ্চতা অনুসারে শাড়ি পছন্দের প্রক্রিয়া

লম্বা মেয়েরা যদি চওড়া পাড়ের শাড়ি পরেন তাহলে বেশ মানাবে। এতে লম্বা কিছুটা কম লাগবে। প্রিন্ট হলে বড় ধরনের প্রিন্ট পরতে বাধা নেই। শাড়ির কাজগুলো শাড়ির দৈর্ঘ্যের দিকে হলে ভালো। প্রস্থে হলে অর্থাৎ খাড়া হলে দেখতে আরও লম্বা লাগবে।

মাঝারি উচ্চতার মেয়েদের মোটামুটি সব ধরনের পাড় ও প্রিন্টে মানায়। তবে প্রস্থে প্রিন্ট ও কাজ করা হলে একটু লম্বা বেশি মনে হবে। পাড় বেশি চওড়া না, আবার বেশি ছোট নয়–এমন হলে ভালো লাগবে।

খাটো মেয়েদের পোশাক পরার ক্ষেত্রে বেশ বাছবিচার করে পরতে হয়। খাটো মেয়েরা কখনোই বড় পাড়ের শাড়ি, বড় প্রিন্টের বা শাড়ির দৈর্ঘ্যমুখী কাজওয়ালা শাড়ি পরবেন না। এতে আরও খাটো লাগবে। এদের শাড়ির পাড় সরু হলে কিংবা পাড় ছাড়া হলে ভালো লাগবে। প্রিন্ট হলে ছোট প্রিন্টের শাড়িতে কাজ করা কিংবা প্রিন্ট প্রস্থে (খাড়া) হলে ভালো। তাতে লম্বা লাগবে। খাটো মেয়েরা ফোলা শাড়ি পরবেন না, এতেও খাটো লাগবে।

গড়ন অনুসারে শাড়ি পছন্দের প্রক্রিয়া

মোটা গড়নের গোলগাল মেয়েরা অবশ্যই ফুলে থাকে এমন শাড়ি কিংবা খুব ভারি কাজের অর্থাৎ যে-সব শাড়ির পুরো জমিনে কাজ ভর্তি–এমন শাড়ি পরবেন না। এতে আরো মোটা দেখাবে। মোটা গড়নের মেয়েরা শরীরের সাথে লেগে থাকে এমন শাড়ি নির্বাচন করবেন। বেশি গাঢ় রঙের শাড়ি পরলেও মোটা লাগবে। ভারি জরিপাড় ধরনের শাড়িতেও মোটা লাগবে। কাতান পরলে শুধু পাড়-আঁচলে কাজ করা বা মধ্যে হালকা ছিট ছিট কাজ করা শাড়ি পরুন। শিফন হলে কিছুটা ভারি কাজের পরতে পারেন। এ শাড়িগুলো শরীরে লেগে থাকে। টিস্যু, মসলিন, ফুলে থাকা শাড়ি মোটেই পরবেন না। মোট কথা নিজেকে বেশি মোটা লাগে–এমন শাড়ি কখনো পরা উচিত নয়।

মাঝারি গড়নের মেয়েদের সব ধরনের শাড়িই মোটামুটি চলে। তবে বেশি ফুলে থাকে এমন শাড়ি, যেমন–টিস্যু বা মসলিন পরলে স্বাস্থ্য ভারী মনে হবে। তারা মোটামুটি সব কাজের সব প্রিন্টের শাড়িই পরতে পারেন।

পাতলা বা রোগা গড়নের মেয়েরা এমন শাড়ি পরবেন, যা একটু ফুলেফেঁপে থাকে। ভারি কাজের, গাঢ় রঙের–সবই তারা পরতে পারেন, এতে স্বাস্থ্য একটু ভালো দেখাবে। শুধু শরীরের সাথে লেগে থাকে এমন শাড়ি ভুল করেও পরবেন না।

গায়ের রং অনুসারে শাড়ি পছন্দের প্রক্রিয়া

ফর্সা রঙের মেয়েদের গাঢ় রঙের চেয়ে হালকা রঙে বেশি মার্জিত লাগে। ফর্সারও ধরন আছে। সাদা ফর্সা, গোলাপি ফর্সা, হলদে ফর্সা। সাদা ফর্সাদের হালকা রঙের পোশাক বেশি ভালো লাগে। গাঢ় হালকার মিশ্রণেও ভালো মানায়। গোলাপি বা লালচে ফর্সাদের মাঝামাঝি গাঢ় রং কিংবা হালকা–দুটোই মানায়। হলদে ফর্সাদের সব রং-ই মানায়। তাদের পাড় গাঢ় রঙের এবং জমিনে হালকা রং–এসব শাড়ি মানাবে। হালকা গোলাপি, হালকা বেগুনি, সী গ্রীন, মস গ্রীন, ফিরোজাসহ নানাধরনের হালকা রঙের জমিনে গাঢ় কাজ করা ইত্যাদি শাড়ি পরতে পারেন। রাতে বিয়ে বাড়িতে অথবা জমকালো কোনো অনুষ্ঠানে ভারি রঙের শাড়ি পরতে পারেন। অলংকার পরুন সোনালি কাজের শাড়ি হলে সোনার কিংবা ইমিটেশনে সোনার রং অথবা শাড়ির সাথে ম্যাচ করে সে রঙের পাথরের গহনা। তবে রূপালি রঙের কাজের সাথে সোনালি গহনা পরবেন না। এতে বেমানান মনে হবে। সোনালি বা রূপালি–কোনো কাজই নেই–এমন শাড়ি হলে অক্সিডাইস গহনাও পরতে পারেন ম্যাচ করে।

শ্যামলা রঙের মেয়েদের জন্যে বাসন্তি, হলুদ, ডিমের কুসুম হলুদ, হালকা কমলা, মেরুন, সাদার সাথে লালের কম্বিনেশন পাড়, হালকা সবুজ–অর্থাৎ আপনার গায়ে ধরে দেখুন, মাথায় কাপড় ঘুরিয়ে ঘোমটা টেনে আয়নায় দেখে নিন–কী ধরনের রঙে আপনাকে উজ্জ্বল লাগে–সে ধরনের শাড়ি বেছে নিন। কালচে বেগুনি অর্থাৎ ঘন গাঢ় বেগুনি, নীল, গাঢ় ঘন কালচে সবুজ ইত্যাদি রং পরলে গায়ের রং আরও ময়লা লাগবে। তবে

কালচে ব্লুতে (নেভি ব্লু) শ্যামলাদের ভালো লাগে। অনুষ্ঠানে বা পার্টিতে মেরুন রঙের মধ্যে সোনালি পাড় কাজ, নেভি ব্লু-তে জমকালো কাজ, মাস্টার ইয়েলো ইত্যাদি শাড়ি রাতের অনুষ্ঠানে পরতে পারেন।

কালো মেয়েদের জন্যে রং বাছাই করা খুব মুশকিল। তবে ফিগার, চেহারা আকর্ষণীয় হলে শ্যামলা মেয়েদের যা পরলে ভালো দেখায় তাদেরও সে রং ভালো লাগবে। তবে কখনো কটকটে লাল রং পরবেন না। এটা দৃষ্টিকটু লাগবে।

এছাড়া আজকাল নানা শেডের শাড়ি বেরিয়েছে। যে শাড়ি পরলে আপনাকে মানানসই মনে হবে সেটাই পরতে পারেন।

অলংকার সোনা, রুপা, অক্সিডাইস (কালো), অক্সিডাইস (তামাটে) ইত্যাদি যা-ই পরুন না কেন, শাড়ির সাথে কিংবা সালোয়ার-কামিজের সাথে মানানসই হতে হবে।

সালোয়ার-কামিজ যারা পরেন তারাও মোটা, পাতলা, মাঝারি সম্পর্কে উলিখিত বিষয়গুলো অনুসরণ করুন। অর্থাৎ মোটা গড়নের মহিলারা ফুলে থাকে এমন মচমচে কাপড়ের সালোয়ার-কামিজ পরবেন না।

পাতলা গড়নের মহিলারা লেগে থাকে এমন কাপড়ের সালোয়ার-কামিজ পরবেন না। একটু ভারি ধরনের ফোলা কাপড় পরুন।

মাঝারি গড়নের মহিলারা সব ধরনের কাপড় পরতে পারলেও বেশি ফুলে থাকে–এমন সালোয়ার-কামিজ পরবেন না।

অলংকার বা গহনা

প্রাচীনকাল থেকেই গহনা বা অলংকারের প্রচলন। আদিম যুগে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই অলংকার পরত। তখন অবশ্য সোনা রুপা মনিমুক্তার অলংকারের প্রচলন ছিল না। অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হতো ফুল, লতাপাতা, গাছের ছালবাকল, শেকড়, জন্তুজানোয়ারের হাড়, শিং, পাখির পালক ইত্যাদি। অবশ্য অলংকার হিসেবে ফুলের কদর এখনো কমে নি। বিয়েবাড়িতে হলুদের অনুষ্ঠানে এখনো ব্যবহৃত হয় ফুলের গহনা। আর এখন অলংকার হিসেবে এসেছে সোনা রুপা হীরা মুক্তা রত্নরাজি। দামি গহনা অনেকের পক্ষেই হয়তো কেনা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি ম্যাচিং করে মাটির গহনাও পরেন, তাতেও আপনি হয়ে উঠতে পারেন অপরূপা। আবার স্থানকাল চিন্তা না করে খুব দামি গহনা পরেও হাসির পাত্রী হতে পারেন।

আজকাল রুপার গহনা বেশ জনপ্রিয়। এর কারণ সোনার প্রচুর দাম এবং নিরাপত্তার অভাব। আবার অন্য দিকে সোনা বা রুপার বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ইমিটেশন গহনা। এসব গহনার একটা নিজস্ব সৌন্দর্যও রয়েছে। এগুলো পোশাকের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরলে দেখতে খুবই সুন্দর এবং স্মার্ট লাগবে। আর দাম কম হওয়ায় কেনাও সহজ। আজকাল অল্পবয়সী মেয়েরা ইমিটেশন গহনা পরতে ভালবাসে, দেখতেও বেশ লাগে।

পোশাকের মতো গহনায়ও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ডিজাইনের পরিবর্তন ঘটছে। নানী-দাদীরা ভারি গহনা ছাড়া চিন্তাই করতেন না। এখন অনেক অল্প সোনা/ রুপা দিয়েই হালকা ধরনের রুচিসম্মত গহনা তৈরি হচ্ছে, যা আমরা পোশাক ও চেহারার সাথে মিলিয়ে অনায়াসে পরতে পারি।

সাজসজ্জায় পোশাকের সাথে গহনা পরা হয় সৌন্দর্য বাড়াতে। তাই আমাদের জানা প্রয়োজন কোন অনুষ্ঠানে কী শাড়ি ও কীরকম মেক-আপ-এর সাথে কী ধরনের গহনা পরলে বেশি মানানসই হবে। যদি তা আমরা বুঝতে পারি তাহলে অন্যের সামনে অপ্রস্তুত হতে হবে না।

এখন কেউ আর আগের মতো একগাদা গহনা পরাটাকে প্রাধান্য দেয় না। পোশাক ও সাজের সাথে মানানসই হালকা গহনায়ও আপনাকে চমৎকার লাগতে পারে। প্রচুর গহনা থাকলেই যে তা পরবেন, এরকম মনোভাব যেন আপনার না হয়। যেমন–হাতভর্তি চুড়ি পরে সাধারণ অনুষ্ঠানে যাওয়া যায় কিন্তু গলাভর্তি একগাদা গহনা পরলে রুচিবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

অলংকার বা গহনা পরার ছোটখাটো কয়েকটি বিষয়–

রাতের অনুষ্ঠানে বিয়েবাড়িতে ভারি গহনা পরতে পারেন। দিনের বেলার অনুষ্ঠানে হালকা গহনা ব্যবহার করাই ভালো। গহনা পরার ক্ষেত্রে আপনার বয়স বিবেচনায় রাখুন।

বয়স যাদের একটু বেশি তারা হালকা মেক-আপের সাথে সোনার গহনা বা পাথরের গহনা শুধু হাতে, কানে ও গলায় পরবেন। হাতভর্তি চুড়ি বা সে জাতীয় জিনিস পরুন। গলায় লম্বা চেইন বা হালকা নেকলেস পরতে পারেন। তাতে আপনাকে মার্জিত মনে হবে।

যাদের বয়স কম তারা যেমন খুশি তেমন সাজো। তবে মেক-আপের সাথে পোশাকের দিকটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে। আজকাল ইমিটেশনের নানা ধরনের গহনা পাওয়া যায়। তা-ও পরতে পারো। আবার রুপার গহনাও বেশ লাগে। পোশাকের রঙের সাথে মিলিয়ে ইমিটেশন গহনাও ভালো লাগবে।

অনেকেই বাড়ির হালকা অনুষ্ঠানে জড়োয়া গহনা পরে বসেন, এটা করবেন না। এতে রুচিবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়। একমাত্র বিয়েবাড়িতে কিংবা জমকালো অনুষ্ঠান ছাড়া ভারি অলংকার না পরাই ভালো। গহনা আধুনিক কিংবা পুরানো দিনের হতে পারে–শুধু খেয়াল রাখতে হবে কোন অনুষ্ঠানে কী পরবেন।

দেহ ও সাজ পোশাকের সাথে মানিয়ে গহনা পরার নিয়ম

১. কখনোই সোনালি কাজ করা শাড়ির সাথে রুপার গহনা পরবেন না।

২. যাদের গ্রীবা (গলা) লম্বাটে তারা গলায় চিক কিংবা গলার কাছে এঁটে থাকে এমন গহনা পরলে ভালো দেখাবে। কানে মাঝারি বা ছোট জিনিস ভালো লাগবে। গলায় ভারি গহনা পরলে কানে ছোট পরতে পারেন।

৩. যাদের গলা লম্বায় ছোট অর্থাৎ খাটো গলায় কখনোই ভারি বা আঁটসাঁট গহনা পরবেন না। এতে গলা আরো ছোট দেখাবে। ঢিলেঢালা লম্বা হার ও চেইন এবং কানে লম্বাটে ধরনের দুল পরলে লম্বা মনে হবে। মানানসই লাগবে।

৪. যাদের গড়ন রোগাপাতলা, ছোটখাটো তাদের জন্যে ছোট ধরনের গহনাই মানানসই হবে।

৫. লম্বা এবং মাঝারি গড়নের মহিলারা বড় মাপের ভারি গহনা অনায়াসে পরতে পারেন।

৬. যদি গলা ও ঘাড় তুলনামূলক চওড়া হয় তাহলে গলার জন্যে বেছে নিন ভারি গহনা ও কানে পরুন লম্বা ধরনের দুল।

গহনা পরিষ্কার ও ভালো রাখার প্রক্রিয়া

১. ইমিটেশন গহনা সবসময় বাতাস না লাগে এমন বাক্সে রাখুন। প্রয়োজনে তুলো দিয়ে পেঁচিয়ে রেখে দিন। তাহলে রং নষ্ট হবে না।

২. রুপার গহনায় বাতাস লাগলে কালচে হয়ে যায়। তাই এটিতেও বাতাস যাতে না লাগে সেভাবে বাক্সে রেখে দিন এবং ময়লা হলে হালকা গরম পানিতে জেট পাউডার গুলিয়ে তাতে ভিজিয়ে রেখে দিন ১৫/২০ মিনিট। তারপর ব্রাশ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করলেই নতুনের মতো লাগবে। তবে বেশি কালো হলে দোকানে দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে পারেন।

৩. সোনার গহনা বাতাস লাগলেও কালো হয় না, তবে মাঝে মাঝে ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে একেও গরম পানিতে জেট গুলে নিয়ে ১৫/২০ মিনিট ভিজিয়ে ব্রাশ করে ধুয়ে নিলে চকচক করবে। অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগেও পরিষ্কার করে নিতে পারেন।

প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন, দৈহিক সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটে তার সামঞ্জস্যপূর্ণ শারীরিক গড়ন, ত্বকের উজ্জ্বলতা, নিখুঁত সাজ, হেয়ার স্টাইল, রুচিসম্মত পোশাক এবং অলংকারে। তেমনি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য বলতে এর সাথে থাকতে হবে মার্জিত আচরণ চলাফেরা কথাবার্তা আত্মবিশ্বাস আদবকায়দা দাঁড়ানো-হাঁটাচলা-বসার সঠিক ভঙ্গি এবং ব্যক্তিত্ব ও মানবিক গুণাবলি। এসব মিলিয়ে একজন নারী হয়ে উঠতে পারেন পরিপূর্ণ আকর্ষণীয় সুন্দরী। এসব গুণ না থাকলে তাকে পরিপূর্ণ সুন্দরী বলা যাবে না।

মার্জিত ব্যবহার ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ প্রো-একটিভ আচরণের মাধ্যমে আপনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুরুচির পরিচয় দিয়ে সৌন্দর্যের আবেদন অনেকখানি বাড়িয়ে নিতে পারেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শিষ্টাচার, প্রো-একটিভ ব্যবহার ও মার্জিত আচরণের গুরুত্ব এত বেশি যে, তা একজন সাধারণ নারীকেও অসাধারণ করে তোলে। বহু ক্ষেত্রে এ আচরণ রূপের ঘাটতিও ঢেকে দেয়। তাই যে নারী প্রসাধন, অলংকার, সাজপোশাক ইত্যাদির মাধ্যমে সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটান শুধু তাকেই আমরা সুন্দরী বলব না; বরং আমরা তাকেই সুন্দরী বলব, যার সুন্দর আচরণ ও ব্যক্তিত্ব অন্যকে আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত করে।

আচারব্যবহার

একজন মানুষের মধ্যে তার আচারব্যবহার সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান তৈরি হয় ছোট বয়স থেকেই। অন্যের প্রতি কী ধরনের ব্যবহার করা উচিত সে সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা পায় সে তার পরিবার থেকে। তাই আপনাকে আপনার পরিবারে মা-বাবা, স্বামী-স্ত্রী, ভাইবোন, ছেলেমেয়ে ও কাজের লোক বা গৃহকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, নম্র, বিনয়ী, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে

হবে, তেমনি পরিচিত, অন্তরঙ্গদের সাথে, প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনদের সাথেও স্বাভাবিক সুন্দর ব্যবহার করতে হবে।

আপনি যদি পরিবারের সবার সাথে ভালো ব্যবহারে অভ্যস্ত না হন, তবে পরিবারের বাইরে যে বিশাল জগৎ রয়েছে সেখানে কখনো ভালো ব্যবহার করতে পারবেন না। আর আপনার আচরণের ওপর নির্ভর করবে আপনি বা আপনার সঙ্গ অন্যের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য বা আকর্ষণীয়। মনে রাখবেন, আপনি যে-রকম আচরণ করবেন, অন্যের কাছ থেকেও তেমনি আচরণ পাবেন। হয়তো যার সাথে ভালো আচরণ করেছেন সে আপনার সাথে সে-রকম আচরণ না-ও করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে তা অন্য জায়গা থেকে আপনি পাবেন। কোয়ান্টাম মেথডে একে বলা হয় 'Laws of Natural Return'।

কখনো কখনো আমরা শুনে থাকি–আরে, অমুকের মতো লোক হয় না, অমুক মহিলার ব্যবহারের তুলনা হয় না। আসলে এটা তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়। আপনিও ইচ্ছে করলে তা পারবেন। আসল কথা, যে-কোনো পরিস্থিতিতে প্রো-একটিভ থেকে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা যার মধ্যে বেশি সে-ই এ গুণের অধিকারী হতে পারে। একটু চেষ্টা করলে আপনিও ধীরে ধীরে এ গুণের অধিকারিণী হতে পারেন।

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক সমাজে আছে হতাশা, ব্যর্থতা, দুঃখযন্ত্রণা। আপনাকে পরিস্থিতি সামলে নিয়ে শোকরগোজার থাকতে হবে। হতাশ হয়ে, অস্থির হয়ে দুর্ব্যবহার করলে কেউ আপনাকে ভালো দৃষ্টিতে দেখবে না। ক্রমান্বয়ে কাছের মানুষগুলোও আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। কাজেই পরিস্থিতি যা-ই হোক, তাকে সামলে নিয়ে মনকে প্রশান্ত রেখে মিষ্টি ব্যবহার দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

আচারব্যবহারের সাথে আপনাকে অবশ্যই আত্মমর্যাদার দিকে নজর রাখতে হবে। আত্মমর্যাদা বজায় রেখেই আপনি অন্যের সাথে সে-রকম ব্যবহার করবেন। পরিবার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ও কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে ব্যবহারে অবশ্যই সৌজন্যবোধ ও সহৃদয়তার পরিচয় রাখতে হবে।

অহংকার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারলে সবার কাছে আপনি হয়ে উঠবেন আকর্ষণীয়। পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষাপরায়ণতা যদি আপনার মধ্যে থাকে, সেগুলোকে দূর করতে হবে। আত্মমর্যাদা বজায় রাখতে গিয়ে যেন দাম্ভিক না হয়ে ওঠেন, সেদিকে খেয়াল রাখুন। যথাসম্ভব বিনয়ী হোন। তাহলেই আপনি যে-কোনো পরিবেশে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে পারবেন।

কথাবার্তা

কথাবার্তায় যতটা সম্ভব সত্য বলতে চেষ্টা করবেন। বললেন এক, করলেন আরেক। কাউকে কথা দিয়ে কথা রাখলেন না আবার এমন একটা কথা বলে ফেললেন, যেটা অন্যের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াল; অথচ আপনি না বললেও পারতেন। তাই কথাবার্তায় সবসময় সংযমী হতে হবে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কখনো কখনো সত্য বলতে না পারলেও অহেতুক মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। একবার যদি আপনার সম্পর্কে মানুষের এমন ধারণা হয় যে, আপনি যা বলেন তা প্রায়ই মিথ্যা, তাহলে আপনার সত্য কথাকেও মানুষ মিথ্যা ভাববে। আপনার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করবে।

দাঁড়ানো, বসা, হাঁটাচলার ভঙ্গি

দাঁড়ানো, বসা বা হাঁটাচলার ভঙ্গি দেহ সৌন্দর্যকে অনেকখানি আকর্ষণীয় করে তোলে। দাঁড়ানো, হাঁটাচলা, বসার ভঙ্গি হওয়া উচিত ঋজু অর্থাৎ কাঁধ সোজা রেখে ঘাড় উঁচু করে টানটান ভঙ্গিতে দাঁড়াবেন। হাঁটাচলা করবেন দৃষ্টি সামনে রেখে। যার সাথে কথা বলবেন দৃষ্টি তার বরাবর রাখবেন। বাঁকা হয়ে, ঝুঁকে, কুঁজো হয়ে দাঁড়ালে হাঁটলে চললে বা বসলে আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য কমে যাবে। শালীনতা বজায় রেখে শোভন ভঙ্গিতে বসবেন। চেয়ারে বসলে সোজা ভঙ্গিতে বসবেন। কখনো পা দোলাতে থাকবেন না। এটি অশিষ্টাচার। এ ধরনের অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। বহুক্ষণ বসে থাকতে হলে পা পাল্টে বসুন। মাটিতে বসতে হলে দুই পা মুড়ে আরামদায়ক ভঙ্গিতে বসুন কিন্তু খেয়াল রাখবেন, আপনার পা যেন শাড়ি দিয়ে ঢাকা থাকে। তা না হলে দৃষ্টিকটু লাগবে। অর্থাৎ আপনার বসার ভঙ্গি এমন হবে, যাতে আপনার মাঝে শালীনতাবোধের পরিচয় ফুটে ওঠে।

সুন্দরভাবে কথা বলুন

সুন্দরভাবে কথা বলা একটি বিশেষ গুণ। সুন্দর কথা দিয়ে জয় করতে পারেন অনেকের মন। কখনো কারো সাথে আলাপ করলে আপনি অবশ্যই তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। কিছুতেই যেন সে না ভাবে আপনি তাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তাই অন্যের কথা মন দিয়ে শোনার ধৈর্য আপনাকে রপ্ত করতে হবে। মানুষ সহজাতভাবেই চায় তার কথা সকলে শুনুক। কথার মধ্যে কথা বলে ওঠা বিরক্তিকর। তাই একজনের কথা শেষ হতে দিন, তারপর আপনার কথা বলুন। সবসময় গুছিয়ে কথা বলুন। একজন বলল

এক, আপনি বুঝলেন আরেক–এরকম করবেন না। কথার প্রসঙ্গ যা, তার বাইরে বলার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। কখনো কাউকে সরাসরি অপমানজনক কথা বলে আহত করবেন না। প্রয়োজনে পরে তার সাথে আলাপ করে শুধরে দিতে পারেন। কারো কথায় ভুল থাকলে তাকে আক্রমণ না করে তার বিষয়ের ভুল অংশ তুলে ধরে এমনভাবে বলুন, যাতে অন্যেরা বিষয়টি বুঝতে পারে। অহেতুক উত্তেজনা যেন না বাড়ে। সবসময় মার্জিতভাবে নিজের মত প্রকাশ করুন।

কথা বলার সময় এক কথা বার বার উচ্চারণ করবেন না। এটি শ্রুতিকটু লাগবে। কথার মাঝখানে প্রয়োজনে উঠতে হলে নম্র ও বিনয়ের সাথে অনুমতি নিয়ে স্থান ত্যাগ করুন। সবিনয়ে বলুন, আমার একটু জরুরি প্রয়োজন ছিল আমাকে এখন যেতে হয়, যদি অনুমতি দেন আসতে পারি। অনেকেই কথার মধ্যে শব্দ করে, এটাও ঠিক নয়। কেউ কেউ নাক টানেন। এগুলো ত্যাগ করতে হবে। কথার মাঝে হাসির প্রসঙ্গ এসে গেলে স্থান-কাল বিচার করে হাসির বহিঃপ্রকাশ করুন। ঘরোয়া পরিবেশে প্রাণ খুলে হাসুন। সামাজিক অনুষ্ঠানে সংযত থেকে হালকা হাসুন। হাসিঠাট্টা, রসিকতা–সবকিছুই উপভোগ করবেন, তবে এমন করবেন না যেন অশোভন লাগে।

মানবিক গুণাবলি

মানবিক গুণাবলির দিকটিও আপনাকে অর্জন করতে হবে। মানুষের জন্যে ভালবাসা সার্বজনীন হওয়া চাই। আত্মকেন্দ্রিক বা শুধু স্বজনদের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবেন না। কেউ যদি ভাবে আপনি নিজের ও স্বজনদের ছাড়া কিছুই ভাবেন না অর্থাৎ এক কথায় স্বার্থপর–এমন হলে চলবে না। মানুষ হিসেবে স্রষ্টা আপনাকে পাঠিয়েছেন এ পৃথিবীতে মহান কিছু করার জন্যে। সেটা নিজের জন্যে যে-রকম, তেমনি অন্যের জন্যেও।

শিষ্টাচার

মানবীয় গুণাবলির মধ্যে একটি প্রধান গুণ হলো শিষ্টাচার, যা একজনের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলে। সমাজের নানান অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশের শিকার আপনি হতেই পারেন। এতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। একটু বুদ্ধি খাটালেই পরিস্থিতি যেমনই হোক আপনি সামলে নিতে পারবেন। দেখা গেল বাইরে গেছেন, কেউ অশালীন ইঙ্গিত করল, কেউ আগ বাড়িয়ে অযথা আলাপ করতে এলো, এ-ক্ষেত্রে বিষয়টি নিয়ে রাগারাগি না করে না-শোনার বা না-বোঝার ভান করে এড়িয়ে যাবেন। এরকম বিরক্তিকর পরিস্থিতিতে

আপনাকে সাধারণ শিষ্টাচার প্রকাশ করার দায়িত্ব পালন করতে হবে, যাতে সেখানে উপস্থিত আর পাঁচজনকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তে না হয়।

দৈনন্দিন জীবনেও আপনাকে সাধারণ শিষ্টাচার ও সৌজন্য প্রকাশে সচেতন হতে হবে। কর্মস্থলে বা ঘরে কিছু মেহমান নিয়ে হঠাৎ একজন এলে আপনার উচিত হবে নিজে অপরিচিতদের সাথে পরিচিত হওয়া, যাতে তারা অস্বস্তি বোধ না করেন। আবার হোটেল রেস্তোরাঁ বা কোনো অনুষ্ঠানে খাওয়ার সময় কখনোই 'ফুরুত ফুরুত' শব্দ করে তরল জিনিস খাবেন না কিংবা অযথা ছুরি, কাঁটা-চামচ দিয়ে টুংটাং শব্দ করবেন না। খাবার সময় মুখে ভঙ্গিমা করার অভ্যাস থাকলে পরিহার করবেন। এগুলো আদব বা শিষ্টাচারের পরিপন্থী। আসলে শিষ্টাচার আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য বিকশিত করবে। কারো সাথে দেখা হলে বা কেউ আপনার বাড়িতে এলে আগে তাকে সালাম দিন। শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। তার পরিবারের কুশলাদি জিজ্ঞেস করুন। অনুষ্ঠানে যদি দাওয়াত করে থাকেন তাহলে জিজ্ঞেস করুন কোনো রকম অসুবিধে হচ্ছে কিনা ইত্যাদি। আপনার মার্জিত ব্যবহার অন্যদের মাঝে আপনাকে এক মর্যাদাকর আসনে উন্নীত করবে।

ব্যক্তিত্ব

ব্যক্তিত্ব মানবচরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিক। শুধু সাজপোশাক দিয়েই তা ফুটিয়ে তোলা যায় না। এর প্রকাশ ঘটে আচার-আচরণ, কথাবার্তা ও মানবিক গুণাবলি প্রকাশের মাধ্যমে। যারা বয়সে ছোট তাদের সাথে যেমন হতে হবে সহজসরল, তেমনি বয়োজ্যেষ্ঠদের ক্ষেত্রে হবেন শ্রদ্ধাশীল বিনয়ী নম্র ও ভদ্র। জীবন সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে, সেইসাথে থাকতে হবে সঠিক মত প্রকাশের সৎসাহস। অর্থাৎ চিন্তায় সৎ আর যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় সাহসী হতে হবে। জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে হবে। মেধার বিকাশ ঘটিয়ে নিজেকে দক্ষ মানুষে রূপান্তরিত করতে হবে। মনে রাখবেন, ব্যক্তিত্বহীন মানুষকে কেউ পছন্দ করে না। সে অন্যের করুণা পেলেও মর্যাদা পায় না।

পারিবারিক শিষ্টাচার

মানুষ একা বাঁচতে পারে না, সুখী হতে পারে না। সুন্দর ও সামাজিক জীবনই মানুষকে সুখী ও পরিতৃপ্ত করে। আর সমাজের প্রাথমিক একক হচ্ছে পরিবার। জাগতিক ও আত্মিক সুখসমৃদ্ধির ভিত্তিও হচ্ছে পরিবার। পরিবার গড়ে ওঠে একজন নারী ও একজন পুরুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। এ সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ হবে, যত মমতা ও শ্রদ্ধামাখা হবে, পারস্পরিক আচার-আচরণ যত প্রো-একটিভ, সুশৃঙ্খল ও সুপরিকল্পিত হবে, জীবনে তত সুখ, পরিতৃপ্তি ও সার্থকতা আসবে। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, সুখী পরিবারের ভিত্তি হচ্ছে ভালবাসা মমতা শ্রদ্ধা শৃঙ্খলা ও আত্মিক একাত্মতা। সবসময় মনে রাখতে হবে, পরিবারে নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। এই পরিপূরক একাত্মতাই সুখসমৃদ্ধির ভিত্তি। তাই পরিবারে নারী ও পুরুষের বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, অভ্যাস ও আচরণ যত প্রো-একটিভ ও সুশৃঙ্খল হবে ততই পরিপূরক একাত্মতা সৃষ্টি হবে, জীবনে আসবে স্বর্গীয় প্রশান্তি।

সফল পরিবার গঠনের প্রক্রিয়া
পুরুষ ও নারী উভয়ের করণীয়

ব্যক্তিজীবনে

১. সকালে ঘুম ভাঙতেই বলুন–‘শোকর আলহামদুলিলাহ/ থ্যাংকস গড/ হরি ওম/ প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ।’ জীবনে কী নেই, তা না ভেবে কী আছে–তা নিয়ে ভাবুন।

২. স্রষ্টায় অবিচল বিশ্বাস ও আস্থা রাখুন।

৩. নিয়মিত আবশ্যিক ইবাদত/ উপাসনা করুন।

৪. দায়িত্বশীল ও আত্মবিশ্বাসী হোন।

৫. আত্ম উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত পড়াশোনা করুন।

৬. পরিমিতি ও সংযম অবলম্বন করুন।
৭. সব ব্যাপারে সময় ও নিয়মানুবর্তী হোন।
৮. পরিকল্পিতভাবে সকল কাজ করুন।
৯. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকুন। শালীন ও মার্জিত পোশাক পরিধান করুন।
১০. শুদ্ধ ও সুন্দর ভাষায় কথা বলুন।
১১. পরচর্চা ও গীবত করবেন না। মিথ্যা বর্জনে সচেষ্ট থাকুন।
১২. নিয়মিত আত্মপর্যালোচনা করুন।

আচরণে

১. সবসময় প্রো-একটিভ থাকুন ও হাসিমুখে কথা বলুন।
২. সবসময় মনে রাখুন, রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন।
৩. কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করুন।
৪. নিজেকে আদর্শ মানুষ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করুন।
৫. রাগ ও ক্রোধের বশে কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকুন।
৬. বিতর্ক ও ঝগড়া কৌশলে পরিহার করুন।
৭. সেন্টিমেন্ট ও আবেগ প্রকাশে কুশলী হোন।
৮. কর্মচারী ও গৃহকর্মীর সাথে মানবিক আচরণ করুন।
৯. কাউকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবেন না।
১০. কাউকে ঠকানোর চেষ্টা করবেন না।
১১. কারো প্রতি ক্ষোভ ও ঈর্ষা পোষণ করবেন না।
১২. স্বজ্ঞানে অন্যের ক্ষতি করবেন না।
১৩. জীবনের সর্বক্ষেত্রে অপচয়কে পরিহার করুন।
১৪. সৎ ও বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিতি লাভের চেষ্টা করুন।
১৫. অহংকার ও লোক-দেখানো আচরণ না করে আন্তরিক ও বিনয়ী হোন।

পারিবারিক জীবনে

১. সবসময় 'কী পেতে পারি' নয়, 'কী দিতে পারি'—এ চিন্তা করুন।
২. পরস্পরকে বুঝতে চেষ্টা করুন।
৩. পারিবারিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সবার মতামতকে গুরুত্ব দিন।

৪. অন্যের কথায় কান দেবেন না। নিজেরাই আলাপ-আলোচনা করে ভুল বোঝাবুঝি দূর করুন। তৃতীয় কাউকে এতে জড়াবেন না।
৫. ঘরের কথা বাইরে বলা থেকে বিরত থাকুন।
৬. পরস্পরের জন্যে নিয়মিত দোয়া করুন।
৭. পরিবারে অশান্তি ও কলহ সৃষ্টি হতে পারে এমন কথা বলবেন না।
৮. একান্নবর্তী পরিবার হলে সবার সন্তানকেই এক নজরে দেখুন। সবার জন্যে একই মানের কেনাকাটা করুন।
৯. ভ্রমণ ও বিনোদনের ব্যাপারে পরিবারের বেশিরভাগের মত অনুসারে সিদ্ধান্ত নিন। সবাইকে নিয়ে বেড়ানোর চেষ্টা করুন।
১০. পরিবারের সবাইকে নিয়ে নিয়মিত আত্ম উন্নয়নমূলক আলোচনার আয়োজন করুন।
১১. অপ্রয়োজনে জ্বলে থাকা বাতি বা ফ্যান বন্ধ রাখুন।
১২. টিভি দেখে সময় নষ্ট না করে পরিবারের সদস্যদের সময় দিন।
১৩. পরিমিত পানি খরচ করুন। কল খোলা রেখে পানি অপচয় করবেন না।
১৪. সমাজের চোখে দৃষ্টিকটু সম্পর্ক বর্জন করুন। দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়–এমন সম্পর্ক এড়িয়ে চলুন।
১৫. গৃহকর্মীদেরকে নিজেদের সমমানের খাবার প্রদান করুন।
১৬. পরিবারকে ধূমপান ও নেশামুক্ত রাখুন।

সন্তান পালনে

১. ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সন্তানকে সমান দৃষ্টিতে দেখুন। এক সন্তানকে অন্য সন্তানের সঙ্গে তুলনা করবেন না।
২. সন্তানকে নেতিবাচক কথা বলে তিরস্কার করবেন না। সন্তানকে ধমকে কথা বলবেন না। রাগের মাথায় অভিশাপ দেবেন না।
৩. অন্যের সামনে সন্তানকে বকবেন না, ভুল ধরিয়ে দেবেন না।
৪. সন্তানকে ছোট থেকেই স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলুন।
৫. সন্তানকে সবসময় আদেশ না করে তার করণীয় কাজ যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিন। যে-কোনো ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করুন।
৬. সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দিন। তাদের বন্ধুদের ব্যাপারে সজাগ থাকুন। সন্তানের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করুন ও নিজেদেরকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করুন।

৭. সারাক্ষণ শুধু পড়ার কথা না বলে খেলাধুলা, বেড়ানো, বই পড়া ইত্যাদি সুস্থ বিনোদনের সুযোগ করে দিন।

৮. সন্তান কোনোকিছু চাওয়ার সাথে সাথেই তাকে তা দেয়ার অভ্যাস পরিহার করুন। তাদের অন্যায় আবদার পূরণ করবেন না।

৯. বয়স ১৮ বছর হওয়ার আগে সন্তানকে স্মার্টফোন দেবেন না। বিনোদনের নামে সন্তান অপসংস্কৃতি ও ড্রাগ এডিকশনের শিকার হচ্ছে কিনা, সেদিকে লক্ষ রাখুন।

১০. সন্তানের বয়স ১৮ হলে পারিবারিক পরামর্শে তাকেও অংশীদার করুন।

১১. তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগে দক্ষ মানুষরূপে গড়ে তুলুন।

১২. সন্তানের নৈতিক, মানসিক, আত্মিক ও সৃজনশীল গুণাবলি বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করুন।

১৩. চাকরির পরিবর্তে সন্তানকে স্বাধীন পেশা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করুন।

১৪. আগে সালাম দেয়া ও হাত মেলানোয় অভ্যস্ত করে তুলুন।

১৫. পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য ও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সন্তানকে যথাযথ ধারণা দিন। আর্থিক ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলবেন না।

১৬. সন্তানের ওপর জীবনের লক্ষ্য চাপিয়ে দেবেন না।
সিদ্ধান্ত নিতে তাকে সহযোগিতা করুন।

১৭. সন্তানকে আদরের নামে প্রশ্রয় দেবেন না ও শাসনের নামে অত্যাচার করবেন না। আদর ও শাসনের সমন্বয়ে তাকে বিকশিত হতে দিন।

সন্তান হিসেবে

১. মা-বাবাকে সম্মান করুন, তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করুন।

২. মা-বাবার কোনো ভুল আচরণে ক্ষুব্ধ হবেন না।
মনে রাখুন–তাদের মাধ্যমেই আপনি পৃথিবীতে এসেছেন।

৩. যে-কোনো ভালো কাজে যাওয়ার আগে তাদের দোয়া নিন।

৪. বয়োবৃদ্ধ মা-বাবাকে নিজের শিশু সন্তানের মতো যত্ন নিন।

৫. ঘরের কাজে সাধ্যমতো সাহায্য করুন।

পরিবারে বয়স্কদের প্রতি

১. সহানুভূতিশীল হোন। তাকে সময় দিন। তার খাওয়াদাওয়া, চিকিৎসা, আর্থিক এবং অন্যান্য প্রয়োজনে খোঁজখবর নিন।

২. পরিবারে বয়স্কদের আগে সালাম দিন।

৩. বাড়ির ছোটদেরকে তার সঙ্গে গল্প করা, সময় কাটানোতে উৎসাহিত করুন।

৪. সবসময় তাকে বলুন, 'আপনি ভালো আছেন' এবং তাকে বুঝতে দিন 'আমরা আপনার পাশে আছি'।

৫. তাকে গুরুত্ব দিন। পারিবারিক সিদ্ধান্তে তার মতামত নিন।

৬. একের পর এক নিষেধাজ্ঞা সরাসরি চাপাবেন না। ক্ষতিকর অভ্যাস বর্জনের জন্যে তাকে উদ্বুদ্ধ করুন।

৭. চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়লে তার প্রতি মানবিক ও সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করুন।

তরুণ বয়সে

১. জ্ঞান অর্জন ও আত্ম উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টিকারী আবেগপ্রবণ সম্পর্ক পরিহার করুন।

২. অতি আবেগ পরিহার করে বাস্তবমুখী মানসিকতার বিকাশ ঘটান।

৩. জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন এবং সে লক্ষ্যে নিজের মেধা, শ্রম ও সময়কে সর্বতোভাবে কাজে লাগান।

৪. বিয়ের আগেই বিবাহ-পরবর্তী আচরণে জড়াবেন না।

৫. বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণকে নিয়ন্ত্রণ করুন।

আত্মনির্মাণে

১. নিয়মিত মেডিটেশন ও কোয়ান্টাম ব্যায়াম করুন।

২. সৎসঙ্ঘে যত বেশি সম্ভব মেধা, শ্রম ও সময় দেয়ার চেষ্টা করুন।

৩. আলোকিত জীবন গড়তে প্রতি মঙ্গলবার আলোকায়ন কার্যক্রমে সবান্ধব আসুন। সকাল ৭.৩০ থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত একঘণ্টার ১০টি সেশনের যে-কোনোটিতে অংশ নিন। আলোচনা, মেডিটেশন ও কাউন্সেলিং ছাড়াও এতে রয়েছে আলোকচিত্র ও ভিডিও প্রদর্শনী।

৪. প্রতি শুক্রবার সকালে নিকটবর্তী সেন্টার/ শাখা/ সেল/ প্রি-সেলের সাদাকায়ন কার্যক্রমে যৌথ মেডিটেশন ও আলোচনায় অংশ নিন।

৫. ধ্যানের আনন্দ ও প্রকৃতির সান্নিধ্য লাভে লামার কোয়ান্টামমে ধ্যানসাফারি এক চমৎকার আয়োজন। সপরিবারে ভ্রমণের বৈচিত্র্যময়

স্বাদ উপভোগ করতে অক্টোবর থেকে মার্চ লামার কোয়ান্টামম এক ব্যতিক্রমী স্থান।

৬. মাসে কমপক্ষে একদিন কোয়ান্টায়নে অংশ নিন।

৭. লামায় কোয়ান্টামমে তিন দিনের কোয়ান্টায়নে অংশ নিন।

৮. প্রযুক্তিদক্ষ হোন। ভার্চুয়াল ভাইরাস–স্মার্টফোন, ফেসবুক, ইউটিউব, ওয়েব সিরিজ, ভার্চুয়াল গেম ও ইন্টারনেট আসক্তি থেকে মুক্ত থাকুন।

সামাজিক ক্ষেত্রে

১. আত্মীয় ও বন্ধুদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখুন।

২. অসুস্থ বা সমস্যাগ্রস্ত বন্ধু, আত্মীয় ও প্রতিবেশীর খোঁজখবর নিন, তাদের জন্যে দোয়া করুন।

৩. ঈদ, পূজা বা আনন্দ-উৎসবে বন্ধু ও আত্মীয়দের সাধ্যমতো ছোটখাটো উপহার দিন।

৪. গৃহকর্মী ও নিরক্ষরদের অক্ষরজ্ঞান দানে সচেষ্ট হোন।

৫. সামাজিক মেলামেশা, কথাবার্তা ও আচার-আচরণে স্থানকালপাত্র বিবেচনা করুন। সর্বাবস্থায় মার্জিত ভাব বজায় রাখুন। নিজেকে বিরক্তিকর করে তুলবেন না।

৬. নিজের মত তর্ক বা জোর করে অন্যের ওপর চাপানোর চেষ্টা করবেন না।

৭. অহেতুক অন্যের প্রতি সমালোচনামূলক মানসিকতা পরিহার করুন।

৮. স্বার্থান্বেষী প্রতারক ও অন্যায়কারী পরিচিতদের সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক ছেদ করুন।

৯. সামাজিক অনুষ্ঠানে উপহার দেয়া-নেয়ার প্রথা বর্জন করুন। কারণ উপহার তা-ই যা স্বেচ্ছায়, আনন্দচিত্তে, নিঃশর্তভাবে দেয়া হয়।

কর্মক্ষেত্রে

১. সবাইকে আগে সালাম দেয়া ও হাত মেলানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

২. পেশাগত ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির রাখুন। পেশাগত দক্ষতা অর্জনে সদা সচেষ্ট থাকুন। লক্ষ্য অনুসারে কর্মকৌশল নির্ধারণ করুন। লক্ষ্য অর্জনের প্রতিটি ধাপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখুন।

৩. সাধারণত পেশা নিজের অন্তর্নিহিত গুণের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ না হলেই

অন্তর্দ্বন্দ্ব হয়। মেজাজ খারাপ থাকে। সহকর্মীদের সাথে দ্বন্দ্ব বাঁধে। প্রো-একটিভ আচরণের পরিবর্তে রি-একটিভ আচরণ সৃষ্টি হয়। সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তাই সর্বাবস্থায় বাস্তববাদী ও প্রো-একটিভ থাকতে চেষ্টা করুন।

৪. বিনয়ী থাকুন। স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বজায় রাখুন। কোনো অন্যায় কাজে সাথী হবেন না। কর্মক্ষেত্রে নিজ দায়িত্ব পালনে আন্তরিকতার পরিচয় দিন। দায়িত্ব পালনকে ভয় পাবেন না।

সৃষ্টির সেবায়

১. সৃষ্টির সেবা বা হক্কুল ইবাদ তৎপরতায় অংশ নিন।
২. নিয়মিত রক্ত দিন ও রক্তদান কার্যক্রমে অংশ নিন।
৩. কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দানের অর্থ জমা রাখুন। তিন মাস পর ফাউন্ডেশনে অথবা নিকটবর্তী সেন্টার/ শাখা/ সেল/ প্রি-সেলে জমা দিয়ে নতুন ব্যাংক সংগ্রহ করুন।
৪. যাকাতকে খয়রাত হিসেবে না দিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আদায়ের জন্যে কোয়ান্টাম যাকাত কার্যক্রমে জমা দিন।
৫. আপনার জমাকৃত মুষ্টিচাল ও পুরানো কাপড় নিয়মিত ফাউন্ডেশনে জমা দেয়ার অভ্যাস করুন।
৬. এতিমান ফান্ড, চিকিৎসাসেবা ফান্ড, ফাতেহা ফান্ডসহ ফাউন্ডেশনের সকল সেবা কার্যক্রমে সাধ্যমতো অংশ নিন।
৭. সেন্টার/ শাখা/ সেল/ প্রি-সেলের হক্কুল ইবাদ কার্যক্রমে এসোসিয়েটদের সম্পৃক্ত করুন।

বন্ধুত্বে

১. বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক থাকুন। চিন্তা, মত ও লক্ষ্যে মিল রয়েছে এমন কারো সাথেই বন্ধুত্ব গড়ে তুলুন। সৎসঙ্ঘে নিবেদিত সদস্যদের বন্ধু হিসেবে অগ্রাধিকার দিন।
২. ওয়াদা ও আমানতদারি রক্ষা করুন।
৩. প্রতিদানের আশা না করেই সাধ্যমতো সহযোগিতা করুন।
৪. অন্যের প্ররোচনায় সিদ্ধান্ত নেবেন না, সম্পর্কচ্ছেদ করবেন না।
৫. ঈর্ষান্বিত হবেন না।

৬. ভুল বোঝাবুঝি আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলুন।
৭. কী পেলেন, তা না ভেবে কী দিতে পারেন−তা নিয়ে ভাবুন।
৮. বোকা ও নেতিবাচক মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকুন। অসৎসঙ্গ সবসময় সর্বনাশের কারণ হয়।
৯. অতিরিক্ত বন্ধুবাৎসল্য দেখাতে গিয়ে নিজের জীবনের লক্ষ্যকে বিসর্জন দেবেন না।

খাবারদাবার

১. পরিমিত খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন।
২. প্রাকৃতিক ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবারকে প্রাধান্য দিন।
৩. পরিবারে শাকসবজি, ফলমূল, সবুজ সালাদ, স্পিরুলিনা ও মাশরুম খেতে অভ্যস্ত হোন।
৪. প্রতিবেলায় তিন/ চার আইটেমের মধ্যে (মাছ অথবা গোশত, সবজি ও ডাল) রান্না সীমিত রাখুন।
৫. সপ্তাহে একদিন পরিবারের সবাইকে নিয়ে সবজিখিচুড়ি খান।
৬. সকালে তৃপ্তির সাথে নাশতা, দুপুরে পরিমিত আহার ও রাতে হালকা খাবার গ্রহণ করুন।
৭. ফাস্ট ফুড, রেস্টুরেন্টের খাবার যত কম খাওয়া যায় তত ভালো।
৮. কৃত্রিম ও কোমল পানীয় এবং দুধ-চা পুরোপুরি বর্জন করুন।
৯. প্রার্থনা করে খাবার শুরু করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

মেহমানদারি

১. মেহমানদারিতে বাহুল্য, অপচয় ও বাড়াবাড়ি বর্জন করুন।
২. সদ্ব্যবহার, সদালাপ ও আন্তরিক পরিমিত পরিবেশনার রেওয়াজ গড়ে তুলুন।
৩. মেহমানদের সঙ্গে সম্ভব হলে ও পরিবেশ অনুকূল থাকলে সৎসঙ্ঘের কার্যক্রম ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করুন।

আপ্যায়ন

১. লেবুর শরবত/ কচি ডাব/ লাল চা/ গ্রিন টি
২. মুড়ি/ চিড়াভাজা/ সেমাই/ পিঠা

৩. সবজিখিচুড়ি/ বিরিয়ানি/ মোরগপোলাও/ ইলিশপোলাও
৪. ফল/ ফিরনি/ পুডিং

উপহার

১. স্মারক ‘কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস’
২. কোয়ান্টাম বুলেটিন, বিভিন্ন কণিকা ও ব্রোশিউর
৩. আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী
   • ইসলাম বিজ্ঞান মেডিটেশন : এম শমশের আলী
   • ভাঙো দুর্দশার চক্র : আবদুলাহ আবু সায়ীদ
৪. • কোয়ান্টাম মেথড • আত্মনির্মাণ
   • আলোকিত জীবনের হাজার সূত্র কোয়ান্টাম কণিকা
   • জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন
   • কোয়ান্টাম ॥ হাজারো প্রশ্নের জবাব (পর্ব ১, ২ ও ৩)
   • রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা
   • কোয়ান্টাম ভাবনা ॥ সাফল্যগাথা (১ ও ২)
   • হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ • বিকশিত হোক শত ভাবনা
   • 1001 Autosuggestions to Change Your Life
   • সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন • কর্মব্যস্ত সুখী জীবন

পারিবারিক দায়িত্ব
পুরুষ ও নারীর করণীয়

পুরুষ

১. স্বামী হিসেবে নিজেকে পরিবারের প্রধান দায়িত্বশীল মনে করুন।
২. পরিবারে দায়িত্ব পালনকে ইবাদত মনে করুন।
৩. স্ত্রীকে বন্ধু, জীবনসঙ্গী ও ঘরের প্রধান হিসেবে বিবেচনা করুন।
৪. পারিবারিক প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করুন।
৫. স্ত্রীর ভালো কাজ, অবদান ও কৃতিত্বের প্রশংসা করুন।
৬. স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন এবং ভালবাসা ও অনুরাগ প্রকাশ করুন কথা ও আচরণের মাধ্যমে।

৭. কর্মস্থল বা বাইরের রাগ-ক্ষোভ ঘরে এসে স্ত্রী, সন্তান বা গৃহকর্মীর ওপর প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকুন।

৮. নিজের ভুল নিঃসংকোচে স্ত্রীর নিকট স্বীকার করুন। অন্যায় করলে মাফ চেয়ে নিন।

৯. আয় অনুসারে স্ত্রীর প্রয়োজন পূরণ, ছোটখাটো উপহার প্রদান ও হাতখরচ প্রদান করুন এবং হাতখরচ ব্যয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা থেকে বিরত থাকুন।

১০. স্ত্রীর অর্জিত অর্থ ও সম্পদ ব্যয়ে স্ত্রীর স্বাধীনতা হরণ করবেন না।

১১. স্ত্রীর যুক্তিসঙ্গত আবদার পূরণে সচেষ্ট থাকুন।

১২. নিজের আয় সম্পর্কে প্রথমেই স্ত্রীকে সুস্পষ্ট ধারণা দিন ও অবৈধ পন্থায় অর্থোপার্জন করা থেকে বিরত থাকুন। ঋণ করে ব্যয় করবেন না।

১৩. পেশাগত বা পারিবারিক সংকট দেখা দিলে স্ত্রীর সাথে তা খোলামেলা আলোচনা করুন।

১৪. আত্মীয়স্বজনকে উপহার দেয়া বা সাহায্য করার ব্যাপারে স্ত্রীকে অযৌক্তিক বাধা দেয়া থেকে বিরত থাকুন।

১৫. স্ত্রীর আত্মীয়দের নিয়ে তাকে কথা শোনাবেন না।

১৬. স্ত্রীর মা-বাবাকে নিজের মা-বাবার মতো শ্রদ্ধা করুন।

১৭. ঘরের খুঁটিনাটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। ঘরের কাজে সাধ্যমতো সাহায্য করুন।

১৮. স্ত্রীর ভুলত্রুটি নিয়ে সন্তানদের সামনে ভর্ৎসনা করবেন না।

১৯. সপ্তাহে একদিন পুরোপুরি স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে কাটান। ঘরের প্রতিটি কাজ–এমনকি রান্নাবান্নায়ও পিকনিকের মতো অংশ নিন। গ্লাসে পানি ঢেলে খাওয়াসহ নিজের ছোটখাটো কাজ নিজে করুন।

২০. স্ত্রীর যে-কোনো ভুলত্রুটিকে সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করুন এবং রূঢ় ভাষায় সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকুন।

২১. বাইরে কাজ আছে বলে ক্লাব বা 'বন্ধু'দের সাথে তাস খেলে বা ফালতু আড্ডায় সময় নষ্ট না করে পরিবারের আত্মিক ও মানসিক উন্নতির জন্যে সময় ব্যয় করুন।

২২. অন্যের কাছে স্ত্রীর বদনাম করবেন না।

২৩. অপচয় করবেন না। আবেগপ্রসূত কেনাকাটা পরিহার করুন।

২৪. নিজের দোষত্রুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন।

২৫. স্ত্রীর শারীরিক খোঁজখবর নিয়মিত জিজ্ঞেস করুন। অসুস্থ হলে নিজে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন।

২৬. স্ত্রীর যে-কোনো অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শুনুন। কোনো প্রস্তাব বা কথায় প্রথমেই 'না' বলা থেকে বিরত থাকুন।

২৭. স্ত্রীকে গৃহকর্মে ও সন্তান পালনে সাধ্যমতো সাহায্য করুন।

নারী

১. নিজেকে পরিবারের প্রাণ মনে করুন।

২. সংসারের প্রতিটি কাজকে ইবাদত মনে করুন।

৩. স্বামীকে বন্ধু, জীবনসঙ্গী, দিশারি ও পরিবারের প্রধান হিসেবে বিবেচনা করুন।

৪. স্বামীকে লুকিয়ে কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকুন।

৫. স্বামীর ভালো কাজ, অবদান ও কৃতিত্বে গর্ববোধ করুন।

৬. স্বামীর প্রতি সর্বাবস্থায় বিশ্বস্ত থাকুন এবং ভালবাসা ও অনুরাগ প্রকাশ করুন কথা ও আচরণে।

৭. স্বামী-সন্তান বাইরে থেকে আসার সাথে সাথে কোনো সমস্যার কথা বলা বা অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকুন।

৮. কোনো ভুল বা অন্যায় হয়ে গেলে নিঃসংকোচে তা স্বীকার করুন ও স্বামীর কাছে মাফ চেয়ে নিন।

৯. নিজের হাতখরচ থেকে কখনো কখনো সম্ভব হলে স্বামীর জন্যে ছোটখাটো উপহার কিনুন। নিজের অর্জিত অর্থ প্রয়োজনে স্বামী ও সংসারের জন্যে খরচ করুন।

১০. স্বামীর কাছে অযৌক্তিক আবদার করা থেকে বিরত থাকুন।

১১. স্বামীর আয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখুন। আয়ের মধ্যেই সংসারের খরচ সীমিত রাখার চেষ্টা করুন। অতিরিক্ত খরচ ও চাপ সৃষ্টি করে স্বামীকে দুর্নীতিপরায়ণ হতে বাধ্য করবেন না।

১২. যে-কোনো বিপদে বা সংকটে স্বামীর প্রতি পরিপূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন।

১৩. স্বামীর অজ্ঞাতে কাউকে কিছু দেবেন না।

১৪. স্বামীর আত্মীয়স্বজন নিয়ে খোঁটা দেয়া থেকে বিরত থাকুন।

১৫. শ্বশুর-শাশুড়িকে নিজের বাবা-মায়ের মতো শ্রদ্ধা করুন। স্বামীর ভাইবোনদের নিজের ভাইবোনের মতো ভালবাসুন।

১৬. ঘরের খুঁটিনাটি সমস্যা নিজেই সমাধানে সচেষ্ট থাকুন।

১৭. সন্তানের সামনে স্বামীর সাথে ঝগড়া এবং তার ভুলত্রুটি নিয়ে সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকুন।

১৮. চাকরিজীবী হলেও সন্তান ও সংসারের ব্যাপারে যাতে কোনো অবহেলা না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখুন।

১৯. স্বামীর যে-কোনো অক্ষমতা সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করুন।

২০. আত্ম উন্নয়ন ও আত্মিক উন্নয়নে স্বামীকে সহযোগিতা করুন। সুযোগমতো হক্কুল ইবাদ বা সৃষ্টির সেবায় অংশ নিন।

২১. অন্যের কাছে স্বামীকে ছোট করা থেকে বিরত থাকুন।

২২. মা হিসেবে সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো ও সন্তানের মাঝে অনন্য মানুষের গুণাবলিকে বিকশিত করার কাজে সচেষ্ট থাকুন।

২৩. গ্যাসের চুলা প্রয়োজনের বাইরে সবসময় বন্ধ রাখুন। সব ধরনের অপচয়ের বিরুদ্ধে পরিবারের সবার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করুন।

২৪. অভিমান করা, নিজের কষ্টকে বড় করে দেখার প্রবণতা পরিহার করুন।

২৫. ঘরবাড়ি পরিষ্কার ও পরিপাটি রাখার ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকুন।

২৬. পুত্রবধূকে পারিবারিক পরামর্শে অংশীদার করুন।

২৭. শাশুড়ি হিসেবে পুত্রবধূকে প্রতিপক্ষ না ভেবে নিজের কন্যার মতো বিবেচনা করুন এবং পুত্রবধূর ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন।

পরিশেষে বলা যায়—শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির চর্চার পাশাপাশি অন্তরতম সত্তা আত্মাকে আলোকিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্যে স্রষ্টার সরাসরি স্মরণে যদি কিছু সময় ব্যয় করেন, তাহলেই আপনার সৌন্দর্য পূর্ণতা পাবে।

[‘পারিবারিক শিষ্টাচার’ অংশটি মহাজাতকের আত্মনির্মাণ ও আলোকিত জীবনের হাজার সূত্র কোয়ান্টাম কণিকা বই থেকে সংকলিত]

প্রিয় পাঠক,

এ বইয়ের কোনো বিষয় সম্পর্কে আপনার কোনো প্রশ্ন, পরামর্শ বা মতামত থাকলে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে পারেন :

নাহার আল বোখারী
যোগ ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৯৩৫৫৭৫৬
মোবাইল : ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮
E-mail : info@quantummethod.org.bd

নাহার আল বোখারী

জন্ম ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬, বৃহত্তর বরিশালের খেপুপাড়া উপজেলার ধানখালী গ্রামে, পিত্রালয়ে। পিতা আধ্যাত্মিক পুরুষ মরহুম হজরত কফিলউদ্দীন আহমেদ (রহ.)। মা মোহতারেমা হাসেনা বানু। নাহার আল বোখারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগ থেকে এমএসএস করেছেন। পারিবারিক জীবনে গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতকের সহধর্মিণী।

কর্মজীবনে যোগ ফাউন্ডেশন ও কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের গুরু দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশে তিনিই প্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মহিলাদের যোগ ব্যায়াম শিক্ষাদান শুরু করেন ১৯৮৩ সালে যোগ মেডিটেশন কেন্দ্রের মাধ্যমে। তার জনপ্রিয় রান্না শেখানোর প্রতিষ্ঠান 'তাই চি চাইনিজ কুকিং সেন্টার' বন্ধ করে মেডিটেশন ও ব্যায়ামের আধুনিকায়নের গবেষণায় গুরুজীর সাথে আত্মনিয়োগ করেন। সেইসাথে শুরু করেন পরিবার স্বাস্থ্য সৌন্দর্য ও রান্না নিয়ে লেখালেখি। টানা ২২ বছরের গবেষণার ফসল হচ্ছে এই 'রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা'।